আধুনিক ভারতীয় ভাষাপ্রসঙ্গে

পরেশচন্দ্র মজুমদার

আধুনিক ভারতীয় ভাষাপ্রসঙ্গে

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার এম. এ., ডি. লিট্ (ক. বি.)
অধ্যাপক, বাঙলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, কলিকাতা

সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী : কলিকাতা-৬

ADHUNIK BHARATĪYA BHAṢĀ-PRASAṄGE

Paresh Chandra Majumdar

Calcutta, 1987

প্রকাশক
প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ
আগষ্ট, ১৯৮৭

প্রচ্ছদ শিল্পী
সোমজিৎ দাশগুপ্ত

মূল্য : ৫০·০০

মুদ্রাকর
শুভঙ্কর বসু
জে. জি. প্রিন্টার্স
১৮৯ শ্রীঅরবিন্দ সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

অধ্যাপক ড. আনন্দমোহন ঘোষ (বি. ই. কলেজ)
এবং
কল্যাণীয়া শ্রীমতী মীরা ঘোষ

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

A Historical Phonology of Oṛiyā

Studies in the Eastern Aryan Languages

সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ (১ম ও ২য় খণ্ড)

বাঙলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

বাঙলা বানানবিধি

নবচর্যাপদ (সহ-সম্পাদক)

পৃথিবীর ভাষা (যন্ত্রস্থ)

ভূমিকা

ভারত-উপমহাদেশের ভাষা-সমারোহের বর্ণাঢ্য বিস্তার আর তার বিচিত্র বিন্যাস আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীর কাছে কেবল এক জটিল জিজ্ঞাসা নয়, পর্যবেক্ষণের ল্যাবরেটরীও বটে। প্রকৃতই ভারতীয় ভাষার ইতিহাস যেমন সুদূর, ব্যাপ্তিও তেমনি বিশাল। এদের বিকাশ ও বিবর্তনের মূল পদচিহ্ন অনুসরণ ক'রে গেছেন প্রাচীন ভারতীয় বৈয়াকরণ ও আলংকারিকেরা। ভাষা সম্পর্কে তাঁদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী, তথ্যনিষ্ঠা এবং বিশ্লেষণ-পদ্ধতি আজও ভাষাবিজ্ঞানীদের সম্ভ্রম উদ্রেক করে। কিন্তু তবু স্বীকার করতে হবে, তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার রীতি কোনো একটি চরম সিদ্ধান্ত নয়। তাছাড়া যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধিৎসুর অদম্য কৌতূহল আরও সুদূরপ্রসারী না হয়ে পারে না, তার ভাষিক জিজ্ঞাসা আজ আর কেবল ব্যাকরণের সীমিত অন্তঃপুরে অন্তরীণ হতে চায় না। ফলে আধুনিক ভারতীয় ভাষা-চর্চার পরিধি আরও বিস্তীর্ণ হয়েছে নানা ক্ষেত্রে—সাহিত্যের সৃজনশীলতায়, সমাজ ও সংস্কৃতির নৃতাত্ত্বিক ভাষ্যে অথবা ভৌগোলিক প্রতিবেশের নিবিড় মেল-বন্ধনে। গণচেতনা জাগ্রত হওয়ার ফলে এর সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে দুই মেরু-ব্যবধান প্রবণতা—মুক্ত মননের পাশাপাশি ধর্মীয় ও আঞ্চলিক সংকীর্ণতার অতিরেক। ফলে স্বাধীন ভারতের নাগরিকের একদিকে যেমন নিজ মাতৃভাষা সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে, বেড়েছে তার জাতীয় আকাঙ্ক্ষা, সাহিত্যিক বৈভব, অপরদিকে তেমন নতুন ক'রে সৃষ্ট হয়েছে ভাষা সম্পর্কে রাজনৈতিক উগ্র মত্ততা এবং ধর্মীয় দূষণ। ভারতের ভাষাচিত্রে ভাষাসমস্যার কণ্টকহার এখন ফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বস্তুত, ভারতীয় ভাষার সমস্যা এখন বহুমুখী। সদ্য-উদ্ভূত ভাষাতাত্ত্বিক সমস্যাগুলির মধ্যে প্রধান হলো: ভারতীয় ভাষা-মানচিত্রে নানা ভাষাগোষ্ঠীর অবস্থান, জাতি-উপজাতি-সম্প্রদায়-বিভক্ত বিষম জনবিন্যাস, উদ্বাস্তু ভাষাভাষীর জনবিস্ফোরণ অথবা আঞ্চলিক সুনির্দিষ্টতার অভাব। আবার রাষ্ট্রভাষা নির্বাচনের দায়িত্ব, স্বাধীন ভারতে ইংরেজীর যথার্থ মূল্যায়ন বা আঞ্চলিক ও মাতৃভাষা উন্নয়নের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রও তার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। কিন্তু এ-কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে এর সঙ্গে রাজনীতিও আজ জড়িয়ে যেতে বাধ্য। ভাষাকে কেন্দ্র ক'রে **nationality**-র বিরোধ, প্রাদেশিক সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতার জিগির অথবা সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের চেষ্টা ইত্যাদি উত্তপ্ত

বিষয় তাই আজ রাজনীতিক নেতাদের শাণিত হাতিয়ার। আক্ষেপের ব্যাপার এই যে নানা সমস্যাকণ্টকিত বিষয় নিয়ে রাষ্ট্রনীতি আজ দ্বিধাগ্রস্ত, সংশয়াকুল। ফলস্বরূপ, ভারতে আজ নিত্যনতুন রাজ্য গ'ড়ে উঠছে, ভাষিক চেতনার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান হয়ে উঠছে ধর্মীয় আবেগ, বিভিন্ন হোমল্যাণ্ড্ দাবির পক্ষে সোচ্চার হচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়; দেশের অখণ্ডতা প্রতি পদে নির্যাতিত হচ্ছে আর জাতীয় সংহতি উঠছে শিকেয়।

বলা বাহুল্য, এই সব সাম্প্রতিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হলে সর্বপ্রথম দরকার জনগণমানসের প্রস্তুতি, ভারতীয় ভাষাসম্পর্কে অনুধ্যান এবং গণমুখী সচেতনতা। আর সেই উদ্দেশ্য নিয়েই বর্তমান গ্রন্থটি পরিকল্পিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এ-গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য কেবল ভারতীয় ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা নয়, অথবা নয় ভাষার ইতিহাস রচনা। এর উদ্দেশ্য ভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ভারতীয় সংস্কৃতিকে চিনে নেওয়া, তার ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকারকে ফিরে পাওয়া। ভাষা নয়, ভাষাপ্রসঙ্গই এর মূল উপজীব্য। ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, দীর্ঘ কালবাহী পথ-পরিক্রমার ফলে ভারতীয় ভাষার সার্বিক কাঠামোয় যেমন এক আঙ্গিক সংহতি দৃঢ়সন্নদ্ধ হয়ে উঠেছে, তার উপজীব্য বিষয়বস্তুতেও তেমন একটি common core ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠেছে। এ-কথা সত্য, আধুনিক ভাষাগুলির প্রাচীন ও মধ্য যুগে পৌরাণিক ও ধর্মীয় বাতাবরণ বড়ো বেশি স্পষ্ট। কিন্তু সেই ধর্মচেতনার পাশাপাশি বিদেশী-সূত্রে উদ্ভূত (আরবী-ফারসী) বিধর্মীয় গণচেতনার স্বাক্ষরও মুছে ফেলা হয় নি; সেখানে অভিজাত ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যমহিমার পাশে আর্যেতর লোক-ঐতিহ্যও আপন স্থান ক'রে নিয়েছে, অখণ্ড জ্ঞানচর্চার ভূখণ্ডও ভক্তিরসস্রোতে বারবার প্লাবিত হয়েছে; সেখানে দেবনির্ভর মানবতাবাদ থাকলেও আদর্শ মানব সম্পর্কে সাধারণের যে অবচেতন ধারণা, তা কখনও বিমলিন হয়ে যায় নি। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, সামাজিক বৈষম্য, নৃতাত্ত্বিক বিধর্মিতা অথবা ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক সমন্বয় ও সমাজমুখী কল্যাণকামনার অক্ষয় দলিলরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। বলাই বাহুল্য, বর্তমান গ্রন্থে এই উচ্চাশা পূরণের যথাসাধ্য চেষ্টাই আমি করেছি।

এখন গ্রন্থটির পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। প্রথমত, ভাষা বর্গীকরণের পদ্ধতি। ভারতের মাতৃভাষা-ভাষীর বিপুল সংখ্যা (বর্তমানে প্রায় ১৬৫২ টি) বর্গীকরণের সর্বপ্রথম চেষ্টা করেন জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন। স্বাধীনতা-উত্তর যুগের সর্ববৃহৎ ও সুপরিকল্পিত ভাষা-সমীক্ষায় (ইং ১৯৬১) এই বর্গীকরণ-পদ্ধতিই মোটামুটি গৃহীত হয়েছে—যদিও এই পদ্ধতি সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে (এ-বিষয়ে আমার

মতামত যথাস্থানে বিবৃত হয়েছে)। বর্তমান গ্রন্থের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়টি এই ১৯৬১-সমীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, ভারতীয় ১৯৭১-এর জনগণনায় ভাষাসমীক্ষা বিশদভাবে আলোচিত হয় নি, তার প্রয়োজনও ছিল না। তবু এই সমীক্ষা থেকে আহৃত ভাষিক তথ্যগুলি পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিভিন্ন ভাষার বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। এই গ্রন্থের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের সঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর আরও পার্থক্য আছে। প্রথমাংশটি ১৯৬১-সমীক্ষা অনুযায়ী মাতৃভাষা-ভিত্তিক আলোচনা। কিন্তু পরবর্তী ভাষার আলোচনা মুখ্যত উপভাষাকেন্দ্রিক। অপর পার্থক্য, প্রথম অংশের বর্গীকরণ-পদ্ধতি প্রধানত গ্রীয়ার্সনের কিন্তু দ্বিতীয় অংশে গ্রীয়ার্সনের ভাষিক বিন্যাস মেনে নিয়েও ভারতীয় ভাষাগুলিকে আঞ্চলিক পরিসীমায় বিন্যস্ত করেছি সাধারণ পাঠকদের সুবিধে হবে জেনে।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ভাষার আপেক্ষিক মর্যাদা। ভারতের সংবিধান-স্বীকৃত ভাষাগুলি বর্তমান গ্রন্থে যেমন প্রাধান্য পেয়েছে, তেমন অন্যান্য ভাষা/উপভাষা, এমনকি বহির্ভারতীয় আর্যভাষাগুলিও বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। তবে সংবিধান-স্বীকৃত ভাষাগুলিকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বেশি, বিশেষত রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দীকে।

তৃতীয়ত, বর্তমান গ্রন্থে সাহিত্য-ইতিহাসের কালসীমা। আলোচ্য ভাষাগুলির প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসের দিকেই আমি নজর দিয়েছি অধিক। এর কারণ, ভারতীয় ভাষার ঐতিহাসিক মানচিত্র উদ্ঘাটনই আমার মূল লক্ষ্য। সুতরাং বলা যেতে পারে, আধুনিক সাহিত্যের বিবরণ আমি সচেতনভাবেই বাদ দিয়েছি। ভারতীয় সাহিত্যে আধুনিকতা বলতে বুঝি উনিশ শতকীয় মূল্যবোধ। ভারতীয় সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব, গদ্যরচনার আবির্ভাব, সংবাদপত্র প্রকাশ ও সমাজ-সচেতনতা এবং সেইসঙ্গে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় চেতনা থেকে ক্রমিক মুক্তির মধ্য দিয়েই আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভব। ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে এ-ইতিহাস রচনার জন্য আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী ও পর্যবেক্ষন রীতির প্রয়োজন। সে-দায়িত্ব বর্তমানে আমি গ্রহণ করতে চাই নি।

এই গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে পাঠকের কাছে আমার কিছু কৈফিয়ৎও দেওয়ার আছে। এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল সত্তরের দশকে। কাজেই সমসাময়িক তথ্য ও উপাদান ছিল এই গ্রন্থের ভিত্তিভূমি। তাছাড়া এই গ্রন্থের একমাত্র মূল পুঁথি প্রকাশকের ঘরে বন্দী ছিল গত ছ'বছর। ফলে কালানুগত নতুন তথ্য এতে সংযোজন করা সম্ভব হয় নি। পরবর্তী সংস্করণে সে-চেষ্টা করবো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই গ্রন্থের কিছু কিছু

অংশ প্রবন্ধাকারে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান (অধুনা মৃত) প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

পরিশেষে দুঃখের সঙ্গে জানাই, এই গ্রন্থ প্রকাশিত হতে দেখলে যিনি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হতেন, তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। ভাষাচার্য ৺সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আজ আমাদের মধ্যে না থাকলেও তাঁর আশীর্বাদ আমার পাথেয় হয়ে আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগ, পালি বিভাগ ও ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ, বিশেষত ডঃ সূর্যদেও শাস্ত্রী এবং আমার ছাত্রী অধ্যাপিকা কৃষ্ণা ভট্টাচার্য এবং ছাত্রদের নিকটও আমি অনেক বিষয়ে ঋণী। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ অশোক ভট্টাচার্য (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) আমার কেবল ঘনিষ্ঠ বন্ধু নন, প্রাজ্ঞ পথ-প্রদর্শকও বটে। আমার পুত্র শ্রীমান অভিজিৎ মজুমদার এবং ছাত্র শ্রীসর্বনাথ ভট্টাচার্য এম. এ. এই গ্রন্থের "ভাষা-সূচী" প্রণয়ন সম্বন্ধে আগ্রহী না হলে তা সংযোজন করা সম্ভব হতো না। সর্বশেষে প্রকাশক সারস্বত লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষকে এইজাতীয় চিন্তামূলক রচনা প্রকাশের আগ্রহ ও প্রকাশনার দুরূহ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। প্রকাশকের তরফে শ্রীমান অরিন্দম ভট্টাচার্যের তারুণ্যোচিত উদ্যম ও নিরলস সহায়তা না পেলে এ-গ্রন্থ আদৌ প্রকাশিত হতো কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। নির্ভুল মুদ্রণ ও পারিপাট্যের জন্য প্রচুর শ্রম স্বীকার করেছেন জে. জি. প্রিন্টার্সের কর্মীবৃন্দ। তাঁরাও ধন্যবাদার্হ। এই গ্রন্থের ভারতীয় ভাষার মানচিত্রটি অঙ্কন করেছে শ্রীমান্ দিব্যেন্দু মজুমদার (সংস্কৃত কলেজ, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ)। আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তাকেও ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার
১৫ই আগষ্ট, ১৯৮৭

॥ ঋতায়ন ॥
পঞ্চবটী, নাটাগড়
পো. অ. সোদপুর
উত্তর চব্বিশ পরগণা

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ভূমিকা	[v—viii]
	বিস্তারিত সূচীপত্র	[x—xii]
	সংকেত-চিহ্ন	[xiii]
	গ্রন্থ-সংকেত	[xiv—xvi]
	ভারতীয় ভাষার মানচিত্র	[xvii]
॥ ১ ॥	পৃথিবীর ভাষা	১—১৩
॥ ২ ॥	ভারতীয় আর্যভাষার পটভূমি	১৪—২৪
॥ ৩ ॥	ভারতীয় ভাষাসমীক্ষার ইতিহাস	২৫—৩৭
॥ ৪ ॥	ভারতের ভাষাচিত্র (১৯৬১): ইন্দো-ইউরোপীয়	৩৮—৬৪
॥ ৫ ॥	ভারতের ভাষাচিত্র (১৯৬১): অ-ইন্দো-ইউরোপীয়	৬৫—৭৬
॥ ৬ ॥	পূর্ব ভারতের প্রধান ভাষা	৭৭—১২৮
॥ ৭ ॥	মধ্য ভারতের প্রধান ভাষা	১২৯—১৭৩
॥ ৮ ॥	পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা	১৭৪—১৯৩
॥ ৯ ॥	দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা	১৯৪—২০১
॥ ১০ ॥	উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা	২০২—২০৯
॥ ১১ ॥	দক্ষিণ ভারতের প্রধান ভাষা	২১০—২৪৪
॥ ১২ ॥	বহির্ভারতীয় আর্য ভাষা	২৪৫—২৫৯
॥ ১৩ ॥	নব্য ভারতীয় আর্য: ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ	২৬০—২৭৯
॥ ১৪ ॥	ভারতীয় লিপি	২৮০—২৮৪
॥ ১৫ ॥	ভারতীয় ভাষা: নির্বাচিত নিদর্শন	২৮৫—২৯২
পরিশিষ্ট ॥ ১ ॥	ভারতীয় মাতৃভাষার পরিসংখ্যান (১৯৬১)	২৯৩
পরিশিষ্ট ॥ ২ ॥	সংবিধান-স্বীকৃত প্রধান ভারতীয় ভাষা (১৯৬১)	২৯৪
পরিশিষ্ট ॥ ৩ ॥	ভারতীয় প্রধান ভাষা ও ভাষিক বিন্যাস (১৯৭১)	২৯৫—২৯৬
ভাষা-সূচী		২৯৭—৩০২
শুদ্ধিপত্র		৩০৩

বিস্তারিত সূচীপত্র

॥ ১ ॥ পৃথিবীর ভাষা — পৃঃ ১-১৩

১.১ ভাষার বর্গীকরণ

১.২ পৃথিবীর ভাষা-পরিবার

॥ ২ ॥ ভারতীয় আর্য ভাষার পটভূমি — পৃঃ ১৪-২৪

২.১ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবার

২.২ ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য—২.২.১ দর্দিক শাখা ;—২.২.২ ইরানীয় শাখা ;—২.২.৩ ভারতীয় আর্য

॥ ৩ ॥ ভারতীয় ভাষাসমীক্ষার ইতিহাস — পৃঃ ২৫-৩৭

৩.১ ভারতীয় ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব

৩.২ ভারতীয় ভাষা ও জনসমীক্ষা

৩.৩ জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন—৩.৩.১ গ্রীয়ার্সন ও **Linguistic Survey of India**

৩.৪ সাম্প্রতিক ভাষাসমীক্ষা (১৯৬১-১৯৭১)

॥ ৪ ॥ ভারতের ভাষাচিত্র (১৯৬১) : ইন্দো-ইউরোপীয় — পৃঃ ৩৮-৬৪

৪.১ ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠী

৪.২ ইন্দো-ইউরোপীয়

৪.৩ ভারতীয় আর্য—৪.৩.১ ভারতীয় আর্য : বহিরঙ্গ শাখা ;—৪.৩.২ ভারতীয় আর্য : অন্তর্বর্তী শাখা ;—৪.৩.৩ ভারতীয় আর্য : অন্তরঙ্গ শাখা ;—৪.৩.৪ প্রাচীন / মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা

৪.৪ বিদেশী ভাষা

৪.৫ অবর্গীভূত ভাষা

॥ ৫ ॥ ভারতের ভাষাচিত্র (১৯৬১) : অ-ইন্দো-ইউরোপীয় — পৃঃ ৬৫-৭৬

৫.১ ভোট-চীনা বা চীনা-তিব্বতীয়

৫.২ অস্ট্রো-এশিয়াটিক

৫.৩ দ্রাবিড়

॥ ৬ ॥ পূর্ব ভারতের প্রধান ভাষা পৃঃ ৭৭-১২৮

৬.১ বাঙলা—৬.১.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;—৬.১.২ প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস ;—৬.১.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৬.২ ওড়িয়া—৬.২.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;—৬.২.২ প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস ;—৬.২.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৬.৩ অসমীয়া—৬.৩.১ ভাষা, নৃতত্ত্ব এবং ইতিহাস ;—৬.৩.২ প্রাচীন সাহিত্য ;—৬.৩.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৬.৪ বিহারী ভাষাবর্গ—৬.৪.১ ভোজপুরী ;—৬.৪.২ মগহী / মগধী ;—৬.৪.৩ মৈথিলী

॥ ৭ ॥ মধ্য ভারতের প্রধান ভাষা পৃঃ ১২৯-১৭৩

৭.১ উর্দু—৭.১.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;—৭.১.২ সাহিত্যের ইতিহাস

৭.২ হিন্দী—৭.২.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;—৭.২.২ 'হিন্দী' অভিধার সংজ্ঞা ও ইতিহাস ;—৭.২.৩ ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস ;—৭.২.৪ পশ্চিমা হিন্দী ও হিন্দী

৭.৩ পূর্বী হিন্দী / কোশলী—৭.৩.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;—৭.৩.২ প্রাচীন সাহিত্য ;—৭.৩.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৭.৪ রাজস্থানী—৭.৪.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;—৭.৪.২ প্রাচীন সাহিত্য ;—৭.৪.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

॥ ৮ ॥ পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা পৃঃ ১৭৪-১৯৩

৮.১ গুজরাটী—৮.১.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;—৮.১.২ ঐতিহাসিক পটভূমি ;—৮.১.৩ প্রাচীন সাহিত্য ;—৮.১.৪ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৮.২ পাঞ্জাবী—৮.২.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;—৮.২.২ প্রাচীন সাহিত্য ;—৮.২.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৮.৩ সিন্ধী—৮.৩.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;—৮.৩.২ ঐতিহাসিক পটভূমি ;—৮.৩.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

॥ ৯ ॥ দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা পৃঃ ১৯৪-২০১

৯.১ মারাঠী—৯.১.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;—৯.১.২ প্রাচীন সাহিত্য ;—৯.১.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

॥ ১০ ॥ উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা পৃঃ ২০২-২০৯

১০.১ কাশ্মীরী—১০.১.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;—১০.১.২ কাশ্মীর ও কাশ্মীরী সাহিত্য ;—১০.১.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

॥ ১১ ॥ দক্ষিণ ভারতের প্রধান ভাষা পৃঃ ২১০-২৪৪

১১.১ তামিল—১১.১.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;—১১.১.২ ভাষা ও সাহিত্য ;—১১.১.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১১.২ মালয়ালম্—১১.২.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;—১১.২.২ ভাষা ও সাহিত্য ;—১১.২.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১১.৩ কানাড়ী / কন্নড়—১১.৩.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;—১১.৩.২ ভাষা ও সাহিত্য ;—১১.৩.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১১.৪ তেলুগু—১১.৪.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;—১১.৪.২ ভাষা ও সাহিত্য ;—১১.৪.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

॥ ১২ ॥ বহির্ভারতীয় আর্য ভাষা পৃঃ ২৪৫-২৫৯

১২.১ নেপালী—১২.১.১ ভাষিক পরিস্থিতি ;—১২.১.২ নেপাল ও নেওয়ারী ;—১২.১.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১২.২ সিংহলী

১২.৩ জিপসী বা রোমনী

॥ ১৩ ॥ নব্য ভারতীয় আর্য : ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ পৃঃ ২৬০-২৭৯

১৩.১ বিবর্তনের পদচিহ্ন

১৩.২ সাধারণ ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ ;—১৩.২.১ ধ্বনিতত্ত্ব ;—১৩.২.২ রূপতত্ত্ব ;—১৩.২.৩ বাক্যরীতি

॥ ১৪ ॥ ভারতীয় লিপি পৃঃ ২৮০-২৮৪

১৪.১ খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপি

১৪.২ আধুনিক ভারতীয় লিপি

॥ ১৫ ॥ ভারতীয় ভাষা : নির্বাচিত নিদর্শন পৃঃ ২৮৫-২৯১

১৫.১ ভারতীয় আর্য শাখা (ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী)

১৫.২ ভারত-বহির্ভূত আর্য ভাষা

১৫.৩ দ্রাবিড় গোষ্ঠী

১৫.৪ অষ্ট্রিক বা নিষাদ গোষ্ঠী

১৫.৫ ভোট-চীনা বা কিরাত গোষ্ঠী

সংকেত-চিহ্ন

´ স্বরোপরি চিহ্ন শ্বাসাঘাত (Stress) বা স্বরসঞ্চার (Pitch) জ্ঞাপক।

/ বিকল্প বা সমান্তরাল প্রয়োগ জ্ঞাপক (যেমন, সং/প্রা অর্থাৎ সংস্কৃত এবং / অথবা প্রাকৃত)।

˘ স্বরোপরি মাত্রা হ্রস্বতা জ্ঞাপক (যেমন এ̆ = হ্রস্ব 'এ' ধ্বনি)।

' ব্যঞ্জনধ্বনির বা স্বরধ্বনির পরবর্তী চিহ্ন বিশেষ ধরণের ব্যঞ্জন বা স্বরধ্বনি জ্ঞাপক।

< উৎপত্তির বা পূর্ববর্তী রূপের গতিদ্যোতক চিহ্ন, যেমন—ক<খ অর্থাৎ ক, খ থেকে উৎপন্ন।

> পরিণতি বা বিকাশের গতিদ্যোতক চিহ্ন, যেমন—ক>খ অর্থাৎ খ, ক থেকে উৎপন্ন।

* অনুমানসিদ্ধ, সম্ভাব্য বা পুনর্গঠিত রূপ।

= সমান পর্যায় দ্যোতক চিহ্ন, সগোত্রজ।

? সন্দেহজ্ঞাপক রূপ (Form)।

√ ধাতুবাচক চিহ্ন (যেমন, যা ধাতু = √ যা)।

- বর্ণের পূর্বে অন্ত্যবর্ণ সূচক (যেমন, -ইল : যাইল); পরে আদি বর্ণসূচক (যেমন, বে- : বেপরোয়া); বর্ণের পূর্বে ও পরে ধ্বনিজ্ঞাপক বা মধ্যগত বর্ণসূচক (যেমন, -গ- : আগত)। পদমধ্যস্থিত চিহ্ন সমাসগত (যেমন, ভাল-মন্দ)।

[ ] বন্ধনীভুক্ত ধ্বনি আন্তর্জাতিক ধ্বনি বা উচ্চারণ প্রকৃতি জ্ঞাপক (Phonetic)।

/ / বন্ধনীভুক্ত ধ্বনি ধ্বনিমান-জ্ঞাপক (Phonemic)।

: স্বরধ্বনির পরবর্তী চিহ্ন দীর্ঘত্ব জ্ঞাপক (যেমন এ: = দীর্ঘ এ)।

গ্রন্থ-সংকেত

AFD Assamese, its Formation and Development : B. Kakati, Revised 2nd edition, Gauhati, 1962.

CGDL A Comparative Grammar of the Dravidian Languages : R. Caldwell, University of Madras, reprint, 1961.

CGMAL A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India (3 vols.) : J. Beames, London, 1872, 1875, 1879. Reprint in one Vol., Delhi, 1966.

CHI Cultural Heritage of India (5 vols.) : Ramkrishna Mission Institute of Culture.

CI Census of India (1961 and 1971).

CIL Contemporary Indian Literature : M. Mansinha, Sahitya Akademi, 2nd edition, 1959.

EAW Evolution of Awadhī : B. Saksena, Allahabad, 1937.

EI *Epigraphica Indica* : edited by Sircar and Krishnan.

EOLS The Evolution of Oṛiyā Language and Script : K. B. Tripathi, Cuttack, 1962.

ESL Elements of the Science of Language : I. J. S Taraporewala. Revised edition, C. U. 1962.

ESPG The Eastern School of Prākrit Grammarians : S. R. Banerji, Calcutta, 1977.

FA দ্র. AFD

GSDL The Grammatical Structure of Dravidian Languges : Jules Bloch, Poona, 1954.

HL Historical Linguistics and Indo-Aryan Languages : A. M. Ghatage, Bombay, 1962.

HOL History of Oṛiyā Literature : M. Manisinha, New Delhi, 1962.

HOM Historical Oṛiyā Morphology : Mrs. H. Misra, Varanasi.

HPO A Historical Phonology of Oṛiyā : P. C. Majumdar, Calcutta, 1970.

IA *Indian Antiquary*, Bombay.

IAP An Introduction to Assamese Phonology : G. C. Goswami, Poona, 1966.

JAS *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Calcutta. Formerly known as JRASB.

JASB द्र. JAS

JRAS *Journal of the Royal Asiatic Society*, London.

KJK Kirāta-Jana-Kṛti : S. K. Chatterji, 2nd edition, Calcutta, 1974.

LH Language Handbook on Mother tongues in Census (Census of India, 1971), New Delhi, 1972.

LLMI Lauguages and Literatures of Modern India : S. K. Chatterji, Calcutta, 1963.

LM La Formation de la Langue Marathe : J. Bloch, Paris, 1919 (English Translation, Poona ; Marāṭhī Translation : V. G. Paranjape, Poona, 1941).

LSI Linguistic Survey of India : G. A. Grierson (with Sten Konow), Calcutta, 1903-27.

ND A Comparative and Etymological Dictionary of the Nepali Language : R. L. Turner, London, 1931.

ODBH The Origin and Development of Bhojpurī : U. N. Tewari, Calcutta, 1960.

ODBL The Origin and Development of the Bengali Language (2 Vols.) : S. K. Chatterji, Calcutta, 1926. Reprint with Supplementary Vol. III, London, 1970.

PLCO The People, Language and Culture of Orissa : S. K. Chatterji, Orissa Sahitya Akademi, Bhubaneswar, 1966.

PP A Phonology of Pañjābī and Ludhiani Phonetic Reader : B. D. Jain, Lahore, 1934.

TSOL Typical Selections from Oṛiyā Literature (in 3 Vols.), Compiled and edited by B. C. Mazumdar, C. U, 1921.

ZDMG *Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft.*

বা ভা প বাঙলা ভাষা পরিক্রমা (২ খণ্ড) : পরেশচন্দ্র মজুমদার, ১ম সংস্করণ, কলিকাতা, বাং ১৩৮৩, ১৩৮৬।

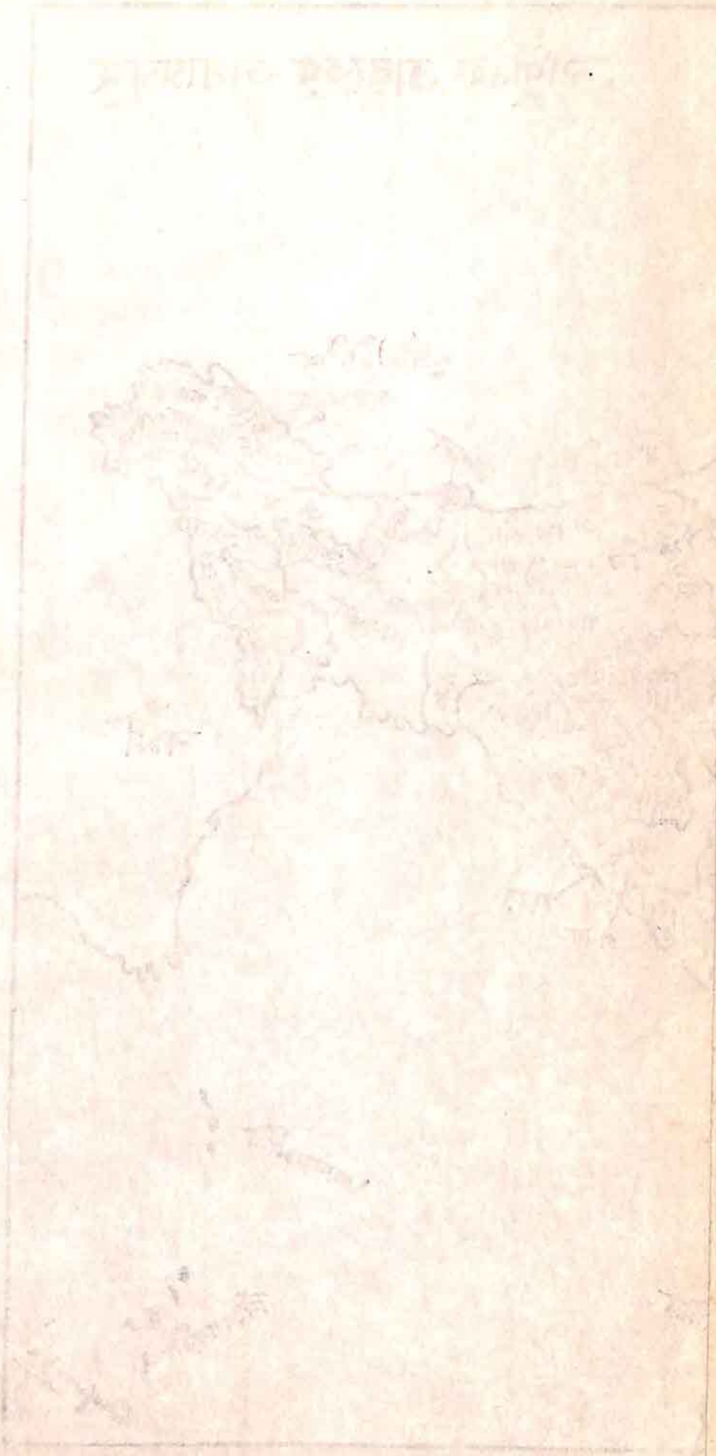
ভা প্র ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ক. বি, ২য় সংস্করণ, ১৯৪২।

ভা ভা ভারতের ভাষা : গোপাল হালদার, কলিকাতা, ১৯৬৭।

ভা ভা স ভারতের ভাষা ও ভাষা-সমস্যা : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, বাং ১৩৫১।

[অন্যান্য উৎসের জন্য যথাস্থানে পাদটীকা দ্রষ্টব্য]

ইন্দে
প্রা
অ
জো



॥ ১ ॥

পৃথিবীর ভাষা

১.১ ভাষার বর্গীকরণ

সারা পৃথিবীতে প্রায় তিন হাজার প্রধান প্রধান ভাষা প্রচলিত আছে। এই ভাষাগুলিকে আনুমানিক ২৫।২৬টি ভাষাগোষ্ঠী বা ভাষাপরিবারের (**Language Families**) অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। যে-কোনো ভাষাকে একটি বিশেষ ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত করার পেছনে রয়েছে এক বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। অবশ্য ভাষার বর্গীকরণ (**Classification**) নানা উপায়েই করা যায়। তবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হলো গোত্রগত বা বংশানুগত বর্গবিভাগ (**Genealogical Classification**)। এই পদ্ধতির মোটামুটি রূপরেখা টানা যায় এইভাবে :

অতীতের কোনো একটি ভাষা ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে যদি দুই বা ততোধিক ভাষায় ক্রমশ বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে, তবে সেই বিবর্তিত ভাষাগুলি সমগোত্রজ (**Cognate**) ব'লে বিবেচিত হবে। দুটি ভাষার গোত্রনির্ণয়ের জন্য তাই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন তাদের তুলনামূলক ঐতিহাসিক বিবরণ। বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত সমার্থক শব্দভাণ্ডার এবং রূপগত উপকরণ বা উপাদানের মধ্যে যদি বিশেষ কোনো সাদৃশ্য দেখা যায় অথবা আপাত-বৈসাদৃশ্যের মধ্যে যদি কোনো গূঢ় নিয়মসূত্র (**Law**) আবিষ্কার করা যায়, তবে ঐ ভাষাগুলির সম্পর্ক অবশ্যই মৌলিক ব'লে স্বীকার করতে হয়। আর এই সম্পর্ক নির্ণয়ের গোড়ার কথাটি হলো—তুলনামূলক বিচারের দ্বারা আলোচ্য ভাষাগুলির অতীত ইতিহাস পুনর্গঠন (**Comparative and Historical Method**)। উদাহরণস্বরূপ, সংস্কৃত *mātā*=গ্রীক *mātēr*=লাতিন *māter*=ইংরেজী ***mother***—এই সমীকরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভাষাগুলি সমগোত্রজ। কারণ, অর্থ ও ধ্বনিগত সাদৃশ্য ভাষাগুলির সাধারণ লক্ষণ। ধ্বনি-বৈষম্য থাকলেও (যেমন উপরের উদাহরণে সংস্কৃত ***t***=ইংরেজী ***th***) তা নিয়মের ব্যতিক্রম নয় মোটেই। এই ব্যতিক্রমই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্যত্র, যেমন তুলনীয়, সংস্কৃত ***pitā, bhrātā***=ইংরেজী ***father, brother*** ইত্যাদি। অবশ্য ধ্বনিবৈষম্যের জটিল ক্ষেত্রগুলিতে (এ-ক্ষেত্রে স্বরধ্বনিগুচ্ছ) অধিকাংশ ভাষার সাক্ষ্য এবং / অথবা প্রাচীনতম রচনানিদর্শন অধিক গ্রহণযোগ্য। তবে দুই বা ততোধিক ভাষা একই গোষ্ঠীভুক্ত কি না বিচার করতে হলে ভাষাগুলির নিজস্ব উপাদানের তুলনামূলক বিচার সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। 'নিজস্ব উপাদানে'র

অর্থ—ভাষার সেই উপাদান যা সহজে অন্য ভাষার দ্বারা স্থানচ্যুত হয় না, যথা, পিতা / মাতা জাতীয় শব্দ, সংখ্যাবাচক শব্দ, সর্বনাম, বহুল-প্রচলিত ধাতু ইত্যাদি। যাই হোক, এই মানদণ্ড অনুযায়ী সমস্ত ভাষা-পরিবারের নামকরণ করা যায় এইভাবে—

(১) ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European), (২) সেমীয়-হামীয় (Semito-Hamitic); (৩) য়ুরালীয় বা ফিন্নো-উগ্রীয় (Uralic or Finno-Ugrian); (৪) আলতাইক (Altaic); (৫) জাপানী ও কোরীয় (Japanese and Korean); (৬) এস্কিমো (Eskimo); (৭) ককেশীয় (Caucasian); (৮) আইবেরীয়-বাস্ক্ (Ibero-Basque); (৯) এশীয় বা প্রায়-প্রাচ্য (Asianic or Near Eastern); (১০) হাইপারবোরীয় বা প্রাচীন এশীয় (Hyperborean or Palaeo-Asiatic); (১১) বুরুশাস্কি (Burushaski); (১২) দ্রাবিড় (Dravidian); (১৩) আন্দামানী (Andamanese); (১৪) চীনা-তিব্বতীয় বা ভোট-চীনা (Sino-Tibetan); (১৫) লা-তি (La-Ti); (১৬) অস্ট্রো-এশীয় (Austro-Asiatic or South East Asiatic); (১৭) মালয়ী-পলিনেশীয় (Malayo-Polynesian or Austronesian); (১৮) প্যাপুয়ান (Papuan); (১৯) তাসমানীয় (Tasmanian); (২০) অস্ট্রেলীয় (Australian); (২১) সুদানী-গিনীয় (Sudano-Guinean); (২২) বান্টু (Bantu); (২৩) হটেন্‌টট্-বুশমান্ (Hottentot-Bushman); (২৪) উত্তর আমেরিকাদেশীয় (North American); (২৫) মধ্য আমেরিকাদেশীয় (Central American or Mexican); (২৬) দক্ষিণ আমেরিকাদেশীয় (South American)।

ভাষার বর্গীকরণের আর একটি পদ্ধতি হলো রূপতত্ত্বনির্ভর (Morphological)। রূপতত্ত্ব বিচারে ঐতিহাসিক বা গোত্রগত সম্পর্ক সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে বিভিন্ন ভাষার বাক্য-বিন্যাস বা পদবিশ্লেষণের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়। ফলে বিভিন্ন ভাষার সাংগঠনিক (Structural) অবয়বটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই পদ্ধতিকে এক হিসেবে বলা চলে বর্ণনামূলক (Descriptive)। এই বর্গবিভাগ (Classification) অনুযায়ী ভাষাগোষ্ঠীর প্রকারভেদ দেখানো যায় এইভাবে—

(ক) অনন্বয়ী (Isolating) বর্গ :

এইজাতীয় ভাষাতে ব্যাকরণগত পদবিভাগ নেই অর্থাৎ ক্রিয়া, বিশেষ্য, বিশেষণ প্রভৃতির কোনো পার্থক্য নেই। শব্দ বা পদগঠনে বিভক্তি যোগেরও দরকার হয় না, বাক্যের মধ্যে তাদের নির্দিষ্ট অবস্থান অনুযায়ী তাদের ব্যাকরণগত আচরণ (Function) প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ, চীনাগোষ্ঠীর ভাষা বা ভারতীয় ভোট-চীনা ভাষা।

(খ) মুক্তান্বয়ী (Agglutinating) বর্গ :

এই বর্গের ভাষায় পদ গঠিত হয় বিভক্তি বা প্রত্যয়ের সাহায্যেই কিন্তু এই বিভক্তিগুলির স্বতন্ত্র অর্থ সর্বদাই বজায় থাকে, সেগুলিকে স্বাধীনভাবে যে-কোনো পদ গঠনে ব্যবহারও করা যায়, যেমন তুর্কী বা দ্রাবিড় ভাষায়।

(গ) প্রত্যয়ান্বয়ী বা সমন্বয়ী (Inflectional/Synthetic) বর্গ :

এইজাতীয় ভাষায় ব্যাকরণগত সম্পর্ক নির্ধারিত হয় প্রত্যয়-বিভক্তি, উপসর্গ যোগে বা গুণ-বৃদ্ধি (অপশ্রুতি/Ablaut) প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সাহায্যে। মুক্তান্বয়ী ভাষার মতো অবশ্য প্রত্যয়-বিভক্তির কোনো স্বতন্ত্র অর্থ বা স্বাধীন সত্তা নেই। এগুলি অনেক আগে সম্ভবত পূর্ণ শব্দ ছিল, এখন পরিণত হয়েছে অর্থহীন শব্দাংশে। উদাহরণস্বরূপ, সংস্কৃত, ইংরেজী প্রভৃতি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা অথবা সেমীয়-হামীয় গোত্রের ভাষাগুচ্ছ।

(ঘ) অত্যন্বয়ী (Incorporating) বর্গ :

এই বর্গভুক্ত ভাষার বৈশিষ্ট্য হলো : যে যে শব্দ বা শব্দাংশ নিয়ে বাক্য রচিত হয়, সেগুলির কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নেই, সেগুলি কেবল কিছু অসম্পূর্ণ ভাবের বাহক মাত্র। কাজেই এক্ষেত্রে শব্দ বা পদ নয়, বাক্যই হলো বাগ্‌ধারার নিম্নতম বা প্রান্তিক সীমা। উদাহরণস্বরূপ, এস্কিমো ভাষার নিদর্শন উদ্ধৃত করা যেতে পারে : *aulisariartorsuarpok* "সে তাড়াতাড়ি মাছ ধরতে যাচ্ছে" = *aulisar* "মাছ ধরা" + *peartor* "কাজে নিযুক্ত হওয়া" + (*pinne*) *suarpok* "সে তাড়াতাড়ি যাচ্ছে"।

ভৌগোলিক অবস্থিতি বিচার করেও ভাষার বর্গীকরণ করা যায়, অন্তত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে—যেখানে সম্পর্কিত ভাষাগুলির নিদর্শন লুপ্ত অথবা নগণ্য। এরূপক্ষেত্রে গোত্রবন্ধন বা বর্গনির্ণয় সম্ভব নয় ব'লে ভাষাগুলি অবর্গীয় (Unclassified) রয়ে গেছে, যেমন, অস্ট্রেলিয়া বা আমেরিকার আদিম ভাষাবর্গ।

এখন ভৌগোলিক তথা গোত্রবিচারের মানদণ্ডে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া যাক।

১.২ পৃথিবীর ভাষা-পরিবার

১. ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European) : এই গোষ্ঠীভুক্ত মুখ্য ভাষাগুলির আনুমানিক সংখ্যা ১৩২, ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ১৬০ কোটি। ভারতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষীর সংখ্যা ৩২ কোটি ১৭ লক্ষ ২০ হাজার ৭০০। মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত মোট ভাষার সংখ্যা ৫৭৪ (ভারতীয় ১৯৬১ সনের জনসমীক্ষা

অনুযায়ী)। ভাষাতত্ত্ব বিচারে এই ভাষা সমন্বয়ী (Inflecting)। ভারতের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

২. দ্রাবিড় (Dravidian) : এই বর্গভুক্ত প্রধান ভাষাগুলির সংখ্যা প্রায় ২৬টি। এর অন্তর্গত ব্রাহুই ভাষা কেবল ভারতের বহির্ভূত অঞ্চলে অর্থাৎ পাকিস্তানে প্রচলিত। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের হিসেবে ভারতে প্রচলিত ভাষাগুলির সংখ্যা ১৫৩। মোট দ্রাবিড়-বর্গীয় ভাষাভাষীর সংখ্যা ১০ কোটি ৭৪ লক্ষ ১০ হাজার ৮১০। এর মধ্যে সংবিধানে-স্বীকৃত তামিল, তেলুগু, মালয়ালম্ ও কানাড়ী ভাষাভাষীর সংখ্যা ১০ কোটি ২৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৪৪৭ (অর্থাৎ মোট দ্রাবিড় ভাষীর শতকরা ৯৫.৫৮ ভাগ)। ভাষাতত্ত্বের বিচারে এই ভাষা মুক্তান্বয়ী (Agglutinating)। বিস্তৃত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

৩. অস্ট্রো-এশিয়াটিক (Austro-Asiatic) : ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা অঞ্চল জুড়ে এই ভাষাগোষ্ঠী ছড়িয়ে আছে। প্রধান ভাষার আনুমানিক সংখ্যা ৫২। ভারতে অষ্ট্রিক বা নিষাদ ভাষাভাষীর সংখ্যা ৬১ লক্ষ ৯২ হাজার ৪৯৫। ভারতে এই গোষ্ঠীভুক্ত মাতৃভাষার সংখ্যা ৬৫ (মুণ্ডা শাখার ৫৮টি এবং মোন্-খ্মের শাখার ৭টি)। ১৯৬১ সনের জনগণনা অনুযায়ী ভারতীয় জনগণের ১.৫ শতাংশ অষ্ট্রিক ভাষায় কথা বলেন। অস্ট্রো-এশিয়াটিক শাখা সম্ভবত ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভাষাগোষ্ঠী। ভাষাতত্ত্বের বিচারে এই ভাষাগুলি মুক্তান্বয়ী (Agglutinating)।

৪. ভোট-চীনা বা চীনা-তিব্বতীয় (Sino-Tibetan) : ভোট-চীনা বা কিরাতগোষ্ঠীর ভাষাবর্গ চীন, তিব্বত, বর্মা, শ্যাম, আন্নাম এবং ভারতের অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে লদাখ ও বাল্তীস্থান থেকে নেফা (NEFA) বা অরুণাচল এবং পূর্ব আসামের দক্ষিণ প্রান্তিক অঞ্চল পর্যন্ত এই ভাষাগুলি প্রসার লাভ করেছে। এই গোষ্ঠীভুক্ত প্রধান ভাষাগুলির সংখ্যা প্রায় ১১৫, সাম্প্রতিক লোকগণনা (১৯৬১) অনুযায়ী ভারতে প্রচলিত এই গোষ্ঠীভুক্ত মাতৃভাষার সংখ্যা ২২৬ (ভোট-বর্মী ২২৫)। মোট ভোট-চীনাভাষীর সংখ্যা পৃথিবীতে ৭৫ কোটিরও অধিক, ভারতে ৩১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮০০। সমগ্র ভারতীয় জনগণের ০·৭৩ শতাংশ এই বর্গের ভাষায় কথাবার্তা বলেন। ভাষাতত্ত্বের বিচারে ভোট-চীনা অনন্বয়ী (Isolating)। বিস্তৃত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

৫. আন্দামানী (Andamanese) : আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত আন্দামানীর মোট ভাষার সংখ্যা ১২। বর্তমানে এই গোষ্ঠীর ভাষা ক্ষীয়মাণ। গ্রীয়ার্সনের গণনা অনুযায়ী আন্দামানী ভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল ১৮৮২, কিন্তু সাম্প্রতিক সমীক্ষায় (১৯৬১)

গ্রেট আন্দামানী-ভাষী সংখ্যায় মাত্র ১৯। এখনও ভাষাগুলি অবর্গীভূত রয়েছে। ধ্বনিতত্ত্ব বিচারে দেখা যায় 'স্' এবং অন্যান্য উষ্মধ্বনির অভাব, উপসর্গ ও প্রত্যয়ের প্রয়োগ-প্রাচুর্য, লিঙ্গ বিচারে সচেতন ও অচেতন বিভাগ ইত্যাদি। সংখ্যাবাচক শব্দের মধ্যে মেলে কেবল এক বা দুইবোধক সংখ্যা। দশের উর্ধ্বে গণনারীতি নেই। রূপতত্ত্ব বিচারে এই ভাষা আংশিক মুক্তান্বয়ী (**Partial Agglutinating**)।

৬. বুরুশাস্‌কী বা খাজুনা (**Burushaski**): ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রত্যন্ত সীমান্তে (কাশ্মীরের উত্তরে হুনজানগ্যর, খিজ্‌র উপত্যকা) প্রচলিত। এই ভাষা বর্তমানে অবর্গীভূত। তুর্কী, ভোট-বর্মী, ইরানীয় এবং ভারতীয় আর্যভাষা দ্বারা পরিবেষ্টিত ব'লে এই ভাষার গোত্রবিচার আরও জটিল হয়ে পড়েছে। প্রাচীন মুণ্ডা ও দ্রাবিড়, এমনকি বাস্‌ক (**Basque**, স্পেন) প্রভৃতি ভাষাগুলির সঙ্গে এর সম্ভাব্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলছে। পূর্বতন লোকগণনা অনুযায়ী বুরুশাস্‌কী ভাষার সংখ্যা ছিল ২৬ হাজার মাত্র। এই ভাষায় সর্বনামশ্লিষ্ট (**Pronominalised**) উপসর্গ পদের যথেষ্ট বিকৃতি ঘটিয়ে থাকে।

৭. অষ্ট্রোনেশীয় বা মালয়ী-পলিনেশীয় (**Malayo-Polynesian**): এই শাখার ভাষাগুলি পূর্বে দক্ষিণ আমেরিকা-সংলগ্ন ইস্টার দ্বীপপুঞ্জ থেকে পশ্চিমে আফ্রিকার মাদাগাস্কার এবং উত্তরে ফরমোসা থেকে দক্ষিণে নিউজিল্যাণ্ড পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন স্থানে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। ভৌগোলিক অবস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে এই গোষ্ঠীর ভাষাগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(ক) ইন্দোনেশীয়—মালয়েশিয়ার ভাষা মালয়ী, ইন্দোনেশিয়ার জাভা, বালি, বোর্ণিও, সেলিবিস প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের ভাষা, ফিলিপ্পীনের ভাষা তাগালোগ এবং মাদাগাস্কারে প্রচলিত মালাগাসি ইত্যাদি প্রায় ২০০টি ভাষা। (খ) মেলানেশীয়—ফিজি, সলোমন, নিউ হেব্রাইডিস প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের প্রচলিত প্রায় ৩৫টি ভাষা। (গ) মাইক্রোনেশীয়—ক্যারোলাইন প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের প্রায় ৮টি ভাষা এবং (ঘ) পলিনেশীয়—সামোয়া, টাহিটি, হাওয়াই প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের ভাষা, নিউজিল্যাণ্ডের মাওরি প্রভৃতি প্রায় ২০টি ভাষা। এই গোষ্ঠীভুক্ত মোট প্রধান ভাষার সংখ্যা প্রায় ২৬৩। ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক ১৩.৫ কোটি। তবে ভাষাগুলির মধ্যে যবদ্বীপীয় (**Javanese**), নামান্তরে 'কবি' (**Kavi**) ভাষার সাহিত্যিক ঐতিহ্য প্রাচীন (আনুমানিক খ্রীস্টীয় ৮ম শতক)। প্রাচীন মালয়ীর ওপর ভিত্তি ক'রে গঠিত 'বাহাসা ইন্দোনেশিয়া' ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় ভাষারূপে বহুল প্রচলিত। প্রাচীন মালয়ীর নিদর্শন মেলে ৭ম শতকের একটি লেখে।

ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে এই ভাষাগোষ্ঠী মুক্তান্বয়ী (Agglutinating)। উপসর্গ (Prefix), প্রত্যয় (Suffix) এবং অন্তরাগমের (Infix) বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বিভক্তি, বচন বা লিঙ্গ বিচার নেই। এই বর্গের ভাষা মূলত একাক্ষরমূলক (Monosyllabic)। নাম বা ধাতুর দ্বিত্ব প্রয়োগের দ্বারা বহুবচন বা ক্রিয়ার তীব্রতা ও পৌনঃপুনিকতা বোঝানো হয়।

৮. লা-তি (La-Ti): ভোট-চীনাগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এই ভাষাগোষ্ঠী বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে আছে। এই ভাষার গোত্র অনির্ণীত। য়ুন্নান এবং টংকিং সীমান্তের সন্নিকটে হাগিয়াং শহরের উত্তর-পশ্চিমে (উত্তর ভিয়েৎ-নাম) এর ভাষাঞ্চল বিস্তৃত। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনা অনুযায়ী এর আনুমানিক লোকসংখ্যা ৪৫০।

৯. পপুয়ান (Papuan): এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রায় ১৩২টি ভাষার গোত্রগত বিচার এখনও সম্ভব হয় নি। বস্তুত, এই বিভাগ ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে নির্ণীত হয়েছে। ভাষাঞ্চল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিউগিনি, হাল্মাহেরা ইত্যাদি অঞ্চলে বিস্তৃত হলেও ইন্দোনেশীয়, মেলানেশীয় বা অস্ট্রেলীয় ভাষাগুলির সঙ্গে এদের কোনো সাদৃশ্য নেই। এই গোষ্ঠীর ভাষা সম্ভবত মুক্তান্বয়ী (Agglutinating)।

১০. অস্ট্রেলীয় (Australian): অস্ট্রেলিয়ার আদিম ভাষাগুলি সংখ্যায় প্রায় ৯৬টি হলেও তাদের গোত্রগত সাধর্ম্য এখনও অনির্ণীত। কাজেই এই বিভাগ ভৌগোলিক মানদণ্ডে গৃহীত। অস্ট্রেলীয় আদিবাসীরা ক্রমশই ক্ষীয়মাণ। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের হিসেব অনুযায়ী এদের লোকসংখ্যা ৭৬ হাজার মাত্র। পপুয়ান ও অস্ট্রেলীয় ভাষাভাষীর সম্মিলিত সংখ্যা ২০ লক্ষের বেশি নয়। ভাষাতত্ত্বের বিচারে অস্ট্রেলীয় ভাষা প্রধানত মুক্তান্বয়ী (Agglomerating) অর্থাৎ এই ভাষায় অত্যন্বয় ধর্ম (Incorporation) ততটা প্রবল নয়।

১১. তাসমানীয় (Tasmanian): তাসমানিয়ার এই ভাষাগোষ্ঠী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। প্রধান ৫টি শাখার সবগুলিই অধুনালুপ্ত। অস্ট্রেলীয় ভাষার সঙ্গে এর বিশেষ কোনো সাদৃশ্যও দেখা যায় না।

১২. জাপানী এবং কোরীয় (Japanese & Korean): জাপান এবং কোরিয়ায় প্রচলিত জাপানী ও কোরীয় ভাষাভাষীর আনুমানিক সংখ্যা যথাক্রমে ৯.৫ এবং ৩.৫ কোটি। এই ভাষাগোষ্ঠীর গোত্রবিচার এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। উভয় ভাষার সম্পর্ক বিচারও তেমন যথেষ্ট নয়। জাপানী সাহিত্য রচনার সূত্রপাত খ্রীস্টীয় ৮ম শতক থেকে।

১৩. প্রত্ন-এশীয় বা হাইপারবোরীয় (**Hyperborean**) : ভৌগোলিক অবস্থান লক্ষ্য করেই এই গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত হয়েছে, গোত্র বিচার করে নয়। এশিয়ার উত্তর-পূর্ব প্রান্তিক অঞ্চলে অল্পসংখ্যক ভাষাভাষীর মধ্যে এই ভাষাগুলি সীমাবদ্ধ। এর অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলির মোট সংখ্যা ১২। আইনু (**Ainu**) ভাষা সমেত এই গোষ্ঠীর ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক ৩০ হাজার। ভাষাতাত্ত্বিক প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো : অনুসর্গের সাহায্যে কারক গঠন, 'আইনু'তে সহায়ক শব্দের সাহায্যে, ক্বচিৎ অন্যত্র অন্তরাগমের (**Infix**) সাহায্যে ক্রিয়াপদের 'কাল' নিরূপণ। 'আইনু' সংখ্যাবাচক শব্দেরও বিশিষ্টতা রয়েছে।

১৪. উরালীয় বা ফিন্নো-উগ্রীয় (**Finno-Ugrian**) : এই গোষ্ঠীভুক্ত মুখ্য ভাষাগুলির সংখ্যা প্রায় ৩২। ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক ২ কোটি। এই গোষ্ঠীর ভাষাকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—(ক) ফিন্নীয় (**Finnish**) ভাষাগুলি, যেমন ফিন্নীয়, এস্তোনীয়, লাপ্পীয়, লিবোনীয় (ফিন্‌ল্যাণ্ড এবং উত্তর রাশিয়া, এস্তোনিয়া, ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড, লিবোনিয়া ইত্যাদি অঞ্চল)। (খ) পারমীয় বর্গ (**Permian**)। (গ) উগ্রীয় (**Ugrian**) ভাষাগুলি, যেমন—ওসত্যাক্ (পশ্চিম সাইবেরিয়া), বোগুল (**Vogul**) [উরাল পার্বত্যাঞ্চল] এবং একটি প্রধান ভাষা হাঙ্গেরীয় বা মজ্যর (**Hungarian/Magyar**) ; এবং (ঘ) সামোয়েদ বর্গ (**Somoyed**) [সাইবেরিয়া মেরু অঞ্চল]। এই ভাষাগোষ্ঠীর প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন রক্ষিত আছে ফিন্নীয় ও হাঙ্গেরীয় ভাষায় (আনুমানিক খ্রীস্টীয় ১৩শ শতক)। ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো স্বরসঙ্গতির (**Vowel Harmony**) ব্যাপক প্রয়োগ, ব্যাকরণসিদ্ধ লিঙ্গানুশাসনের অভাব, প্রত্যয়ের প্রয়োগ-প্রাচুর্য, কারক-বাহুল্য (যথা, লাপ্পীয় ৮টি কারক, হাঙ্গেরীয় ২২টি কারক), মুক্তান্বয় (**Agglutination**) ইত্যাদি।

১৫. আলতাইক (**Altaic**) : এই ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত প্রধান ভাষাগুলির সংখ্যা প্রায় ৩৪টি। ভাষাভাষীর আনুমানিক সংখ্যা ৬.৫ কোটি। এর প্রধান তিনটি শাখা হলো : (ক) তুর্ক-তাতার বা তুরেনীয় (**Turanian**) এবং অন্যান্য উপভাষা, যথা, তুর্কী ইত্যাদি ; (খ) মোঙ্গোল এবং (গ) মাঞ্চু বা তুঙ্গুস্। এই ভাষাবর্গ ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে প্রসারিত। প্রধান ভাষাঞ্চল হলো—তুরস্ক, ভল্‌গা নদীর পূর্ব-প্রান্তীয় ইউরোপীয় রাশিয়া থেকে এশীয় রাশিয়া, চীনা তুর্কীস্তান, মোঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া এবং উত্তর-পশ্চিম ইরান ও উত্তর আফগানিস্তানের অঞ্চল বিশেষ। প্রাচীন নিদর্শন মেলে তুর্কীভাষার পূর্বী উপ-ভাষার কয়েকটি লেখমালায়। উরালীয় ভাষার সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। মুক্তান্বয়, লিঙ্গানুশাসনের অভাব ও স্বরসঙ্গতি উভয় গোষ্ঠীরই সাধারণ লক্ষণ।

বিদ্বজ্জনদের কেউ কেউ জাপানী, কোরীয় এবং এস্কিমো গোষ্ঠীকে আল্‌তাইক গোষ্ঠীভুক্ত মনে করেন।

১৬. বাস্‌ক্ (Basque) : এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রধান ভাষা দুটি। ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক ১০ লক্ষ। ফ্রান্স ও স্পেনের সীমান্তে পীরেনীজ পার্বত্যাঞ্চলে বাস্‌ক্ কথিত হয়। খ্রীস্টীয় ৮ম শতকে প্রাপ্ত বাস্‌ক্ নিদর্শন থেকে কিছু কিছু স্থানের নাম পাওয়া যায়। তবে ১৬ শতক থেকে নিয়মিত সাহিত্যের পরিচয় মেলে। ১৮০০ সাল পর্যন্ত রচিত সাহিত্য প্রধানত ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ। এই ভাষা ধ্বনিমালার দিক দিয়ে খুব সমৃদ্ধ, বিশেষত স্পর্শবর্ণ, উষ্মবর্ণ ও তালব্যভীবনের ক্ষেত্রে। রূপতত্ত্বের বিচারে এ-ভাষা প্রত্যয়ান্বয়ী। ক্রিয়াগঠন পদ্ধতি জটিল নয়, তবে কর্তৃবাচ্যের স্থানে কর্মবাচ্যের প্রয়োগ (Ergative Case) সহজলভ্য। বহুপদিক বা যৌগিক পদগঠনের প্রবণতা বর্তমানে সুলভ। বাক্যগঠনরীতির (Syntax) ক্ষেত্রে এ-ভাষা অত্যন্ত জটিল। এই ভাষা বর্তমানে অবর্গীয় (Unclassified) ভাষারূপে গণ্য।

১৭. ককেশীয় (Caucasian) : এই গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাগুলির গোত্রবিচার সম্পূর্ণ নয়। তাই এ-বিভাগ প্রধানত ভৌগোলিক বিচারে গৃহীত হয়েছে। প্রধান প্রধান ভাষার সংখ্যা ২৬। ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক ৫০ লক্ষ। গঠনরীতি অনুসারে ককেশীয় ভাষাগোষ্ঠী যুক্তান্বয় (Agglutination) লক্ষণাক্রান্ত।

১৮. প্রায়-প্রাচ্য বা এশিয়ানীয় (Asianic) : ইউরোপীয় অঞ্চলের অধুনালুপ্ত কয়েকটি প্রাচীন ভাষার গোত্র নির্ণয় সম্ভব হয় নি। উদাহরণস্বরূপ, সুমেরীয় বা Sumerian (নিম্ন মেসোপোটেমিয়া, প্রাচীনতম নিদর্শন, খ্রীঃ পূঃ ৪০০০), মিটান্নী বা Mitanni (উত্তর মেসোপোটেমিয়া, খ্রীঃ পূঃ ১৪১০), এলামীয় বা Elamite (পশ্চিম ইরানের শুশা অঞ্চল অর্থাৎ আধুনিক লুরিস্তান, খুজিস্তান, খ্রীঃ পূঃ ২৫০০), ক্যাসাইট বা Kassite (ব্যাবিলোনের জাগ্রোস পার্বত্যাঞ্চল, খ্রীঃ পূঃ ১৭শ শতক), খট্টী বা Khattian (এশিয়া মাইনর, খ্রীঃ পূঃ ২০০০), ক্রীটদ্বীপীয় বা Cretan (ক্রীট দ্বীপ, খ্রীঃ পূঃ ১৫০০), এট্রুস্কান বা Etruscan (ইতালী, খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতক) ইত্যাদি।

১৯. সুদানী-গিনীয় (Sudano-Guinean) : এই গোষ্ঠীর ভাষাগুলি মধ্য আফ্রিকায় বিষুবরেখার উত্তরাংশে পশ্চিম থেকে পূর্বের সংকীর্ণ ভূখণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। মোট ভাষার সংখ্যা প্রায় ৪৩১। ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক ১০ কোটি। পশ্চিম ও দক্ষিণ সুদানের গণভাষা (Lingua Franca) 'হাউস্‌সা' (Haussa) সমেত মোট অসম্পৃক্ত ভাষাগোষ্ঠী ১৬টির কম নয়। প্রাচীনতম লেখ-নিদর্শন নুবিয়ান (Nubian) ভাষায় রক্ষিত আছে ৮ম শতক থেকে। ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণের কয়েকটি হলো—

অনন্বয়ী (Isolating) ধর্ম অর্থাৎ প্রত্যয়রাহিত্য এবং স্বরবৃত্তি (Tone), একাক্ষরী ধাতু, ব্যাকরণসিদ্ধ লিঙ্গশাসনের অভাব, আশ্রিত বাক্যাংশের সরলীকরণ, ধ্বন্যাত্মক শব্দপ্রাচুর্য ইত্যাদি।

২০. সেমীয়-হামীয় (Semito-Hamitic) : সেমীয়-হামীয় গোষ্ঠীভুক্ত প্রধান ভাষাগুলির সংখ্যা ৪৬। ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ১২ কোটি। এই ভাষাগুলি আরব, ইরাক, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং ট্রান্সজর্ডান, উত্তর আফ্রিকায় মিশর থেকে মরক্কো এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে ইথিওপিয়া, সোমালিল্যাণ্ড ইত্যাদি অঞ্চল জুড়ে প্রসারিত। আধুনিক বিদ্বানদের অনেকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে এই গোষ্ঠীর সম্পর্ক স্থাপন করবার চেষ্টা করেছেন। ইন্দো-ইউরোপীয়ের মতো ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণও হয়েছে এই ভাষাগোষ্ঠীকে কেন্দ্র ক'রে সমধিক। এই গোষ্ঠীর দুটি প্রধান শাখা—সেমীয় (Semitic) ও হামীয় (Hamitic)—যদিও অনেক ভাষাবিজ্ঞানী এ-দুটিকে শাখা না ব'লে দুটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীরূপে চিহ্নিত করতে চান।

ভৌগোলিক বিচারে সেমীয়কে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় : পূর্বী (আক্কাদীয়), উত্তর-পশ্চিমা (কনানীয় ও আরামীয়) এবং দক্ষিণ-পশ্চিমা (আরবী ও ইথিওপীয়)। সেমীয় শাখার পূর্বী বর্গের অন্তর্ভুক্ত প্রাচীন আক্কাদীয় বা এ্যাসীরীয় (Old Akkadian/Assyrian) রচনার লেখনিদর্শন মিলছে খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ অব্দ থেকে। তৎপরবর্তী ব্যাবিলোনীয় বা নবীন আক্কাদীয় (Babylonian) খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতক থেকে ক্রমশ আরামীয় দ্বারা স্থানচ্যুত হয়। সেমীয় শাখার উত্তর-পশ্চিমা বর্গের (ক) কনানীয় (Canaanite) উপশাখায় প্রাপ্ত তেল্-এল্-অমার্নহ্ (Tel-el-Amarnah) পত্রাবলী রচিত হয়েছিল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৫ শতকে। অপর উপশাখা (খ) ফিনিসীয় (Phoenician)-উদ্ভূত লিপিরীতি (প্রাচীনতম প্রত্নলেখ খ্রীঃ পূঃ ১৩শ-১০ম শতক) গ্রীক, ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপি এবং প্রায় সমস্ত সেমীয় লিপিমালার জনক। ফিনিশীয় থেকে বিবর্তিত পিউনিক (Punic) একদা ফিনিসীয় উপনিবেশ কার্থেজের প্রধান ভাষা ছিল অন্তত খ্রীস্টীয় ৬ষ্ঠ দশক পর্যন্ত—পরে তা আরবী দ্বারা স্থানচ্যুত হয়। (গ) মোয়াবাইট উপশাখার (Moabite) প্রথম পরিচয় মেলে মোয়াবাইট প্রস্তরে উৎকীর্ণ ৩৪ পংক্তির একটি প্রত্নলেখে (খ্রীঃ পূঃ ৯৩০)। উত্তর-পশ্চিমা বর্গের সর্বপ্রধান ভাষা (ঘ) হিব্রুতে (Hebrew) খ্রীস্টধর্মের প্রাচীন বিধান (Old Testament) রচিত হয়েছিল (খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতক)। আধুনিক হিব্রু ইস্রায়েল-এর রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত হয়েছে (ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক ৩০ লক্ষ)।

উত্তর-পশ্চিমা বর্গের প্রাচীন আরামীয় (Aramaic) শাখার (খ্রীঃ পূঃ ৯ম শতক) একটি পশ্চিমা উপভাষায় (Biblical Aramaic) বাইবেল রচিত হয়েছিল। এছাড়া আর একটি উপভাষা সামারিটান (Samaritan) ছিল তদানীন্তন সিরিয়া, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি অঞ্চলের গণভাষা (Lingua Franca) এবং যীশু খ্রীস্টের মাতৃভাষা। আরামীয় থেকে উদ্ভূত আধুনিক সিরীয় (Syriac) ভাষাগুলি সিরিয়া, লেবানন, ট্রান্সজর্ডান, ইরাক প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত।

দক্ষিণ-পশ্চিমা বর্গের তথা সমগ্র সেমীয় শাখার সর্বপ্রধান ভাষা হলো (ক) আরবী (Arabic)। ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে আরবী ভাষা আরব থেকে উত্তর আফ্রিকা এবং পূর্ব এশিয়ায় বিস্তৃত হয়ে পড়েছে (ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক ৯ কোটি)। আরবী ভাষার প্রাচীনতম স্বাক্ষর মেলে ৩২৮ খ্রীস্টাব্দে রচিত একটি প্রত্নলেখে। দক্ষিণ-পশ্চিমা বর্গের অপর উপশাখা (খ) ইথিওপীয়ের (Ethiopic or Ge'ez) নিদর্শন তুলনামূলকভাবে নবীন (আঃ খ্রীঃ ৪র্থ শতক)। আধুনিক সেমীয় ইথিওপীয় ভাষাগুলি, যথা, অম্হারিক (Amharic), তিগ্রে (Tigre) ইত্যাদি ইথিওপিয়ায় প্রচলিত (ভাষাভাষী আঃ ১ কোটি), যদিও মূলত এই ভাষাগুলি আরব থেকে নীত হয়েছিল।

হামীয় বর্গের ভাষাগুলির মধ্যে (ক) মিশরীয় (Egyptian) ভাষার ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। এর কালানুক্রম হলো—আদি যুগ (খ্রীঃ পূঃ ৩৪০০-২২০০), মধ্য যুগ (খ্রীঃ পূঃ ২২০০-১৫৮০) এবং অন্ত্য যুগ (খ্রীঃ পূঃ ১৫৮০-খ্রীস্টীয় ৩য় শতক)। এর শেষ পরিণতি কপটিক (Coptic) আনুমানিক খ্রীস্টীয় ১০ম শতক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল—বর্তমানে তা কেবল খ্রীস্টানদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে সংরক্ষিত আছে। (খ) লিবীয়-বেরবের উপশাখার লিবীয় বা প্রাচীন নুমিদীয় (Lybian or Numidian) রচনার লেখনিদর্শন খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতকের পূর্বে সম্ভবত মেলে না। আধুনিক লিবীয়-বেরবের ভাষাগুচ্ছ, যেমন, তমশেক্ (Tamashek), কাবিল (Kabyl), শিল্হ্ (Shilh) ইত্যাদি আরবীর পাশাপাশি কথিত হয় প্রধানত উত্তর আফ্রিকার আলজিরিয়া ও তৎসংলগ্ন সাহারা অঞ্চলে। (গ) কুশীয় (Kushitic) বা হামীয় ইথিওপীয় ভাষাগুলির প্রাচীন স্বাক্ষর বিশেষ কিছু নেই। আধুনিক কুশীয় ভাষাগুলির মধ্যে প্রধান হলো ইথিওপিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডে প্রচলিত গাল্লা (Galla), খমির (Khamir), সোমালি (Somali) ইত্যাদি (ভাষাভাষীর সংখ্যা আঃ ১ কোটি ১০ লক্ষ)। ইথিওপিয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে সেমীয় ও হামীয় ভাষাগুচ্ছের সহ-অবস্থান বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ভাষার রূপতত্ত্ববিচারে এই ভাষাগোষ্ঠী ইন্দো-ইউরোপীয়ের মতই প্রাত্যয়িক বা সমন্বয়ী (Inflectional)। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হলো—এর ধাতুগুলি সর্বদাই ত্রিব্যঞ্জন-সমন্বিত (Tri-lateral) আর পদের পূর্বে, মধ্যে বা শেষে উপসর্গ, অন্তরাগম ও প্রত্যয়-রূপে স্বরাগমের ফলে পদগঠনরীতিরও পরিবর্তন ঘটে থাকে। যেমন, আরবী কৃত্ব্ (*qtb*) "লেখা" ধাতু, কতব "সে লিখেছে", কুতিব "লিখিত হয়েছে", য়কৃতুবু "সে লিখবে", য়কৃতবু "এ লেখা হবে", কিতাবুন্ "বই", কাতিবুন্ "লেখক" ইত্যাদি। ক্রিয়ার কাল (Tense) সময়জ্ঞাপক নয়, সম্পন্ন অথবা অসম্পন্ন কার্যকালজ্ঞাপক (Aspective)। লিঙ্গ দুটি—পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ এবং ব্যাকরণসিদ্ধ লিঙ্গানুশাসন। স্ত্রীলিঙ্গে পদান্ত -ত্ প্রত্যয় (আরবী অখ্ "ভাই" : উখ্‌ত্ "বোন")। তিনটি বচন : একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। তিনটি কারক (কর্তৃ, কর্ম, সম্বন্ধ), বিশেষ ধরণের উষ্মবর্ণ ইত্যাদি সুলভ ব্যঞ্জনবর্ণের বৈচিত্র্য।

২১. হটেনটট্-বুশ্‌মান (Hottentot-Bushman) : হটেনটট্ এবং বুশমান ভাষাগুলি আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আদিবাসী পিগমিদের দ্বারা কথিত হয়। প্রথমটির চারটি এবং দ্বিতীয়টির দুটি, মোট এই ছয়টি শাখার ভাষাভাষী প্রায় ৩ লক্ষ। ভাষাতাত্ত্বিক কয়েকটি লক্ষণ হলো : অন্তত ৬টি নিরুদ্ধ ব্যঞ্জনধ্বনি (Click) ও তিনটি স্বরের (Tone) অস্তিত্ব, তিন বচন, উত্তম পুরুষ সর্বনামের দ্বিবচন ও বহুবচনে অন্তর্ভূত ও বহির্ভূত (Inclusive & Exclusive) পদের ব্যবহার (যেমন 'আমরা' অর্থে 'আমি ও তুমি' এবং 'তুমি ব্যতীত আমি' ইত্যাদি); বিশেষ ধরণের লিঙ্গগঠনে প্রাণীবাচক এবং বস্তুবাচক (সচেতন ও অচেতন) বিভাগ, বহুবচন গঠনের বৈচিত্র্য (যেমন শব্দের দ্বিত্ব প্রয়োগ ইত্যাদি ৫০।৬০টি পদ্ধতি); প্রত্যয়ের সাহায্যে কারক গঠন। এই গোষ্ঠী মূলত মুক্তান্বয়ী হলেও এতে অনন্বয়ী (Isolating) ধর্ম অসুলভ নয়।

২২. বান্টু (Bantu) : দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহত্তম অঞ্চল জুড়ে এই ভাষাগোষ্ঠী প্রচলিত। প্রধান প্রধান ভাষার সংখ্যা ৮৩। ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ৭.৫ কোটি। ভাষাগুলোর মধ্যে প্রধান হলো জাঞ্জিবার অঞ্চলের সোয়াহিলি (Swahili), লোক-সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। সোয়াহিলি আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের বিস্তৃত অঞ্চলের গণভাষা (Lingua Franca)। অন্যান্য মুখ্য উপভাষা হলো কাফির, জু-লু ইত্যাদি। ভাষাতাত্ত্বিক বিশিষ্ট লক্ষণগুলি হলো এই : অন্ত্য-অক্ষরে সর্বত্র স্বরবর্ণ, যুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে কেবল নাসিক্যধ্বনি + ব্যঞ্জন অথবা ব্যঞ্জনবর্ণ + য়্, ব্ সিদ্ধ। রূপতত্ত্ববিচারে এই ভাষা উপসর্গ-শ্লিষ্ট মুক্তান্বয়ী (Prefix Agglutinating)। প্রত্যয়, শব্দমূল বা প্রকৃতির

অর্থ নিয়ন্ত্রণ করে আর উপসর্গ করে পদগঠনরীতি বা ব্যাকরণগত আচরণ (যথা, বচন ইত্যাদি)। বিশিষ্ট বর্গে বিভক্ত নামবাচক শব্দের (যথা, মানুষ, বৃক্ষ, জল ইত্যাদি) পূর্বে সমবর্গীয় উপসর্গই যুক্ত এবং পুনরুক্ত হয়। ব্যাকরণসিদ্ধ লিঙ্গশাসনের অভাবও সহজ দ্রষ্টব্য।

২৩. এস্‌কিমো-আলেউট (**Eskimo-Aleut**) : এই ভাষাগোষ্ঠী প্রধানত কথিত হয় উত্তর আমেরিকার আলাস্কা থেকে পূর্বে গ্রীনল্যাণ্ড্ পর্যন্ত সমুদ্রের উপকূলবর্তী এস্কিমো অধ্যুষিত অঞ্চলে, আলেউট-অধ্যুষিত আলেউশিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জে এবং উত্তর-পূর্ব এশিয়ার প্রান্তীয় খণ্ডাঞ্চলে (**Yuit**)। প্রধান ভাষাগুলির সংখ্যা ২৪। বিশেষ ভাষাগত লক্ষণ হলো : তিনটি বচন, কেবল প্রশ্নবোধক সর্বনামে লিঙ্গ বিচার, ক্রিয়াপর্যায়ে 'কাল' (**Tense**) ধারণার অভাব, চারটি 'ভাব' বা বৃত্তির (**Mood**) অস্তিত্ব ইত্যাদি। রূপতত্ত্ব বিচারে এই ভাষা অত্যন্বয়ী (**Incorporating**)।

২৪. উত্তর আমেরিকাদেশীয় (**North American**) : উত্তর আমেরিকার (কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ভাষাগুলি ভৌগোলিক বিচারে বর্গীভূত। এই ভাষাগুলির বৈচিত্র্য যেমন স্পষ্ট, নৈকট্যও তেমন সুদূর। এই ভাষাগুলিকে সাধারণত ২৫টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায়। প্রধান ভাষাগুলির সংখ্যা প্রায় ৩৫১টি। এদের মধ্যে এ্যালগঙ্কিন (**Algonkin**) ভাষা নিয়ে গবেষণা হয়েছে সর্বাধিক। অপর একটি ভাষাগোষ্ঠী আথাপাস্‌কান্ (**Athapaskan**) উত্তর আমেরিকার বিস্তৃততম অঞ্চল জুড়ে প্রসারিত। রূপতত্ত্ববিচারে এই ভাষাগুলি অত্যন্বয়ী (**Incorporating**)।

২৫. মেক্সীয় ও মধ্য আমেরিকাদেশীয় (**Mexican & Central American**) : ভৌগোলিক বিচারে শ্রেণীবদ্ধ এই বিভাগে কুড়িটিরও অধিক ভাষাগোষ্ঠী দেখা যায়। সর্বমোট ভাষার সংখ্যা প্রায় ৯৬। প্রসিদ্ধ ভাষাবর্গ হলো উটো-আজ.টেক (**Uto-Aztec**) এবং মায়া (**Maya**)। উটো-আজটেক অন্তর্ভুক্ত নাহুয়াট্‌ল্ বা আজটেক (**Nahuatl or Aztec**) প্রাচীন মেক্সীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান বাহন ছিলো। মায়া ভাষাও একটি প্রধান সাহিত্যিক ভাষা। প্রাচীন মায়া সভ্যতার লিখিত নিদর্শনও রয়েছে প্রচুর। দুটি ভাষারই বর্তমান ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক ১০ লক্ষ ক'রে। লক্ষণীয়, মধ্য আমেরিকাস্থ ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যেই কেবল লিখনপদ্ধতি প্রচলিত হতে দেখা যায়। রূপতত্ত্ববিচারে এই ভাষাগুলি অত্যন্বয়ী (**Incorporating**)।

২৬. দক্ষিণ আমেরিকাদেশীয় (**South American**) ঃ গোত্রবিচার সম্ভব নয় ব'লে দক্ষিণ আমেরিকার ভাষাগুলিকে ভৌগোলিক মানদণ্ডে বর্গীভূত করা হয়ে থাকে। এই অঞ্চলে সম্ভবত ৭৭টি স্বতন্ত্র ভাষাগোষ্ঠী রয়েছে। মোট ভাষার সংখ্যা আনুমানিক ৭৮৩টি। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ভাষা হলো আরাওয়াক (**Arawak**)—ভাষাবর্গ। একসময় এই ভাষা আরও ব্যাপক অঞ্চলে, এমনকি অ্যানটিলিস্ দ্বীপপুঞ্জ (**Antilles Islands**) পর্যন্ত প্রসারিত ছিলো। এতদ্ব্যতীত কিচুয়া (**Kichua or Runa-Simi**) ভাষার ঐতিহ্যও প্রাচীন। এই ভাষা একদা পেরুর ইঙ্কা (**Inca**) জাতির প্রাচীন সভ্যতার প্রধান বাহন ছিল। স্পেনীয়দের আগমনের পূর্বেই এই ভাষা ইকুয়েডর, পেরু, চিলি, বোলিভিয়া, আর্জেন্টিনা ইত্যাদি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো। খ্রীস্টধর্ম প্রচারের প্রধান মাধ্যম হিসেবে স্প্যানিশ মিশনারীরা এর আরও ব্যাপৃতি ঘটিয়েছিলেন। কিচুয়াকে ৫টি ভৌগোলিক বিভাগে ভাগ করা হয়। বর্তমানে এই ভাষার আন্তর্জাতিক গুরুত্বও যথেষ্ট। ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক ৪০ লক্ষ। ভাষাতত্ত্বের বিচারে এই গোষ্ঠীর ভাষাগুলি অত্যন্বয়মূলক (**Incorporating**)।

এস্কিমো-আলেউট এবং উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীদের ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক ১ কোটি ২০ লক্ষ।

॥ ২ ॥

ভারতীয় আর্যভাষার পটভূমি

২.১ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবার

পূর্বেই বলেছি, ভাষাবিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সমস্ত ভাষাগুলিকে কয়েকটি গোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন। এই গোষ্ঠীগত বিভাগ সংখ্যায় ২৫।২৬টির কম নয়। ইন্দো-ইউরোপীয় এদের অন্যতম। অবশ্য এই গোষ্ঠী বা গোত্রের মেল-বন্ধন নির্ণয় করতে হলে কতকগুলি ভাষাতাত্ত্বিক সূত্র অবলম্বন করতে হয়। তবে এই মূল-নীতির প্রাথমিক সর্ত হলো, বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত মোটামুটি একই অর্থযুক্ত শব্দ বা শব্দাংশের তুলনা ক'রে, তাদের সাধর্ম্য আবিষ্কার এবং সেইসঙ্গে তাদের পূর্বতন রূপটি পুনরুদ্ধার করা [দ্রঃ ১.১]। সম্পর্কিত ভাষাগুলির ধ্বনি, ব্যাকরণ ও শব্দভাণ্ডার—যে-কোনো বিষয় অবলম্বন করেই এই তুলনা করা যায়। মোটকথা, তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে ভাষার ঐতিহাসিক রূপটি পুনর্গঠন করাই হলো ভাষার গোত্রবিচারের প্রাথমিক দায়িত্ব। এইরূপ ভারত ও ইউরোপের বহু ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করে দেখা গেছে যে এই ভাষাগুলির প্রত্ন-স্তরে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় (সংক্ষেপে ই. ইউ) থেকে উদ্ভূত হয়েছে আর এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে।

আদিম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষীদের ('জাতি' বা Race নয়) আদি বাসস্থল কোথায় ছিলো, তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। তবে প্রধানত ভাষাতত্ত্বের আলোকে বর্তমানে এই সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে উরাল পর্বতমালার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বা উত্তর-পশ্চিম কিরঘিজ তৃণভূমি অর্থাৎ দক্ষিণ রাশিয়ার ইউরেশীয় অঞ্চলই ছিল ইন্দো-ইউরোপীয়দের মূল নিবাসস্থল।

তৌলন (Comparative) ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে ইন্দো-ইউরোপীয়দের জীবনধারা ও ধ্যানধারণা সম্পর্কেও যথেষ্ট আলোকপাত করা গেছে। এরা মূলত ছিল যাযাবর বা অর্ধ-যাযাবর, তাই কৃষিকার্যে তারা ছিল অনুন্নত। তাদের প্রধান বৃত্তি ছিল শিকার ও সম্ভবত গো-পালন। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে প্রধান ছিলো ঘোড়া, কুকুর, হাঁস, ভেড়া, শূকর ইত্যাদি। তারা প্রধানত প্রস্তর যুগের লোক হলেও ধাতুনির্মিত অস্ত্রের ব্যবহার জানতো। ধর্মজীবনে তারা ছিল প্রকৃতির উপাসক আর তাদের সমাজ-

ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক ছিল ব'লে ঈশ্বরও কল্পিত হয়েছিল পিতারূপে। প্রধান দেবতা ছিলেন অবশ্য 'আকাশের পিতা', বৈদিকে যিনি দ্যৌস্পিতা, গ্রীকে জেউস্-পতের (**Zeus-pater**) এবং বর্তমানে **Jupiter**।

বলাবাহুল্য, মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কোনো লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়নি। আধুনিক ই. ইউ. ভাষা এবং তাদের প্রাচীনতম নিদর্শনগুলির ভাষা বিশ্লেষণ ক'রে মূল ভাষার বিশেষত্ব নির্ণীত হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে মূল ই. ইউ. ছিল প্রাত্যয়িক বা **Inflectional** ভাষা। এই ভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো—

(১) অধিকাংশ ই. ইউ. ধাতু একাক্ষরী (**Monosyllabic**)। আর দ্ব্যক্ষরী (**Dissyllabic**) ধাতুর শেষে স্বরধ্বনি। ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় (**Suffix**) এবং বিভক্তি (**Flexion**) যুক্ত ক'রে পদ গঠিত হতো। (২) নাম, ধাতু ও প্রত্যয়ের স্বরবর্ণে ক্ষয়-গুণ-বৃদ্ধি প্রক্রিয়া অর্থাৎ স্বরক্রম বা অপশ্রুতি (**Ablaut**)। (৩) স্বরসঞ্চার (**Pitch Accent**) শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রণ করতো। আরও প্রাচীন স্তরে সম্ভবত শ্বাসাঘাত (**Stress Accent**) প্রধান ছিল। (৪) শব্দরূপে স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দবিভাগ, সম্বন্ধ ও সম্বোধন সমেত মোট আটটি কারক, উত্তম, মধ্যম ও প্রথম—এই তিন পুরুষ। (৫) বচন তিনটি—যদিও দ্বিবচনের প্রয়োগ ছিল সীমিত এবং কেবল স্বাভাবিক যুগ্ম শব্দে প্রযুক্ত। (৬) তিনটি লিঙ্গ—যদিও প্রাচীনতম স্তরে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের ভেদ ছিল না। (৭) সর্বনাম-রূপে বিভিন্ন মূলের যুগপৎ ব্যবহার। (৮) ধাতুরূপে তিন বচন, তিন পুরুষ ও দুই বাচ্য: কর্মকর্তৃবাচ্য বা আত্মনেপদী (**Middle Voice**) এবং কর্তৃবাচ্য বা পরস্মৈপদী (**Active Voice**); পাঁচটি 'ভাব' (**Mood**) – নির্দেশক (**Indicative**), অনুজ্ঞা (**Imperative**), সম্ভাবক (**Optative**), অভিপ্রায় (**Subjunctive**) এবং নির্বন্ধ (**Injunctive**)। (৯) মূল ভাষায় 'কাল' (**Tense**) সময়জ্ঞাপক (**Temporal**) ছিল না, তা ছিল কার্যকাল বা কার্যরীতি-নির্দেশক (**Aspective**)। (১০) সমাসের ক্ষেত্রে দুই পদের মিলনই ছিল স্বাভাবিক। (১১) ই. ইউ. শব্দভাণ্ডার বিচার ক'রে অনুমিত হয় এই ভাষা পরবর্তী স্তরে ফিন্নো-উগ্রীয় বা সেমেটিক ভাষাগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসেছিল।

আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দে ইন্দো-ইউরোপীয়রা তাদের মূল আবাস-স্থল থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। খুব সম্ভব এরা প্রধান দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি দল এশিয়া মাইনর ধ'রে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ক্রমে ভারত অভিমুখে চলে আসে। অপর দলটি উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপে ক্রমশ নানা দলে বিভক্ত হয়ে আগু-পিছু ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষীদের এই সর্বপ্রাচীন বিভাগ ভাষাতাত্ত্বিক

উপাদানের দ্বারাই নির্ণীত হয়েছে, যেমন, পশ্চিমাভিমুখী দল যে-শব্দে কণ্ঠ্যধ্বনি ব্যবহার করে, পূর্বাভিমুখী দল তা উচ্চারণ করে 'শ'-জাতীয় ধ্বনিরূপে। মূল ভাষার তালব্য 'ক' ধ্বনির এই উচ্চারণ-বিভেদ থেকেই সম্ভবত সর্বপ্রথম দুটি উপভাষার সৃষ্টি হয়—যাদের নামকরণ করা হয়ে থাকে 'কেন্তুম্' ও 'সতম্' বর্গীয় উপভাষা রূপে। কেন্তুম্ উপভাষাভুক্ত ভাষাগুলি হলো : গ্রীক, ইতালীয়, জার্মানিক, কেলটিক, হিট্টাইট্ এবং তোখারীয়। আর 'সতম্' বর্গীয় উপভাষাগুলি হলো : ইন্দো-ইরানীয়, বালটো-শ্লাবিক, আলবানীয় ও আর্মেনীয়। 'কেন্তুম্' ও 'সতম্'—এই নামকরণ করা হয়েছে মূল ই. ইউ. সংখ্যাবাচক ১০০-র প্রতিশব্দটি দুই প্রতিনিধিস্থানীয় ভাষায় কী-ভাবে উচ্চারিত হয়েছে, তার ওপর ভিত্তি ক'রে। উদাহরণস্বরূপ, ই. ইউ. * *k̂m̥tom* >কেন্তুম্ বর্গের গ্রীক *he-katon* (=হে কাতোন), লাতিন *centum* (=কেন্তুম্), কেলতিক (প্রাচীন আইরিশ) *cet* (=কেত্), তোখারীয় *kant* (=কন্ত্), জার্মানিক (গথিক) *hund* (=খ়ুন্দ) ; কিন্তু সতম্ বর্গের সংস্কৃত শতম্, ইরানীয় (আবেস্তা) *satəm* (=সতম্), বাল্‌টো-শ্লাবিকের লিথুয়ানীয়তে *szimtas* (=শিমতাস্), এবং প্রাচীন শ্লাবিকে *suto* (=শুতো) ইত্যাদি।

বর্তমানে ই. ইউ. গোষ্ঠীভুক্ত মুখ্য ভাষাগুলির আনুমানিক সংখ্যা ১৩২, ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ১৬০ কোটি। ভারতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষীর সংখ্যা ৩২ কোটি ১৭ লক্ষ ২০ হাজার ৭০০ ; মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত মোট ভাষার সংখ্যা ৫৭৪ (ভারতের ১৯৬১ সনের জনসমীক্ষা অনুসারে)। যাইহোক, মূল ই. ইউ. ভাষার দশটি প্রধান উপভাষা যে-ভাবে ভৌগোলিক বিস্তার লাভ করেছে অথবা বিবর্তিত হয়েছে, তার পরিচয় নিচে দেওয়া হলো[১]—

---

১ বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. মজুমদার : সপ্রাঙ্ক, পৃঃ ১৩-৩৫।

[১] ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য (Indo-Iranian/Aryan) :

এই শাখার বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হয়েছে (দ্র. ২.২)।

[২] বাল্টো-শ্লাবিক (Balto-Slavic) :

এই শাখা (ক) বাল্টিক (Baltic) এবং (খ) শ্লাবিক (Slavic)—এই দুই উপশাখার সাধর্ম্যের ভিত্তিতে অনুমিত এবং পুনর্গঠিত হয়েছে। (ক) বাল্টিক উপশাখার প্রাচীনতম নিদর্শন মেলে প্রাচীন প্রুশীয় (Old Prussian) উপভাষায় রচিত মার্টিন লুথারের কথোপকথন (Catechism) রচনায়, কিন্তু বর্তমানে এই উপভাষা লুপ্ত। অপর দুই উপভাষা লিথুয়ানীয় (Lithuanian) এবং লেতিশ্ বা লাত্বিয়ান (Lettish or Latvian) যথাক্রমে লিথুয়ানিয়া ও লাত্বিয়ার (রাশিয়া) সরকারী ভাষা ; প্রাচীনতম নিদর্শন মেলে ষোড়শ শতক থেকে। লিথুয়ানীয় ভাষায় মূল ই. ইউ. প্রাচীন বৈশিষ্ট্য গ্রীক, লাতিন ও সংস্কৃতের মতো বজায় রয়েছে। (খ) শ্লাবিক-উপশাখাকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) দক্ষিণ শ্লাবিক : বুলগেরীয় (Bulgarian) [বুলগেরিয়া, ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ৭০ লক্ষ], সার্বো-ক্রোশীয় (Servo-Croatian)—সার্ব ও ক্রোট্দের ভাষা (যুগোশ্লাবিয়া) এবং শ্লোবেনিয়ান (Slovenian) [যুগোশ্লাবিয়া]। প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় প্রাচীন বুলগেরীয় বা ওল্ড চার্চ শ্লাবিকে (Old Church Slavic) রচিত বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদে (খ্রী. ৯ম শতক)। (২) পশ্চিম শ্লাবিক : চেক (Czech) [চেকোশ্লোবাকিয়া], ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি, প্রাচীন নিদর্শন প্রধানত ১৩শ শতকের রচনা ; শ্লোবাক (Slovac) [চেকোশ্লোবাকিয়া] এবং পোলিশ (Polish) [পোল্যাণ্ড], প্রাচীন নিদর্শন : ১৪শ শতক। (৩) উত্তর শ্লাবিক বা শ্লাবোনিক : আধুনিক সন্ততি—রুশীয় (Russian) বা গ্রেট রাশিয়ান (ভাষাভাষী : ২০ কোটি) রাশিয়ার সাহিত্যিক আদর্শ ভাষা ; ইউক্রেনীয় (Ukrainian) বা লিট্ল্ রাশিয়ান (ইউক্রেন, ভাষাভাষী : ৪ কোটি) এবং বাইলো-রুশীয় (Bylo-Russian) বা হোয়াইট রাশিয়ান (White Russian, ভাষাভাষী প্রায় ৯০ লক্ষ)। বাল্টো-শ্লাবিক প্রায় ৩৩ কোটি লোকের কথ্যভাষা।

[৩] আর্মেনীয় (Armenian) :

আধুনিক আর্মেনীয় ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ। আর্মেনিয়া ছাড়াও ইরান, তুরস্ক প্রভৃতি স্থানে (এশিয়া মাইনর ও ককেশাস অঞ্চল) আর্মেনীয় প্রচলিত আছে। প্রাচীন আর্মেনীয় রচনা খ্রীষ্টীয় ৫ম শতক থেকে পাওয়া যায়। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে এই ভাষার বিকৃতি ঘটেছে সবচেয়ে বেশী (কেল্টিকের মতো)।

[৪] আল্‌বানীয় (Albanian) :

আল্‌বানিয়ার ভাষা আল্‌বানীয় কিন্তু দক্ষিণ ইটালীতেও তা সমধিক চলে, ভাষাভাষী প্রায় ৩০ লক্ষ, প্রাচীনতম রচনার স্বাক্ষর খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতকেই মেলে। এর শব্দভাণ্ডারে ল্যাটিন, গ্রীক, তুর্কী, শ্লাবোনিক, ইটালীয় প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক ভাষার বহু শব্দ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

[৫] গ্রীক (Greek) :

প্রাচীনকালে গ্রীক বহু উপভাষায় বিভক্ত ছিল। যেমন—আয়োনিক (Ionic), আত্তিক (Attic), এ্যাওলিক (Aeolic), ডোরিক (Doric) ইত্যাদি। খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম শতক থেকেই গ্রীকের নিদর্শন পাওয়া যায়, তবে প্রধানতম রচনা হোমারের দুটি মহাকাব্য : ইলিয়াড ও ওডিসি। সম্প্রতি ক্রীট্‌দ্বীপে প্রাপ্ত প্রত্নলিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হওয়ায় গ্রীক নিদর্শন ১৪৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি বলে গণ্য হয়েছে। বলা-বাহুল্য, ইউরোপীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রীকভাষা ও সাহিত্যের দান অতুলনীয় ; গ্রীক-সাহিত্য সংস্কৃতের চেয়ে কম সমৃদ্ধ নয়। গ্রীক শাখার একমাত্র জীবিত সন্ততি আধুনিক গ্রীক বর্তমান গ্রীস এবং ভূমধ্যসাগরীয় পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত। ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি।

[৬] ইটালীয় (Italic) :

ইটালিক ভাষাগুচ্ছের প্রাচীনতম নিদর্শন রক্ষিত আছে ওস্‌কো-উম্ব্রিয়ান্ (Osco-Umbrian) উপশাখায় কিন্তু খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্বেই এই উপভাষাগুলি লুপ্ত। ইটালিক শাখার প্রধান উপশাখা ল্যাটিন—সাহিত্যসম্পদে যা কেবল সংস্কৃতের সঙ্গেই তুলনীয়। প্রাচীনতম লেখ-নিদর্শন খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতক থেকে মেলে। রোমের ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি এবং সেই সঙ্গে খ্রীষ্টানধর্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ল্যাটিন সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এই ল্যাটিন থেকেই উদ্ভূত হয়েছে আধুনিক রোমান্স (Romance) ভাষাসমূহ, যথা—ফরাসী (French), প্রায় ৮ কোটি লোকের ভাষা, প্রচলন ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড ও কানাডায়। প্রভাঁসাল্ (Provencal): উপভাষা-গুচ্ছের (দক্ষিণ ফ্রান্স) নিদর্শন ১১শ শতক থেকেই সাহিত্যে সুরক্ষিত। ইটালিয়ান (Italian) [ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড] প্রায় ৬ কোটি লোকের কথ্য ভাষা। স্প্যানিশ (Spanish) বলা হয় স্পেন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং মধ্য ও উত্তর আমেরিকায় (ব্রাজিল ছাড়া)। ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। অন্যান্য ভাষাগুলি হলো—পর্তুগীজ (Portuguese) [পর্তুগাল], ভাষাভাষী : ৯ কোটি ; রুমানীয় (Rumanian), ভাষাভাষী : ২

কোটি ; রেটো-রোমানিক (**Rhaeto-Romanic**) [সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী] ; ক্যাটালান্ (**Catalan**) [স্পেন] ; সার্দিনিয়ান (**Sardinian**) [সার্দিনিয়া] এবং অধুনালুপ্ত দাল্মাসিয়ান্ (**Dalmatian**) [আড্রিয়াটিক উপকূল]। বর্তমানে রোমান্স্ ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ৪১ কোটি।

[৭] কেলটিক (**Celtic**) :

কেলটিকের তিনটি ভাগ—(১) গলিশ (**Gaulish**), আন্তর্য়ুরোপীয় এই ভাষাটি বর্তমানে লুপ্ত। রোমান শাসনের সময় তার প্রচলন ছিল ফ্রান্স্ বা প্রাচীন গলদেশে, উত্তর ইটালিতে। (২) ব্রিটানিক (**Britannic**) [ব্রিটেন] ও তার বর্তমান সন্ততি—কর্নিশ্ (**Cornish**) [কর্নওয়াল], বর্তমানে লুপ্ত ; ওয়েলশ্ (**Welsh**) [ওয়েলস্] ও ব্রিটন্ (**Breton**) [ব্রিটানি]। (৩) গ্যালিক (**Gaelic**) ও তার বর্তমান সন্ততি—আইরিশ (**Irish**) [আয়ারল্যাণ্ড], স্কটস্ গ্যালিক (**Scots Gaelic**) [স্কটল্যাণ্ড] এবং মান্‌কস্ (**Manx**) [আইল্ অফ্ ম্যান]। এই ভাষাগুলির মধ্যে আইরিশই সমৃদ্ধ ভাষা। তার লিখিত স্বাক্ষর মেলে ৮ম শতক থেকে। বর্তমানে কেল্‌টিক ভাষায় কথা বলে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক।

[৮] জার্মানিক (**Germanic**) :

জার্মানিক শাখার ভাষাগুলি কেবল ইউরোপেই সীমাবদ্ধ নয়, ঔপনিবেশিক প্রসারের ফলে তা আজ সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছে—যার মধ্যে প্রধান হলো ইংরেজী। বর্তমানে জার্মানিক ভাষায় কথা বলে প্রায় ৫৬ কোটি লোক। জার্মানিকের প্রধান উপশাখা এবং তাদের বর্তমান সন্ততি হলো এই—

(ক) উত্তর জার্মানিক বা স্ক্যাণ্ডিনেভীয় (**Scandinavian**) : স্ক্যাণ্ডিনেভীয় ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। বিভিন্ন উপশাখা হলো—ড্যানিশ (**Danish**) [ডেনমার্ক], সুইডিশ (**Swedish**) [সুইডেন], আইসল্যাণ্ডিক (**Icelandic**) [আইসল্যাণ্ড] এবং নরওয়েজিয়ান (**Norwegian**) [নরওয়ে]। আইসল্যাণ্ডিকের প্রাচীনতম নিদর্শন (১২শ শতক) 'এড্ডা' (**Edda**) নামক সংকলনে জার্মানিক জাতির পৌরাণিক কাহিনী রক্ষিত আছে।

(খ) পূর্ব জার্মানিক : বর্তমানে এই শাখা লুপ্ত। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে রচিত ধর্মাচার্য উল্‌ফিলাসের (**Wulfilas**) বাইবেল অনুবাদ জার্মানিক শাখার প্রাচীনতম রচনা।

(গ) পশ্চিম জার্মানিক : (১) ইংরেজী (English) [গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা] প্রায় ৪০ কোটি লোকের কথ্য ভাষা। (২) ফ্রিজীয় (Frigian) [উত্তর নেদারল্যাণ্ড, জার্মানী]। প্রাচীন ফ্রিজীয় ও প্রাচীন ইংরেজীর সাধর্ম্য খ্রীষ্টীয় ৭ম-৮ম শতক থেকেই লক্ষণীয়। (৩) ডাচ্ (Dutch) বা ওলন্দাজ [হল্যাণ্ড বা নেদারল্যাণ্ড], ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। (৪) ফ্লেমিশ (Flemish) [বেলজিয়াম] ভাষা ডাচ্ ভাষার সঙ্গে বেশী সম্পর্কিত। (৫) য়িড্ডিশ (Yiddish) —পোল্যাণ্ড, জার্মানী, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী ও সোভিয়েত রাষ্ট্রে বসবাসকারী ইহুদীদের ভাষা। এই উপভাষার মূল হলো মধ্যযুগের জার্মান ভাষা, কিন্তু তার মধ্যে হিব্রু, শ্লাবোনিক ও অন্যান্য ভাষার উপাদান মিশ্রিত হয়ে গেছে। (৬) জার্মান (German) প্রায় ১২ কোটি লোকের ভাষা। এর উপভাষা দুটি—Low বা নিম্ন জার্মান (উত্তর জার্মানীর নিম্নভূমি) এবং High বা উচ্চ জার্মান (দক্ষিণ জার্মানীর পার্বত্যাঞ্চল, সুইজারল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া)। উচ্চ জার্মান (High German) ভাষাই হলো সরকারী ও সাহিত্যিক ভাষা।

[৯] তুখারীয় (Tokharian) :

প্রাচীন তুখারীয় বলা হতো মধ্য এশিয়ায়। অধুনালুপ্ত এই ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন মেলে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতক থেকে। এক সময়ে এই ভাষা পূর্বদেশীয় তুখারীয় 'ক' (Tokharian A) এবং পশ্চিমদেশীয় তুখারীয় 'খ' (Tokharian B)—এই দুই উপভাষায় বিভক্ত ছিল। বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় চীনা-তুর্কীস্তান থেকে প্রাপ্ত প্রত্নলিপি থেকে এই ভাষা উদ্ধার করা হয়েছে।

[১০] হিট্টাইট বা হিট্টী (Hittite) :

প্রাচীন এশিয়া মাইনরে প্রচলিত অধুনালুপ্ত এই শাখাকে বলা উচিত আনাতোলীয় (Anatolian)। এর বর্গীকরণ সম্পর্কে মতভেদ আছে। অনেকের মতে তা মূল ই. ইউ. ভাষার সহোদরস্থানীয়া, কাজেই ই. ইউ. ও আনাতোলীয়ের জননীস্বরূপা হলো আদি ইন্দো-হিট্টী। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে এই শাখা মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার প্রাচীনতম সন্ততি। প্রাচীনতম নিদর্শন মেলে খ্রীঃ পূঃ ১৫-১৩শ শতকে। এই শাখার অনেক উপশাখা ছিল, যথা—হিট্টী, লিডিয়ান (Lydian), লিসিয়ান (Lycian), লুবিয়ান (Luwian), প্যালেয়িক (Palaeic) ইত্যাদি।

২.২ ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য

ভারত ও ইরানের প্রচলিত ভাষাগুলির জননীরূপে কল্পিত হয়ে থাকে ইন্দো-ইরানীয়। এই ভাষা আর্য নামেও পরিচিত। গোত্রবিচারে ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই হিসেবে ইন্দো-ইরানীয় এশিয়ার আর্মেনীয়, ইউরোপের গ্রীক, লাটিন, গথিক (জার্মানিক), প্রাচীন আইরিশ ও ওয়েলস্ (কেলটিক), প্রাচীন শ্লাব (বাল্‌টো-শ্লাবিক) প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাদের ভগিনীস্থানীয়। ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য ভাষা আসলে অনুমিত ভাষা (খ্রীঃ পূঃ ২০০০)। ভারতীয় ও ইরানীয় ভাষাগুলির প্রাচীনতম নিদর্শনগুলিকে ভিত্তি ক'রে এই প্রত্ন-স্তরের ভাষাকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে।

২. ২. ১ দর্দিক শাখা (Dardic) :

খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় দুই সহস্রাব্দে ভারতীয় আর্য (**Indo-Aryan or Indic**) এবং ইরানীয় (**Iranian**)—এই দুই শাখায় আর্যভাষা বিভক্ত হয়ে পড়ে। সম্ভবত খ্রীঃ পূঃ ১৭৫০—১৫০০ অব্দের সময়সীমায় ভারতীয় আর্যেরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করে। তবে **Grierson,** সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিদ্বজ্জনের মতে, ভারতীয় আর্য এবং ইরানীয়—এই দুই শাখা বিভাজনের পূর্বে সম্ভবত আর একটি শাখা—দর্দিক (**Dardic**) বা পিশাচ ভাষাগুচ্ছ—বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। অবশ্য এই বিভাগ সুধীজনের অনেকে স্বীকার করেন না। যেমন, **Sten Konow**-র মতে দর্দিক, ইরানীয় শাখার মধ্যে অন্তর্গণ্য। **Jules Bloch**-এর মতে বর্তমান দর্দিক ভাষাসমূহ এবং ভারতীয় উত্তর-পশ্চিমা প্রাকৃতের মূল উৎস একই এবং তা ভারতীয় আর্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। অপরদিকে **E. J. Rapson** মনে করেন, দর্দিক ইরানীয়ের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হলেও মূলে তা প্রাচীন বৈদিক আর্য উপভাষার প্রতিনিধিস্থানীয়।

দর্দিক ভাষাগুলির প্রসার ঘটেছে এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে—কাশ্মীর উপত্যকা এবং কাশ্মীরের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল বা দর্দিস্তান (গিলগিট ইত্যাদি), চিত্রাল ও কাফিরস্তান থেকে উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ এবং পামীর মালভূমি পর্যন্ত। দরদীয় ভাষাগুলির অন্যতম হলো পশৈ, কাফির, খোয়ার বা চিত্রালি, কোহিস্তানী, শিণা

কাশ্মীরী ইত্যাদি। দর্দিক ভাষাগুলির মধ্যে কাশ্মীরীর স্থান সর্বোচ্চ (দ্র. কাশ্মীরী)। কেবল জনসংখ্যার দিক দিয়ে নয়, সাহিত্যিক ঐতিহ্য সৃজনে এবং নিজস্বলিপি (শারদা) উদ্ভাবনে তা অন্যান্য মৌখিক দর্দিক ভাষার চেয়ে অনেক প্রগতিশীল। লক্ষণীয়, ভারতীয় আর্যভুক্ত পশ্চিমা পাঞ্জাবী এবং সিন্ধী ভাষা যেমন দর্দিক প্রভাবে পুষ্ট হয়েছে, দর্দিকভুক্ত কাশ্মীরীও তেমনি সমৃদ্ধ হয়েছে ভারতীয় আর্যভাষার নিবিড় সংযোগে—যা অন্যান্য দর্দিক ভাষার ক্ষেত্রে কখনও ঘটে নি।

২. ২. ২ ইরানীয় শাখা (Iranian) :

ইরানীয় শাখা (Iranian) এবং ভারতীয় আর্য শাখার (Indo-Aryan) ঐতিহাসিক বন্ধন এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য নিবিড় ও সুচিহ্নিত। উভয় ভাষাগোষ্ঠীই নিজেদের 'আর্য' নামে অভিহিত করতো (সং আর্য=আবেস্তিক ঐর্‌য়=প্রাচীন পারসীক অরিয়)। ইরানীয় জরথুস্‌ত্র ও ভারতীয় বৈদিক ধর্মোপাসনার ক্ষেত্রে উভয়গোষ্ঠীর দেবদেবী (মিত্র, অর্যমা, অগ্নি, সোম ইত্যাদি), পূজাপদ্ধতি, যজ্ঞোপাসনা, উপনয়ন পদ্ধতি সম্পর্কীয় ধ্যানধারণা এবং পুরাকল্পের (Mythology) সাদৃশ্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। ভাবাদর্শের ক্ষেত্রেও উভয়ের মিল যথেষ্ট। ধ্বনিগত, রূপগত, শব্দসম্পদ, এমনকি ছন্দ-রীতিতেও (গায়ত্রী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ্‌, অনুষ্টুভ্‌) আবেস্তিক ও বৈদিক ভাষার সাদৃশ্য স্পষ্ট। তবে পরবর্তী যুগে সম্ভবত উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক অনৈক্য ও বিভেদ ঘটেছিল। তাই কয়েকটি দৈব ধারণার ক্ষেত্রে উভয়ের পার্থক্য দেখা দিয়েছিল, যেমন আবেস্তায় 'দএব', 'অহুর' দেবতাবাচক কিন্তু সংস্কৃতে তা অপদেবতা বা অসুর। এইরূপ বৈদিক দেবতা নাসত্য ও ইন্দ্র আবেস্তায় অপদেবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইরানীয় শাখার প্রসার ঘটেছিল সারা প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্য জুড়ে। এলাম এবং মেসোপোটামিয়ার পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিম মিডিয়া এবং পারস্য থেকে উত্তর-পূর্ব সোগডিয়ানা এবং ব্যাকৃট্রিয়া পর্যন্ত। ইরানীয় শাখার প্রাচীনতম উপশাখা হলো আবেস্তিক—জরথুস্‌ত্রীয় মতাবলম্বীদের বেদকল্প প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ জেন্দ্‌ আবেস্তার ভাষা (সংকলনের সময় : আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৩য় শতক)। এই গ্রন্থের রচনাকার পারসীদের ধর্মাচার্য জরথুস্‌ত্র (সং জরতুষ্ট্র, আ. খ্রীঃ পূঃ ৬৬০-৫৮৪)। এই ভাষা ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের (প্রাচীন মিডিয়া) কথ্য ভাষাবিশেষ। অপর উপশাখা প্রাচীন পারসীক

(Old Persian) ছিল ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অর্থাৎ আধুনিক ফারস্ প্রদেশের ভাষা (বর্তমান ফারসীর জননী)। নিদর্শনগুলি প্রাচীন বাণমুখ (Cuneiform) লিপিতে লেখা হখামনিষ-বংশীয় (সং সখামনীয়) রাজাদের (খ্রীঃ পূঃ ৫২১-৩৩৮), বিশেষত রাজা দারয়বহুষ্ (সং ধারয়দ্বস্থ, Darius, খ্রীঃ পূঃ ৫২২-৪৮৬) এবং তৎপুত্র খ্‌ষয়ার্ষার (সং ক্ষয়ার্ষা, Xerxes) কতকগুলি রাজকীয় শিলালেখ। রাজ্যজয়ের বিবরণমূলক এই শিলালেখগুলি প্রাচীন পারসীক, এলামাইট ও ব্যাবিলোনীয় এই তিন ভাষায় উদ্ধৃত। এই উপভাষা ছিল তদানীন্তন রাজভাষা বা সরকারী ভাষা। মধ্য-স্তরের মধ্য ইরানীয় গৌণ উপভাষাগুলিকে (সোগ্‌ডিয়ান্, পার্থিয়ান্, শক ইত্যাদি) বাদ দিলে সাসানীয় রাজাদের (খ্রীঃ ৩য়—৭ম শতক) ব্যবহৃত পহ্লবী (Pehlvi) ছিল পারস্যের সর্বজনগ্রাহ্য ভাষা। আধুনিক ভাষা পারসী বা ফারসীর (Persian) উৎপত্তি খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকে। বিখ্যাত কবি ফিরদৌসীর (১০ম শতক) রচনা দিয়ে তার সূত্রপাত। ইরানীয় শাখার অন্যান্য আধুনিক উপভাষা হলো: আফগানিস্তানের আফগান বা পশ্‌তো/পখ্‌তো, বালুচিস্তানের বালুচি, কুর্দিশ, ককেশাস্ অঞ্চলের ওসেটিক (Ossetic) ইত্যাদি।

২. ২. ৩ ভারতীয় আর্য (Indo-Aryan/Indic):

ইন্দো-ইরানীয়ের তৃতীয় শাখা ভারতীয় আর্যের (Indic/Indo-Aryan) সাহিত্যিক ঐতিহ্য অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির তুলনায় অতি সুপ্রাচীন এবং সুরক্ষিতও বটে। আধুনিক ভাষা-উপভাষা সৃজনে তার বৈচিত্র্যও অপরিসীম। বর্তমান ভারতীয় জনসমীক্ষা (১৯৬১) অনুযায়ী ভারতে ইন্দো-ইউরোপীয় মাতৃভাষার সংখ্যা ৫৭৪; ভাষাভাষীর সংখ্যা ৩২,১৭,২০,১০০। সমগ্র ভারতীয় জনগণের ৭৩.৩০ শতাংশ লোক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী। ভারতে এই শাখা সম্প্রসারিতও হয়েছে সমধিক—পশ্চিমে সিন্ধু থেকে পূর্বে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত এর ভাষাঞ্চল। ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত ভাষার সংখ্যা ১৬টির মধ্যে ১২টিই এই ভাষা পরিবারের অন্তর্গত, যথা—বাঙলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, গুজরাটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, হিন্দী, উর্দু, কাশ্মীরী, সংস্কৃত (এবং ইংরেজী)। ভারতের বাইরেও ভারতীয় আর্য ভাষা সম্প্রসারিত হয়েছে, যেমন, নেপালী (নেপাল), সিংহলী (শ্রীলঙ্কা) এবং জিপসী (ইউরোপ, এশিয়া)।

আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলির উদ্ভব আনুমানিক ১০ম/১১শ শতকে কিন্তু তা বিবর্তিত হয়েছে পূর্ববর্তী আরও দুটি স্তর অতিক্রম করে। যথা—

১। প্রাচীন ভারতীয় আর্য (**Old Indo-Aryan**) [খ্রীঃ পূঃ ১৫০০-৬০০] :

এই স্তর আবার চারটি উপস্তরে বিভক্ত—(ক) প্রাচীন বৈদিক যুগ (খ্রীঃ পূঃ ১৫০০-১০০০): এই যুগের প্রাচীনতম রচনা ঋগ্‌বেদ সংকলন। দশটি মণ্ডলে সংকলিত ঋগ্‌বেদের (১০২৮টি সূক্ত-নিবদ্ধ মোট স্তবক সংখ্যা ১০,৪৬২) প্রাচীনতম অংশ হলো ২য় থেকে ৭ম মণ্ডলের সূক্তগুলি। (খ) অর্বাচীন বৈদিক যুগ (খ্রীঃ পূঃ ১০০০-৮০০): এই যুগের প্রধান রচনা—ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডল, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ সংহিতা। (গ) বেদোত্তর বা প্রাক্‌-সংস্কৃত যুগ (খ্রীঃ পূঃ ৮০০-৫০০): সাহিত্যসম্ভার প্রধানত গদ্যে রচিত 'ব্রাহ্মণ' জাতীয় গ্রন্থাবলী, বিভিন্ন আরণ্যক ও উপনিষদ্‌ এবং 'সূত্র'জাতীয় রচনা। (ঘ) সংস্কৃত যুগ (খ্রীঃ পূঃ ৫০০—): এই পর্বের সূচনা করেছেন বৈয়াকরণ পাণিনি (খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতক)। সংস্কৃত যুগকে সাধারণত মহাকবি কালিদাসের (খ্রীষ্টীয় ৪র্থ/৫ম শতক) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

২। মধ্য ভারতীয় আর্য (**Middle Indo-Aryan**) [খ্রীঃ পূঃ ৬০০-খ্রীঃ ১০০০]:

এই স্তর সাধারণত তিনটি উপস্তরে বিভক্ত—(ক) আদি উপস্তর (খ্রীঃ পূঃ ৬০০-খ্রীঃ ২০০): সাহিত্যিক নিদর্শন—অশোক-লেখের প্রাকৃত এবং হীনযানী বৌদ্ধদের প্রাচীনতম গ্রন্থে ব্যবহৃত পালিভাষা; অশ্বঘোষের নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত, খরোষ্ঠী লিপিতে লিখিত খোটানী ধর্মপদ ও নিয়া প্রাকৃত (মধ্য এশিয়ায় প্রাপ্ত)। (খ) মধ্য উপস্তর (খ্রীষ্টীয় ২০০-৬০০): এই যুগের ভাষা/উপভাষা সাধারণত 'প্রাকৃত' নামে অভিহিত হয়। প্রাকৃতগুলির মধ্যে প্রধান হলো—মাগধী, অর্ধমাগধী, মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, পৈশাচী ইত্যাদি। এদের মধ্যে মাগধী,শৌরসেনী ও মাহারাষ্ট্রী সংস্কৃত নাটকে প্রায়শই ব্যবহৃত। ধর্মনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ সাহিত্যরচনা মেলে কেবল মাহারাষ্ট্রীতে। অর্ধমাগধী প্রধানত জৈন-ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা ব্যবহৃত। এছাড়া অন্যান্য অপ্রধান প্রাকৃতের উল্লেখ বা নিদর্শন মেলে প্রধানত প্রাকৃত বৈয়াকরণদের রচনায়। (গ) অন্ত্য উপস্তরের প্রাকৃত বা অপভ্রংশ (খ্রীঃ ৬০০-১০০০): অপভ্রংশ সাহিত্যের রচনা-নিদর্শন প্রচুর। কালিদাসের (৪র্থ/৫ম শতক) 'বিক্রমোর্বশীয়ম্‌' নাটকেও অপভ্রংশের প্রয়োগ দেখা যায়। এই পর্বের গোড়ার দিকে অপভ্রংশ প্রধানত জৈনদের সাহিত্যিক মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হলেও পরে তা ধর্মনিরপেক্ষ লোকসাহিত্যের বাহন হয়ে উঠেছিল।

অর্বাচীন অপভ্রংশের বা অবহট্‌ঠের পরবর্তী স্তরে আধুনিক ভাষাগুলি এক-একটি আঞ্চলিক প্রাকৃত বা অপভ্রংশকে ভিত্তি করে বিবর্তিত হয়েছে।

॥ ৩ ॥

ভারতীয় ভাষাসমীক্ষার ইতিহাস

৩. ১ ভারতীয় ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব

ভারতীয় ভাষার আলোচনা প্রকৃতপক্ষে ভাষাতত্ত্বের উদ্বোধন দিয়েই শুরু। ভাষাতত্ত্বের সূত্রপাতও এই ভারতে সর্বপ্রথম ঘটেছিল। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে ইংরেজী ১৭৮৬ সাল একটি স্মরণীয় বছর। এই সময় Sir William Jones কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্বোধনী ভাষণে (ফেব্রুয়ারী ২, ১৭৮৬) সর্বপ্রথম সংস্কৃত, গ্রীক ও ল্যাটিনের সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেন : The Sanscrit Language whatever be its antiquity, is of wonderful structure ; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either ; yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and in the forms of grammar than could possibly have been produced by accident ; so strong indeed, that no philologer could examine all three without believing them to have sprung from some common source which, perhaps no longer exists."

জোন্‌স্‌-এর অন্তর্দৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এরপর অনেকেই সংস্কৃত ও ইউরোপীয় ভাষাগুলির ঐতিহাসিক আলোচনায় মনোনিবেশ করলেন, কিন্তু ভারতে ভাষা সম্পর্কে নতুন কিছু রচনা আর প্রকাশিত হয় নি। দীর্ঘদিন বাদে ১৮৫৬ সালে Bishop Caldwell-এর (১৮১৪-৯১) বিখ্যাত গ্রন্থ "The Comparative Grammar of the Dravidian or South Indian Family of Languages" প্রকাশিত হলে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের নবদিগন্ত সূচিত হলো। বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থ এখনও একখানি আদর্শ গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হয়ে থাকে। যাই হোক, এর কয়েক বছর বাদে ১৮৬৬ সালে ঠিক এইরূপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে John Beames ভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কিত গবেষণার সূত্রপাত করলেন। ১৮৬৬ সালে "A Comparative Grammar of the Modern Indian Languages" গ্রন্থখানি রচিত হলেও তিনখণ্ডের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হলো ১৮৭২ সালে। এরপর J. Beames তাঁর গ্রন্থটি সমাপ্ত করলেন তিনখণ্ডে এই নামে : A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages, London, 1872 (I), 1875 (II), 1879 (III)। তাঁর বিখ্যাত অপর

ক্ষুদ্র পুস্তক 'Outlines of Indian Philology'' প্রকাশিত হয়েছিলো অবশ্য উপরোক্ত গ্রন্থের পূর্বে (ইং ১৮৬৭)। ১৮৭২ সালে Rudolf Hoernle (১৮৪১-১৯১৮) তাঁর গবেষণার প্রথম অংশটি প্রকাশ করলেন Journal of the Asiatic Society of Bengal এবং পরে তা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হলো ১৮৮০ সালে :

১। Essays in aid of the Comparative Grammar of the Gaudian Languages, JASB Vol. XLI, part I, 1872, p. 120 ; Vol. XLII part I, 1873, p. 59 ; Vol. XLIII, part I, 1874, p. 22.

২। A Grammar of the Eastern Hindi compared with the other Gaudian Languages, London, 1880.

বস্তুত, গ্রীয়ার্সনের Linguistic Survey of India (LSI) গ্রন্থে অনুসৃত আর্য-ভাষা বর্গীকরণের সূত্রগুলি এইখানেই সর্বপ্রথম প্রযুক্ত হলো।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে এই শতকের আরও কয়েকজনে বিখ্যাত গ্রন্থকারের তালিকা নিচে দেওয়া হলো :

১। Ernest Trumpp : (ক) Grammar of the Sindhi Language compared with Sanskrit, Prakrit and the cognate Indian Vernaculars, 1872 (গ্রন্থখানি প্রকৃতপক্ষে ব্যুৎপত্তিমূলক ব্যাকরণ) ; (খ) Pashto Grammar, 1873.

২। John Platts : Grammar of the Hindustani or Urdu Language, 1872 (ব্যুৎপত্তিমূলক ব্যাকরণ)।

৩। Frederick Drew : The Jamoo and Kashmir, 1875 (গ্রন্থখানিতে জম্মু ও কাশ্মীরের ১৩টি প্রধান ভাষা/উপভাষা আলোচিত হয়েছে)।

৪। S. H Kellogg : A Grammar of the Hindi Language, 1876 (বিষয় : হিন্দীভাষা ও তার উপভাষার বিবরণ)।

৫। R. G. Bhandarkar : Wilson Philological Lectures, 1877, Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol 16, 17 (1883-85, 1887-89), বোম্বাই-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণ ; উপজীব্য : সংস্কৃত ভাষা থেকে আধুনিক ভাষার বিবর্তনগত ইতিহাস।

৬। R. N. Cust : A Sketch of the Modern Languages of the East Indies, 1878 ; গ্রন্থটি East Indies-এর ভাষাসমীক্ষা, কিন্তু সেইসঙ্গে ভারতীয় আর্য-ভাষা বর্গীকরণের নতুন মানদণ্ড স্থাপিত হয়েছে। গ্রীয়ার্সন Cust-এর কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন।

উপরোক্ত লেখক ও তাঁদের রচনাবলী ছাড়াও আরো কিছু ইউরোপীয় পণ্ডিত আধুনিক ভারতীয় ভাষাসম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন, যেমন—**B. H. Hodgson, Rev. W. Robinson, Prof. Maxmüller, George Campbell, W. W. Hunter, L. D. Skrefsrud, E. T. Dalton** প্রমুখ।

৩.২ ভারতীয় ভাষা ও জনসমীক্ষা

ভারতীয় জনসমীক্ষার প্রথম সূত্রপাত উনিশ শতকের শেষ পাদে। কিন্তু যে-নিবন্ধে ভারতের ভাষাসমীক্ষার একটি উপযোগী আদর্শ সর্বপ্রথম তুলে ধরা হয়েছে, সেটি হলো—**Sir Erskine Perry** রচিত **"On the Geographical Distribution of the Principal Languages of India and the feasibility of introducing English as a *lingua franca*"**, প্রকাশিত **Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, 1853.**

সারা ভারতের মাতৃভাষা সমীক্ষার প্রথম সূত্রপাত অবশ্য ১৮৮১ সালে। এই সমীক্ষায় কিন্তু কাশ্মীর এবং কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিসংখ্যান দেওয়া সম্ভব হয় নি। তাছাড়া, এই সমীক্ষায় ভাষার মূল্যায়ন ছিল খানিকটা গৌণ। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বক্তার মাতৃভূমি (**Birth place**), জাতি (**Race**), স্বাজাত্য (**Nationality**) অথবা নৃতাত্ত্বিক সংবাদ পরিবেশন।

১৮৮১ সমীক্ষার পূর্বে অবশ্য আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কিছু কিছু লাভ করা গিয়েছিল, যেমন, বোম্বাই (১৮৬৪), মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী (১৮৭১) এবং বাঙলা (১৮৭২)। তবে ভাষাভাষীর সংখ্যা, ভাষাঞ্চল, এমনকি ভাষাতাত্ত্বিক সাধর্ম্য ইত্যাদি সম্পর্কে মুখ্য অথবা গৌণ উল্লেখ এই সমীক্ষায় থাকলেও তা গভীরভাবে অনুশীলনযোগ্য হয়ে ওঠে নি। যাই হোক, ১৮৮১ সনের এই জনসমীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কেউ কেউ ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা শুরু করে দিলেন। এগুলি প্রধানত পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ অথবা বাঙ্‌লার জনসমীক্ষা, যেমন—

১। **Ibbetson D. C. J : Report on the Census of the Punjab taken on the 17th February 1881, Vol. I, Chapter V.**

২। **White E : Report on the Census of the North-Western Provinces and Oudh taken on the 17th February, 1881, Section XV.**

৩। **McIver L : Imperial Census of 1881, operations and results in the Presidency of Madras, Chapter X.**

৪। **Bourdillon J. A : Census of Bengal, 1881 (Report), Vol. I, Chapter X.**

এই সমস্ত বিবরণী সংক্ষিপ্ত হলেও সংবেদকেরা সমকালীন ভাষাতাত্ত্বিক রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন; তাই Caldwell, Hoernle, Beames, Max Müllar, Cust প্রভৃতি ভাষাবিদ্দের মতামত তাঁরা সদ্ব্যবহার করতে কার্পণ্য করেন নি।

ভারতীয় জনসংখ্যার দ্বিতীয় সমীক্ষা পরিচালিত হলো আরও দশ বছর বাদে অর্থাৎ ১৮৯১ সালে। এই সমীক্ষার সরকারী উদ্দেশ্য ছিল জনগণনা কিন্তু সেইসঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার অনুধাবন: "To serve as an aid to future Philological inquiry" (Baines J. A., Census of India, 1891, General Report, p. 130), পূর্ব-অনুসৃত পদ্ধতি অনুযায়ী কেবল race অথবা nationality-র বিচার নয়। এর ফলে ভারতীয় ভাষাগুলির প্রচলিত পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের যথাযথ মৌলিক সম্বন্ধ নির্ণয় অপরিহার্য হয়ে উঠলো। এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য: "to collect parent tongue information and compare the same with accepted scientific nomenclature" (p.131)। এই গবেষণা-কর্মের পরিচালন পদ্ধতি প্রসঙ্গে Baines স্মরণ করিয়ে দিলেন: An operation of that description can only be conducted by a skilled philologist who knows exactly the lines on which information should be collected, so that the results may be susceptible of comparison over the whole of India. It is hardly necessary to add that he must have a practical knowledge too, of the country and its inhabitants and should not work from books alone. Then again, an enquiry of this sort should be commenced, if taken in hand at all, without further delay" (p. 131)। বলা বাহুল্য, Baines-এর পরামর্শ-বাণী ভাষাসমীক্ষার ক্ষেত্রে এখনও প্রযোজ্য। শুধু তাই নয়, সরকারী পরিচালকদের তুলনায় ভাষাতত্ত্ব-বিদ্দের প্রয়োজন যে এক্ষেত্রে অধিক প্রয়োজনীয়, তা Baines তাঁর অন্তর্জ্ঞান দিয়েই বুঝতে পেরেছিলেন।

এর পরের দশকের ভাষাসমীক্ষা পরিচালিত হলো ১৯০১ সালে। এই ভাষা-সমীক্ষার (Linguistic Survey) পরিচালক বা Superintendent ছিলেন Sir George A. Grierson। তিনি অবশ্য তাঁর পূর্ববর্তী সমীক্ষাগুলির সাহায্য নিতে দ্বিধাবোধ করেন নি। এই সমীক্ষায়-অনুসৃত তাঁর ভাষা-বর্গীকরণের সূত্র পরবর্তী-কালে, ১৯৩১ সাল পর্যন্ত ভাষাসমীক্ষার মূল ভিত্তি ছিল।

১৯০১-এর সমীক্ষার পরে ১৯২১ সালে যে জনসমীক্ষা হয়েছিলো, তার পরিচয় মেলে Martin-এর বিবরণে (দ্র. Martin J. J : Census of India, 1921, Vol. I, Part i, Report, Chapter IX, p. 192)।

স্বাধীনতা-পূর্ব-যুগে জনসমীক্ষার শেষ পর্ব হলো ১৯৩১ সাল এবং বলা বাহুল্য, তা গ্রীয়ার্সন-অনুসৃত পথেই পরিচালিত হয়েছিলো। এই সমীক্ষার পরিচালক ছিলেন Hutton (দ্র. Hutton J. H : Census of India, 1931, Vol. I, part i, Report, Chapter X)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশা করি, পরিস্ফুট হয়েছে যে ভারতীয় জনগণনা বা Census এবং ভাষাসমীক্ষা (Linguistic Survey) প্রকৃতপক্ষে পরিপূরক সমীক্ষারূপে আগাগোড়া পরিচালিত হয়েছিল।

৩.৩ জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন (১৮৫১-১৯৪১)

গ্রীয়ার্সনের পরিকল্পনায় ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব এবং ভাষাসমীক্ষা এক চমৎকার সুসংহত আদর্শ সৃষ্টি করেছিল। তাই তাঁর পরিকল্পিত Linguistic Survey of India (LSI) গ্রন্থখানি আজও অমর। সুতরাং ভারতীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে গ্রীয়ার্সন সম্পর্কীয় তথ্যগুলি জানা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

Sir George Abraham Grierson ১৮৫১ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজধানী ডাবলিনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৩ সালে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (ICS) পরীক্ষায় কৃতবিদ্য হয়ে তিনি বাঙ্‌লা প্রেসিডেন্সীতে চাকরীসূত্রে আসেন। একাদিক্রমে ২৩ বছর তিনি কর্মজীবনের দায়িত্বভার বহন করেন। পরে ১৮৯৮ সালে তিনি LSI যোজনার পরিচালক (Superintendent) নির্বাচিত হন। ১৮৭৪ সাল থেকে তিনি ক্রমান্বয়ে ভারতীয় লোককথা, সাহিত্য ও ভাষাসম্পর্কে অবিশ্রান্তভাবে লেখনী চালনা করেন। এই শতকের আট দশকে বিহারে স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় বিহারী ভাষাগুলি সম্পর্কে তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌ সম্মেলনের (Congress of Orientalist) ভিয়েনা অধিবেশনে (১৮৮৬) Bühler, Weber, Cust, M. Williams এবং অন্যান্যদের সহায়তায় তিনি ভারতীয় ভাষাসমীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রস্তাব অনুমোদন করান। এই কাজ শুরু হয় ১৮৯৮ সালে। ১৯০৩ সাল থেকে LSI খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হতে থাকে এবং শেষ খণ্ড বেরোয় ১৯২৭ সালে। এই বিপুল গ্রন্থ ১১টি Octavo Volume-এ গ্রথিত। তার মধ্যে ৫টি খণ্ড ১৪টি অংশে বিভক্ত। এতে ভারতে প্রচলিত ১৭৯টি ভাষা এবং ৫৪৪টি উপভাষার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

সমস্ত গ্রন্থই সম্পাদনা করেন গ্রীয়ার্সন নিজে। ১৯০৩ সালে তিনি সরকারী কার্য থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে ইংলণ্ডে ফিরে যান। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কয়েকটি প্রধান গ্রন্থ হলো—

১। An Introduction to the Maithili Language of North Bihar, Asiatic Society of Bengal, 1881-82.

২। Seven Grammars of the Dialects and Sub-dialects of the Bihari Language (8 Parts), 1883-87.

৩। Bihar Peasant Life, Calcutta, 1885.

৪। Padumavati of Jaisi (in collaboration with Sudhakar Dwibedi), 1876.

৫। Modern Vernacular Literature of Hindustan, JASB, 1889.

৬। Translation of Emile Senart's "The Inscriptions of Piyadasi", Indian Antiquary, 1888.

৭। On the Phonology of the Modern Indo-Aryan Vernaculars, ZDMG, 1895-96.

৮। Essays on Kashmiri Grammar, Calcutta/London, 1899.

৯। A Manual of the Kashmiri Language (2 parts), Oxford, 1911.

১০। A Dictionary of the Kashmiri Language, 1916-32 ইত্যাদি।

দীর্ঘদিন ভারতীয় ভাষাসম্পর্কে গবেষণা করার ফলে এই ভাষাগুলি সম্পর্কে তাঁর একটি বিশেষ ধ্যানধারণা গড়ে ওঠে। ভারতীয় তথা এশীয় ভাষাগুলির গোত্রগত সম্পর্ক নির্ণয় ও ভাষাসমীক্ষা ছাড়াও তাঁর উদ্ভাবিত বিশেষ কতকগুলি তত্ত্ব এবং অবদান দেখা যাবে এই এই ক্ষেত্রে : ভারতীয় ভাষার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বর্গীকরণ (Inner and Outer Circle Theory), পশ্চিমা হিন্দুস্থানী ও বিহারী ভাষাগুলির সঠিক মূল্যায়ন, দর্দ (Dardic) গোষ্ঠীভুক্ত আর্যভাষা, বিশেষত কাশ্মীরী ভাষার স্বরূপ নির্ণয়, জিপসী ভাষা সম্পর্কে তথ্যাবলী আহরণ ইত্যাদি।

৩. ৩. ১ গ্রীয়ার্সন ও "Linguistic Survey of India" (LSI) :

গ্রীয়ার্সন-পরিচালিত ভাষাসমীক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল : একটি আদর্শ পাঠ অবলম্বনে জ্ঞাত কথ্য ভাষাগুলির অনূদিত নমুনা সংগ্রহ এবং সেইসঙ্গে কিছু শব্দ ও

বাক্যের তালিকা প্রস্তুতকরণ: "Collection of Specimens of every known speech through the translation of a standardized running text and the listing of words and sentences"। কিন্তু এই ভাষাগুলির বর্গীকরণের জন্য প্রয়োজন একটি সুসংহত পদ্ধতি। গ্রীয়ার্সনের লক্ষ্য ছিল প্রচলিত ব্যাকরণের সাহায্যে তাদের শ্রেণীভুক্ত করা (LSI Vol. I, Part i, p. 22)। ভাষাসমীক্ষার প্রাথমিক ধ্যানধারণা অনুযায়ী তিনি কেবল শব্দ-ভাণ্ডারকেই একমাত্র অবলম্বন মনে করেন নি। দ্বিতীয়ত, তুলনীয় বিভিন্ন ভাষাগুলি বক্তাদের কাছে কতখানি বোধগম্য, তা মানদণ্ড না ক'রে তিনি প্রচলিত ব্যাকরণগত কাঠামোর ওপরই জোর দিতে চেয়েছিলেন বেশী। ফলে তাঁর সমীক্ষা কিছুটা অনুমাননির্ভর (Subjective) হয়ে উঠেছে। তৃতীয়ত, ভাষার সাহায্যে জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ করাও তাঁর পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য (Motif)। তিনি মনে করতেন, ভাষা-পরিকল্পিত জাতীয়তাবোধ ভাষা-ভাষীদের ভাষা সম্পর্কে সচেতন ও আগ্রহী করে তুলবে এবং তার ফলে সেই ভাষা-সৃজনশীল হয়ে উঠবে আগামী দিনের সৃষ্টি সম্ভাবনায় (p. 24)। চতুর্থত, তাঁর ভাষা বিন্যাস প্রধানত গোত্রগত (Genealogical) বর্গীকরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই বর্গীকরণের ক্ষুদ্রতম একক হলো Sub-dialect এবং বৃহত্তম একক Family এবং এদের অন্তর্বর্তী ক্রম হলো এইরূপ: Sub-dialect (বিভাষা)→Dialect (উপভাষা)→ Language (ভাষা)→Group (বিভাগ/বর্গ)→Sub-branch (প্রশাখা)→শাখা (Branch)→Sub-family (উপগোষ্ঠী)→Family (গোষ্ঠী)। গ্রীয়ার্সন-সমীক্ষায় গোত্রগত বিচারের মানদণ্ডে ভারতের ভাষাগোষ্ঠী সংখ্যায় ছয়টি, যথা—অষ্ট্রিক (Austric), কারেন (Karen), মোন (Mon), ভোট-বর্মী (Tibeto-Burman), দ্রাবিড় (Dravidian) এবং ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European)।

একথা অনস্বীকার্য, গ্রীয়ার্সনের সমীক্ষা সর্বতোভাবে ত্রুটিমুক্ত নয়। গ্রীয়ার্সন নিজেও অনেক সময় তাঁর রচনার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এই প্রসঙ্গে LSI-গ্রন্থের কয়েকটি অসম্পূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে:

১. এই সমীক্ষা থেকে মাদ্রাজ, ব্রহ্ম, হায়দ্রাবাদের রাজ্যগুলি এবং মহীশূর রাজ্য বাদ পড়েছিল।

২. আলোচ্য ভাষাগুলির ক্ষেত্রে ধ্বনিবিজ্ঞান বা Phonetics-এর আলোচনা নেই। অবশ্য এইসময় ধ্বনিবিজ্ঞান ছিল শৈশব স্তরেই। ফলে, ধ্বনিবৈজ্ঞানিক বা-Phonetician সংগ্রহ করা অসম্ভব-প্রায় ছিল।

৩. সমীক্ষার 'উপাদানগুলি' সমীক্ষা-সম্পাদকের কাছে প্রেরিত হয়েছিল আর

এদের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছিলেন সরকারী কর্মচারীরা। এঁরা যথার্থ যোগ্য ('uniformly competent') এবং পারদর্শী ('qualified') ছিলেন কিনা এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

৪. নমুনা-সংগ্রহের উপাদান ছিল প্রচুর, কয়েক হাজার তো বটেই! গ্রীয়ার্সন তাই এইগুলিকে ঝাড়াই-বাছাই বা পরিশোধন করেছিলেন তাঁর নিজের আদর্শ অনুযায়ী (আর এই আদর্শও ছিল subjective এবং তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন, দ্রঃ **LSI** Vol. I, Part i, p. 197)। তিনি নিজেই অনেকক্ষেত্রে (বিশেষত ভোট-বর্মী, অষ্ট্রিক বা দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী সম্পর্কে) মন্তব্য করেছেন যে উপাদানগুলির কিছু কিছু অংশ অবিশ্বাসযোগ্য (**'untrustworthy'**), অসন্তোষজনক (**'unsatisfactory'**) বা বিতর্কিত ('to be taken with reserve') ইত্যাদি।

স্পষ্টতই **LSI** সমীক্ষায় গ্রীয়ার্সন কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং সে-সম্পর্কে তিনি নিজেও যথেষ্ট অবহিত ছিলেন (দ্রঃ **LSI, Vol. I, Part i, p. 194**)। পরবর্তী যুগে স্বভাবতই এই সমীক্ষা আরও যথার্থ এবং সুবিন্যস্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু তাতে গ্রীয়ার্সনের অবদান বাতিল হয়ে যেতে পারে না। বর্তমানে কোনো কোনো নব্য পণ্ডিত গ্রীয়ার্সনের এই বিশাল কর্মকাণ্ডকে বক্র দৃষ্টিতে দেখেছেন, যদিও LSI-ভাষাসমীক্ষার মতো এমন স্থাপত্য-শিল্প এখনও কোন দেশে দেখা যায় নি। Prof. Jules Bloch বলেন: "No other large portion of earth can boast of any so extensive and methodologically uniform description as the one you see collected in the volumes of the Linguistic Survey of India. That will long give you a basis and a frame to linguistic studies in India." [দ্রঃ Some Problems of Indo-Aryan Philology, Forlong Lectures for 1929, Bulletin of the School of Oriental Studies, London, Vol. V (1924-30), pp. 750-75]।

বলা বাহুল্য, এই উক্তি তাৎক্ষণিক প্রশংসা নয়, কারণ, বর্তমানেও Prof. M. B. Emeneau-র মতো সুধীজন বর্ণনামূলক অথবা তৌলন ভাষাতত্ত্বের পক্ষে **LSI** প্রতিবেদন অপর্যাপ্ত ('inadequate') বলে মনে করলেও, গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: "Yet an amazing amount of the gross features come through, and the Survey does roughly map out language and dialect areas which can be visited to produce more adequate treatment." [Presidential Address. American Oriental Society at Toronto on April 20, 1955,

published in Journal of the American Oriental Society, Vol. 75, No. 3 (July-Sept.), 1955, p. 152]।

সম্প্রতি J. J. Gumperz এবং C. A. Ferguson LSI সম্পর্কে যে সপ্রশংস মন্তব্য করেছেন, এই প্রসঙ্গে তাও উল্লেখযোগ্য : "Almost all the work in South-Asian dialectology published since Grierson has been based on his work with only a very meagre amount of original investigation and Grierson's volume remains by far the most important source of data for the social scientist concerned with the distribution of dialect diversity of South-Asian languages"। একই গ্রন্থের অন্যত্র তাঁরা বলেছেন : "...in noting that Grierson did little or no dialect atlas work, we have no intention of belittling his tremendous achievement. The LSI remains one of the world's major productions of linguistic scholarship and Grierson himself was aware of the necessary limitation of his project" [Linguistic Diversity in South Asia, 1960, pp. 8,18]। গ্রীয়ার্সন সম্পর্কে উপরোক্ত প্রশংসা বাক্যগুলি উদ্ধৃতির একমাত্র কারণ এই যে সাম্প্রতিক কালের বৃহত্তম ভাষাসমীক্ষার (১৯৬১) ক্ষেত্রেও গ্রীয়ার্সনের এই বর্গীকরণ পদ্ধতি গ্রহণ না ক'রে উপায় ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই গ্রীয়ার্সন সমীক্ষার দোষ-গুণ বর্তমান সমীক্ষায়ও বর্তেছে।

৩.৪ সাম্প্রতিক ভাষাসমীক্ষা (১৯৬১-১৯৭১) :

পূর্বেই বলেছি, সাম্প্রতিক ভাষাসমীক্ষার মূল প্রতিশ্রুতি গ্রীয়ার্সন-বর্গীকরণকেই অঙ্গীকার করে নিয়েছে। কোথায়ও কোথায়ও অবশ্য কিছুটা পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে, যেমন, এই পরিসংখ্যানে অথবা ১৯৫১ সমীক্ষায় হিন্দী ভাষাঞ্চলকে একটি বিশাল অবয়বে প্রসারিত করার চেষ্টা দেখা গেছে।

দ্বিতীয়ত, সমীক্ষার কাজ পরিচালনা করেছেন ক্ষেত্র বিশেষজ্ঞদল (Field Workers)। বর্তমান সমীক্ষা প্রশ্নোত্তরমালার (Questionnaire) আকারে রচিত ; প্রত্যেক নাগরিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল দুটি প্রশ্ন : প্রথমত, বক্তার (Enumerator) মাতৃভাষা কী ; দ্বিতীয়ত, বক্তা অন্য ভাষা জানে কিনা। মোট কথা,

মাতৃভাষা (Mother tongue) ও দ্বিভাষীর সংখ্যা (Bi-lingual returns) নিরূপণ ছিল এই পরিসংখ্যানের মূল উদ্দেশ্য।

তৃতীয়ত, সমীক্ষা-পরিচালক কার্যসাধন প্রণালীর (modus operandi) সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও আমাদের অবহিত করেছেন। এইজাতীয় ক্রিয়াকাণ্ডের প্রধান অসুবিধা নানা ধরণের হতে পারে, যেমন—

১. সাধারণভাবে প্রত্যেক বক্তাই তার মাতৃভাষা সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু শহরাঞ্চলে ভাষাভাষীদের মিশ্রণের ফলে বিপর্যয় ঘটতে পারে, যেমন দিল্লীতে বসবাসকারী দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাভাষী প্রশ্নোত্তরে জানায়, তাঁর মাতৃভাষা মাদ্রাজী (অর্থাৎ তামিল, তেলুগু, মালয়ালাম্ বা কানাড়ীর পরিবর্তে)।

২. মাতৃভাষার ইংরেজী প্রতিবর্ণীকরণেও (Roman Transcription) কিছু ভুল থেকে যেতে পারে।

৩. একই রাজ্যের মধ্যে অথবা অন্য রাজ্যে একই মাতৃভাষা বিভিন্ন নামে অথবা বানানে প্রচলিত, যেমন—লুসাই/লুশেই/মিজো, মোঘ/মঘি, সৌরাষ্ট্র/সৌরাষ্ট্রী ইত্যাদি।

৪. অনেক সময় একই ভাষা বিভিন্ন উচ্চারণে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, যেমন —বির্‌জিআ/ব্রিজিআ/বিঞ্জিঅ, বোডো/বোরো, ব্রজভাষা/ব্রজভাখা, দক্‌নী/মুসলমানী, খোন্দ্‌/কোন্দ্‌ ইত্যাদি। বিদেশী ভাষাগুলি সম্পর্কেও এইরূপ বিপর্যয় সহজলভ্য, যথা—আফগানী/কাবুলী/পখ্‌তো/পশ্‌তো/পাঠানী ইত্যাদি।

৫. বিপরীত পক্ষে, বিভিন্ন ভাষাকে একই ভাষারূপে চিহ্নিত করার প্রবণতা দেখা যায় ; যেমন, 'হিন্দী' ভাষাসম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকায় তা বিভিন্ন নামে চিহ্নিত : হিন্দী/হিন্দুস্থানী/নাগরী/নাগরী হিন্দী/পছাহাঁ ইত্যাদি।

৬. গ্রীয়ার্সন-নির্ধারিত বানান অনেকক্ষেত্রে পরিবর্তিত করা হয়েছে, যেমন, গ্রীয়ার্সনের 'ওরাওঁ' এখানে হয়েছে—Oran বা ওরান্।

৭. বহুক্ষেত্রে মাতৃভাষীর সংখ্যা দু/একজন মাত্র। এছাড়া অনির্ণীত (Unspecified) সংকর (Hybrid) ভাষাগুলির সমস্যা তো আছেই।

উপরোক্ত আলোচনা থেকেই বোঝা গেলো, বর্তমান ভাষাসমীক্ষার মূল সমস্যা কোথায়। জটিল বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বরং বর্তমান ভাষাসমীক্ষার পরিচালন-পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। লক্ষ্য করবার বিষয়, বর্তমান পরিসংখ্যান থেকে কেবল মাতৃভাষার পরিচয় উদ্ঘাটন করা যাচ্ছে, ভাষার উপভাষা (Dialect) বা বিভাষার (Sub-dialect) পরিচয় নয়। প্রকৃত-

পক্ষে মাতৃভাষার সংজ্ঞা কী তা জানা নেই। ভারতের বিপুল নিরক্ষর জনগণকে (প্রায় ৭০%) যখন তাদের মাতৃভাষা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তখন তাদের কাছ থেকে আমরা কী উত্তর আশা করতে পারি? বর্তমান সমীক্ষণেই দেখা গেছে, বহু নাগরিক তাদের মাতৃভাষাকে নিজেদের উপজাতিক (Tribal) নামে অভিহিত করেছেন (যেমন, বঞ্জারী, আদিবাসী ভীলী, রাজবংশী, আদি গোণ্ডী ইত্যাদি); কখনও বা প্রচলিত ধর্মীয় অভিধায় ভাষাকে চিহ্নিত করেছেন (ইসলামী, মুসলমানী, শিখী, পার্সী ইত্যাদি); এমনকি লিপিরীতিকেই ভাষা নামে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন (যেমন নাগরী) অনেকে। এমনও দেখা গেছে, নিজের জন্মভূমিকেই ভাষা ব'লে মনে করেছেন বহু বক্তা (পাকিস্তানী, মাদ্রাজী) অথবা নিজের বৃত্তিকে ভাষা বলে ভুল করেছেন (ক্ষত্রী, ক্ষত্রিয় মারাঠী, রাজপুতী, অহীর হিন্দী, ব্রাহ্মণী ইত্যাদি)। এছাড়া মাতৃভাষা মানদণ্ড হিসেবে গৃহীত হওয়ায় মাত্র দু/তিনজনে কথা বলে—এমন মাতৃভাষাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুতরাং বক্তার ইচ্ছায় ভাষা চিহ্নিত হলে তা সুষ্ঠু বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, ভাষাসমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, ভাষা-উপভাষা-বিভাষার স্পষ্ট বিভাজন (Delimitation), কেবল ভাষাভাষীর পরিসংখ্যান সেখানে অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক। এই সমীক্ষার মূল ত্রুটি হলো: ব্যাকরণগত বিচারে ভাষাগুলিকে চিহ্নিত করা হলেও ব্যক্তিগত স্তরে মাতৃভাষাকে সেই আলোকে বিচার না ক'রে বক্তার ইচ্ছার উপর ভাষার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছে। সুতরাং ভাষার delimitation-এর জন্য প্রয়োজন ভাষাবিভেদের ভৌগোলিক জরিপ (Dialectal Atlas)। ভাষার সীমানা চিহ্নিত না ক'রে মাতৃভাষার পরিসংখ্যান নেওয়া এবং সেই সঙ্গে সেই ভাষাটিকে নির্বিচারে যে-কোনো ভাষা বা উপভাষার এক্তিয়ারে বর্গীভূত করা অনেক সময় সঠিক পদক্ষেপ নাও হতে পারে। অথবা বিপরীত দিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, আগে বক্তাদের ভাষাগুলির পরিপূর্ণ চিত্র গ্রহণ করা দরকার, তারপর আসে ভাষাগুলির ভাষাগত সীমানা নির্ধারণ।

তৃতীয়ত, মাতৃভাষার সংখ্যাধিক্য দিয়ে যেমন ভাষিক বা ঔপভাষিক মর্যাদা (Dialectal status) নির্ণয় করা যায় না, তেমনি কোনো ভাষার জনবল-পরিসংখ্যান দিয়ে সেই ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬১—সমীক্ষায় প্রদর্শিত পরিসংখ্যানের সাহায্যে হিন্দীর গুরুত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, কারণ ১৯৬১—জনগণনায় হিন্দী সারা ভারতের আনুমানিক ৩০.৩৭% জনগণের ভাষা (১৯৫১—

জনগণনায় উর্দু-হিন্দুস্থানী-পাঞ্জাবীকে অন্তর্গত ক'রে হিন্দীর হার দেখানো হয়েছিল, ৪২.০১%)। কিন্তু জনগণের সংখ্যাধিক্যই যদি কোনো ভাষার গুরুত্বের মাপকাঠি ব'লে ধরা হয়, তাহলে ভারতে অ-হিন্দী ভাষাভাষীর বাকী ৭০% জনগণের ভাষাকে উপেক্ষা করা হয়। সাহিত্যিক মর্যাদার দিক দিয়েও বাঙলা, তামিল ও মারাঠীর পরে হিন্দীর স্থান। শুধু তাই নয়, ভারতীয় জনগণের মাত্র ২.৫% অংশ ইংরেজী জানে বা বোঝে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে ইংরেজীর গুরুত্ব কি কোনো অংশে কম? লক্ষণীয়, ১৯৬৬ সনের হিসেব অনুযায়ী ইংরেজী সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মোট প্রচার সংখ্যার ২৫.৬% কিন্তু হিন্দীর ক্ষেত্রে ১৩% (দ্রঃ **Jyotirindra Das Gupta : Language Conflict and National Development, California, 1970**]। এই প্রসঙ্গে কোনো ভাষার অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের কথাও ভেবে দেখা দরকার। সমগ্র হিন্দী ভাষাঞ্চলে (অর্থাৎ বিহার-উত্তরপ্রদেশ-মধ্যপ্রদেশ-রাজস্থান) সাক্ষর লোকের গড় হার ১৭.৭% কিন্তু অ-হিন্দী-ভাষাঞ্চলে এই হার ২৭.১% (**Census of India, paper no. I of 1962, p xxxii**)।

চতুর্থত, যদিও এই সমীক্ষায় দ্বিভাষী জনগণের পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে, তথাপি প্রকৃতপক্ষে ভারতে এক-ভাষাভাষীদেরই প্রাধান্য। যেমন ১৯৬১ সনের গণনা অনুযায়ী প্রায় ৪৪ কোটি লোকের মধ্যে ৩ কোটি লোক দ্বিভাষী (**Bi-lingual**) (লিখতে পড়তে বা বুঝতে পারার স্বচ্ছন্দতার কথা বাদ দিয়েই!)। প্রকৃতপক্ষে সারা ভারতে দুটি ভাষা জানে এমন লোকের সংখ্যা শতকরা সাতের (৭%) বেশি নয়। তাছাড়া, দ্বিভাষীদের কেবল হার-নির্ণয়ই যথেষ্ট নয়, প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত: দ্বিভাষপ্রবণতার পরিবেশগত পরিস্থিতি, সামাজিক যোগাযোগজনিত প্রভাব, দ্বিতীয় ভাষাটির ওপর মাতৃভাষীর প্রকৃত অধিকার (**Degree of control**) অথবা দুটি ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক ও বোধগম্যতা ইত্যাদি নানা বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা। **Charles A. Ferguson**-এর মতে উপাদান-সংগ্রহের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত: "When and under what circumstances each language is used and what the attitudes of the people are toward the two languages" [Background to Second language problems in "Study of the role of Second language in Asia, Africa and Latin America." edited Frank A. Rice, p. 2]।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বর্তমান সমীক্ষার অসম্পূর্ণতার কথা বোঝা গেল।

কোনো গৃহকর্তার দায়-দায়িত্বের কথা বাদ দিয়ে তার আয়ের অঙ্ককেই যদি গৃহস্থের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা ব'লে স্থির করা হয়, তাহলে যেমন সুবিচার হয় না, তেমনি ভারতের ভাষাসমস্যার প্রকৃত দিক উদ্ঘাটন না ক'রে জনসংখ্যা বা মাতৃভাষার হিসেব নির্ণয় আসল সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়ারই নামান্তর। কাজেই ভারতীয় ভাষার সার্বিক চিত্র উহ্য রেখে কেবল মাতৃভাষা গণনা ঘোড়ার আগে গাড়ী জোতারই সামিল। ভারতীয় ভাষাগুলির সমীক্ষাকে সম্পূর্ণাঙ্গ ক'রে তুলতে পুণায় অনুষ্ঠিত (মে, ১৯৫৩) ভাষাতাত্ত্বিকদের সম্মেলনে এই আদর্শ পূর্বেই গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই আদর্শের সূত্রগুলি এই—

(a) Basic descriptive analysis of the languages and dialects to be found in India.

(b) Recording of all the available materials in each language/dialect, such as folk songs, folk literature, proverbs, stories, fables etc.

(c) For literary Languages with a continuous history (i) critical editions of texts, (ii) historical grammars, (iii) modern descriptive analysis of the literary standard and of the spoken varieties of the same.

(d) Typology of material culture from a material point of view.

(e) Dialect geography and atlases of individual regional languages and dialects.

(f) Adequate description of primitive languages.

(g) A complete record of the full vocabularies of each dialect.

কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে হিন্দীর সাড়ম্বর জয়যাত্রা ও ঢক্কানিনাদে যে বিস্তর ধূলিজাল উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে, তাতে ভারতের অন্যান্য ভাষাগুলি কেবল ধূলায় ধূসর ও মলিন হয়ে উঠছে না, ক্রমশ পিছু হটেও যাচ্ছে; আর পণ্ডিতী প্রতিশ্রুতি রয়ে যাচ্ছে কেবল সরকারী নথিপত্রে এবং 'সেমিনার' নামক সর্বভারতীয় কোলাহলের হট্টমেলায়।

॥ ৪ ॥

ভারতের ভাষাচিত্র (১৯৬১) : ইন্দো-ইউরোপীয়

৪.১ ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠী

সারা পৃথিবীতে প্রায় তিন হাজার প্রধান প্রধান ভাষা চলিত আছে। এই ভাষাগুলিকে আনুমানিক ২৫।২৬টি ভাষাগোষ্ঠী বা ভাষাপরিবারের (Language Families) অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। গোত্রগত বর্গীকরণের (Genealogical Classification) মানদণ্ডে বিচার করলে দেখা যাবে, অবিভক্ত ভারতের ভাষাগুলি প্রধানত চারটি ভাষাগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এর বাইরে যে-সব ভাষা রয়েছে, তা সংখ্যায় ও গুরুত্বে নগণ্য। প্রধান চার ভাষাগোষ্ঠী হলো - ইন্দো-ইউরোপীয়, ভোট-চীনা, অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড়। অবর্গীভূত ভাষার মধ্যে কয়েকটি হলো আন্দামানী, বুরুশাস্‌কী ইত্যাদি। স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে বিশদ জনসমীক্ষায় (ইং ১৯৬১) দেখা গেছে, ভারতে প্রচলিত মোট ভাষার সংখ্যা ১৬৫২, ভাষাভাষীর সংখ্যা ৪৩ কোটি ৮৯ লক্ষেরও অধিক। এর মধ্যে প্রায় ৪৩ কোটি ১৪ লক্ষ লোক উপরোক্ত প্রধান চারটি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক জনসমীক্ষার প্রতিবেদন [Census of India, 1961, Vol. I Part II c (ii)] নিচে দেওয়া হলো—

ভাষাগোষ্ঠীর নাম	মাতৃভাষার সংখ্যা	মোট ভাষাভাষীর সংখ্যা
ভোট-চীনা	২২৬	৩১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮০১
অস্ট্রিক	৬৫	৬১ লক্ষ ৯২ হাজার ৪৯৫
দ্রাবিড়	১৫৩	১০ কোটি ৭৪ লক্ষ ১০ হাজার ৮২০
ইন্দো-ইউরোপীয়	৫৭৪	৩২ কোটি ১৭ লক্ষ ২০ হাজার ৭০০
কিসান (দ্রাবিড়/অস্ট্রিক মিশ্রিত)	১	৫০ হাজার ৩৭৮
অভারতীয় ভাষা	১০৩	৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৪৬৬
অবর্গীভূত ভাষা	৫৩০	৬৩ হাজার ২৫৮
	মোট ১৬৫২	৪৩ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯১৮*

* এই লোকসংখ্যার মধ্যে নেফা বা অরুণাচলের ২,৯৭,৮৫৩ জন অধিবাসীর হিসেব ধরা হয়নি। এ ছাড়া ১৯৬১ সালের প্রতিবেদন ব'লে স্বাভাবিকভাবেই সিকিমের অন্তর্ভুক্তির কথাও ওঠে না।

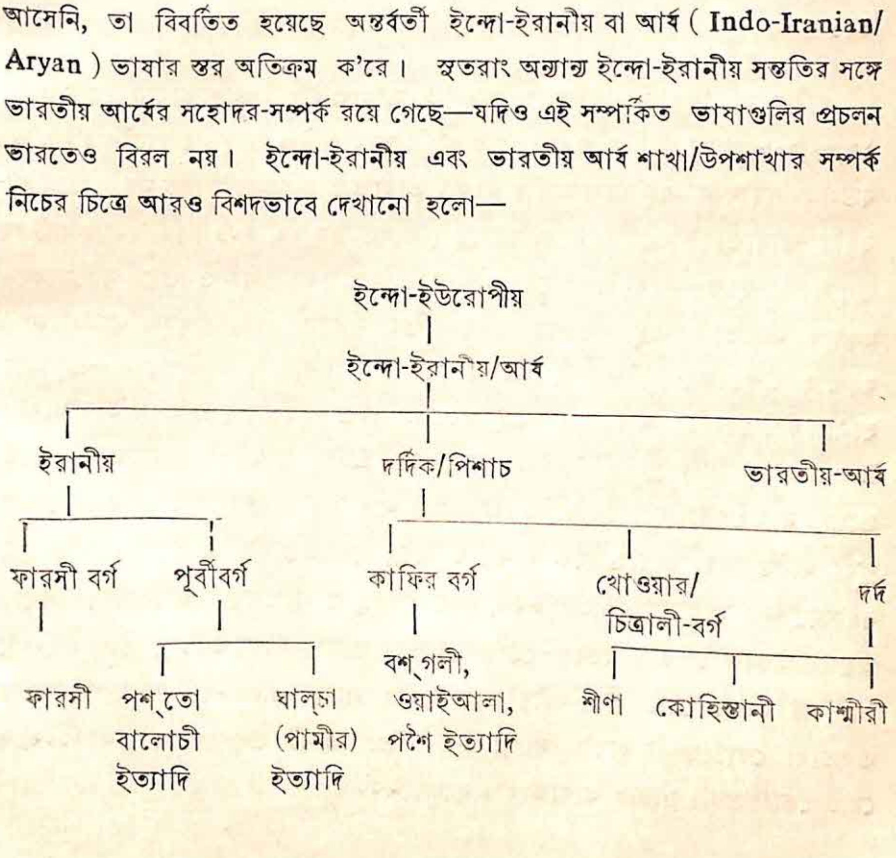
৪.১ ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠী

ভারতের প্রধান চারটি ভাষাগোষ্ঠী সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য ও পরিসংখ্যান এখন আলোচিত হবে।

৪.২ ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European)

সমগ্র ভাষা-পরিবারের মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী সারা পৃথিবীতে অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে। ভারতেও এই ইন্দো-ইউরোপীয়ের সন্ততি ভারতীয় আর্যশাখা (Indo-Aryan/Indic Sub-Family) সম্প্রসারিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি—পশ্চিমে সিন্ধু থেকে পূর্বে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত এর ভাষাঞ্চল। বর্তমান জনসমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতে ভারতীয় আর্যশাখার অন্তর্গত মাতৃভাষা সংখ্যায় ৫৭৪টি। উপরোক্ত ৫৭৪টি মাতৃভাষার ভাষাভাষীর সংখ্যা ৩২ কোটি ১৭ লক্ষ ২০ হাজার ১০০; অর্থাৎ সারা ভারতের জনসংখ্যার ৭৩.৩০ শতাংশ লোক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী।

ঐতিহাসিক বিচারে ভারতীয় আর্য, ইন্দো-ইউরোপীয় উৎস থেকে সরাসরি আসেনি, তা বিবর্তিত হয়েছে অন্তর্বর্তী ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য (Indo-Iranian/ Aryan) ভাষার স্তর অতিক্রম ক'রে। সুতরাং অন্যান্য ইন্দো-ইরানীয় সন্ততির সঙ্গে ভারতীয় আর্যের সহোদর-সম্পর্ক রয়ে গেছে—যদিও এই সম্পর্কিত ভাষাগুলির প্রচলন ভারতেও বিরল নয়। ইন্দো-ইরানীয় এবং ভারতীয় আর্য শাখা/উপশাখার সম্পর্ক নিচের চিত্রে আরও বিশদভাবে দেখানো হলো—



বলা বাহুল্য, ইন্দো-ইরানীয় বা আর্যশাখার এই বর্গীকরণ করেছেন গ্রীয়ার্সন এবং সুনীতিবাবু। এই বিভাগ সুধীজনের অনেকে স্বীকার করতে চান না (দ্রঃ ২.২.১)। যাই হোক, বর্তমান জনসমীক্ষায় (ইং ১৯৬১) কিন্তু গ্রীয়ার্সনের (G. A. Grierson) আদর্শই অনুসৃত হয়েছে।

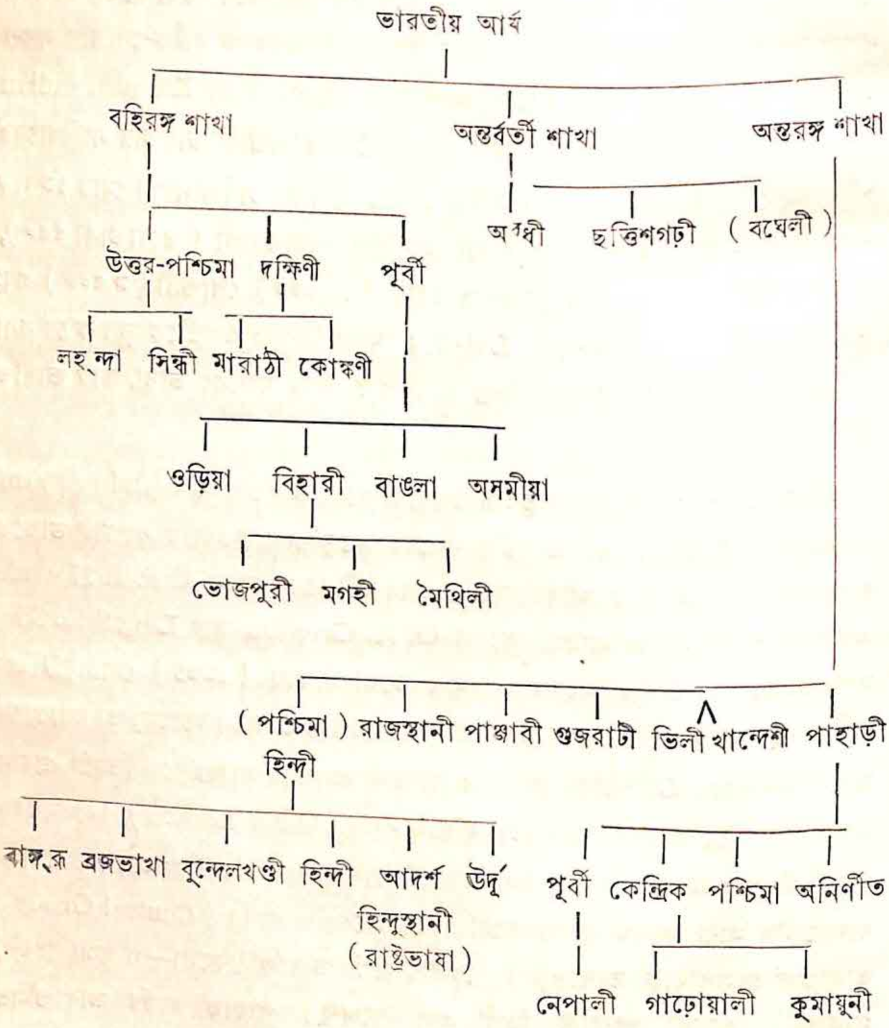
বর্তমান জনসমীক্ষার প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, উপরোক্ত ভাষাগুলির মধ্যে ইরানীয় উপশাখার অন্তর্গত ফারসী, পশ্‌তো (নামান্তর : আফগানী/কাবুলী/পখ্‌তো/পাঠানী) এবং বালোচী (প্রচলিত যথাক্রমে ইরান, আফগানিস্তান এবং বালোচিস্তানে) ভারতের সীমানা-বহির্ভূত, কাজেই এগুলি ভারতীয় ভাষার অন্তর্গত হয় নি সঙ্গত কারণেই। তবে ভারতে প্রচলিত বিদেশী ভাষা হিসেবে বর্তমান সমীক্ষায় তাদের পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছে। ভারতে ফারসী, পশ্‌তো এবং বালোচী—এই তিনটি বিদেশী ভাষাভাষীর সংখ্যা যথাক্রমে ৮ হাজার ৭; ১১ হাজার ২৬৯ এবং ২ হাজার ৩২১ জন।

দর্দিক বা পিশাচ উপশাখার অন্তর্গত ভাষাগুলির (ভাষাভাষীর মোট সংখ্যা ১৯,৬৪,৯০৮) মধ্যে কাফির ও খোওয়ার বর্গের ভাষাগুলিও ভারতীয় রাষ্ট্রের বহির্ভূত। বর্তমান সমীক্ষায় এই ভাষাভাষীর সংখ্যা ভারতে চার জনের অধিক নয়। তবে দর্দ-বর্গীয় ভাষাভাষী ভারতে যথেষ্ট রয়েছে (সংখ্যা ১৯,৬৪, ৯০৪)। 'দর্দ' কথাটি দর্দ উপজাতির সূচক—যারা এককালে কাশ্মীর ও কাশ্মীরের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বসবাস করতো। এই অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম সীমানা হলো হিন্দুকুশ পার্বত্যাঞ্চল। কাশ্মীর উপত্যকা, দর্দিস্তান (গিলগিট ইত্যাদি), চিত্রাল ও কাফিরস্তান—এই নিয়ে হলো দর্দ উপজাতির অধিষ্ঠান। এই অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসীই ছিল দর্দ-ভাষাভাষী। Linguistic Survey of India (সংক্ষেপে LSI) গ্রন্থে এই ভাষাঞ্চলের সমস্ত ভাষার নাম দেওয়া হয়েছিল দর্দিক (Dardic) আর 'দর্দ' বলতে বোঝানো হতো কেবল পূর্বী দর্দিস্তানের ভাষাগুলিকে (অর্থাৎ শীণা, কোহিস্তানী, কাশ্মীরী)। বর্তমান সমীক্ষায় শীণা মাতৃভাষীর সংখ্যা ৮৫৬, সকলেই জম্মু ও কাশ্মীরের অধিবাসী। শীণার অন্তর্গত অন্যান্য উপভাষা হলো—ব্রোকপা (ভাষাভাষীর সংখ্যা ৫৪৪), চিলাসি (৮২), গিলগিটি (৭৬), মোট শীণা-বর্গীয় ভাষাভাষীর সংখ্যা ১,৫৫৮। দর্দ বর্গের দ্বিতীয় উপভাষা কোহিস্তানী-ভাষীর সংখ্যা ৮১। এর একটি উপশাখা কাঘানী (১৫২)। মোট কোহিস্তানী গুচ্ছের ভাষাভাষীর সংখ্যা ২৩৩।

দর্দিক ভাষাগুলির মধ্যে কাশ্মীরীর স্থান সর্বোচ্চ। কেবল জনসংখ্যার দিক দিয়ে নয়, সাহিত্যিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার অর্জন এবং বিশিষ্ট লিপি (শারদা) প্রবর্তনার দিক দিয়ে তা অন্যান্য মৌখিক দর্দিক ভাষার চেয়ে অনেক প্রগতিশীল। লক্ষণীয়, ভারতীয় আর্যভুক্ত পশ্চিমা পাঞ্জাবী এবং সিন্ধী ভাষা যেমন দর্দিক প্রভাবে পুষ্ট হয়েছে, দর্দিক-ভুক্ত কাশ্মীরীও তেমন সমৃদ্ধ হয়েছে ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির নিবিড় বন্ধনে। বলা বাহুল্য, অন্যান্য দর্দিক ভাষার ক্ষেত্রে এমনটি কখনই ঘটে নি। অবশ্য কাশ্মীরী ভাষায় ভারতীয় আর্য উপাদানের প্রাবল্য দেখে এক সময়ে মনে করা হতো, কাশ্মীরী সংস্কৃত-উদ্ভূত ভারতীয় আর্যভাষা। কিন্তু গ্রীয়ার্সনই প্রথম এর দর্দিক-গোত্রীয় লক্ষণ প্রতিষ্ঠিত করেন (Grierson : Linguistic Classification of Kasmiri, Indian Antiquary, 1915, p. 270)। যাই হোক, বর্তমানে কাশ্মীরী ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম অনুসূচী (8th Schedule)-স্বীকৃত-ভাষা ; কাশ্মীরী ভাষীর সংখ্যা মোট ১৯ লক্ষ ৫৬ হাজার ১১৫। মাতৃভাষার সংখ্যা ৫টি, যথা—বুঞ্জ্ওয়ালী (ভাষাভাষী ৫৫০), বিশুদ্ধ কাশ্মীরী (১৯,১৪,৪৪৬), কিশ্‌ত্‌ওয়ারী (১১,৬৩৩), পোগুলী (৯,৫০৮) এবং সিরাজী কাশ্মীরী (১৯,৯৭৮)। LSI-গ্রন্থে অবশ্য কিশ্‌ত্‌ওয়ারীকে ভুল ক'রে বলা হয়েছে কিশ্‌ত্‌ওয়ার, আসলে কিন্তু তা কিশ্‌ত্‌ওয়ার অঞ্চলের ভাষা, তাই ভাষাও কিশ্‌ত্‌ওয়ারী।

আর্য/ইন্দো-ইরানীয় শাখার তৃতীয় উপশাখা হলো ভারতীয় আর্য (Indo-Aryan/ Indic)। পূর্বেই বলেছি, ভারতীয় আর্যের অন্তর্ভুক্ত মাতৃভাষার সংখ্যাই ভারতে সর্বাধিক। এই ভারতীয় আর্যভাষাগুলি প্রথম বর্গীকরণ করেন A. F. R Hoernle এবং পরে তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন G. A. Grierson তাঁর Linguistic Survery of India (LSI) গ্রন্থে। বর্তমান ভাষাসমীক্ষায় (১৯৬১) মোটামুটি এই বর্গীকরণই অনুসৃত হয়েছে। উভয় সমীক্ষার পার্থক্য যেখানে রয়েছে, তা যথাস্থানে আলোচিত হবে। LSI-গ্রন্থের বর্গীকরণ অনুযায়ী ভারতীয় আর্যগুলিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা—(১) বহিরঙ্গ শাখা (Outer Branch), (২) অন্তরঙ্গ শাখা (Inner Branch) এবং (৩) অন্তর্বর্তী শাখা (Mediate Branch)। উপরোক্ত শাখাগুলির মধ্যে অন্তরঙ্গ শাখার অন্তর্গত হয়েছে কেন্দ্রীয় বর্গের (Central Group) ভাষাগুচ্ছ এবং পাহাড়ী ভাষাগুলি। কেন্দ্রীয় বর্গের ভাষাগুলি হলো—পশ্চিমা হিন্দী, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, গুজরাটী, ভিলী এবং খান্দেশী। পাহাড়ী বর্গের ভাষাগুলির তিনটি বিভাগ—পশ্চিমা, কেন্দ্রিক এবং পূর্বী পাহাড়ী। অন্তর্বর্তী শাখার প্রধান ভাষা

হলো—পূর্বী হিন্দী এবং তার উপভাষা অবধী ও ছত্তিশগঢ়ী। এছাড়া বহিরঙ্গ শাখাকে আবার তিনটি উপশাখায় ভাগ করা হয়েছে : উত্তর-পশ্চিমা, দক্ষিণী এবং পূর্বী উপশাখা। ১৯৬১ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির বর্গীকরণ করা হয়েছে এইভাবে—



৪.৩ ভারতীয় আর্য (Indo-Aryan / Indic)

৪.৩.১ ভারতীয় আর্য : বহিরঙ্গ শাখা (Indic : Outer Branch)

[ক] উত্তর-পশ্চিমা বর্গ (North-Western Group)

১ ॥ পশ্চিমা পাঞ্জাবী / লহ্ন্দা :

উত্তর-পশ্চিমা বর্গের প্রধান ভাষা দুটি—পশ্চিমা পাঞ্জাবী বা লহ্ন্দা এবং সিন্ধী। এই দুই ভাষাভাষী-অধ্যুষিত অঞ্চল LSI-গ্রন্থে চিহ্নিত হয়েছে পেশোয়ার থেকে আরব সাগর অর্থাৎ পশ্চিম পঞ্জাব এবং সিন্ধু প্রদেশ পর্যন্ত। এই অঞ্চল বর্তমানে ভারতের বহির্ভূত। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমা বর্গের ভাষাভাষীর বেশ কিছু অংশ ভারতে চলে আসায় ১৯৬১ সনের জনসমীক্ষায় তারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই সমীক্ষা অনুযায়ী লহ্ন্দা ভাষায় প্রায় ১৫টি মাতৃভাষা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সারা ভারতে লহ্ন্দা ভাষা-ভাষীর সংখ্যা ১৯ হাজার ৮০৮। তবে এই মাতৃভাষাগুলির মধ্যে মূলতানী ভাষী সংখ্যায় সর্বাধিক (৫,৭৬০ জন)। কোনো কোনো স্থানে আবার লহ্ন্দার পরিবর্তে 'মূলতানী' নামই বেশি চলে ('লহ্ন্দা' শব্দের অর্থ 'সূর্যাস্ত' অর্থাৎ পশ্চিম)। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে পঞ্ছি (১,৮৭৮ জন), সমস্ত ভাষাভাষীই জম্মু ও কাশ্মীরের অধিবাসী। এই সমস্ত মাতৃভাষাগুলিই LSI গ্রন্থে উল্লিখিত, ব্যতিক্রম কেবল মীরপুরী (জম্মু/কাশ্মীরের মীরপুর শহরে)।

২ ॥ সিন্ধী :

সিন্ধী পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধু প্রদেশের ভাষা, কাজেই বর্তমানে ভারত-বহির্ভূত। সিন্ধী সম্প্রতি (ইং ১৯৬৭) ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম অনুসূচী স্বীকৃত, অবশ্য সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে তার স্বীকৃতি সাহিত্য এ্যাকাডেমীতে পূর্বেই ছিল। কারণ ভারতে সিন্ধী ভাষী সংখ্যায় স্বল্প নয়, মোট ভাষাভাষীর সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৭১ হাজার ৯৩২। মোট মাতৃভাষার সংখ্যা ৮টি। এদের মধ্যে গরিষ্ঠ হলো বিশুদ্ধ সিন্ধীভাষীরা (৯ লক্ষ ৭৭ হাজার ২৩)। সংখ্যার দিক দিয়ে এর পরে উল্লেখযোগ্য হলো কচ্ছী, লোকসংখ্যা ৩ লক্ষ ৯২ হাজার ২৭৯। কচ্ছী কতকটা গুজরাটী ও সিন্ধীর মিশ্রণ। এর প্রচলন প্রধানত গুজরাটের অন্তর্গত কচ্ছ দেশে। বর্তমান জনসমীক্ষায় কচ্ছীর ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় সম্পূর্ণ নয় ব'লে LSI গ্রন্থের বিভাগই স্বীকার করে নিতে হয়েছে। সিন্ধী মাতৃভাষার ৮টির মধ্যে ৬টি LSI গ্রন্থে পূর্বেই চিহ্নিত, বর্তমানে অপর দুইটি মাতৃভাষা 'ভুজ' এবং 'সোঙ্গনী'কে সিন্ধীর অন্তর্গত করা হয়েছে।

[খ] দক্ষিণী বর্গ (Southern Group)

১॥ মারাঠী ঃ

LSI গ্রন্থ অনুযায়ী বহিরঙ্গ ভাষাগুলির মধ্যে সারা দক্ষিণদেশীয় ভাষা একটিই —মারাঠী এবং কোঙ্কণী তার একটি প্রধান উপভাষা। কিন্তু বর্তমান সমীক্ষায় দেখা গেছে, কোঙ্কণী মারাঠীর উপভাষা নয়, তা একটি স্বতন্ত্র ভাষা। কিন্তু এ-মতবাদ এখনও অনেকে স্বীকার করেন না।

মারাঠী ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম অনুসূচী স্বীকৃত ভাষা। সংখ্যার দিক দিয়ে ভারতে এর স্থান হলো চতুর্থ অর্থাৎ হিন্দী, তেলুগু ও বাঙলার পরেই এর স্থান। মোট মারাঠী ভাষাভাষীর সংখ্যা ৩ কোটি ৩২ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭৭১। মাতৃভাষার সংখ্যা ৬৫ ; এদের মধ্যে ৪০টি LSI গ্রন্থেই উল্লিখিত, ২২টি নতুন ক'রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, অপর তিনটি অনুমানভিত্তিক (Tentative)।

মারাঠীর অন্তর্ভুক্ত হলবী এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হলবী ভাষাভাষীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৬০। এদের মধ্যে বেশির ভাগই মধ্যপ্রদেশের অধিবাসী (২,৯৩,৪৯৩)। পূর্বী হিন্দী ও মারাঠীর সংযোগসূত্র স্থাপন করেছে হলবী। LSI-সম্পাদকের ভাষায়—"...On the other hand, its (Marathi) most eastern dialect Halabi of Bastar, shows such intimate connection with the neighbouring Chhattisgarhi dialect of Eastern Hindi that it is a matter of opinion to which language it belongs." (LSI, Vol. I, pt. i, p. 141)। সাম্প্রতিক ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে, হলবীকে পূর্বী হিন্দীর অন্তর্ভুক্ত করাই বাঞ্ছনীয়। ১৯৬১ সনের জনসমীক্ষায় অবশ্য LSI-নির্ণীত আদর্শই অনুসৃত হয়েছে।

২॥ কোঙ্কণী :

সাম্প্রতিক জনসমীক্ষায় কোঙ্কণী পৃথক্ ভাষারূপে চিহ্নিত হয়েছে। কোঙ্কণী-অন্তর্ভুক্ত মাতৃভাষার সংখ্যা ১৬। অবশ্য এদের মধ্যে ৭টির নাম LSI গ্রন্থে উদ্ধৃত (মারাঠীর উপভাষা হিসেবে), বাকি ৯টির নাম অনুল্লিখিত। কোঙ্কণী ভাষাভাষীর মোট সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৬৩। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র, মহীশূর, কেরালা, গোয়া এবং তামিলনাড়ুর অঞ্চলবিশেষে এই ভাষা প্রচলিত। বর্তমানে (ইং ১৯৭৬) কোঙ্কণী সাহিত্য এ্যাকাডেমী কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে।

[গ] পূর্বী বর্গ (Eastern Group)

১ ॥ ওড়িয়া :

উড়িষ্যা প্রদেশের ভাষা ওড়িয়া ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম অনুসূচী-চিহ্নিত ভাষা, মোট লোকসংখ্যা ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ১৯ হাজার ৩৯৮। মাতৃভাষার সংখ্যা ২৪টি। এদের মধ্যে ১৩টির নাম LSI গ্রন্থে পাওয়া যায়, ৯টি মাতৃভাষার উল্লেখ ঐ গ্রন্থে মেলে না। বাকি ২টির নাম ঐ গ্রন্থে পাওয়া গেলেও বর্গীকৃত হয়েছে নতুন ক'রে (গউড়ো, সবরী)।

ওড়িয়া ভাষাগুলির মধ্যে 'ভত্রি' উপভাষা বিশেষরূপে উল্লেখ্য, ভত্রি ৮৫ হাজার ৬৯ জনের মাতৃভাষা। মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বস্তার অঞ্চলেই ভত্রি প্রধানত বলা হয়ে থাকে (এখানে ভাষাভাষীর সংখ্যা ৮৫,০৪৮)। এই অঞ্চলটির সীমানা অন্যান্য ভাষাঞ্চলের দ্বারা পরিবেষ্টিত, যেমন, মারাঠী, পূর্বী হিন্দী (ছত্তিশগঢ়ী) এবং ওড়িয়া ; ফলে ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে সর্বাধিক। ভত্রি ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি, কিন্তু বর্তমান সমীক্ষায় (১৯৬১) তা ওড়িয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (LSI আদর্শ অনুসরণ ক'রে)। LSI গ্রন্থ-সম্পাদকের মতে ভত্রি মারাঠী ও ওড়িয়ার যোগসূত্রের কাজ করছে।

নতুনভাবে বর্গীকৃত গউড়ো (ভাষাভাষীর সংখ্যা ৩০), LSI গ্রন্থের মতে, উত্তরা বাঙলার উপভাষা এবং সবরী (ভাষাভাষী ৬) হিন্দীর উপভাষা বিশেষ (খান্দেশী) কিন্তু বর্তমানে এই দুটি ভাষাকে ওড়িয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২ ॥ বিহারী :

বিহারের সমগ্র ভাষাগুলিকে একত্রে বলা হয় বিহারী। "বিহারী" এই নামকরণ করেছেন গ্রীয়ার্সন। এর আগে অবশ্য 'বিহারী' বর্গকে পূর্বী হিন্দীর উপভাষা ব'লে মনে করা হতো। বিহারী ভাষাভাষীর মোট সংখ্যা ১ কোটি ৬৮ লক্ষ ৬ হাজার ৭৭২। পূর্বী অঞ্চলের ভাষাগুলির মধ্যে সংখ্যার গুরুত্বে বাঙলার পরেই এর স্থান। বিহারীর প্রধান শাখা তিনটি—ভোজপুরী, মগহী ও মৈথিলী।

বিহারীর অন্তর্ভুক্ত মাতৃভাষার সংখ্যা ৩৪টি—এদের মধ্যে ১৫টির নাম LSI গ্রন্থেই মেলে, আর ১৭টির নাম ঐ গ্রন্থে মেলে না। বাকী ২টি (নাগপুরী-পূর্বী মগহী এবং পূর্বী মৈথিলী) নতুনভাবে চিহ্নিত হয়েছে, নাগপুরী মারাঠীর উপভাষা ব'লে নতুন নামকরণে 'নাগপুরী-পূর্বী মগহী' বলা হয়েছে, অপরদিকে পূর্বী বলতে অবধী বোঝায় ব'লে 'পূর্বী মৈথিলী' নামকরণ করা হয়েছে।

বর্তমান ভাষাতাত্ত্বিকদের অনেকে ভোজপুরীকে অবধীর সঙ্গে যুক্ত করতে চান, কিন্তু গ্রীয়ার্সনের মতকে অস্বীকার করার মতো এখনও কোনো কারণ ঘটেনি। আসলে অবধী এবং মৈথিলী/মগহীর মধ্যে ভোজপুরী যোগসূত্র স্থাপন করেছে, ফলে অবধীর সঙ্গে এর সাধর্ম্য স্বাভাবিক। বর্তমান সমীক্ষায় তাই গ্রীয়ার্সনের মতই অনুসৃত হয়েছে।

বিহারীর তিনটি শাখার মধ্যে অবশ্য সংখ্যার গুরুত্বে প্রধান হলো ভোজপুরী, মোট ভাষাভাষীর সংখ্যা ৭৯ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭৫৫, অপর দুটি ভাষার পরিসংখ্যান এইরূপ—মৈথিলী : ৪৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮১১ এবং মগহী : ২৮ লক্ষ ১৮ হাজার ৬০২। অনেকের মতে মগহী মৈথিলীর উপভাষা, কিন্তু এ-মতও গ্রাহ্য নয়। বর্তমান সমীক্ষায় অবশ্য তিনটি ভাষাকে একত্রে 'বিহারী' বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাদের পৃথক ভাষা-মর্যাদা দেওয়া হয় নি।

৩॥ বাঙলা :

বাঙলা ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম অনুসূচী অনুমোদিত ভাষা। ১৯৬১ সনের আদমশুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বাঙলা ভাষাভাষীর সংখ্যা ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯৩৯। বর্তমান জনসমীক্ষকের মতে সারা ভারতে বাঙলার স্থান তৃতীয়, অর্থাৎ সংখ্যার গুরুত্বে হিন্দী ও তেলুগুর পরেই তার স্থান। বাঙলার মাতৃভাষার সংখ্যা মোট ১৫টি। এদের মধ্যে ১০টি **LSI** গ্রন্থেই সমর্থিত। এদের মধ্যে চাক্মা (জনসংখ্যার ৪০ হাজার ৭১), হাইজোঙ/হজোঙ (৮,৮৫৮), কিসানগঞ্জিয়া (৫৫,৫৯৭), মালপাহাড়িয়া (৯,০৭৭), রাজবংশী (১৮,৭৬২) সংখ্যার দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই মাতৃভাষাগুলি যে উদ্বাস্তু স্রোতে নীত হয়েছে, তার প্রমাণ পেয়েছেন সমীক্ষক, যেমন—চাকমা পূর্ব পাকিস্তানের (অধুনা বাঙলাদেশ) চট্টগ্রাম থেকে আনীত; হাইজোঙ/হজোঙ বাংলাদেশের গারো পাহাড়ের সন্নিহিত মৈমনসিংহের জাতিবিশেষের নাম; কিসানগঞ্জিয়া হলো কিসানগঞ্জের (পূর্ণিয়া জেলা, বিহার, বর্তমানে পশ্চিম-বাঙলার অন্তর্গত) ভাষা ইত্যাদি। নতুন মাতৃভাষার মধ্যে বারিক (৮৬৪), ভতি-আরি (৪৩০), লোহারি-মালপাহাড়িয়া (২৭), সামারিয়া (৪০৭), তাকাম (চাকমা-সম্পর্কিত, ২৯) উল্লেখযোগ্য।

৪ ॥ অসমীয়া :

অসমীয়া ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম অনুসূচী স্বীকৃত ভাষা। মোট ভাষাভাষীর

সংখ্যা ৬৮ লক্ষ ৩ হাজার ৪৬৫। মাতৃভাষার বৈচিত্র্য অসমীয়ায় মোটেই লক্ষ্য করা যায় না।

৪.৩.২ ভারতীয় আর্য : অন্তর্বর্তী শাখা (Indic : Mediate Branch)

সাম্প্রতিক জনসমীক্ষায় (১৯৬১) অন্তর্বর্তী শাখা (Mediate Branch) স্বতন্ত্র-রূপে স্বীকৃত হয় নি। একে হিন্দীবর্গীয় ভাষাভুক্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ বর্তমানে এই বর্গের ভাষাগুলিকে অন্তরঙ্গ শাখার (Inner Branch) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু গ্রীয়ার্সনের মতে, অন্তর্বর্তী বর্গের ভাষাগুলির স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে। এই অন্তর্বর্তী ভাষাগুলির সাধারণ নাম হলো পূর্বী হিন্দী, যার প্রতিনিধিস্থানীয় প্রধান উপশাখা হলো অবধী, অপর দুই উপশাখা বঘেলী এবং ছত্তিশগঢ়ী। গ্রীয়ার্সন পূর্বী হিন্দীর নতুন নামকরণ করেছেন 'কোশলী' বা কোশল দেশের ভাষা। বর্তমান জনসমীক্ষকের মতে গ্রীয়ার্সন-অনুমিত বঘেলী—এই বিভাগ করা হয়েছিল জনগণ-অনুসৃত মতকে গ্রাহ্য করার তাগিদে। আর ছত্তিশগঢ়ী এবং অবধীর নৈকট্য এত বেশি যে একে বোধ হয় স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া যায় না। মোট কথা, বর্তমান ভাষাসমীক্ষায় একদিকে যেমন অন্তর্বর্তী বর্গ অস্বীকৃত হয়েছে, অপরদিকে তেমন পূর্বী হিন্দীকে স্থান দেওয়া হয়েছে পশ্চিমা হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, ভীলী, খান্দেশী এবং রাজস্থানী প্রভৃতি মধ্যদেশীয় অন্তরঙ্গ ভাষাগুলির সহোদরা হিসেবে। কাজেই পূর্বী হিন্দীর উপশাখা-গুলিও হিন্দীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১॥ অবধী :

সারা ভারতে অবধী ভাষাভাষীর মোট সংখ্যা ৫ লক্ষ ২৮ হাজার ২৮১। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ ভাষাভাষীই উত্তরপ্রদেশের অধিবাসী (মোট ৫,২৬,৮০১)। অবধী সমেত মোট মাতৃভাষীর সংখ্যা ১৬। এগুলির মধ্যে ১৩টিই LSI গ্রন্থে সমর্থিত, ২টি একেবারেই নতুন (মার্লি, রেওয়াপরী)। মার্লি (ভাষাভাষী ১১) এবং রেওয়াপরী (ভাষাভাষী : ৪৩১) ভাষাভাষীর সন্ধান মিলছে যথাক্রমে মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশে। তবে খুঁটিয়ে দেখলে এই দুইটি মাতৃভাষাই অপর মাতৃভাষা বঘেলখণ্ডীর (৫,৫৭,০৩৪) অন্তর্ভুক্ত। আর একটি মাতৃভাষা 'মালি' (৯৬৯) বর্তমান সমীক্ষায় নতুন ক'রে আরোপিত। LSI-গ্রন্থ অনুযায়ী মালি ওড়িয়া-সম্পৃক্ত, কাজেই এখানে তা নতুনভাবে বর্গীকৃত হয়েছে।

২ ॥ ছত্তিশগঢ়ী ঃ

ছত্তিশগঢ়ী ভাষাভাষীর সংখ্যা ২৯ লক্ষ ৬২ হাজার ৩৮। ছত্তিশগঢ়ী সমেত অন্যান্য মাতৃভাষার সংখ্যা ১৬। ১৬টির মধ্যে ৮টি LSI- সমর্থিত, আর ৬টি একেবারেই নতুন নাম; বাকি ২টি বিলাসপুরী (২,৮৭৫) এবং গোব্রো (৪,৮০২) নতুনভাবে বর্গীকৃত, কারণ গ্রীয়ার্সনের বর্গীকরণের সঙ্গে এদের পার্থক্য রয়েছে।

৩ ॥ বঘেলী / বঘেলখণ্ডী ঃ

গ্রীয়ার্সন-চিহ্নিত বঘেলী বর্তমান জনসমীক্ষায় স্বীকৃত হয় নি। তা অবধীর মাতৃভাষা রূপে চিহ্নিত হয়েছে (পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

৪.৩.৩ ভারতীয় আর্য ঃ অন্তরঙ্গ শাখা (Indic : Inner Branch)

গ্রীয়ার্সন অন্তরঙ্গ শাখার দু'টি বিভাগ করেছিলেন—মধ্যদেশীয় বিভাগ (Central Group) এবং উত্তরদেশীয় (Northern Group)। মধ্যদেশীয় ভাষাগুলির অন্তর্গত হলো—পশ্চিমা হিন্দী, রাজস্থানী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী ইত্যাদি এবং উত্তরদেশীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পাহাড়ী ভাষাগুচ্ছ।

ক. মধ্যদেশীয় বিভাগ (Central Group)

[১] পশ্চিমা হিন্দী (Western Hindi) :

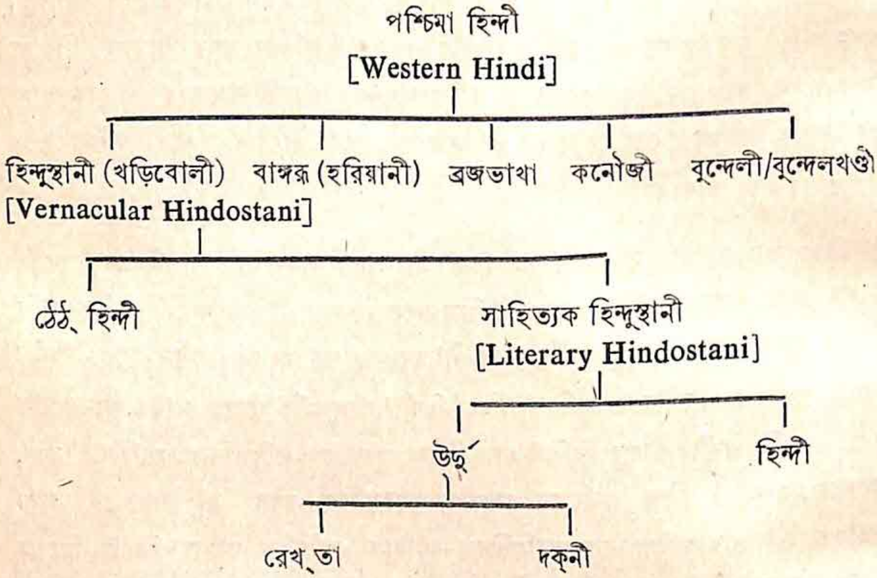
পশ্চিমা হিন্দীর মূল অধিষ্ঠান হলো পাঞ্জাবের সিরহিন্দ্ থেকে উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল, আর উত্তরে হিমালয়ের তরাই-অধ্যুষিত ভোট-চীনা গোষ্ঠীর ভাষাঞ্চল থেকে দক্ষিণে রাজস্থানসহ মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগ। কিন্তু বর্তমানে হরিয়ানা-পাঞ্জাব থেকে শুরু ক'রে বিহার পর্যন্ত বিশাল অঞ্চলে হিন্দী সাংস্কৃতিক জীবনের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে (অবশ্য উর্দুর পাশাপাশি)। এই বিরাট ভূ-ভাগের সীমানা চিহ্নিত করা যায় এইভাবে ঃ পশ্চিমে জৈসলমীর (রাজস্থান), উত্তর-পশ্চিমে আম্বালা (পূর্ব পাঞ্জাব), উত্তরে সিমলা (হিমাচল প্রদেশ) থেকে হিমালয়ের দক্ষিণ পাহাড়ী অঞ্চল (নেপালের পূর্বাঞ্চল বাদে), পূর্বে ভাগলপুর (বিহার) এবং দক্ষিণ-পূর্বে রায়পুর (মধ্যপ্রদেশ) এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে খণ্ডোয়া/খণ্ডবা (মধ্যপ্রদেশ) পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল। বলা বাহুল্য, হিন্দী অঞ্চল বলতে সাধারণ্যে এই ভাষাঞ্চলই বোঝায়।

গ্রীয়ার্সনই লক্ষ্য করেছিলেন, পশ্চিমা হিন্দী প্রাচীন 'মধ্যদেশ'-চিহ্নিত অঞ্চলের ভাষা। পরে সংস্কৃত-উত্তর যুগে শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপভ্রংশ স্তর অতিক্রম ক'রে এখানকার ভাষাগুলিই আধুনিক পর্বে পশ্চিমা হিন্দী নামে চিহ্নিত হয়ে আস্‌ছে। মোট কথা, আর্যাবর্তের কেন্দ্রভূমিতে হিন্দীর এখন পূর্ণ প্রতিষ্ঠা আর তাছাড়া বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও হরিয়ানা—এই পাঁচটি রাজ্যের তা রাজ্যভাষা এবং সাংস্কৃতিক ভাষা তো বটেই! বর্তমানে তা আবার ইংরেজীর পাশাপাশি ভারত-রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা।

কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে এই হিন্দী-সংসারের অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলি কোনক্রমেই বিশেষ একটি ভাষার সামগ্রিক ও সংহত চিত্র তুলে ধরে না। এগুলি বিচ্ছিন্ন কতকগুলি ভাষার সাধারণ নামমাত্র। 'পশ্চিমা হিন্দী' নামকরণের মধ্যেই যেমন 'পূর্বী হিন্দী' বিভেদ সহজেই লক্ষণীয়, তেমনি 'পশ্চিমা হিন্দী'র অন্তর্গত হয়েছে আরও অনেকগুলি ভাষা, যেগুলি প্রাচীন কালে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভাষারূপে পরিগণিত হয়েছিল (যেমন, ব্রজভাখা, দক্‌নী) কিন্তু বর্তমানে সেগুলি আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা মাত্র। দ্বিতীয়ত, এই ভাষাগুলির মধ্যে সাহিত্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত অন্তত তিনটি বিভেদ রয়েছে (যেমন, হিন্দী, উর্দু, হিন্দুস্থানী)। এছাড়া লিপি-সমস্যা তো আছেই (নাগরী বনাম ফারসী লিপি)।

আসল কথা, সাধারণের দৃষ্টিতে, অন্তত অ-হিন্দী ভাষাভাষীদের চোখে এই পার্থক্য-গুলি সহজে নজরে পড়ে না। মনে হয়, এর কারণও রয়েছে। প্রথমত, এই তথাকথিত হিন্দী ভাষাগুলির লিপিরীতি এক অর্থাৎ সর্বত্রই নাগরী হরফ ব্যবহৃত (ক্বচিৎ তা 'দেবনাগরী' নামে সম্ভ্রম জাগায়!)। দ্বিতীয়ত, ভাষাগুলির মোটামুটি ধ্বনিগত সাধর্ম্য (Phonetic Similarity)। তৃতীয়ত, প্রান্তিক হিন্দী ভাষাভাষীদের ভাষা-সম্পর্কীয় সচেতনতার অভাব ও অজ্ঞতা। সম্প্রতি এই ভাষাচেতনা জাগরূক হওয়ার ফলে নতুন নতুন ভাষাঞ্চল সৃষ্টির প্রবণতা (যেমন, হরিয়ানা) অথবা মাতৃভাষা স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা (যেমন, মৈথিলী, ভোজপুরী) দেখা যাচ্ছে। লক্ষণীয়, ১৯৬১ সনের জনসমীক্ষা অনুযায়ী হিন্দী ভাষাঞ্চলে সাধারণ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন জনগণের হার শতকরা ১৭·৭, কিন্তু অ-হিন্দী ভাষাঞ্চলে এই হার ২৭·১% (J. Dasgupta: Language Conflict and National Development, University of California, 1970; Census of India, Paper No, I of 1962, p. xxxii)।

যাই হোক, পণ্ডিতপ্রবর গ্রীয়ার্সন পশ্চিমা হিন্দীর বিভাগগুলি চিহ্নিত করেছেন এইভাবে—



বর্তমান ভাষা-সমীক্ষক (ইং ১৯৬১) অবশ্য গ্রীয়ার্সন-প্রবর্তিত উপরোক্ত বিভাগ স্বীকার করতে চান নি। উভয় পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য দেখা যাবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে—

প্রথমত, বর্তমান ভাষা-সমীক্ষকের মতে 'হিন্দোস্তানী' নামটি অর্বাচীন এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দ্বারা সৃষ্ট। এঁদের মতে, ১৭শ শতকের পূর্বে 'হিন্দোস্তানী' এই নামটি কখনও ব্যবহৃত হয় নি। খুব সম্ভব এই নামটি দাক্ষিণাত্যেই প্রথম প্রযুক্ত হয় দক্নী (<দক্ষিণী) ভাষাঞ্চলের বিপরীতবোধক ভাষাঞ্চল হিসাবে অর্থাৎ 'হিন্দোস্তানী' হলো 'হিন্দুস্থান' বা উত্তর ভারতের ভাষা। অপর পক্ষে হিন্দী/হিন্দ্বী/দহল্বৈ নামগুলি আরও প্রাচীন, অন্তত ১৩শ শতক থেকেই এই নামটি প্রচলিত। প্রাচীনতম উল্লেখ আমীর খসরুর (খ্রীঃ ১২৫৩—১৩২৫) রচনায়। সুতরাং সমীক্ষকের মতে, গ্রীয়ার্সন-প্রবর্তিত 'পশ্চিমা হিন্দী' নামকরণ গ্রহণীয় নয়। তাই এই সমীক্ষায় পশ্চিমা হিন্দীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে 'হিন্দী'। হিন্দুস্তানী এবং উর্দু হলো এরই প্রশাখা। লক্ষণীয়, গ্রীয়ার্সনের 'হিন্দী' ছিল পশ্চিমা হিন্দীর একটি রীতিগত ভেদ—যা মূলত সংস্কৃত শব্দসম্পদের দ্বারা ভারাক্রান্ত সাধু হিন্দী (বা **High Hindi**)।

দ্বিতীয়ত, বর্তমান জনসমীক্ষায় ব্রজভাখা, কনৌজী ইত্যাদি উপভাষাগুলির সঙ্গে

পূর্বী হিন্দীকে একই পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ গ্রীয়ার্সন-বর্গীকরণের অন্তর্বর্তী বিভাগ (Mediate Branch) যেমন স্বীকার করা হয় নি, পূর্বী হিন্দী ভাষাগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্বও তেমন অস্বীকার করা হয়েছে। ফলে পশ্চিমা ও পূর্বী হিন্দীর সমস্ত ভাষাগুলিই হিন্দী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তৃতীয়ত, বর্তমান জনসমীক্ষক উর্দু, হিন্দী এবং হিন্দুস্থানীর পৃথক পরিসংখ্যান দিলেও মনে করেন, এই ভাষাগুলি সমগ্রভাবে হিন্দীরই অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু সাম্প্রতিক সমীক্ষায় তা সম্ভব হয়নি, তার কারণ : (ক) হিন্দী ও উর্দুর স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত না হলে ভাষাভাষীদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি এবং বিভ্রাট দেখা দিতে পারে। তাই হিন্দী এবং উর্দুর পার্থক্য বজায় রাখতে হয়েছে। অর্থাৎ সমীক্ষক প্রকারান্তরে দুটি ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন—যদিও গ্রীয়ার্সন তা করেন নি। (খ) হিন্দী ও উর্দুর পার্থক্য স্বীকার করতে হয়েছে ব'লে হিন্দুস্থানীর স্বাতন্ত্র্যও অনিবার্য হয়ে উঠেছে, কারণ হিন্দুস্থানী প্রকৃত পক্ষে কোন্ ভাষাটির অন্তর্ভুক্ত হবে, সে-সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্থানী ভাষী হিন্দী বা উর্দুর যে-কোনো একটি ভাষা ব্যবহার করতে পারেন।

সুতরাং বর্তমান জনসমীক্ষকের কাছে সমগ্র ব্যাপারটি দাঁড়িয়েছে এই : হিন্দী, পশ্চিমা হিন্দীর সমার্থক, কিন্তু পশ্চিমা হিন্দীর সব ভাষাগুলি এর অন্তর্ভুক্ত হয় নি ; কারণ, LSI-চিহ্নিত এই উর্দু ও হিন্দুস্থানী এর পরিসংখ্যান থেকে বাদ গেছে, উর্দু ও হিন্দুস্থানী পৃথক্‌রূপে চিহ্নিত হয়েছে। অপরদিকে এই হিন্দী, পশ্চিমা হিন্দীর চেয়েও ব্যাপক, কারণ তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পূর্বী হিন্দী। সূত্রাকারে বক্তব্যটি বোধহয় এইরূপ : হিন্দী = পশ্চিমা হিন্দী—(উর্দু + হিন্দুস্থানী) + পূর্বী হিন্দী।

যাই হোক, এই সার্বজনীন হিন্দীর মোট ভাষাভাষীর সংখ্যা ১৩ কোটি ৩৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৬০। এর অন্তর্ভুক্ত মাতৃভাষার সংখ্যা ৯৭। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে পরিগণিত হয়েছে যেমন পূর্বী হিন্দীর লোকসংখ্যা ও মাতৃভাষা, তেমনি ব্রজভাখা, বাঙ্গরু, কনৌজী, বুন্দেলী প্রভৃতি এবং সেই সঙ্গে হিন্দুস্থানীর অপরাপর গ্রামীণ বুলি (যেমন খড়ীবোলী, বিশুদ্ধ হিন্দী) অথবা অন্যান্য অচিহ্নিত মাতৃভাষা। বর্তমানে সারা ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৩০% লোক হিন্দীতে কথা বলে (১৯৫১ জনসমীক্ষায় পাঞ্জাবীকে হিন্দীর অন্তর্গত ক'রে এই হার দেখানো হয়েছিল ৪২%)।

গ্রীয়ার্সন-প্রস্তাবিত পশ্চিমা হিন্দীর বিভাগগুলিকে সাধু ও কথ্য ভেদে দুইভাবে ভাগ করা যায়, যথা—

(ক) সাধু বা সাহিত্যিক ভাষা : (১) হিন্দী (বা আদর্শ হিন্দী), (২) উর্দু এবং (৩) সাহিত্যিক হিন্দুস্থানী।

(খ) কথ্য বা আঞ্চলিক ভাষা : (৪) জানপদ হিন্দুস্থানী (বা খড়িবোলী), (৫) বাঙ্গরু, (৬) ব্রজভাখা, (৭) কনৌজী, (৮) বুন্দেলী/বুন্দেলখণ্ডী।

এখন বর্তমান জনসমীক্ষার (১৯৬১) মানদণ্ডে গ্রীয়ার্সন-উল্লিখিত ভাষাগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যেতে পারে।

(১) আদর্শ হিন্দী

পূর্বেই বলেছি, বর্তমান সমীক্ষায় 'হিন্দী' অভিধাটি পশ্চিমা হিন্দীর সমার্থক, ফলে এর সীমানা বৃহত্তর হিন্দী ভাষাঞ্চলে প্রচলিত (পূর্বে দ্র.)। কিন্তু গ্রীয়ার্সনের মতানুযায়ী হিন্দী, পশ্চিমা হিন্দীর একটি রীতিগত ভেদমাত্র। বর্তমানে এই হিন্দীকে **Hindi Proper** বা **Standard Hindi** বলা হয়েছে, এমনকি এর ঔপভাষিক বা আঞ্চলিক সত্তা স্বীকার করা হয়েছে। অবশ্য এর আঞ্চলিক সীমানা সংকীর্ণ নিশ্চয়ই। বিশুদ্ধ সাহিত্যিক হিন্দী অঞ্চল বলতে বোধ হয় বোঝানো হয়েছে এই সীমানা : উত্তরে তরাই অঞ্চল, পশ্চিমে পাঞ্জাব-অন্তর্গত আম্বালা ও হিসার জেলা, পূর্বে উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত ফৈজাবাদ, প্রতাপগড় এবং এলাহাবাদ জেলা, আর দক্ষিণে যথারীতি রায়পুর ও খণ্ডোয়া (মধ্যপ্রদেশ)। অবশ্য এই অঞ্চলের পূর্বাংশ প্রকৃতপক্ষে পূর্বী হিন্দীরই অন্তর্গত।

আদর্শ হিন্দীর ভাষাতাত্ত্বিক স্বরূপ এই : খড়িবোলী বা জানপদ হিন্দুস্থানীর সাহিত্যিক রূপান্তর হলো এই হিন্দী। কিন্তু এর ভগিনীস্থানীয়া উর্দুর প্রসারের প্রতিক্রিয়ারূপে তা ক্রমশই সংস্কৃতাশ্রিত হয়ে উঠছে, ফলে হিন্দী দ্রুত গতিতে অঞ্চল-নির্বিশেষ হয়ে উঠছে।

সাম্প্রতিক আদমশুমারি অনুযায়ী বিশুদ্ধ বা খাঁটি হিন্দীর এই হিন্দীসমেত মাতৃভাষার সংখ্যা ৪৩টি। সারা ভারতে এই আদর্শ ভাষাভাষীর সংখ্যা ১২ কোটি ৩০ লক্ষ ২৫ হাজার ৪৮৯। সর্বোচ্চ ভাষাভাষীর সংখ্যা দেখা যায় যথাক্রমে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বিহার রাজ্যে। এর অন্তর্গত ৪৩টি মাতৃভাষার মধ্যে ২১টির নাম **LSI**-সমর্থিত। তবে লক্ষণীয়, বর্তমান এই তালিকায় বহু মাতৃভাষা সংকর ভাষারূপে উল্লিখিত, যেমন—ভতেআলী হিন্দী, চমেআলী হিন্দী, ডোগরী হিন্দী, গদী হিন্দী, হিন্দী পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী হিন্দী, হিন্দী পাহাড়ী ইত্যাদি। লক্ষ্য করার বিষয়, **LSI** গ্রন্থে ঠিক এইরূপ মিশ্রিত ভাষার উল্লেখ নেই, কিন্তু যেহেতু পৃথক্ পৃথক্ ভাষারূপে এরা **LSI**-তে স্থান পেয়েছে, সেইহেতু এখানে সেগুলিকে **LSI**-সমর্থিত বলা হয়েছে।

তাছাড়া বিশুদ্ধ হিন্দী বাদে বাকি ৪২টি মাতৃভাষার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত হলো খড়ী-বোলী (ভাষাভাষীর সংখ্যা ৫৯,৮৯,১২৮)। এক থেকে দশটি ভাষাভাষী দেখা যায় এমন মাতৃভাষা সংখ্যায় প্রায় ২২টি। ২০টি পর্যন্ত ভাষাভাষী এমন সংখ্যা আরও ৪টি মাতৃভাষার।

(২) উর্দু

হিন্দুস্থানীর একটি সাহিত্যিক রূপ যেমন সাধু হিন্দী (**High Hindi**), অপর আর একটি সাহিত্যিক রূপ তেমন উর্দু। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে ভাষা দুটি এক-ই, তাদের ব্যাকরণগত কাঠামোও অভিন্ন, কিন্তু উভয়ের পশ্চাৎপট পৃথক। হিন্দীর প্রধান ভিত্তি হলো প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা তথা হিন্দু সংস্কৃতি, আর উর্দু ভারতীয় ভাষা হলেও তার বাতাবরণ আরবী-ফারসী তথা ইরান/আরবের সংস্কৃতি। উভয় ভাষার মূল আধার ও উৎস সংস্কৃত হলেও সাহিত্যিক উত্তরাধিকার, শব্দসম্ভার এবং লিপি বিচারে এদের পার্থক্য আকাশ-পাতাল। ঐতিহাসিক বিচারে অবশ্য সাহিত্যিক খড়ীবোলী হিন্দীর চেয়ে খড়ীবোলী উর্দুর ব্যবহার ঘটেছিল আগে। চতুর্দশ শতকের সময়সীমায় দিল্লী-মীরাট এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে যে-খড়ীবোলী ভাষা ব্যবহৃত হতো, তাই হলো সাহিত্যিক উর্দুর প্রধান ভিত্তিভূমি (পরবর্তী যুগে সাহিত্যিক হিন্দীর মতো) কিন্তু বর্তমানে তা যে-কোনো শিক্ষিত মুসলমান বা উত্তরদেশীয় হিন্দু বা দেশী কাশ্মীরীর মাতৃভাষা।

যাই হোক, **LSI**-বর্গীকরণ অনুযায়ী উর্দু হলো পশ্চিমা হিন্দীর উপভাষা। বর্তমানে অবশ্য উর্দু ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম অনুসূচী-স্বীকৃত স্বতন্ত্র ভাষা। তাই তাকে বৃহত্তর হিন্দী পরিবারের বহির্ভূত রাখা হয়েছে। সারা ভারতে উর্দুভাষীর সংখ্যা ২ কোটি ৩৩ লক্ষ ২৩ হাজার ৫১৮। মোট মাতৃভাষা ৯টি। এদের মধ্যে প্রধান হলো উর্দু (ভাষাভাষীর সংখ্যা ২,৩৩,২৩,০৪৭), রেখ্‌তী (১৯), দকনী/মুসলমানী (২১৫) ইত্যাদি। এদের মধ্যে ৪টি **LSI**-স্বীকৃত। উর্দু ভাষীরা প্রায়শই বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছেন, যেমন, বাহানে (৯, মহারাষ্ট্র), পিঞ্জরী (৯৩, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, মহারাষ্ট্র)—যেগুলি মুসলমান উপজাতির নাম অনুযায়ী বর্ণিত। এ ছাড়া ইস্‌লামি (গুজরাট), মুঘলিয়া (উত্তরপ্রদেশ), পাকিস্তানী (দিল্লী, অরুণাচল) প্রভৃতি নামকরণও মাতৃভাষারূপে চিহ্নিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে রেখ্‌তা ও দকনী সম্পর্কে গ্রীয়ার্সনের মন্তব্য স্মরণীয়। কেবল উর্দু এই নাম ১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। ১৭-র শতকে বা তার পূর্বে

উত্তর ভারতে আরবী-ফারসী শব্দবহুল হিন্দীকে বা খড়ীবোলীকে রেখ্‌তা নামেও উল্লিখিত করা হতো। রেখ্‌তা শব্দের অর্থ 'বিক্ষিপ্ত' ["scattered, crumbled"]। ফারসী শব্দের বিক্ষিপ্ত ব্যবহার এই ভাষায় স্বাভাবিক ছিল বলেই এই নামকরণ। রেখ্‌তা ব্যবহৃত হতো কবিতায়।

দাক্ষিণাত্যে উপনিবিষ্ট মুসলমানদের ব্যবহৃত হিন্দুস্থানী 'দকনী' নামে প্রচলিত। দকনী ফারসী লিপিতে লিখিত হলেও প্রথমে তা ফারসী প্রভাব মুক্ত ছিল।

(৩) হিন্দুস্থানী

সাহিত্যিক উর্দুর মৌখিক রূপ হলো হিন্দুস্থানী। কেবল মুখের ভাষা হওয়ার জন্য এর ওপর ফারসী শব্দাবলীর বোঝা চেপে বসেনি, যদিও এর ঝোঁক ফারসীর দিকেই বেশী। উৎপত্তি বিচারে সাহিত্যিক হিন্দী এবং উর্দুর মতই এর মূল আধার হলো খড়ীবোলী বা জানপদ হিন্দুস্থানী। তবু বলা যায়, খড়ীবোলীর সঙ্গে এর সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ, কারণ উর্দু ও হিন্দীর মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে ফারসী ও সংস্কৃতের অস্বাভাবিক প্রভাব। বলা বাহুল্য, উর্দুর এই ব্যবহারিক সহজবোধ্য রূপ 'হিন্দুস্থানী' রূপে সারা ভারতেই জনগণগ্রাহ্য হয়ে আছে, যদিও তার নিজস্ব অধিষ্ঠান হচ্ছে দিল্লী-লখ্‌নউ-আগ্রা অঞ্চল। সাধারণ জনগণের সাহিত্যে নাগরী বা ফারসী যে-কোনো লিপিতেই ছাপা নানা কাহিনী, গজল, ভজন ইত্যাদি রচনায় এই হিন্দুস্থানী প্রচারিত হয়ে আসছে। বর্তমানে অবশ্য এর স্থান দখল করতে চাইছে সংস্কৃত-ঘেঁষা হিন্দী।

হিন্দুস্থানী-হিন্দী-উর্দু—এই তিনটি ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক গ্রীয়ার্সন চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর নিম্নলিখিত মন্তব্যে : We may now define the three varieties of Hindostani as follows :—'Hindostani' is primarily the language of the northern Doab and is also the *lingua franca* of India, capable of being written both in the Persian and the Nāgarī characters, and without purism, avoiding alike the excessive use of either Persian or Sanskrit words when employed for literature. The name 'Urdu' can then be confined to that special variety of Hindostani in which Persian words are of frequent occurrence and which, therefore can only be written with ease in Persian character, and similarly 'Hindi' can be confined to the form of Hindostani in which Sanskrit words abound and which therefore,

is legible only when written in the Nāgarī character" (LSI, Vol. I pt, i, p. 167).

LSI-অনুযায়ী হিন্দুস্থানী পশ্চিমা হিন্দীর উপভাষা হলেও বর্তমান সমীক্ষায় তাকে বৃহত্তর হিন্দী পরিবারের অন্তর্গত করা হয়েছে, যদিও উর্দুর মতো তা স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত। এর কারণ পূর্বেই বলেছি। হিন্দুস্থানী সমেত হিন্দুস্থানীর মাতৃভাষার সংখ্যা সাত। মোট ভাষাভাষীর সংখ্যা ১ লক্ষ ২৩ হাজার ২০০, তবে সংখ্যায় হিন্দুস্থানীই অধিক (১,২২,০১১)।

(৪) খড়ীবোলী

খড়ীবোলী নামটি দ্ব্যর্থবোধক। ব্রজভাখা, অবধী, ডিঙ্গল বা রাজস্থানী প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যিক ভাষাগুলির সঙ্গে ভেদ দেখাতে গিয়ে সাধারণত আধুনিক সাহিত্যিক হিন্দীকেও কখনও কখনও 'খড়ীবোলী' বলা হয়ে থাকে। আর এই অর্থে প্রথম 'খড়ীবোলী' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন লল্লুজীলাল তাঁর 'প্রেমসাগর' গ্রন্থের ভূমিকায় ("দিল্লী আগরে কো খড়ীবোলী")। ব্রজভাষা আর এই 'সাহিত্যিক খড়ীবোলী হিন্দী'র ঝগড়া বহু পুরোনো। আসলে ব্রজভাষা ইত্যাদি অপেক্ষা এই ভাষা 'খাড়া' দাঁড়িয়ে আছে, আর এর তুলনায় অন্যান্য কথ্যভাষা, এমনকি সাহিত্যে প্রযুক্ত ব্রজভাষা হলো 'পড়ীবোলী' বা পতিত ভাষা।

কিন্তু ভাষাশাস্ত্রের বিচারে খড়ীবোলী হলো 'গ্রামীণ বুলি' বা আঞ্চলিক কথোপ-কথনের ভাষা। কিন্তু একদা মুসলমান রাজশক্তির ভাষামাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় তা পদস্থ ভাষার মর্য্যাদা লাভ করেছিল, তাই মুসলমানী প্রভাব এতে এখনও সক্রিয়; ফলে গ্রামীণ খড়ীবোলীতে ফারসী-আরবী শব্দের ব্যবহার অন্যান্য হিন্দী বিভাষার চেয়ে বেশী। এতে সাধারণত অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দের সংখ্যা অধিক।

যাই হোক, LSI গ্রন্থে গ্রীয়ার্সন এই হিন্দুস্থানীর নামকরণ করেছেন Vernacular Hindostani বা জানপদ হিন্দুস্থানী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একে বলা উচিত খড়ীবোলী বা সির্‌হিন্দী—যা বলা হয় প্রধানত গঙ্গার উত্তর দোয়াব অঞ্চলস্থিত রোহিলখণ্ড এবং পাঞ্জাবের আম্বালা জেলার পূর্বাঞ্চলে। গ্রীয়ার্সনের ভাষায়ঃ Vernacular Hindostani "is dialect of Western Hindi spoken in the upper Gangetic Doab in Rohilkhand and in the east of the Ambala district of Panjab. It is spoken in its great purity round Mērath (Meerut) and to the North" (LSI, Vol. I pt. i p. 164)। খড়ীবোলী

প্রকৃত কথ্যভাষা হলো এই এই অঞ্চলের : রামপুর, মুরাদাবাদ, বিজনৌর, মীরাট, মুজফ্ফর নগর, সাহারানপুর, দেরাদুনের সমতল অঞ্চল, আম্বালা এবং পাতিয়ালার পূর্বাঞ্চল।

এক সময়ে এই জানপদ হিন্দুস্থানীকে সাহিত্যিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল (ঠেঠ্ হিন্দী) দিল্লী-মীরাট অঞ্চলের আশে পাশের গ্রাম্য বুলিকে জাতে উঠিয়ে, কিন্তু তা সফল হয় নি। সে যাই হোক, মোট কথা, হিন্দী, উর্দু, হিন্দুস্থানী অথবা ঠেঠ্ হিন্দীর মূল আধার হলো এই খড়ীবোলী। হিন্দী ও উর্দু হলো আসলে সাহিত্যিক খড়ীবোলী আর হিন্দুস্থানী হলো শিষ্ট জনসাধারণের মৌখিক কথোপকথনে ব্যবহৃত পরিমার্জিত খড়ীবোলী। বর্তমান সমীক্ষায় কিন্তু খড়ীবোলীকে আদর্শ হিন্দীর মাতৃভাষা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং এর লোকসংখ্যা ৫৭,৮৭,১২৮ (পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

(৫) বাঙ্গরু

বাঙ্গরুর অপর নাম জাটূ বা হরিয়ানী। দিল্লী, কর্ণাল, রোটক, হিসার জেলা এবং তৎসংলগ্ন পাতিয়ালা, নাভা এবং ঝিন্দ্ অঞ্চলে এই ভাষা প্রচলিত আছে। বাঙ্গরুকে বলা যায় পাঞ্জাবী এবং রাজস্থানী মিশ্রিত খড়ীবোলী। বাঙ্গরুর পশ্চিম সীমা হলো সরস্বতী নদী। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পানিপথ এবং কুরুক্ষেত্র এই ভাষাঞ্চলের অন্তর্গত। কাজেই একে বলা যায় হিন্দীর প্রান্তিক বিভাষা।

বর্তমান জনসমীক্ষা অনুযায়ী বাঙ্গরুর মোট চারটি মাতৃভাষা—বাঙ্গরু (ভাষাভাষীর সংখ্যা ১১৫), চমরালি (২), জাতী (৩১) এবং দেশওয়ালী/হরিয়ানী (৩,৪০৩)। চমরালি নামটি অবশ্য নতুন।

(৬) ব্রজভাষা / ব্রজভাখা

ব্রজভাখা এককালে সাহিত্যিক ভাষাই ছিল কিন্তু এখন তা 'পড়িবোলী' বা হিন্দীর উপভাষা মাত্র। ১৯শ শতক থেকেই ব্রজভাখার স্থান দখল করেছে সাহিত্যিক খড়ীবোলী। ব্রজভাখার বিশুদ্ধ রূপ এখনও মথুরা, আগ্রা, আলীগড় এবং ধৌলপুর অঞ্চলে শ্রুত হয়। গুড়গাঁও, করৌলী এবং গোয়ালিয়রের পশ্চিম উত্তরাঞ্চলের ব্রজভাষায় রাজস্থানী এবং বুন্দেলীর কিছু কিছু আভাস মেলে। আবার বুলন্দ্শহর, বদায়ূন এবং নৈনিতালের তরাই অঞ্চলে খড়ীবোলীর প্রভাব সহজেই চোখে পড়ে; অপরদিকে এটা, মৈনপুরী এবং বেরিলী জেলার ব্রজভাষায় কনৌজীর সঙ্গে সাদৃশ্য খুব স্পষ্ট।

বর্তমান জনসমীক্ষায় দেখা গেছে, ব্রজভাষার মাতৃভাষার সংখ্যা অন্তত ৫টি—ভরতপুরী (ভাষাভাষীর সংখ্যা ২৪৬), ব্রজভাখা (৭৬,১৮৯), মৈনপুরী (১১), মথুরী (২,৮৩১) এবং পিঙ্গল (৫২)। মৈনপুরী ব্যতীত সব কটি নামই **LSI** গ্রন্থে উল্লিখিত।

(৭) কনৌজী

ব্রজভাষা এবং অবধীর মধ্যবর্তী ভাষাঞ্চল কনৌজীর অন্তর্ভুক্ত। কনৌজী স্বভাবতই প্রাচীন কনৌজ রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রকৃতপক্ষে তা ব্রজভাষারই এক উপরূপ। কনৌজীর কেন্দ্র হলো ফরাক্কাবাদ, কিন্তু উত্তরে হরদোঈ, শাহ্‌জাহানপুর এবং পীলীভীত এবং দক্ষিণে এটোয়া এবং কানপুরের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত কনৌজীর পরিসীমা। প্রতিবেশী সমৃদ্ধ ব্রজভাষার প্রভাবের ফলে কনৌজী সাহিত্যিক অগ্রগতি লাভ করতে পারে নি। বাস্তবিক পক্ষে কনৌজী কোনো স্বতন্ত্র ভাষা নয়, তা ব্রজভাষারই বিভাষা মাত্র। বর্তমান সমীক্ষায় কনৌজীর কোন পৃথক বিবরণ দেওয়া হয় নি, তার সম্ভাব্য কারণ ভাষাভাষীর সংখ্যাল্পতা (মোট ১১ জন)।

(৮) বুন্দেলী / বুন্দেলখণ্ডী

নামকরণেই বোঝা যায়, বুন্দেলী বুন্দেলখণ্ডের ভাষা। বুন্দেলী উত্তরপ্রদেশের দক্ষিণ জেলাগুলির প্রত্যন্ত অঞ্চলেও কথিত হয়, এছাড়া মধ্যপ্রদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে এর প্রসার। এর শুদ্ধ রূপ মিলবে ঝাঁসী, জালৌন, হমীরপুর, গোয়ালিয়র, ভূপাল, ওড়ছা, সাগর, নৃসিংহপুর, সেওনী এবং হুশঙ্গাবাদ অঞ্চলে। বুন্দেলী এবং ব্রজভাষার সাধর্ম্য যথেষ্ট। বুন্দেলখণ্ডীর অন্তর্গত মাতৃভাষার সংখ্যা ১২টি। সব কয়টিই **LSI** সমর্থিত। মাতৃভাষাগুলির মধ্যে প্রধান হলো—বুন্দেলখণ্ডী (ভাষাভাষীর সংখ্যা ২২,০৬৫), লোধী (২৭,৩৯৩), রঘোবংশী (২,৪৮৪) ইত্যাদি।

[২] পাঞ্জাবী

পাঞ্জাব প্রদেশের ভাষাঞ্চল দুই ভাগে বিভক্তঃ বহিরঙ্গ শাখার অন্তর্গত লহ্‌ন্দা বা পশ্চিমা পাঞ্জাবী এবং পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত অন্তরঙ্গ শাখাভুক্ত পূর্বী পাঞ্জাবী বা পাঞ্জাবী। বর্তমানে লহ্‌ন্দা ভাষাভাষীরা প্রধানত পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত হলেও স্বাধীনতা-উত্তর যুগে বহু লহ্‌ন্দা-ভাষী পূর্বাঞ্চলে চলে এসেছেন। কাজেই বর্তমান পাঞ্জাবের লহ্‌ন্দা ও পাঞ্জাবী ভাষাঞ্চল পৃথক করা সম্ভব হয় নি। পাঞ্জাবী ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম অনুসূচী স্বীকৃত ভাষা, মোট ভাষাভাষীর সংখ্যা ১ কোটি ৯ লক্ষ

৫০ হাজার ৮২৬, মোট মাতৃভাষার সংখ্যা ২৯। এই ২৯টি মাতৃভাষার মধ্যে ১৭টি LSI-সমর্থিত।

বর্তমান জনসমীক্ষকের মতে LSI-উল্লিখিত কাংড়ী (কাংড়া উপত্যকা, ভাষাভাষীর সংখ্যা ৭,৮০৬) এবং ডোগরী (পাঠানকোট, জম্মু, ৮,৭৯,৭৪৮) সম্পর্কে বিশেষ সমীক্ষা প্রয়োজন। কারণ, এগুলিকে কেবল পাঞ্জাবীর বিভাষা বলা ঠিক হবে না, এগুলি পাঞ্জাবী থেকে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। এছাড়া কাংড়ী ও ডোগরীর মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য রয়েছে, কেন-না, কাংড়ীর মধ্যে পশ্চিমা পাহাড়ী ভাষাগুলির প্রভাব যথেষ্ট সক্রিয়।

[৩] গুজরাটী

পাঞ্জাবীর মতো গুজরাটীও অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ শাখার সীমান্তবর্তী ভাষা। গুজরাটী ও সিন্ধীর যোগসূত্র স্থাপন করেছে কচ্ছী ('সিন্ধী' দ্রষ্টব্য)। রাজস্থানী, বিশেষত পশ্চিমা রাজস্থানী এবং গুজরাটীর সাধর্ম্যও যথেষ্ট। তাই 'প্রাচীন পশ্চিমা রাজস্থানী' (Old Western Rājasthānī)—উদ্ভূত এই ভাষা দুইটিকে ভগিনীস্থানীয়া ধরা হয়ে থাকে। গুজরাটী ভাষাভাষীর সংখ্যা সারা ভারতে ২ কোটি ৩ লক্ষ ৪ হাজার ৪৬৪। গুজরাটী ভাষা ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম সূচী অনুমোদিত। মোট মাতৃ-ভাষার সংখ্যা ২৭, এদের মধ্যে ১৬টি LSI গ্রন্থে সমর্থিত। এই ১৬টি মাতৃভাষার মধ্যে সৌরাষ্ট্র (ভাষাভাষীর সংখ্যা ১,৫৭,৫৭০) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বর্তমান সুধীজন-দের মধ্যে অনেকেই আবার সৌরাষ্ট্রকে মারাঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত করতে চান। সৌরাষ্ট্র ভাষীদের অধিকাংশই (১,৫৫,৩৯২) মাদ্রাজ/তামিলনাড়ুর অধিবাসী। LSI গ্রন্থে অবশ্য সৌরাষ্ট্র ছাড়াও সৌরাস্ত্রীর উল্লেখ আছে (বর্তমানে ভাষাভাষী : ১১৪ জন)—যেটি হলো আসলে গুজরাটীর একটি উপভাষা, নাম পতনুলি (Patnuli), আর তা হলো তামিলনাড়ুর বিশেষ একটি রেশম শিল্পী-সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষা। বেশ কয়েক শতক আগে এরা গুজরাট থেকে এসে এখানে উপনিবিষ্ট হয়েছিল। বহু শতক ধ'রে দ্রাবিড় সংযোগের ফলে এই ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব সহজদৃশ্য। অন্যান্য মাতৃভাষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : গুজরু (ভাষাভাষী : ২৪,৫৭৭), কাথিয়াবাড়ী (ভাষাভাষী : ২,৯৮৯) ইত্যাদি।

[৪] ভিলী ও খান্দেশী

বর্তমান ভাষা-সমীক্ষায় ভিলী ও খান্দেশী একত্রে আলোচিত হয়েছে। ভিলী ও খান্দেশী তিনটি প্রধান ভাষাঞ্চলের সীমানায় অবস্থিত, ফলে এদের বর্গীকরণও এক

জটিল সমস্যা। এই তিনটি প্রধান ভাষা হলো—গুজরাটী, মারাঠী এবং রাজস্থানী। LSI গ্রন্থানুসারে ভিলী ও খান্দেশী ভাষাগুচ্ছ রাজস্থানী/গুজরাটীর সঙ্গে যতটা সম্পর্কিত, মারাঠীর সঙ্গে ততটা নয়। খান্দেশীতে অবশ্য মারাঠী লক্ষণ যথেষ্ট পরিস্ফুট, কারণ মারাঠী ভাবাঞ্চলে তা যথেষ্ট প্রসারলাভ করেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও LSI গ্রন্থ অনুযায়ী এই ভাষার মূল কাঠামো গুজরাটী ও রাজস্থানীর ভিত্তিমূলেই প্রতিষ্ঠিত। যাই হোক, এই বিষয়ে আরও আলোকপাত হওয়া দরকার।

(ক) ভিলী :

বর্তমানে ভিলী ভাষাভাষীর সংখ্যা ২৪ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬১১ ; মোট মাতৃভাষা ৩৬টি। এদের মধ্যে ২৯টিই LSI সমর্থিত। বর্তমান সমীক্ষায় ভিলীর মাতৃভাষা দুটি—ভিলী (১,৬৯,৩৪০) এবং ভিলোডী (৫৯,২৪৩)—স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত হয়েছে LSI গ্রন্থের মতই, কিন্তু বর্তমান সমীক্ষকের মতে এদের একটি নামই থাকা উচিত ভিলী/ভিলোডী, কারণ সম্ভবত এরা অভিন্ন। আর একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য হলো : LSI গ্রন্থে ভিলীর একটি বিভাষা 'কোঙ্কণী'-রূপে উল্লিখিত হলেও তার প্রকৃত নাম কোকনা/কোকনি/কুকনা (৮৪,১১৬)। এই নামগুলি আসলে উপজাতির নাম থেকে আগত।

(খ) খান্দেশী :

পূর্বতন বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত খান্দেশ জেলার ভাষা খান্দেশী নামে পরিচিত। তা অবশ্য আহিরাণী অর্থাৎ আভীর বা গোপালকদের ভাষারূপেও পরিচিত। খান্দেশী ভাষাভাষীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ২৮ হাজার ১২৬। মোট মাতৃভাষা ৫টি। এদের মধ্যে প্রধান হলো আহিরাণী (৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ১৮০)। অন্যান্য মাতৃভাষা—খান্দেশী (৩,৬৯২), ডঙ্গী (৬০,৫৮৪) ঢেদগুজরী (৪৮), চিটোদী (২২)। সব কয়টি ভাষাই LSI সমর্থিত।

[৫] রাজস্থানী

রাজস্থানী নামকরণ গ্রীয়ার্সনের। রাজস্থানী ভাষাঞ্চল প্রায় সমগ্র রাজস্থান জুড়ে প্রসারিত। আগে রাজস্থানী ভাষাগুচ্ছকে হিন্দীর অন্তর্ভুক্ত করা হতো, গ্রীয়ার্সনই প্রথম এর স্বতন্ত্র স্বীকৃতি দিয়েছেন। রাজস্থানী ভাষাঞ্চল এক বিশাল ভূ-ভাগ জুড়ে প্রসারিত ব'লে এর এক প্রান্তের ভাষার সঙ্গে অপর প্রান্তের ভাষার বিশেষ মিল দেখা

যায় না, বিশেষত বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ শাখার অন্তর্বর্তী অঞ্চলগুলিতে এই অমিল আরও বেশী। উদাহরণস্বরূপ, LSI অনুযায়ী পশ্চিমা রাজস্থানীর প্রধান উপভাষা মারোয়াড়ীর সঙ্গে মিল বেশি বহিরঙ্গ শাখাভুক্ত সিন্ধীর। অপর পক্ষে, উত্তর-পূর্বী রাজস্থানীর উপভাষাদ্বয়—মেওয়াটি এবং আহীরবাটী, এবং দক্ষিণ-পূর্বী রাজস্থানীর উপভাষাদ্বয়—মালবী ও নিমাড়ীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ শাখাভুক্ত পশ্চিমা হিন্দীর সাধর্ম্য যথেষ্ট। বলা বাহুল্য, পশ্চিমা হিন্দীর জননী শৌরসেনী প্রাকৃত ও শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাব রাজস্থানের পূর্বাঞ্চলে আগাগোড়াই সক্রিয় ছিল; কাজেই পূর্বী রাজস্থানী ও পশ্চিমা হিন্দীর আত্মিক সম্পর্ক অস্বীকার করা চলে না। অপর পক্ষে ভাষা-তাত্ত্বিকদের মতে মারোয়াড়ী এবং গুজরাটী উদ্ভূত হয়েছিল "প্রাচীন পশ্চিমা রাজস্থানী" (Old Western Rājasthānī) থেকে। এতদ্ব্যতীত, সিন্ধী ও মারোয়াড়ীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও রয়েছে যথেষ্ট। মোট কথা, বর্তমানে রাজস্থানীর পূর্বী ও পশ্চিমা বিভেদ যেমন এখনও স্পষ্টীকৃত হয় নি, তেমন পূর্বী রাজস্থানী ও পশ্চিমা হিন্দীর যথার্থ সম্পর্কও যথাযথ উন্মোচিত হয়নি।

ভারতে রাজস্থানী ভাষাভাষীর সংখ্যা ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৩৩ হাজার ১৬। মাতৃ-ভাষার সংখ্যা ৭৩টি। এদের মধ্যে ৫৫টি LSI-সমর্থিত। মাতৃভাষাগুলির প্রধান কয়েকটি হলো—জয়পুরী (৮১,৫১৪), মালবী (১১,৪২,৪৭৮), মারোয়াড়ী (৬২,৪২,৪৪৯), মেওয়াটী (৪৮,৪২৭), নিমাড়ী (৫,২৮,১৭২), আহীরবাটী (২১,১১৯) ইত্যাদি। এগুলি অবশ্য সবই LSI সমর্থিত। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে গ্রীয়ার্সনের মতের সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে, যেমন, বর্তমানে লমনী/লম্বড়ী (৬,৭৯,৩৬৩) এবং বঞ্জারী (বঞ্জার উপজাতির ভাষা, ভাষাভাষী সংখ্যা ৫,৯২,৬৫৪) ভাষা দুটিকে স্বতন্ত্ররূপে ধরা হয়েছে, কিন্তু LSI-তে এরা অভিন্ন। লমনী/লম্বড়ী ভাষীরা প্রধানত অন্ধ্রপ্রদেশ আগত, কিন্তু বঞ্জারী ভাষীরা প্রধানত মহারাষ্ট্র এবং মহীশূর অঞ্চলের অধিবাসী। বঞ্জারী ভাষীরা আসলে বঞ্জার উপজাতি; এরা বর্তমানে রাজস্থানে বসতি স্থাপন করলেও তাদের মৌলিক যাযাবর বৃত্তি ছাড়তে পারে নি, ভাষাও তাই অবিমিশ্র নয়।

গ্রীয়ার্সন নির্দিষ্ট গুজুরী, গুজরী, গোজরী মূলত গুজর উপজাতির ভাষাগুচ্ছ এবং তা রাজস্থানীর উপভাষা। ১৯৬১ সনের জনসমীক্ষায়ও এরা পৃথক মাতৃভাষা। গোজ্‌রী (২,০৯,৩২৭), গুজরী (১,৯১১) এবং গুজুরী (৫,৩১৭) ভাষাভাষীরা প্রধানত এসেছে যথাক্রমে জম্মু/কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ/মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাব থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই-জাতীয় যাযাবর উপজাতিদের ভাষা সম্পর্কে আরও গবেষণা প্রয়োজন।

খ. উত্তরদেশীয় বিভাগ (Northern Group)

[৬] পাহাড়ী

LSI চিহ্নিত পাহাড়ী ভাষাগুচ্ছ কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলের ভাষা নয়, তা হিমালয়ের বিশাল পার্বত্যাঞ্চল জুড়ে প্রসারিত। পাহাড় অঞ্চলে কথিত বলেই তাদের সাধারণ নাম 'পাহাড়ী'। এই ভাষাগুলি পশ্চিমে ভদ্রবা থেকে পূর্বে নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত। পাহাড়ী ভাষাগুচ্ছকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) পূর্বী পাহাড়ী/নেপালী/খস্‌কুরা। (খ) পশ্চিমা পাহাড়ী এবং (গ) কেন্দ্রিক পাহাড়ী।

গ্রীয়ার্সনের বক্তব্য অনুযায়ী এই বিশাল অঞ্চল এককালে আধুনিক মুণ্ডাভাষাগুলির জননীস্থানীয়া কোনো প্রত্ন-মুণ্ডা ভাষার দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল। পরে ভোট-বর্মী ভাষা-ভাষীরা এখানে অনুপ্রবিষ্ট হয়। সর্বশেষে দক্ষিণের সমতল ভূমি থেকে উত্তরের এই পার্বত্যাঞ্চলে ভারতীয় আর্যদের আগমন ঘটে। অবশ্য ভারতীয় আর্যদের আগমনের পূর্বে হিন্দুসমাজ-বহির্ভূত দর্‌দ্‌-ভাষী 'খস্‌' উপজাতি দ্বারা এই অঞ্চল অধ্যুষিত ছিল। বলা বাহুল্য, এই খস্‌রাও ছিল আর্য বা ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত—যারা এককালে পশ্চিম থেকে পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিল। আনুমানিক ষোড়শ শতকে নেপালে গোর্খা অভিযান ঘটে, ফলস্বরূপ, নেপালে গোর্খা শাসনের সূত্রপাত এবং সেইসঙ্গে তাদের ভাষা 'খস্‌কুরা'ও (খস উপজাতির ভাষা) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এই খস্‌জাতি ভারতীয় আর্য ভাষাভাষীদের দ্বারা হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়। অবশ্য এই হিন্দু ভারতীয় আর্যরা প্রধানত এসেছিলেন রাজপুতানা থেকে। এই দেশান্তরী (**Immigrant**) হিন্দুদের ভাষা ক্রমে মূল খস্‌ ভাষাকে স্থানচ্যুত করে এবং তার স্থান দখল করে ভারতীয় আর্য-উদ্ভূত আধুনিক পাহাড়ী ভাষাগুলি। তাই আজও পশ্চিম দেশ থেকে পূর্ব দিকে যত যাওয়া যায়, ততই ভাষার মধ্যে খস্‌ বা দর্দিক উপাদান ক্ষীণতর হতে দেখা যায়।

পাহাড়ী ভাষাগুলির বর্গীকরণ ভাষাতাত্ত্বিকদের পক্ষে এক জটিল সমস্যা। একদিকে এর ভাষাঞ্চল যেমন বিশাল, তেমন 'পাহাড়ী' অভিধাও অস্পষ্ট। কারণ, 'পাহাড়ী' বলতে যেমন বিভিন্ন ভাষা বোঝায়, তেমন বিভিন্ন উপজাতিও বোঝায়। তাছাড়া, এমন অনেক পাহাড়ী ভাষা রয়েছে, যেগুলিকে উপরোক্ত তিনটি বিভাগের (পূর্বী, পশ্চিমা ও কেন্দ্রিক) অন্তর্গত করা যায় না। কাজেই এই অনির্ণীত ভাষাগুলিকে (ভাষাভাষীর সংখ্যা : ৯,৭৭,৪১৬) বর্তমান সমীক্ষায় 'অনির্দিষ্ট পাহাড়ী' (**Unspecified Pāhāṛī**) ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। যাই হোক, বর্তমানে পাহাড়ী

ভাষাভাষীর মোট সংখ্যা ৪৫ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৫০। পাহাড়ী ভাষাগুচ্ছের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো—

(ক) নেপালী / পূর্বী পাহাড়ী

LSI গ্রন্থে পূর্বী পাহাড়ীর একমাত্র প্রতিনিধি নেপালী। অবশ্য নেপালী ভাষীদের মূল অধিষ্ঠান নেপালে, যা ভারত-বহির্ভূত রাষ্ট্র। কিন্তু গোর্খালী সমেত নেপালী ভাষাভাষী ভারতে প্রচুর সংখ্যায় বসবাস করে এবং মণিপুর ছাড়া প্রায় সারা ভারতে নেপালীরা ছড়িয়ে আছে। তাছাড়া, ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির সঙ্গে নেপালীর সম্পর্কও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ। নেপালী এবং গোর্খালী যদিও প্রায় একই ধরণের ভাষা, তবু বর্তমান জনসমীক্ষায় দুটির পৃথক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা হয়েছে। কারণ, বহু সংখ্যক নেপালীই এই দুটি ভিন্ন নামে পরিচিত হতে চান। সারা ভারতে নেপালী তথা পূর্বী পাহাড়ী ভাষাভাষীর সংখ্যা ১০ লক্ষ ২১ হাজার ১০২। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গেই এদের বসবাস অধিক (৫,২৪,৭৯৭), এর পরের স্থান আসামের (২,১৫,২১৩)। নেপালী অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য মাতৃভাষা হলো—নেপালী (১০,০৩,০২৬), গোর্খালী (১৭,০৬৭), দর্হি (৮) এবং থাপের (১)। দর্হি ভাষাভাষীরা সকলেই মহারাষ্ট্রের অধিবাসী এবং একমাত্র থাপের ভাষী অন্ধ্রপ্রদেশবাসী। সম্প্রতি (ইং ১৯৭৬) নেপালী, সাহিত্য এ্যাকাডেমী কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে।

(খ) কেন্দ্রিক পাহাড়ী

গ্রীয়ার্সন কেন্দ্রীয় পাহাড়ীর দুটি উপভাষা লক্ষ্য করেছিলেন, যথা—কুমাওনী বা কুমায়ুনী এবং গাঢ়োয়ালী। সমগ্র কেন্দ্রিক পাহাড়ী ভাষাভাষীর সংখ্যা ১৮ লক্ষ ৪০ হাজার ২২১। এদের মধ্যে কুমাওনীর সংখ্যা ১০ লক্ষ ৩০ হাজার ২৫৪, মাতৃভাষা সংখ্যায় ৮টি, যথা, আলমোড়ী, নৈনীতালী ইত্যাদি। এদের মধ্যে তিনটি **LSI** সমর্থিত। গাঢ়োয়ালী ভাষাভাষী সংখ্যায় ৮ লক্ষ ৯ হাজার ৯৬৭, মাতৃভাষা ৮টি, যথা—ডোগুিআলী, টেহ্‌রী ইত্যাদি। এদের মধ্যে তিনটি **LSI** সমর্থিত।

(গ) পশ্চিমা পাহাড়ী

পশ্চিমা পাহাড়ী যাদের মাতৃভাষা এমন লোকের সংখ্যা ৬ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫৫৬। বর্তমান আদমশুমারি (১৯৬১) অনুযায়ী মাতৃভাষার সংখ্যা ৬২। পশ্চিমা পাহাড়ীর প্রধান ভাষাঞ্চল হলো : হিমাচল প্রদেশ এবং এরই সংলগ্ন জম্মু ও কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের অঞ্চল বিশেষ।

LSI গ্রন্থে সমগ্র পশ্চিমা পাহাড়ীকে ৯টি প্রধান বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান সমীক্ষায় এই সংখ্যা প্রায় ২১।২২টিতে দাঁড়িয়েছে—এদের অন্তর্গত মাতৃভাষার সংখ্যাও প্রচুর (৬২টি)। মাতৃভাষার এইরূপ বাহুল্যের কারণও রয়েছে; প্রথমত, পাহাড়ী এলাকা ব'লে ভাষাঞ্চল বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত, একের সঙ্গে অন্যের যোগাযোগও কম। দ্বিতীয়ত, এই ভাষাঞ্চলগুলি এককালে বিভিন্ন স্বয়ংশাসিত রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, ফলে এদের মধ্যে যোগাযোগও ছিল অনিয়মিত। লক্ষণীয়, অনেক ভাষা এইরূপ রাজ্যের দ্বারা নামাঙ্কিত, যেমন, চমেআলী, মণ্ডেআলী, সিরমউরী ইত্যাদি, এমনকি ছোটো ছোটো অঞ্চল, যেমন, জৌনসর, গিরিপরি, ধরতি ইত্যাদি স্থানের নামও ভাষাঞ্চল দ্বারা চিহ্নিত। অনেক সময় স্থানগত বিভেদ স্বীকার ক'রে নেওয়া হলেও ভাষার দিক দিয়ে তাদের তেমন পার্থক্য নজরে পড়ে না। মোট কথা পশ্চিমা পাহাড়ীর যথাযথ মূল্যায়ন বর্তমান সমীক্ষাতেও সম্পূর্ণ নয়। সে যাই হোক, বর্তমান ৬২টি মাতৃভাষার মধ্যে ৩১টি LSI সমর্থিত।

(ঘ) অনির্ণীত পাহাড়ী

অনির্ণীত পাহাড়ী ভাষাভাষীর সংখ্যা ১০ লক্ষ ১৫ হাজার ২০৩। এইজাতীয় ভাষাগুলি হলো—বিন্হারী (১৪), হিমাচলী (৫৯৬), কাংড়ী পাহাড়ী (৯০৮), কাশ্মীরী পাহাড়ী (৫৭), মহাজনী (৫৩), পচ্ছিমী পাহাড়ী (৫৫,৩২৭) এবং অন্যান্য অনির্ণীত পাহাড়ী (৯,৫৮,২৪৮)। এই ভাষাগুলিকে পশ্চিমী, পূর্বী বা কেন্দ্রীয় কোনো বিভাগেই অন্তর্ভুক্ত করা যায় নি।

৪.৩.৪ প্রাচীন / মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা (OIA/MIA)

সংস্কৃত

সংস্কৃত ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম অনুসূচী স্বীকৃত ভাষা। মাতৃভাষা হিসেবে সংস্কৃতের দাবীদার ২ হাজার ৫৪৪ জন। বর্তমান সমীক্ষকের মতে: "It will not be unreasonable to presume that Sanskrit is hardly a spoken language and the returns are more an expression of a wish than a fact."

অর্ধমাগধী / প্রাকৃত / পালি

সংস্কৃতের মতই এই Classical বা ধ্রুপদী ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন ১৯ জন, এঁরা সকলেই মহারাষ্ট্রের অধিবাসী। এইরূপ প্রাকৃত ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫ জন (মাদ্রাজ বা তামিলনাড়ুর অধিবাসী)। এছাড়া পালি ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন আরও প্রায়

৯৩ জন। এঁরা অবশ্য বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসী—বিহার, কেরালা, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং দিল্লী।

এইজাতীয় ধ্রুপদী ভাষাগুলিকে মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করার প্রবণতা দেখে সমীক্ষক মন্তব্য করেছেন : "Strange are the ways of ambition !"

৪.৪ বিদেশী ভাষা (Foreign Languages)

এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, ওসিয়ানিয়া এবং ইউরোপীয় দেশগুলির বিভিন্ন ভাষাভাষীরাও বর্তমান সমীক্ষায় পরিসংখ্যানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এইরূপ বিদেশী মাতৃভাষার সংখ্যা ১০৩, মোট ভাষাভাষীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৪৬৬। বলা বাহুল্য, এদের মধ্যে ইংরেজীর স্থান সর্বাগ্রগণ্য। মোট ইংরেজী ভাষীর সংখ্যা ২ লক্ষ ২৩ হাজার ৭৮১। ভারত সরকারের Official Language Act (1963) অনুসারে ইংরেজী, হিন্দীর পাশাপাশি সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত হয়েছে। দ্বিভাষা-ভাষীদের (Bi-lingual) মধ্যে ইংরেজী জানেন এমন লোকের সংখ্যা ভারতে ১ কোটি ১০ লক্ষ ২১ হাজার ৬১০।

৪.৫ অবর্গীভূত ভাষা (Unclassified Languages)

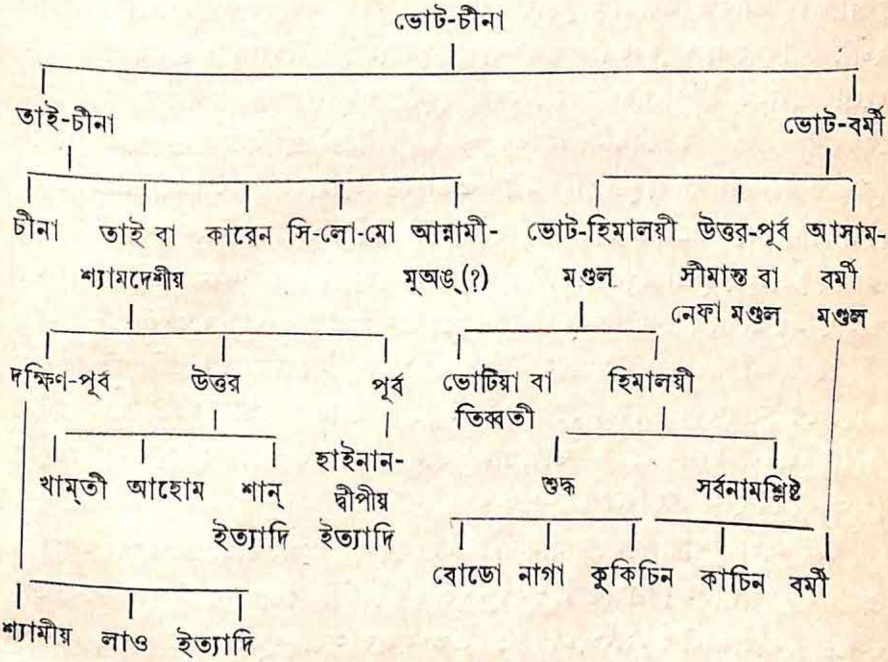
সারা ভারতে অবর্গীভূত মাতৃভাষার সংখ্যা ৫২৭। মোট মাতৃভাষীর সংখ্যা ৬২ হাজার ৪৩২। অবশ্য এই ৫২৭টি ভাষার মধ্যে ২১০টি মাতৃভাষার কথক এমনকি দু/একজন মাত্র। কেবল একজন ভাষাভাষী রয়েছে এমন মাতৃভাষার সংখ্যা ১৫১। এই অবর্গীভূত ভাষাগুলির মধ্যে যেমন জিপ্‌সী ভাষাকে ধরা হয়েছে, তেমনি কিছু অপভাষাও (Argot) এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গ্রীয়ার্সন এইজাতীয় অবর্গীভূত ভাষা সম্পর্কে বলেছেন : "All mixtures of various forms of speech, but they possess one characteristic in common—that they nearly all seem to have a Dravidian basis" (LSI Vol. I pt. I p. 186)। আর এই অবর্গীভূত ভাষাগুলি সম্পর্কে বর্তমান সমীক্ষকের মন্তব্য হলো : "It is also stated that the Gypsies are mostly bilinguals or even trilinguals and preserve their own speech also to a certain extent. Since the situation regarding all these languages deserves a re-assessment through fresh studies, it was decided to keep them in this 'unclassified' category".

LSI অনুযায়ী অখণ্ড ভারতে অবর্গীভূত ভাষা প্রধানত তিনটি, যথা—(ক) বুরু-শাস্‌কী/খাজুনা, (খ) আন্দামানী এবং (গ) জিপসী ভাষাগুচ্ছ (Gypsy Languages)। এই ভাষাগুলির বিবরণ যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

ভারতের ভাষাচিত্র (১৯৬১) ঃ অ-ইন্দো-ইউরোপীয়

৫.১ ভোট-চীনা বা চীনা-তিব্বতীয় (Tibeto-Chinese/Sino-Tibetan)

ভোট-চীনা বা কিরাত গোষ্ঠীর ভাষাবর্গ চীন, তিব্বত, বর্মা, শ্যাম, আন্নাম এবং ভারতের অঞ্চল বিশেষে (উত্তর-পশ্চিমে লদাখ ও বাল্‌তীস্তান থেকে পূর্বে 'নেফা' (NEFA) বা অরুণাচল এবং পূর্ব আসামের দক্ষিণ প্রান্তিক অঞ্চল পর্যন্ত) প্রচলিত। এই গোষ্ঠীভুক্ত প্রধান ভাষাগুলির সংখ্যা প্রায় ১১৫। সাম্প্রতিক লোকগণনা (ইং ১৯৬১) অনুযায়ী ভারতে প্রচলিত এই গোষ্ঠীভুক্ত মাতৃভাষার সংখ্যা ২২৬ (ভোট-বর্মী ২২৫)। মোট ভোট-চীনা ভাষীর সংখ্যা পৃথিবীতে ৭৫ কোটিরও অধিক (ভারতে ৩১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮০০ অর্থাৎ ভারতীয় জনসংখ্যার ০·৭৩%)। আলোচ্য গোষ্ঠীর প্রধান শাখা ও বিভাগ দেখানো যায় এইভাবে—



তাই-চীনা (Thai-Chinese) বর্গের প্রধান ভাষা হলো—চীনা (মান্দারিন্ এবং ক্যান্টনদেশীয়)। তাই বা শ্যামীয় (Thai/Siamese) ভাষাবর্গের মধ্যে খাম্‌তী

(ভাষাভাষীর সংখ্যা ২৯৬) উত্তর-পূর্ব আসামের প্রান্তিক বা 'নেফা' অঞ্চলে প্রচলিত। খ্রীষ্টীয় ১৩শ-১৮শ শতক পর্যন্ত আহোম ভাষাও আসামে প্রচলিত ছিল ('আহোম' থেকেই 'আসাম' শব্দের উৎপত্তি)। শান্ এবং অপর উপভাষাগুলি উত্তর বর্মা ও শ্যামদেশে বর্তমানে চলিত আছে। কারেন উপভাষাগোষ্ঠী দক্ষিণ বর্মা ও তৎসংলগ্ন শ্যামদেশে এবং সি-লো-মো ভাষাগুলি ইয়াংসি-কিয়াং অববাহিকা অঞ্চলে বলা হয়। সুধীজনের মধ্যে কেউ কেউ আন্নামী ও মুঅঙ্ ভাষাগুলিকে (টংকিং, উত্তর আন্নাম, কোচিন-চীন) তাই-চীনা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। মতান্তরে এই দুইটি উপগোষ্ঠী যথাক্রমে অষ্ট্রিক শাখার মুণ্ডা ও মোন্-খ্মের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

ভোট-বর্মী বা কিরাত (**Tibeto-Burman**) শাখার অন্তর্গত ভোট-হিমালয়ী মণ্ডলের (**Tibeto-Himalayan**) ভাগ দু'টি—(ক) ভোটিয়া বা তিব্বতী (ভাষাভাষীর সংখ্যা : ২,০৭,৩৫৩)—মধ্যদেশীয় তিব্বতী হলো আদর্শ ভাষা (**Standard Language**)। লাসা এর কেন্দ্র। অন্যান্য উপভাষা হলো : পশ্চিমা বাল্‌তী ও লদাখী (কাশ্মীর), লহুলী, স্পিতি ইত্যাদি। পূর্বী ভাষাগুলি হলো : সিকিম-ভোটিয়া, ভুটানী, শের্‌পা, কাগতে ইত্যাদি। ভারতে তিব্বতী মাতৃভাষা সংখ্যায় ৩৩টি। (খ) হিমালয়ী—মোট মাতৃভাষা ২৪টি, লোকসংখ্যা ৭১,৯২৪। 'শুদ্ধ' বা অ-সর্বনামশ্লিষ্ট হিমালয়ীর প্রধান ভাষাগুলি হলো প্রধানত নেপালের গুরুঙ্, মগর, মুরমী, সুন্‌ওয়ার ও নেপালের আদিভাষা নেওয়ারী এবং পূর্ব নেপাল, সিকিম ও দার্জিলিঙে প্রচলিত লেপ্‌চা বা রোঙ্ (মতান্তরে নাগা গোষ্ঠীভুক্ত)। অষ্ট্রিক-প্রভাবিত সর্বনামশ্লিষ্ট (**Pronominalised**) হিমালয়ীর মধ্যে প্রধান ভাষাগুলি হচ্ছে : কিরান্তী, ধীমাল, লিম্বু ইত্যাদি (পূর্ব নেপাল) এবং কন্‌ওয়ারী (ভাষাভাষী : ২৮,৬৩০) ইত্যাদি (পশ্চিম নেপাল)। হিমালয়ী ভাষাগুলির মধ্যে, বিশেষত কন্‌ওয়ারীতে মুণ্ডা ভাষার প্রভাব দেখা যায়।

ভোট-বর্মী শাখাভুক্ত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বা 'নেফা' মণ্ডলের ভাষাগুলি হিমালয়ের সানুদেশে আসামের পার্বত্যাঞ্চলে কথিত হয়। মোট মাতৃভাষা ২৪টি, ভাষাভাষীর সংখ্যা ১,৪২,৬৪০। প্রধান ভাষাগুলি হলো : আকা, আবোর (৪,০০০), দফ্‌লা (১,৩৮০), মিশ্‌মি এবং মিরি (১,৩৬,৬০০)।

ভোট-বর্মী শাখাভুক্ত আসাম-বর্মী মণ্ডলের (Assam-Burmese) অন্তর্ভুক্ত প্রচলিত ভাষাগুলির (ভাষাভাষী : ২৭,৬১,৫৮৮) চারিটি বিভাগ, যথা—(ক) বোডো/বোরো (ভাষাভাষী : ১২,২৮,৪২১) : এক সময়ে সমগ্র পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম আসাম জুড়ে বোডো-ভাষীদের বসবাস ছিল। বর্তমানে এই শ্রেণীভুক্ত মাতৃভাষার সংখ্যা ২২। প্রধান উপভাষাগুলি হলো কাছাড়ী (কাছাড় পার্বত্যাঞ্চল), ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ

বাঁকের পূর্বে রাভা, প্রায়-লুপ্ত কোচ, মেচ (উত্তরবঙ্গ, আসামের সমতলভূমি) ও গারো (গারো পার্বত্যাঞ্চল, ভাষাভাষী : ৩,০৭,০০০), ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরী/টিপ্‌রা (৩,৭০,০০০), জৈন্তিয়া পাহাড়ের পূর্বে, গৌহাটী ও নওগাঁর মধ্যে লালুঙ্‌, হোজাই, বোডো (গৌহাটী জেলা), কাবুইস্‌ (৩০,০৮৯) এবং মিকির (নওগাঁ, শিবসাগর, ১,৫৪,৮৯৩)। (খ) নাগা (৪,৭৮,৪৩৯): নাগা বলা হয় প্রধানত নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুরে, অন্যত্র 'নেফা' (অরুণাচল) ও আসামে। মোট মাতৃভাষা ৪৭টি। শুদ্ধ নাগা ভাষাগুলির মধ্যে প্রধান হলো—আও, অঙ্গামী, সেমা, তঙ্‌খুল, লোথা, রেঙ্‌মা ইত্যাদি। এছাড়া অবর্গীভূত **(Unclassified)** নাগা ভাষাও রয়েছে (মোট লোকসংখ্যা ৩৩,৩৩৩)। (গ) কুকি-চিন (১০,৪৩,৪১৪): কুকি-চিন বলা হয় বর্মা এবং আসামের লুশেই পার্বত্যাঞ্চল, মণিপুর এবং ত্রিপুরা রাজ্যে। মোট মাতৃভাষা ৬৯টি। প্রধান উপভাষা হলো—মেইতেই বা মণিপুরী (মণিপুর, লোকসংখ্যা ৬,৩৬,৪৩০) এবং তদন্তর্গত বিষ্ণুপুরিয়া, বিভিন্ন চিন্ উপভাষা (উত্তর ও দক্ষিণ চিন্), লুশেই বা মিজো (মধ্য চিন্, ২,২২,২০২) এবং কুকি। (ঘ) বর্মী (১০,৪৮৯): বর্মী হলো ব্রহ্মদেশ বা বর্মার ভাষা, তবে মধ্যাঞ্চলের উপভাষাগুলি চট্টগ্রামের পার্বত্যাঞ্চলে কথিত হয়। এই উপভাষাগুলি হলো আরাকানী এবং তদন্তর্গত মোঘ ও ম্রু।

ভোট-চীনা গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাগুলির মধ্যে চীনা সাহিত্যের নিদর্শন অতি প্রাচীন (আনুমানিক খ্রী. পূ. ১৫০০ অব্দ)। তিব্বতীয় ভাষার সর্বপ্রাচীন নিদর্শন ৮২২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত স্তম্ভলিপিতে উৎকীর্ণ একটি চুক্তিপত্র। বর্মী ও শ্যামদেশীয় ভাষার প্রাচীনতম স্বাক্ষর হলো যথাক্রমে ১১শ ও ১৩শ শতকে রচিত লেখমালা। নেপালের আদি ভাষা নেওয়ারী, মণিপুরের ভাষা মণিপুরী বা মেইতেই এবং আসামের অধুনা-লুপ্ত ভাষা আহোম-এ রচিত সাহিত্যসম্ভার ১৩-১৪শ শতকের মধ্যে সীমিত। এই ভাষাগুলির ব্রাহ্মীলিপি-উদ্ভূত নিজস্ব লিপিরীতি রক্ষিত আছে।

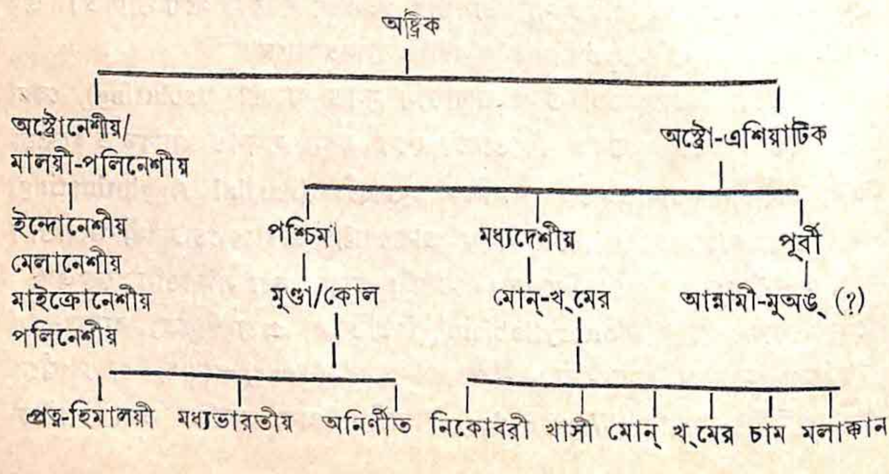
ভাষাতত্ত্বের বিচারে ভোট-চীনা ভাষাগুলি মূলত অনন্বয়ী **(Isolating)**, যেমন চীনা ভাষা। তবে সম্ভবত বিবর্তনের ফলে নতুন লক্ষণও আবির্ভূত হয়েছে, যেমন, তাই-চীনা ভাষাগুলিতে আংশিক মুক্তান্বয়ী **(Partial Agglutinating)** লক্ষণ দেখা যায়। অপর দিকে অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাবে ভোট-বর্মী ভাষাগুলি ক্রমশ সম্পূর্ণ মুক্তান্বয়ী হয়ে গিয়েছে। অনন্বয়ী ভাষার মুখ্য লক্ষণগুলি হচ্ছে এই—শব্দের একাক্ষর ধর্ম **(Monosyllabism)**, বিভক্তি বা প্রত্যয়হীনতা, ব্যাকরণগত পদগঠনের অক্ষমতা, শব্দার্থ-নিয়ামক স্বর বা সুরের **(Tone)** প্রয়োগ, বাক্য গঠনে শব্দের সুনির্দিষ্ট অবস্থান **(Word-order)** ইত্যাদি। অবশ্য অনন্বিত ভাষার সার্বিক

লক্ষণ সর্বত্র পরিস্ফুট নয়। তাই বর্তমানে অনেকে আবার তাই-ভাষাগোষ্ঠীকে ভোট-চীনা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করার বিপক্ষে। চীনা ভাষার প্রভাব দেখা গেলেও গোত্র বিচারে বোধ হয় এরা ভিন্ন। এইজন্য আধুনিক সুধীজনের মধ্যে কেউ কেউ তাই-ভাষা-গোষ্ঠীর নতুন নামকরণ করেছেন—কাদাই (Kadai)।

৫.২ অস্ট্রো-এশিয়াটিক (Austro-Asiatic)

ভারতে অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা নিষাদ ভাষাগুলির স্থান কেবল সংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করলে ভুল হবে। সাম্প্রতিক লোক গণনায় (ইং ১৯৬১) ভারতে এই গোষ্ঠীর ভাষাভাষীর সংখ্যা মাত্র ৬১ লক্ষ ৯২ হাজার ৪৯৫ (অর্থাৎ ভারতীয় জনসংখ্যার ১.৫%)। এই ভাষাবর্গের গুরুত্ব ও গৌরব প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনত্বের এক দৃঢ়মূল ভিত্তির ওপর প্রসারিত। অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভারতের সম্ভবত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভাষাগোষ্ঠী। আর প্রাচীন বলেই তার ভৌগোলিক অবস্থান ভারতে এত ব্যাপক, যদিও অধুনা বিচ্ছিন্ন। উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্যভূমি, দক্ষিণে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, পূর্বে আসাম এবং পশ্চিমে বাঙলা-বিহার-অন্ধ্র-ওড়িশা-মধ্যপ্রদেশ ছাড়িয়ে এমনকি সুদূর মহারাষ্ট্র পর্যন্ত এই ভাষাবর্গ এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যে দেখে মনে হয়, এই 'ভাষাদ্বীপ'গুলি (Linguistic Islands) একদা ভারতের বিশাল পূর্ব ভূ-খণ্ড জুড়ে বিস্তৃত ছিল। ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনচর্যায় এর প্রভাবও বড় উপেক্ষণীয় নয়। সেই দিক দিয়ে দ্রাবিড় ভাষা ও সংস্কৃতের পরই এর স্থান। দ্বিতীয়ত, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবর্গ যেমন ভারতকে ইউরোপ ও মধ্য প্রাচ্যের সঙ্গে একাত্ম করে তুলেছে, অস্ট্রিক ভাষাবর্গও তেমনি যুক্ত করেছে ভারতকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিবিড় বন্ধনে। বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস রচনায় অস্ট্রিকের স্থান তাই এত ঊর্ধ্বে।

বৃহত্তর অস্ট্রিক গোষ্ঠীর শাখা ও বিভাগ নিচে প্রদর্শিত হলো—



অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও অস্ট্রোনেশীয় বর্গের অষ্ট্রিক সাধর্ম্য সর্বপ্রথম তুলে ধরেন Father W. Schmidt। অস্ট্রোনেশীয় ভাষাগুচ্ছ ভারতের বাইরে অবস্থিত। কাজেই সম্পর্কে জ্ঞাতি হলেও এদের আলোচনা বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক।

যাই হোক, ওপরের ভাষাচিত্র থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, অস্ট্রো-এশিয়াটিক গোত্রের বহু ভাষাই ভারতের বাইরের বৃহত্তর খণ্ড জুড়ে রয়েছে, যেমন ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের দক্ষিণে প্রচলিত মোন্ বা তালৈঙ্, ব্রহ্মদেশের উত্তরে প্রচলিত পালোউঙ্ এবং ওয়া, ইন্দোচীনের অন্তর্গত কাম্বোডিয়ার (কম্বোজ) খ্মের (Khmer) এবং অপ্রধান ভাষা বাহ্নার, স্তিএঙ্ ইত্যাদি ; কোচিন-চীনের মালয়ী-প্রভাবিত চাম, সেদাঙ্, মলাক্কাদেশীয় সেমাঙ্, সাকৈ, ইয়াকুন ইত্যাদি।

অস্ট্রো-এশিয়াটিক গোষ্ঠীর পূর্বী শাখা 'আন্নামী-মুঅঙ্' প্রকৃতপক্ষে এই বর্গের অন্তর্গত কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে—একথা পূর্বেই বলেছি (দ্রঃ পৃঃ ৬৬)।

আধুনিক জনসমীক্ষা (১৯৬১) থেকে জানা গেলো, ভারতে অষ্ট্রিক মাতৃভাষা সংখ্যায় ৬৫টি। এই ভাষাগুলির মধ্যে ৫৮টি মুণ্ডা শাখার এবং ৭টি মোন-খ্মের (Mon-Khmer) শাখার অন্তর্গত। এখন এই দুইটি শাখার আলোচনা করা যাক্—

(১) মোন্-খ্মের (Mon-Khmer) শাখা :

সর্বভারতীয় মোন্-খ্মের ভাষাভাষীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯৯৩। মোট ৭টি ভাষার মধ্যে ৪টি ভাষার উল্লেখ গ্রীয়ার্সনের Linguistic Survey of India (LSI) গ্রন্থে মেলে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : (ক) খাসি বা খাসিয়া, সর্বভারতীয় লোকসংখ্যা ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬৩। এদের মূল অধিষ্ঠান আসামের খাসি-জৈন্তিয়া পার্বত্যাঞ্চলে। আদর্শ (Standard) খাসি বলা হয় দক্ষিণ খাসি পার্বত্যাঞ্চলের চেরাপুঞ্জী ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে। খাসির বিভিন্ন উপভাষা : জৈন্তিআ, নঙ্টুঙ্, ভোই-খাসি (এগুলি LSI গ্রন্থে উদ্ধৃত নয়) এবং প্নার/স্তনতেঙ্ এবং ওয়ার্। গত শতকের মধ্য ভাগ থেকে খাসি ভাষার চর্চা শুরু হয়েছে এবং তা সম্ভব হয়েছে ওয়েল্শ্ খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টার ফলে। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় খাসিকে পাঠ্য ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। খাসি আগে লেখা হতো বাঙলা হরফে, এখন লেখা হয় রোমক (Roman) বর্ণমালায়। আসামের ভোট-বর্মী ভাষাগুলির দ্বারা পরিবেষ্টিত এই অষ্ট্রিক ভাষাটির অবস্থান ভাষাতাত্ত্বিকদের কৌতুহল ও গবেষণার যথেষ্ট খোরাক জোগায়। (খ) নিকোবরী (Nicoborese) : নিকোবরী আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের ভাষা। মোট ভাষা-

ভাষীর সংখ্যা ১৩ হাজার ৯৩৬। অষ্ট্রিক ভাষাগুলির মধ্যে খাসি ভাষার সঙ্গেই এর সাধর্ম্য বেশি।

(২) মুণ্ডা বা কোল (Munda/Kol) শাখা :

মুণ্ডা ভাষাগুলি বলা হয় প্রধানত বাঙলা, বিহার, ওড়িশা এবং মধ্যপ্রদেশে। এছাড়া মহারাষ্ট্রের পশ্চিম প্রত্যন্ত দেশে (কোর্‌কু) এবং অন্ধ্রে (গদবা ও শবর) অষ্ট্রিক ভাষাভাষী মিলছে। দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাগুলির সঙ্গে সহাবস্থানের ফলে দ্রাবিড় প্রভাবও এদের ওপর সক্রিয়। মুণ্ডা গোষ্ঠীভুক্ত মাতৃভাষা সংখ্যায় ৫৮টি হলেও **LSI** গ্রন্থে ৩১টি ভাষার সমর্থন পাওয়া যায়, ২০টি ভাষার কোনো উল্লেখই নেই, আরও ৭টি ভাষা উল্লিখিত হলেও বর্তমানে তাদের নতুন ক'রে শ্রেণীবিন্যাস করতে হয়েছে। বর্তমানে মুণ্ডা গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাভাষীর সংখ্যা ৫৮ লক্ষ ১৪ হাজার ৪৯৬। এক লক্ষেরও অধিক সংখ্যক মাতৃভাষী—এমন ভাষাগুলি হলো (সংখ্যার ক্রম অনুযায়ী): সাঁওতালী, মুণ্ডারী, হো, শবর, কোরকু, খাড়িয়া এবং ভূমিজ। তবে এই গোষ্ঠীভুক্ত প্রধান ভাষাগুলি সংখ্যায় প্রায় ১৫/১৬টি। ভাষাগুলির নাম, জনসংখ্যা ও নিবাসস্থল নিচে দেওয়া হলো—

১) সাঁওতালী/সান্তালী : ৩২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৮ ; বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা।
২) মুণ্ডারী : ৭ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩৭ ; বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ।
৩) ভূমিজ : ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৩ ; ওড়িশা, বিহার।
৪) হো : ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩৫৯ ; বিহার, ওড়িশা।
৫) বির হোড় : ৫৯০ ; মধ্যপ্রদেশ, বিহার।
৬) কোডা/কোড়া : ৩১ হাজার ১২৪ ; পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার।
৭) তুরী : ১ হাজার ৫৬২ ; পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা।
৮) আসুরী : ৪ হাজার ৫৪০ ; মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ।
৯) অগারিয়া : ৯৮ ; মধ্যপ্রদেশ।
১০) কোর্‌ওয়া : ১৭ হাজার ৭২০ ; মধ্যপ্রদেশ, বিহার।
১১) বিরজিআ/ব্রিজিয়া/বিঞ্ঝিআ : ২ হাজার ৩৯৫ ; বিহার, ওড়িশা।
১২) খাড়িয়া : ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ১৫৯ ; বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ।
১৩) কোর্‌কু : ২ লক্ষ ২০ হাজার ২৪২ ; মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র (বেরার)।
১৪) জুয়াঙ্ : ১৫ হাজার ৭৯৫ ; ওড়িশা।
১৫) গদবা : ৪০ হাজার ১৯৩ ; ওড়িশা, অন্ধ্র।
১৬) শবর/শোরা : ২ লক্ষ ৬৫ হাজার, ৭২১ ; ওড়িশা, অন্ধ্র।

উপরে উল্লিখিত ১৫টি ভাষার মধ্যে প্রথম ১১টি ভাষাকে গ্রীয়ার্সন 'খের্‌ওয়ারী/খের্‌ওয়ালী' ভাষার বিভিন্ন উপভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সাঁওতাল জাতির পুরাণ অনুসারে 'খের্‌ওয়ার' হলো তাদের পিতৃপুরুষদের একটি প্রাচীন নাম। গ্রীয়ার্সন কিন্তু 'খেরওয়ারী' ভাষার কোনো আদর্শ নমুনা দেননি, সাঁওতালী ভাষার সঙ্গে তার পার্থক্য একাকার ক'রে দেখেছেন। বর্তমানে অবশ্য খের্‌ওয়ারী-ভাষীর সন্ধান মিলছে কিন্তু তারা সংখ্যায় নগণ্য, মাত্র ৬৪৭ জন। এই খেরওয়ারী ভাষীরা নিজেদের সাঁওতালী ব'লে মনেও করে না। তাছাড়া সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি ভাষাভাষীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা মুষ্টিমেয় ভাষাভাষীর নামে চিহ্নিত হতে পারে না। বর্তমানে তাই খের্‌ওয়ারীকে পৃথক রাখা হয়েছে।

যাই হোক, মুণ্ডাগোষ্ঠীর প্রধান ভাষা হচ্ছে সাঁওতালী/সান্তালী, তার প্রায় ১০টি বিভিন্ন উপভাষাও রয়েছে। সাঁওতালী ভাষার মুল কেন্দ্রস্থল হলো বিহারের ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা। সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক দিয়ে বিহারের পর এর প্রাধান্য পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায়। চাষের কাজ ও চা-বাগানে মজুরগিরির জন্য এরা ওড়িশা, উত্তরবঙ্গ এবং আসামের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষাদীক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালদের স্বাতন্ত্র্যবোধ জেগে উঠছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও সাঁওতালীকে পাঠ্য বিষয় হিসাবে মর্যাদা দিয়েছেন। নরওয়ের মিশনারী-পণ্ডিত **P. O. Bodding**-এর চেষ্টায় সাঁওতালদের লোকগাথা, পুরাণ ও গীতি-সংকলন সম্ভব হয়েছে। সাঁওতালদের ভাষা আগে লেখা হতো বাঙলায় অথবা রোমক (**Roman**) লিপিতে। বর্তমানে সাঁওতালীদের নিজস্ব লিপি 'অলচিকি' উদ্ভাবিত হয়েছে, উদ্ভাবক শ্রী রঘুনাথ মুর্মু।

মুণ্ডাগোষ্ঠীভুক্ত অপর ভাষা মুণ্ডারীর কেন্দ্রস্থল হলো বিহারের রাঁচি অঞ্চল। সংখ্যা গুরুত্বের দিক দিয়ে বিহারের পরেই স্থান হলো যথাক্রমে ওড়িশা ও পশ্চিম-বঙ্গের। রাঁচির খ্রীস্টান মিশনারীদের চেষ্টায় মুণ্ডারী প্রকৃত ভাষাতাত্ত্বিক মর্যাদা লাভ করেছে। **Father Hoffmann** ১৩ খণ্ডে 'মুণ্ডারী এন্‌সাইক্লোপিডিয়া' বা 'মুণ্ডা কোষগ্রন্থ' (ইং ১৯৩০ – '৪১) সংকলন করেছেন।

বিভিন্ন মুণ্ডা ভাষাগুলির সঙ্গে সাঁওতালীর ভাষাগত সাদৃশ্য রয়েছে যথেষ্ট, কেবল পশ্চিম প্রত্যন্ত দেশের কোর্‌কু অবস্থানের দূরত্ব হেতু কিছুটা পৃথক হয়ে গেছে। জুয়াঙ্‌, গদবা ও শবর বোধ হয় আরও কিছুটা বেশি পরিমাণে সাধারণ মুণ্ডা রূপ ও প্রকৃতি থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

উপরোক্ত মুণ্ডা ভাষাগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি মুণ্ডা ভাষা রয়েছে, যেগুলির

শ্রেণীবিন্যাস বর্তমানে করা যায়নি, যেমন, পারেঙ্গা (ওড়িশা), থর (বিহার) ইত্যাদি প্রায় আরও ৮টি ভাষা। সমস্ত মিলিয়ে এদের মোট লোকসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৬৫৩ জন।

এই মুণ্ডা ভাষাগুলি একদা হিমালয় অঞ্চলেও বিস্তৃত ছিল। হিমালয়ী ভোট-বর্মী ভাষাগুলির গঠনরীতির মধ্যে তাই আজও মুণ্ডা ভাষার ছাঁদটি লক্ষ্য করা যায়। মুণ্ডা-প্রভাবিত ভোট-বর্মী ভাষাগুলি হিমালয়ের পার্বত্যাঞ্চলে বিস্তৃত জায়গা জুড়ে আছে—পূর্বে ধীমাল, থামী, থম্বু, লিম্বু, রাই এবং পশ্চিমে মঞ্চাটী, কনৌরী বা কন্‌ওয়ারী, লাহুলী ইত্যাদি। এদের মধ্যে সিমলার উত্তর-পূর্বে প্রচলিত কন্‌ওয়ারী ভাষায় (২৮,৬৩০) বোধ হয় মুণ্ডা প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি।

ভাষাতত্ত্বের বিচারে ভারতীয় অষ্ট্রিক প্রধানত মুক্তান্বয়ী (**Agglutinating**) ভাষা। তবে পৃথক পৃথক ভাষায় সাধারণ লক্ষণগুলির ইতরবিশেষ আছে। মুণ্ডা ভাষাগোষ্ঠীর কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ হলো—

(১) স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনির নিরুদ্ধ উচ্চারণ (**Click**) অর্থাৎ নিঃশ্বাস ভেতরের দিকে টেনে উচ্চারণ।

(২) মুণ্ডা ও নিকোবরীতে বচনের তিন ভেদ অর্থাৎ একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন।

(৩) সচেতন ও অচেতন ভেদে লিঙ্গ বিচার।

(৪) মুণ্ডা ও নিকোবরী শব্দ গঠনে উপসর্গ (**Prefix**), প্রত্যয় (**Suffix**) ও অন্তরাগমের (**Infix**) ব্যবহার।

(৫) মুণ্ডা ও নিকোবরী সর্বনামে (বিশেষত উত্তম ও মধ্যম পুরুষে) দ্বিবচন/বহুবচন ভেদে প্রত্যেকটির দ্বিবিধ রূপ অর্থাৎ সম্বোধিতকে নিয়ে বা বাদ দিয়ে অন্তর্গণিত (**Inclusive**) এবং বহির্গণিত (**Exclusive**) সর্বনাম গঠন, যেমন—ইঞ্‌ (=আমি), অলঙ্‌ (=আমি ও তুমি), অলিঞ্‌ (=সে এবং আমি), অবো [ন্‌] (=আমরা এবং তোমরা), অল্যে [ন্‌] (=তোমরা ছাড়া আমরা) ইত্যাদি। লক্ষণীয় এইজাতীয় বৈশিষ্ট্য হিমালয়ী ভোট-বর্মী ভাষাতে এখনও দেখা যায়। যেমন লিম্বু প্রভৃতি সর্বনামশ্লিষ্ট ভাষাতে—অন্‌গা "আমি", আন্‌ছী "আমি এবং তুমি", আন্‌-ছী-গে "আমি ও সে", আনী "আমি ও তোমরা", আনী-গে "আমি ও তারা" ইত্যাদি ('ছী' দ্বিবচনসূচক এবং 'নী' বহুবচনদ্যোতক)।

(৬) ধাতুর 'অভ্যাস' (**Reduplication**) অর্থাৎ দ্বিত্ব প্রয়োগের দ্বারা ক্রিয়ামূল গঠন।

(৭) 'কুড়ি' সংখ্যার গুণিতক দ্বারা ঊর্ধ্ব সংখ্যার গণনা ইত্যাদি।

৫.৩ দ্রাবিড় (Dravidian)

ভারতীয় ভাষা হিসেবে দ্রাবিড় গোষ্ঠী আর্য ভাষার পরের স্থানটি দখল করে আছে। এই গোষ্ঠীর ভাষা কেবল ভারতের দক্ষিণাঞ্চল জুড়েই বিস্তৃত নয়, তা অন্যত্রও ছড়িয়ে আছে। প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে তার প্রসার ছিল সম্ভবত আরও ব্যাপক। বর্তমানে এই গোষ্ঠীর ভাষাগুলির প্রচলন রয়েছে প্রধানত ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে (তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, কেরল ও কর্ণাটক), মহারাষ্ট্রের পূর্ব প্রান্তে, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশার অরণ্য-সঙ্কুল পার্বত্যাঞ্চলে, বিহারের ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণায় এবং বাঙলা-বিহার সীমান্তে গঙ্গাতীরবর্তী রাজমহল পাহাড়-সংলগ্ন এলাকায়। ভারতের বাইরে তার প্রসার সিংহলের উত্তরাংশে ও পাকিস্তানের অন্তর্গত বালুচিস্তানে।

১৯৬১ সনের লোকগণনা থেকে আহৃত তথ্যে জানা যাচ্ছে, দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত প্রধান ভাষাগুলির সংখ্যা ২৬। মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, এমন দ্রাবিড় ভাষা সংখ্যায় ১৫৩টি। মোট দ্রাবিড় ভাষাভাষীর সংখ্যা ১০ কোটি ৭৪ লক্ষ ১০ হাজার ৮২০ (অর্থাৎ ভারতীয় জনসংখ্যায় ২৪%)। এদের মধ্যে প্রধান ভাষাগুলি হলো, সংবিধানে স্বীকৃত তামিল, তেলুগু, মালয়ালম্ ও কানাড়ী বা কন্নড় ভাষা। এই চারিটি ভাষায় কথা বলে এমন লোকের সংখ্যা মোট ১০ কোটি ২৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৪৪৭ অথাৎ দ্রাবিড় ভাষাভাষীর মোট সংখ্যার ৯৫·৫৮ শতাংশ।

দ্রাবিড় ভাষাগুলি সম্পর্কে গ্রীয়ার্সন-এর বর্গ বিভাগ ছিল এই রকম: (ক) আন্ধ্র বর্গ (তেলুগু)। (খ) দ্রাবিড় বর্গ (তামিল, মালয়ালম্, কানাড়ী, কোড়গু/কুর্গী, টুলু, টোডা, কোটা)। (গ) মধ্যবর্তী বর্গ (কুরুখ্/ওরাওঁ, মালতো, কুই, গোণ্ডী, কোলমী)। (ঘ) উত্তর-পশ্চিমা বর্গ (ব্রাহুই, বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত বালুচিস্তান) এবং (ঙ) সংকর-দ্রাবিড় বর্গ (Semi-Dravidian Hybrids), যথা, লধদি, ভারিআ। গ্রীয়ার্সনের মতে, মধ্যবর্তী বর্গের ভাষাগুলির মধ্যে দ্রাবিড় ও আন্ধ্র বর্গের ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু আধুনিক গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে এই বর্গ-বিভাগ যথার্থ নয় ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে এই বিভাগ করা হয় ভৌগোলিক অবস্থান-বিচারের মানদণ্ডে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত ভাষাগুলির আলোচনা এখন সঙ্গত হবে (বন্ধনীভুক্ত সংখ্যা জনসংখ্যার হিসেব), যথা—

১॥ দক্ষিণ দেশীয়: তামিল (ভাষাভাষীর সংখ্যা: ৩,০৫,৬২,৭০৫), তেলুগু (৩,৭৬,৬৮,১৩২), মালয়ালম্ (১,৭০,১৫,৭৮২), কন্নড় (১,৭৪,১৫,৮২৭)। ভাষাগুলি বলা হয় যথাক্রমে মাদ্রাজ বা তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, কেরল এবং কর্ণাটকে। অন্যান্য ভাষাগুলির মধ্যে টুলু (৯,৩৫,১০৮; মহীশূর), কুর্গী/কোড়গু (৭৯,১৭২;

মহীশূর এবং তদন্তর্গত প্রাক্তন কুর্গ রাজ্য), টোডা (৭৬৫ ; নীলগিরির পার্বত্যাঞ্চল) এবং তৎসম্পর্কিত কোটা (৯৫৬ ; তামিলনাড়ু)। লক্ষণীয়, এদের মধ্যে টুলুর লোক সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি, নয় লক্ষেরও কিছু বেশি।

২॥ উত্তরদেশীয় : কুরুখ বা ওরাওঁ (১১,৪১,৮০৪), মাল্‌তো (৮৮,৬৭৬) এবং ব্রাহুই। এদের মধ্যে কুরুখ/ওরাওঁ বলা হয় বিহার ও ওড়িশায়। ওরাওঁ বা তার উপভাষায় কথা বলে এমন লোক পশ্চিমবঙ্গেও যথেষ্ট রয়েছে। এছাড়া কিসান-ওরাওঁ ভাষীও রয়েছে এখানে প্রায় শ'খানেক। মালতো বা মালপাহাড়ীর (৮৮,৬৭৬) প্রচলন বাঙলা ও বিহারের সীমান্তবর্তী রাজমহল পাহাড়সংলগ্ন অঞ্চলে। ব্রাহুই বলা হয় সিন্ধুর উত্তর এবং বালুচিস্তানের পূর্বাঞ্চলে। সাম্প্রতিক জনসমীক্ষায় ব্রাহুই ভাষীর সংখ্যা স্বভাবতই বাদ গেছে। ১৯৬১-র জনগণনায় পাকিস্তানে ব্রাহুইভাষীর সংখ্যা ৩,৬৬,০০০।

৩॥ মধ্যদেশীয় : এই বর্গভুক্ত প্রধান ভাষাগুলি সংখ্যায় ৭টি। সর্বপ্রধান ভাষা-গুলির পরিচয় হলো এই—

(ক) গোণ্ডী : লোকসংখ্যা ১৫ লক্ষ ১ হাজার ৪৩১। গোণ্ডী ভাষা ছড়িয়ে আছে মধ্য ভারতের প্রায় সর্বত্র, তবে প্রধান অধিষ্ঠান হলো বিহার, ওড়িশা, মধ্য-প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র। গোণ্ডী প্রধানত গোণ্ড্ উপজাতির ভাষা হলেও তা সর্বত্র অবিমিশ্র থাকে নি। গ্রীয়ার্সনই লক্ষ্য করেছিলেন, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে গোণ্ডীর সঙ্গে বঘেলী, ছত্তিশগঢ়ী (কোশলীর উপভাষা) এবং ওড়িয়ার সংমিশ্রণ স্থানে স্থানে ঘটে চলেছে।

(খ) কুই : লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ ১০ হাজার ৯০৭ এবং তৎসম্পর্কিত পেঙ্গু, লোকসংখ্যা ১ হাজার ২৫৪। কুই বলা হয় ওড়িশার কোন্ধমাল, গঞ্জাম ইত্যাদি জেলায় এবং পেঙ্গু ওড়িশার কোরাপুট ও কালাহাণ্ডি জেলার সংলগ্ন অঞ্চলে।

(গ) খোন্দ্/কোন্ধ্ : মোট লোকসংখ্যা দেড় লক্ষের ওপর (১,৬৮,০২৭), কথিত হয় অন্ধ্র, আসাম, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে, তবে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ওড়িশায়। গ্রীয়ার্সনের মতে অবশ্য খোন্দ্ ছিল কুই বর্গভুক্ত, কিন্তু বর্তমানে তাকে স্বতন্ত্র ধরা হয়।

(ঘ) কোয় : কোয় ভাষার সর্বাধিক প্রচলন অন্ধ্রপ্রদেশে, লোকসংখ্যা দেড় লক্ষের কিছু নিচে (১,৪০,৭৭৭)। গ্রীয়ার্সনের নামকরণ অনুযায়ী কোই হলো গোণ্ডীর উপভাষা, কিন্তু বর্তমানে তা স্বতন্ত্র ভাষারূপে স্বীকৃত।

(ঙ) পর্জি : পর্জি ভাষার প্রচলন মধ্যপ্রদেশের বস্তার রাজ্যে ও ওড়িশার কোরাপুট জেলায়, লোকসংখ্যা প্রায় লাখ খানেক (১,০৭,৪০১)। পশ্চিম বাঙলায়ও দেড় শোর কাছাকাছি এই ভাষাভাষীয় সন্ধান মেলে।

(চ) কোলমি : কোলমি কথিত হয় অন্ধ্রপ্রদেশের আদিলাবাদ ও ইয়েৎমাল জেলায়। লোকসংখ্যা আধ লাখের মতো (৫১,০৫৫)। কোলমির একটি বিশেষ উপভাষা 'নইকি' সম্পর্কে বর্তমানে গবেষণার কাজ অনেক দূর এগিয়েছে।

(ছ) কোন্দ্ : কোন্দ্ বলা হয় প্রধানত ওড়িশায়, লোকসংখ্যা ১২ হাজার ২৯৮। গ্রীয়ার্সনের মতে, কোন্দ্ হলো 'কুই'-এর উপভাষা, কিন্তু বর্তমান নিরীক্ষায় তা সঠিক নয়।

এক হিসেবে তেলুগুকেও মধ্যদেশীয় ব'লে ধরা যায়, কারণ তা দক্ষিণী হয়েও ভৌগোলিক বিচারে মধ্যদেশীয় ভাষাঞ্চলের সংলগ্ন। মধ্যদেশীয় ভাষাগুলির মধ্যে অন্যান্য কয়েকটি ভাষা, যেমন ওড়িশার কুবি (কোরাপুট), ওল্লারি ও সলুর (কোরাপুট ও সলুর) সম্পর্কে ১৯৬১ সনের আদমশুমার কোনো তথ্য দিতে পারেনি। গ্রীয়ার্সন-উল্লিখিত সংকর-ভাষাদ্বয়—ভারিআ (লোকসংখ্যা ২৪৯, মধ্যপ্রদেশ) এবং লধদি (লোকসংখ্যা ৩০৫, মহারাষ্ট্র) সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু তথ্য আহরণ করা যায়নি ; এদের মধ্যে সম্ভবত আর্যভাষার প্রভাব বেশ খানিকটা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, ফলে এই ভাষা-গুলিকে দ্রাবিড় ভাষার কোন্ বর্গে ফেলা চলে, তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে আধুনিক গবেষণার ফলে সবচেয়ে বেশি আলোকপাত ঘটেছে মধ্যদেশীয় ভাষাগুলির ক্ষেত্রে। সম্প্রতি পর্জি, কোন্দ্, ওল্লারি এবং কুবি ভাষাগুলির পুরো বিবরণ সংগ্রহ করা গেছে ; গোণ্ডী, নইকি (কোলমির উপভাষা) এবং কুই সম্পর্কে আরও নতুন তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তাছাড়া কোলমি ভাষার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট কাজ হয়েছে (দ্রঃ **S. Bhattacharya : New Dravidian Languages, JAS, Vol. IX, No. 2 p. 156, 1967**)।

ভাষাগত প্রকৃতির দিক দিয়ে দ্রাবিড় ভাষা অষ্ট্রিকের মতই মুক্তান্বয়ী (**Agglutinating**), তবে অষ্ট্রিকে যেমন উপসর্গ (**Prefix**), প্রত্যয় (**Suffix**) বা অন্তরাগমের (**Infix**) মুক্তান্বয় দেখা যায়, দ্রাবিড়ে তা নয়। এখানে মুক্তান্বয় হলো প্রধানত প্রত্যয়ের। দ্রাবিড় ভাষাগুলির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো—

(১) দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে সংস্কৃতসুলভ মূর্ধন্য ধ্বনি তো আছেই, এছাড়া আরও অনেক ধরণের মূর্ধন্য ধ্বনির ব্যবহার দেখা যায়।

(২) দ্রাবিড় ভাষায় লিঙ্গ নির্ণীত হয় যে-কোনো জাগতিক বস্তুর কল্পিত জাতি

বিভাগ ক'রে। বিচারবুদ্ধি আছে এমন বস্তু হলো উচ্চ জাতির (High Caste) অন্তর্গত আর বিচারবুদ্ধিহীন বস্তু বা প্রাণী হলো জাতিহীন (Casteless)। উচ্চজাতীয় বিশেষ্যের একবচনে পুংলিঙ্গ/স্ত্রীলিঙ্গ ভেদ আছে, কিন্তু বহুবচনে সে-ভেদ নেই। আর জাতিহীন বিশেষ্য সর্বদাই ক্লীবলিঙ্গ (সচেতন বা অচেতন যাই হোক না কেন !)।

(৩) দ্রাবিড় ভাষায় বচন দুইটি—একবচন ও বহুবচন। উচ্চজাতি ও জাতিহীন শব্দভেদে বহুবচনের প্রত্যয় পৃথক হয়। এই প্রত্যয়গুলি হলো অনুসর্গীয় (Post-positional)। অনেক ক্ষেত্রে কেবল পূর্ণ শব্দই বিশেষ অর্থে প্রত্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেমন, তামিল উর "নগর", ইল "বাড়ী" কিন্তু উর-ইল "নগরে" (এখানে ইল "বাড়ী"/"মধ্যে" অর্থে প্রযুক্ত)। অনুসর্গ যোগে বহুবচন গঠিত হওয়ার পর বচন ও লিঙ্গ নির্বিশেষে শব্দগুলির রূপ করা হয় একবচনের মতই। ক্লীবলিঙ্গ শব্দের বহুবচন দুর্লভ।

(৪) বিশেষণের শব্দরূপ হয় না। বহু ক্ষেত্রেই বিশেষণগুলি কৃদন্ত (Participial)।

(৫) উত্তম পুরুষ সর্বনামের বহুবচনে দ্বিবিধ রূপ অর্থাৎ অন্তর্গণিত (Inclusive) ও বহির্গণিত (Exclusive) সর্বনাম।

(৬) সহায়ক ক্রিয়ার (Auxiliary Verb) সাহায্যে ক্রিয়ার ভাব (Mood), বাচ্য, কার্যরীতি বা কার্যকাল (Aspect) ও কাল (Tense) নির্ণীত হয়। প্রকৃতপক্ষে কর্মবাচ্যের প্রয়োগ নেই। 'ভোগ করা' (to suffer) বা 'হওয়া' (to become) অর্থে—এই সহায়ক ক্রিয়ার অকর্তৃক (Impersonal) বা অকর্মক প্রয়োগ দ্বারা কর্মবাচ্য গঠিত হয় (যেমন, ইংরাজী It is broken=It becomes in the state of broken condition)। ক্রিয়ার সঙ্গে উপসর্গ (Preposition) যুক্ত হয় না।

(৭) নাস্ত্যর্থ ক্রিয়ার (Negative Verb) স্বতন্ত্র ধাতুরূপ।

(৮) ভবিষ্যৎ বর্তমানের দ্বারাই সূচিত হয়।

(৯) আশ্রিত বাক্যাংশ (Sub-ordinate Clause) বা সম্বন্ধ-নির্দেশক সর্বনামের (Relative Pronoun) ব্যবহার নেই।

(১০) বাক্যগঠন ক্রিয়াকেন্দ্রিক (Verbal) নয়, তা মূলত নামমূলক (Nominal) অর্থাৎ ক্রিয়া বাদ দিয়ে বাক্য গঠন, ঠিক যেমনটি বড় সমাসবদ্ধ পদে হয়ে থাকে। যে-কোনো ধাতু তাই বিশেষ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। কালবাচক বিকরণ (Temporal Suffix) অথবা খণ্ড/অখণ্ড সর্বনাম প্রত্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হলেই বিশেষ্য ক্রিয়াপদে পরিণত হয়।

॥ ৬ ॥

পূর্ব ভারতের প্রধান ভাষা

৬.১ বাঙলা

৬.১.১ ভাষিক পরিস্থিতি ঃ

আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলির মধ্যে বাঙলা ভাষা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সংখ্যাগুরুত্বে এবং সাহিত্যিক ঔৎকর্ষে, প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মহিমায় অথবা আন্তর্জাতিক মর্যাদায় বাঙলাভাষা বিশ্বের তাবৎ প্রধান ভাষাগুলির অন্যতম। এই ভাষা ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তপশিলীভুক্ত ভাষারূপে স্বীকৃত। ১৯৬১ সনের জনগণনা অনুসারে ভারতে বাঙলা ভাষাভাষীর সংখ্যা ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯৩৯। ১৯৭১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৪৫ লক্ষ ২১ হাজার ৫৩৩। এই ভাষা পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী (Offical) ভাষা। রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে বাঙলাদেশে আরও প্রায় ৯ কোটি লোক এই ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। সংখ্যা-গুরুত্বের দিক দিয়ে ভারতে বাঙলা ভাষার স্থান হিন্দী ও তেলুগুর পরে হলেও অখণ্ড ভারতের হিসেব ধরলে মোট ভাষাভাষীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১৪ কোটি।

ঐতিহাসিক বিচারে বাঙলা পূর্বাঞ্চলীয় মাগধী প্রাকৃতের সঙ্গে সম্পর্কিত—যা এককালে পশ্চিমে বারানসী থেকে পূর্বে গৌহাটী এবং উত্তরে নেপাল থেকে দক্ষিণে ওড়িশা পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। কেবল আঞ্চলিক বিস্তারে নয়, প্রাচীনত্বের দিক দিয়েও মাগধী ঐতিহ্য অশোকানুশাসনের সমসাময়িক। প্রাচ্যের এই উপভাষার বিশুদ্ধ ও প্রাচীনতম নমুনা জোগীমারা গুহার (ছোটনাগপুর) প্রত্নলিপি (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক)। এই মাগধী প্রাকৃতের পরবর্তী স্তর (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ-১০ম শতক) হিসেবে কল্পিত হয় মাগধী অপভ্রংশ। এই যুগের অব্যবহিত পরেই আবির্ভূত হয়েছে বাঙলা তথা অন্যান্য পূর্ব ভারতীয় আর্যভাষা। এই হিসেবে বাঙলা, বিহারী ও ওড়িয়া ভাষার সহোদর-স্থানীয়। অসমীয়া অবশ্য উদ্ভূত হয়েছে আরও পরে, আনুমানিক ১৩/১৪শ শতকে, বাঙলাভাষার কামরূপী উপভাষা থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে।

অখণ্ড বাঙলার প্রধান উপভাষাগুলিকে* ভৌগোলিক মানদণ্ডে দুই ভাগে ভাগ

* বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. মজুমদার ঃ বাঙলা ভাষা পরিক্রমা (১ম), ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

করা যায়, যথা—(ক) পাশ্চাত্ত্য বা গৌড়ী এবং (খ) প্রাচ্য বা বঙ্গীয়। পাশ্চাত্ত্য বা গৌড়ীবর্গের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলভিত্তিক উপভাষাগুলি হলো—(১) রাঢ়ী (পশ্চিমা), (২) ঝাড়খণ্ডী (দক্ষিণ-পশ্চিমা প্রান্তিক), (৩) বরেন্দ্রী (উত্তর-মধ্যা, উদীচ্য), (৪) পশ্চিম কামরূপী (উদীচ্য) এবং (৫) মধ্যপূর্বী (বাঙলাদেশ অন্তর্ভুক্ত যশোর-খুলনা প্রভৃতির উপভাষা)। প্রাচ্য বা বঙ্গীয় বর্গের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলভিত্তিক উপভাষাগুলি হলো—(১) পূর্বদেশীয়, (২) দক্ষিণ-পূর্বী এবং (৩) পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমা। প্রাচ্যভুক্ত সব উপভাষাগুলিই বাঙলাদেশে প্রচলিত।

অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মতই বাঙলা হরফের উৎপত্তি ব্রাহ্মীলিপি থেকে। সপ্তম শতকে ব্রাহ্মীলিপি তিনটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করে: শারদা, নাগর এবং কুটিল লিপি। মূল ব্রাহ্মীলিপির এই 'কুটিল" রূপভেদ থেকেই বাঙলা বর্ণমালার উদ্ভব। বাঙলা ভাষা জন্মলগ্ন থেকেই তার নিজস্ব লিপিতে লিখিত হয়ে এসেছে।

৬.১.২ প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস :

বাঙলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ধারায় তিনটি যুগ পরিকল্পিত হয়, যথা—(১) প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য (খ্রীঃ ৯০০-১২০০); (২) মধ্য বাঙলা সাহিত্য (১২৫০-১৭৬০): ঐতিহাসিক বিচারে এই যুগকে তিনটি উপস্তরে ভাগ করা যায়, যথা—(ক) যুগসন্ধিকাল (খ্রীঃ ১২০০-১৩৫০), (খ) প্রাক্-চৈতন্য পর্ব (১৩৫০-১৫০০) এবং (গ) চৈতন্য-পর্ব (১৫০০-১৭৬০) এবং (৩) আধুনিক বাঙলা (১৭৬০—)। প্রাচীন বাঙলার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হলো চর্যাগীতি-সংকলন। যুগসন্ধি পর্বে বাঙলাভাষার কোনো নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নি। প্রাক্-চৈতন্য পর্বে উল্লেখযোগ্য হলো বড়ু চণ্ডীদাস, মালাধর বসু, কৃত্তিবাস, বিজয় গুপ্ত বা বিপ্রদাস প্রমুখ লেখকদের রচনা অথবা রচনাস্মৃতি। চৈতন্য-পর্বের লেখকরা সংখ্যায় অগুনতি, রচনাপ্রাচুর্যও লক্ষ্য করার মতো। ভাষাতাত্ত্বিক মানদণ্ডে অবশ্য প্রাপ্ত পুঁথির প্রাচীনত্বই বিচার্য। এই হিসেবে বাঙলা ভাষার যুগবিভাগ দাঁড়ায় এই রকম—(১) প্রাচীন বাঙলা—যার প্রধান নিদর্শন চর্যাগীতি (খ্রীঃ ১০০০-১২০০), (২) মধ্য বাঙলা—(ক) আদি মধ্য বাঙলা (১৩৫০-১৫০০) [বড়ু চণ্ডীদাস : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন] এবং (খ) অন্ত্য মধ্য বাঙলা (১৫০০-১৭৫০) এবং (৩) আধুনিক বাঙলা (১৭৫০—)। লক্ষণীয় বাঙলা সাহিত্য ইতিহাসের বিচারে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু এই ঐতিহাসিক ঘটনা বাঙলা ভাষার বিবর্তনেও একটি বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছিল—এমন কথা মনে করবার যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ আছে।

প্রাচীন বাঙলা—

বাঙলা সাহিত্যের প্রথম উন্মেষ চর্যাগীতিকায়।* চর্যাগীতিকা গানের আকারে লিখিত কতকগুলি পদের সমষ্টি। বাঙলা ভাষায় প্রাচীনতম রূপ এই বৌদ্ধ সহজিয়া-পন্থী ধর্মীয় গানগুলিতে সংরক্ষিত আছে। এই গানগুলি সর্বপ্রম আবিষ্কার করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৯০৭) নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত একখানি নামহীন তারিখহীন পুঁথি থেকে। তাঁরই সম্পাদনায় গানগুলি প্রকাশিত হয় (১৯১৬) "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা" এই নামে। এই গ্রন্থে সংকলিত চারখানি পুঁথির মধ্যে তিন খানির ভাষা অর্বাচীন অপভ্রংশ বা অবহট্ঠ (সরোজবজ্রের দোহাকোষ, কাহ্নপাদের দোহাকোষ ও ডাকার্ণব), আর 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামে চিহ্নিত (সম্পাদকের দেওয়া নাম) পুস্তকখানির ভাষাই প্রকৃত বাঙলা। এটির ভাষা যে বাঙলা তা প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯২৬)—যদিও ওড়িয়া, বিহারী, অসমীয়া, এমনকি হিন্দী ভাষীরাও তাঁদের দাবী ছাড়েন নি।

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' আসলে চর্যাগানের টীকার পুঁথি। টীকা সংস্কৃতে লেখা, টীকাকারও স্বাভাবিকভাবে পরবর্তী যুগের লোক। টীকার সঙ্গে অবশ্য মূল গানও উদ্ধৃত। পুঁথিখানি খণ্ডিত এবং শেষের দু/একটি পাতা নেই। এই গানগুলি এবং সংস্কৃত টীকা তিব্বতী ভাষায়ও অনূদিত হয়েছিল। টীকাকারের নাম যে মুনিদত্ত, তা জানা যায় এই তিব্বতী অনুবাদের সহায়তায়। এছাড়া খণ্ডিত পুঁথির লুপ্ত গানগুলির বিষয়বস্তুও এই টীকা থেকে জানা যায়। তিব্বতী অনুবাদ সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৯৫৬)।

এই খণ্ডিত পুঁথির প্রাপ্ত অংশে ৪৬টি সম্পূর্ণ গান এবং একটি গানের ভগ্নাংশ পাওয়া যায়। এই ৪৬টি গান ২৪ জন কবির রচনা। কবিরা যেমন সকলেই সমসাময়িক ছিলেন না, তেমনি ছিলেন না একই অঞ্চলের লোক। সংকলিত গানগুলির ভণিতায় কবির নাম উল্লিখিত আছে, গোড়ায় রাগরাগিণীরও উল্লেখ আছে। এই গানগুলি 'সন্ধা' ভাষায় রচিত। সন্ধা ভাষার অর্থ গুহ্য ভাষা। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকরা সাধারণত সংস্কৃত, অবহট্ঠ ও প্রাচীন বাঙলায় এই গুহ্য সাধন পদ্ধতি ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক রচনা লিখতেন। গানগুলির মধ্যে নিগূঢ় তত্ত্বকথা কখনো সরল, কখনও বা প্রহেলিকারূপে উপস্থাপিত হয়েছে। রূপক প্রতিভাসের মধ্য দিয়ে তদানীন্তন

* বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. মজুমদার : বাঙলা ভাষা পরিক্রমা (১ম), ২য় অধ্যায়।

বাঙালী জীবনের একটি সুন্দর ও নিখুঁত ছবিও গানগুলিতে ফুটে উঠেছে। গানগুলির রচনাকাল অনিশ্চিত। সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এগুলির রচনাকাল আনুমানিক ১০ম-১২শ (খ্রীঃ ৯৫০-১২০০) শতক।

আদি মধ্য বাঙলা—

আদি মধ্য বাঙলার একমাত্র নির্ভরযোগ্য রচনা হলো শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।* প্রাক্‌চৈতন্য-যুগের রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক কাব্যের এটি একখানি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। গ্রন্থখানির একমাত্র পুঁথি আবিষ্কার করেন শ্রীবসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে (১৯০৯)। গ্রন্থটির আদি ও অন্ত্য অংশ খণ্ডিত, ভিতরের কতকগুলি পাতাও পাওয়া যায় নি। আবিষ্কর্তা স্বয়ং গ্রন্থখানি সম্পাদনা ক'রে প্রকাশ করেন ১৯১৬ সালে (প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)। গ্রন্থের নাম তাঁরই প্রদত্ত, কারণ পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থের কোনো নাম ছিল না। খণ্ডিতপদসহ পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত পদের সংখ্যা ৪১৭। ভণিতা থেকে জানা যায় কবির নাম বড়ু চণ্ডীদাস। কবি বাসলীদেবীর সেবক ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আসলে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক একখানি কাব্য। তবে একে জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত গীতি-নাট্য শ্রেণীর অন্তর্গত করাই সঙ্গত। লেখার মধ্যে জয়দেবের প্রভাবও যথেষ্ট। এর অধিকাংশ পদ কৃষ্ণ, রাধা অথবা দূতী বড়াই-এর সংলাপ আকারে রচিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদমাত্রই এক-একটি গীত। প্রত্যেক পদের আরম্ভেই সুর-তাল প্রভৃতির নির্দেশ আছে। পূর্বাপর সম্বন্ধ রক্ষার জন্য পদগুলির যোজনায় মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত আছে। এগুলি সম্ভবত কবির নিজেরই রচনা।

পুঁথির প্রাপ্ত অংশ ৯টি খণ্ডে বিভক্ত : জন্ম, তাম্বূল, দান, নৌকা, ভার, বৃন্দাবন, যমুনা, বাণ ও বংশী খণ্ড। এই নয়টি খণ্ড ছাড়া 'রাধাবিরহ' অংশও আছে—যা 'খণ্ড' রূপে চিহ্নিত নয়। এছাড়া 'ছত্রখণ্ড' নামে একটি ক্ষুদ্র খণ্ডও আছে। এটি ভারখণ্ডের অন্তর্গত। যমুনা খণ্ডটিও বস্তুত তিনটি খণ্ডাংশের সমষ্টি। প্রথম ও তৃতীয় অংশের নাম 'কালিয়দমন' ও 'হারখণ্ড'। মধ্যাংশের নাম পাওয়া যায়নি, কিন্তু এর বর্ণনীয় বিষয় রাধার বস্ত্রহরণ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল কাহিনীর জন্য কবি ভাগবত ও গীতগোবিন্দের ওপর অধিক

* বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. মজুমদার : বাঙলা ভাষা পরিক্রমা (১ম), ৩য় অধ্যায়।

নির্ভর করেছেন। সমসাময়িক লৌকিক কথা-কাহিনীর প্রভাবও রয়েছে যথেষ্ট। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে খ্রীষ্টীয় ১৪০০-১৫০০ শতকের ভাষার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে এই রচনায়।

প্রাক্‌চৈতন্য যুগের স্বীকৃত কবি হিসেবে আরও কয়েকজন কবির নাম করা যেতে পারে: মালাধর বসু [শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ১৪৭৩-১৪৮০], কৃত্তিবাস [শ্রীরাম পাঁচালী, ১৫শ শতক], বিজয় গুপ্ত [পদ্মাপুরাণ, আঃ ১৪৯৪] এবং বিপ্রদাস পিপলাই [মনসাবিজয়, ১৪৯৫/১৪৯৬]। লোক প্রচলিতি ও সাহিত্যিক ঐতিহ্যের সুবাদে এই গ্রন্থগুলি প্রাক্‌চৈতন্য যুগের রচনা ব'লে স্বীকৃত হলেও ভাষার দিক দিয়ে কিন্তু এগুলি অর্বাচীন এবং অন্ত্য মধ্য বাঙলা লক্ষণাক্রান্ত। অনুমান করা চলে, লোকপ্রিয়তার ফলে মূল ভাষার বহুল পরিমাণে পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘটেছে।

মালাধর বসু 'গুণরাজ খানে'র 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কৃষ্ণলীলা বিষয়ক প্রথম বাঙলা কাব্য। এই গ্রন্থের অপর নাম 'গোবিন্দবিজয়' বা 'গোবিন্দমঙ্গল'। নাম থেকেই বোঝা যায়, এটি একখানি 'মঙ্গল' বা 'বিজয়' জাতীয় পাঁচালী বা আখ্যান কাব্য। গ্রন্থখানি ভাগবতাশ্রয়ী (১০ম-১১শ স্কন্ধ) পৌরাণিক কাহিনী ব'লে এটিকে অনুবাদশাখার প্রাচীনতম নিদর্শনরূপে চিহ্নিত করা যায়। কবির কাব্যপ্রেরণায় উৎসাহ যুগিয়েছিলেন তদানীন্তন গৌড়েশ্বর রুকনুউদ্দীন বারবক শাহ্ (খ্রী. ১৪৫৯-১৪৭৬)। "গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজখান।" মালাধরের যশঃকীর্তি শ্রীচৈতন্যকেও উদ্দীপিত করেছিল, আর তা জানা যায় শ্রীচৈতন্যর নিজের স্বীকৃতি থেকে।

কৃত্তিবাস ওঝার শ্রীরাম পাঁচালী বা রামায়ণ বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক প্রধান সম্পদ। অবশ্য কৃত্তিবাসী রামায়ণরূপে যা আজও বাঙলীর ঘরে ঘরে পঠিত বা আলোচিত হয়ে থাকে, তার অনেকখানিই বহু রামায়ণ রচয়িতার প্রক্ষিপ্ত অংশে আর নির্ভেজাল নেই, তবু রূপে ও রসে তা বাঙলীর নিজস্ব মহাকাব্য। পয়ার ছন্দের নিবিড় বাঁধনে, ভাবাপ্লুত ভক্তিরস সিঞ্চনে অথবা বাঙালী জীবনের ঘরোয়া চিত্রায়ণে তা গড়ে তুলেছে এক মহান্ আদর্শ—যা বাঙালীর একান্ত নিজস্ব পারিবারিক মহাকাব্য-রূপে কালোত্তীর্ণ। কৃত্তিবাসের আবির্ভাব-কাল নিয়ে এখনও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় নি। কৃত্তিবাসের সংবর্ধনাকারী গৌড়েশ্বর হয়তো রাজা গণেশ, তাহিরপুরের হিন্দুরাজা কংসনারায়ণ অথবা রুকনুউদ্দীন বারবক শাহ।

বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপলাই-এর মনসামঙ্গল দুটি যথাক্রমে পূর্ববাঙলা ও পশ্চিমবঙ্গের বহুল স্বীকৃত গ্রন্থ। উভয় গ্রন্থেই সুলতান হুসেন শাহ্-র (খ্রী. ১৪৯৩-১৫১৯) উল্লেখ আছে, কবির আত্মপরিচয়ও আছে। সব বিচার ক'রে সিদ্ধান্তে আসা চলে,

উভয় কবিই চৈতন্য-পূর্ব যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু পুঁথির ভাষা সে-সাক্ষ্য দেয় না।

অন্ত্য মধ্য বাঙলা—

চৈতন্য-পর্বের বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কিন্তু তার পূর্বে বাঙলা মধ্যযুগীয় সাহিত্যের আন্তঃপ্রেরণা ও অবদান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া দরকার। সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে জয়দেবই বোধ হয় শেষ বাঙালী কবি যিনি সর্বভারতীয় মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তুলসীদাস, কবীর, দাদূ, মীরাবাঈ, সুরদাস প্রমুখ কবিদের আবির্ভাব বাঙলায় ঘটেনি। কিন্তু তবু বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে তার সাহিত্যিক বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি অন্যান্য ভারতীয় ভাষার চেয়ে অনেক বেশি। এর কারণ অবশ্যই বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যমণি শ্রীচৈতন্যদেবের (ইং ১৪৮৬-১৫৩৩) আবির্ভাব।

দ্বিতীয়ত, অপভ্রংশ/অবহট্‌ঠ-অনুশীলিত প্রাচীন ঐতিহ্যধারা থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসন বাঙালীর স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। এর ফলে অবশ্য বাঙলা সাহিত্যে বীরগাথামূলক সাহিত্যের একান্ত অভাব ঘটতে দেখা গেছে। বস্তুত, পশ্চিমা হিন্দী অথবা প্রাচীন রাজস্থানী-গুজরাটী অনুশীলিত 'রাসৌ'-জাতীয় কাব্যনির্মিতি বাঙলায় সম্ভব হয়নি। কালকেতু (চণ্ডীমঙ্গল) অথবা লাউসেনের (ধর্মমঙ্গল) বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীকে হয়তো এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিন্তু এগুলি দেশপ্রেম উদ্‌বুদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এমনকি বিদ্রোহী বারো ভূইঞাদের যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনীর সুযোগও বাঙলা সাহিত্যে গ্রহণ করা হয়নি। পশ্চিমা হিন্দীভুক্ত 'রাসৌ' কাব্যগুলি ছাড়াও আল্‌হা-উদালের কাহিনী অথবা ভূষণ (১৬১৩-১৭১২) প্রমুখ কবিদের কাব্যে যে শৌর্যবীর্য ও দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়, বাঙলা সাহিত্যে তার প্রকৃতই একান্ত অভাব।

তৃতীয়ত, বিদেশী হলেও আরব-পারস্যের কাহিনী (Matter of Arab and Persia) ও বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গী অথবা রচনাশৈলী ভারতীয় সাহিত্যে কখনই অপাংক্তেয় ছিল না। তাই ১৫শ শতকের পূর্বেই ঐশ্লামিক ধ্যানধারণা ভারতীয় সংস্কৃতিজগতে অঙ্গীভূত হতে পেরেছিল। বাঙলা সাহিত্যে কিন্তু এই ঐশ্লামিক বিষয়বস্তুর আবির্ভাব ঘটেছে অনেক পরে—১৭শ শতকের শেষার্ধে। তাই ঐশ্লামিক বিষয়বস্তুর বিলম্বিত আবির্ভাবের ফলে একদিকে যেমন হিন্দু-মুসলমানের সমবেত প্রচেষ্টায় কোন যৌথ

সৃষ্টি গড়ে ওঠে নি, অপরদিকে তেমন ধর্মনিরপেক্ষ রোমান্টিক প্রণয়গাথা-জাতীয় রচনাও রয়ে গেছে অনাদৃত।

চতুর্থত, ধর্মনিরপেক্ষ লোকসাহিত্য (Folk Literature) রচনার অপ্রতুলতা। পাঞ্জাবী, গুজরাটী বা বিহারী ইত্যাদি ভাষায় লোকগাথামূলক রচনার যে প্রাচুর্য দেখা যায়, বাঙলায় তা দেখা যায় নি (বাঙলার নিজস্ব লোকনৃত্যের অভাবও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য)। সে-রচনাগুলি হয়তো জনগণের মৌখিক সাহিত্য হিসেবে প্রচলিত ছিল, কিন্তু সেগুলি সংকলনের কোনো গরজ দেখা যায় নি।

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত প্রবণতার সম্ভাব্য কারণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে সূচিত ব'লে মনে করা যেতে পারে। চৈতন্যদেবের উচ্চ জীবনাদর্শ, উজ্জীবিত মানবতাবোধ এবং তাঁর ভক্তিবিগলিত হৃদয়ের প্রেম ও কারুণ্যধারা বাঙালীর জীবনে এনেছিল এক নব উন্মাদনা—যা বাঙালীর সাহিত্যপ্রেরণাকে অহিংসা ও ভক্তিরসে সিঞ্চিত করেছিল, আর তাই মানবিক জীবনের শৌর্য-বীর্য, মানবীয় চটুল প্রেম অথবা অ-হিন্দু সংস্কৃতিকে করতে চাইছিল নীরবে বর্জন। বস্তুত, এই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়েই ভক্ত বাঙালী কবি যেমন সাহিত্যে পৌরাণিক বিষয়বস্তুর (Matter of Sanskrit World) সংযোজন ঘটাতে চাইছিলেন, তেমন লৌকিক বিষয়বস্তুর (Matter of Bengali) পরিমার্জন ও বিশুদ্ধীকরণ চাইছিলেন মনে ও প্রাণে, পরিকল্পনা ও উপস্থাপনায়। চৈতন্যপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও উদ্দীপিত বাঙালীর জীবনাদর্শ তাই সর্বভারতীয় আদর্শ থেকে নিজেকে অবগুণ্ঠিত ক'রে গড়ে তুলেছিল এক চেতনাবোধ—যা কেবল সৃষ্টির প্রেরণায় ব্যাপক নয়, আবেদনেও গভীর।

বাঙালী সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের অবদান কী এবং চৈতন্যপ্রভাবিত উত্তর যুগের বাঙলা সাহিত্যে কীভাবে এক নতুন ভাবাদর্শ গড়ে উঠেছিল, তা আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি।* বর্তমান প্রসঙ্গে কেবল এই মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের ব্যাপ্তির পরিমাপ-সমীক্ষাই হবে প্রধান আলোচ্য।

বাঙলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব তাঁর মহান্ ব্যক্তিত্ব, দেবদুর্লভ চরিত্র ও বিচিত্র জীবনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। 'শিক্ষাষ্টক' ছাড়া অন্য কোনো সাহিত্যকর্ম চৈতন্যদেব রেখে গেছেন, এমন কোনো প্রমাণ নেই। বাঙলা সাহিত্যের ভাব-বিবর্তনে সাক্ষাৎ প্রভাব রেখে গেছেন আরও দুই কৃতী পুরুষ: জয়দেব ও বিদ্যাপতি। কিন্তু

* দ্র. মজুমদার: বাঙলা ভাষা পরিক্রমা (১ম), ৪র্থ অধ্যায়।

অলোকসামান্য ব্যক্তিজীবন নয়, তাঁদের রচনার রসোত্তীর্ণ সাফল্যই বাঙলা সাহিত্যকে উদ্বোধিত ও পরিপুষ্ট করেছে, ভাষিক বা প্রাদেশিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও দীর্ঘ দিন।

প্রকৃতপক্ষে বাঙলা সাহিত্যের সূত্রপাত করেছেন জয়দেব (১২শ শতক)। অবশ্য শুধু বাঙলার নয়, আধুনিক ভারতীয় আর্যের প্রায় সব ভাষাতেই বৈষ্ণব পদাবলীর সূত্রপাত জয়দেবের গীতগোবিন্দ-এর পদ বা গীতিগুলি দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে গীতগোবিন্দ পদাবলীর ভাষা সংস্কৃত এবং ছন্দ প্রাকৃত (অবহট্‌ঠ) হলেও ভাববস্তু খাঁটি বাঙলা। তাই গীতগোবিন্দ-পদাবলীর গীতিমুখর রসোচ্ছ্বাস বৈষ্ণব পদাবলীর আকৃতিতে প্রাণবন্ত হয়ে আধুনিক বাঙলা গীতি-কবিতার বিশ্বজনীন মোহানায় উত্তরিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, 'পদাবলী' নামকরণ, পদাবলীর রূপবন্ধ বা অবয়ব অথবা ধ্রুবপদ ও ভণিতার আরোপ বা সুর ও রাগ-রাগিণীর উল্লেখ ইত্যাদি ক্ষেত্রে জয়দেবই পথিকৃৎ। এছাড়া ব্রজবুলি এবং (মৈথিল) রচনার ওপরও জয়দেবের প্রভাব অপরিসীম। ব্রজবুলির ছন্দে যে মাত্রাবৃত্ত ধর্ম তা জয়দেব থেকেই গৃহীত। পরবর্তী যুগে অবশ্য একজাতীয় রচনায় জয়দেব ও পদ্মাবতীর বিচিত্র কাহিনী প্রত্যক্ষভাবে উপজীব্য হয়ে উঠেছে (যেমন বনমালী দাসের 'জয়দেব চরিত্র' : ১৮শ শতক)।

অপর জন বিদ্যাপতি (খ্রী. ১৩৮০-১৪৬০) মিথিলার কবি হলেও বাঙলা সাহিত্যে তাঁর প্রভাব প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। একথা সত্য, চৈতন্যদেব কর্তৃক আস্বাদিত ও স্বীকৃত হওয়ার ফলে বিদ্যাপতির পদাবলী এক বিশেষ রসঘন মর্যাদা লাভ করেছিল; আর সেই মর্যাদাকে ভিত্তি করেই বাঙলা সাহিত্যে তাঁর শাশ্বতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে বাঙলা পদাবলীর একটি চিরস্থায়ী মানদণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছিল। বস্তুত, কেবল রচনার রূপ-অবয়ব নয়, বিদ্যাপতি ভণিতায় নিজ নিজ রচনাকে কালোত্তীর্ণ করার সচেতন প্রয়াস বাঙালী পদকর্তার ছিল চির-আকাঙ্ক্ষিত। এমনকি সার্থক পদকর্তাও তুলিত হতেন বিদ্যাপতির নামে (যেমন গোবিন্দদাস ছিলেন দ্বিতীয় বিদ্যাপতি)।

বাঙালীর ব্রজবুলি সাহিত্যও বিদ্যাপতি-সূত্রে অর্জিত। তাই অবহট্‌ঠ-সূত্রে ব্রজবুলি উদ্ভূত হলেও তার শব্দ, পদ, অন্বয়, বাগ্‌বিধি অথবা ছন্দ বিদ্যাপতি তথা মৈথিলী ভাষা ও সাহিত্যের রাজপথ ধ'রে বাঙলা সাহিত্যে পৌছতে সমর্থ হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বাঙলা সাহিত্যে রাজসভার প্রভাবও স্মরণে রাখা দরকার। পূর্বেই বলেছি, মালাধর বসু গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দীন্ বারবক শাহ-এর (ইং ১৪৫৯-১৪৭৬) আনুকূল্য পেয়েছিলেন। হুসেনশাহী রাজাদের আমলে এই পৃষ্ঠপোষকতা বাঙলা সাহিত্যে এনে দিয়েছিল এক অভিজাত মর্যাদাবোধ। আফগানী সুলতান (১৫৫৩-১৫৭৫) বা মুঘল বাদশাহদের কালেও (১৫৭৫-১৭৫৭) এর গতি ছিল অব্যাহত।

মধ্যযুগের বাঙলায় গৌড় সুলতান হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) এবং তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহ (১৫১৯-১৫৩২) ছিলেন দুই উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। বাঙালী লেখকরা এঁদের প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। পাঠান রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গৌড় দরবারের নির্বাপিত দীপশিখা বহুগুণিত ভাস্বরতায় জ্বলে উঠেছিল বাঙলা সীমান্তের স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন সামন্ত রাজসভাগুলিতে, যেমন—কামতা-কামরূপে, শ্রীহট্ট-ত্রিপুরায়, দরঙ্গ-কাছাড়ে, চাটিগাঁ-রোসাঙ্গে (আরাকানের রাজধানী) অথবা মল্লভূম-ধলভূমে। বাঙলা সাহিত্যের অপর প্রাচীন কেন্দ্র ছিল নেপাল। ১৭শ শতক পর্যন্ত নেপাল গোর্খাদের অধীনস্থ হয়নি। তা ছিল মঙ্গোল গোষ্ঠীভুক্ত নেওয়ারীদেরই স্বদেশভূমি। এই নেওয়ারী রাজা ও রাজগুরুদের পৃষ্ঠপোষকতায় নেপালে দৃঢ়মূল হয়েছিল বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা। যাই হোক, বাঙলাসাহিত্যে রাজসভার প্রকৃত অবদান কী, তা বিচার করবেন সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তা। বর্তমানে কেবল বাঙলা সাহিত্যের অপরিহার্য বিষয়বস্তুর দিক নির্দেশই হবে প্রাসঙ্গিক।

মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের বিষয়-বিন্যাস এইভাবে করা যেতে পারে—[১] আখ্যানসাহিত্য—যার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যগুলি। [২] জীবনী-সাহিত্য—প্রধানত শ্রীচৈতন্য ও অদ্বৈত মহাপ্রভুর জীবনীকাব্য ও উত্তরযুগে অন্যান্য ভক্তের জীবন-আখ্যান। [৩] পদাবলী সাহিত্য তথা ব্রজবুলি-আশ্রিত রচনা। [৪] অনুবাদ সাহিত্য ঃ রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক অথবা ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য বৈষ্ণবশাস্ত্র। [৫] নাথসাহিত্য। [৬] ইসলামী সাহিত্য এবং [৭] লোকযান (Folklore)—আশ্রিত সাহিত্য। উপরোক্ত শাখাগুলির মধ্যে পদাবলী সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য এবং বৈষ্ণবশাস্ত্র-নির্ভর অনুবাদ সাহিত্য-জাতীয় রচনা শ্রীচৈতন্যদেব ভাবধারায় সাক্ষাৎ প্রভাবিত। অপরদিকে আখ্যান সাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্য পরোক্ষভাবে চৈতন্য-প্রভাবিত। অপর শাখাগুলির মধ্যে চৈতন্যপ্রভাব তেমন ফলপ্রসূ হয় নি।

১. আখ্যান সাহিত্য ঃ

আখ্যান সাহিত্যের অন্তর্গত প্রধান উপশাখা তিনটি ঃ মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল। কালিকামঙ্গল জাতীয় রচনাগুলিও আখ্যান সাহিত্যের অন্তর্গত—যদিও এগুলি যথার্থ মঙ্গল সাহিত্য কিনা তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

মনসামঙ্গলের প্রধান বিষয়বস্তু বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী, যা সাধারণ্যে 'বেহুলার ভাসান' নামে পরিচিত। কাহিনীর প্রাণবস্তু লৌকিক এবং বাঙলার নিজস্ব। এর

বিষয়বস্তু যে যথেষ্ট প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। চৈতন্যপূর্ব যুগের বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস কবির কথা পূর্বেই বলেছি। চৈতন্যোত্তর যুগের প্রধান কবিরা হলেন—মৈমনসিংহের (পূর্ববঙ্গ) দুই কবি বংশীবদন বা বংশীদাস চক্রবর্তী (১৬ শতক) এবং নারায়ণদেব (১৬শ শতক)। নারায়ণ দেবের গ্রন্থ পশ্চিমবঙ্গেও যথেষ্ট প্রচলিত। ১৭শ শতকের একজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন দক্ষিণ রাঢ় নিবাসী 'কেতকাদাস' ক্ষেমানন্দ। ১৮শ শতকের মনসামঙ্গলের সাহিত্যিক মূল্য অবনমিত হয়েছে, লৌকিক আধারের ওপর পৌরাণিক বিষয়বস্তুর ভার অযথা চেপে বসেছে। তবু এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীহট্টের কবি ষষ্ঠীবর (দত্ত) এবং উত্তরবঙ্গের (দিনাজপুর) কবি জগজ্জীবন ঘোষাল।

চণ্ডীমঙ্গলের বিষয়বস্তু দুটি : কালকেতু-ফুল্লরার উপাখ্যান এবং শ্রীমন্তের উপাখ্যান বা ধনপতি সদাগরের কাহিনী। চৈতন্যপূর্ব যুগের রচনা না পাওয়া গেলেও লৌকিক দেবী মনসার মত চণ্ডীরও যে সামাজিক আধিপত্য ছিল, তা দেখা যায় বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের একাধিক উক্তি থেকে ('দেখ এই চণ্ডী বিষহরিরে পূজিয়া ॥ কে না ঘরে খায় পরে যত নাগরিয়া')। ১৬শ শতকের মাণিকদত্ত সম্ভবত চণ্ডীমঙ্গলের প্রাচীনতম কবি, কারণ তাঁর সম্বন্ধে মুকুন্দরাম বলেছেন : "যাহা হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয়।" চণ্ডীমঙ্গল ধারার শ্রেষ্ঠ কবি ও কথাশিল্পী মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 'কবিকংকণ' (১৫৭৪-১৬০৪)। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি মানবমহিমা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে, সূক্ষ্ম বাস্তববোধ ও স্বাভাবিকতায় মঙ্গলসাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তবে চণ্ডীমঙ্গলের প্রাচীনতর পুঁথি হলো দ্বিজমাধবের 'সারদাচরিত' বা 'সারদামঙ্গল' (রচনাকাল ১৫৭৯-৮০)। সম্ভবত ইনি মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী কবি। চণ্ডীমঙ্গলের পরবর্তী কবিরা কেউই কবিকঙ্কণের প্রভাব অথবা তাঁর কাব্যশক্তিকে অতিক্রম করতে পারেন নি। ১৭ শতকের প্রধান কয়েকজন কবি হলেন জয়নারায়ণ সেন, মুক্তারাম সেন ইত্যাদি। ১৮ শতকে তেমন প্রসিদ্ধ কবি আবির্ভূত হন নি ব'লে মনে হয়।

ধর্মমঙ্গল সাহিত্য দুটি ভাগে বিভক্ত : ধর্মপুরাণ এবং ধর্মমঙ্গল। ধর্মমঙ্গল অংশ প্রধানত ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য অবলম্বনে লাউসেন-রঞ্জাবতীর আখ্যান। ধর্মপুরাণ অংশে বিধৃত হয়েছে—(ক) শূন্যশাস্ত্র বা সৃষ্টিতত্ত্ব (=শূন্য পুরাণ), (খ) ধর্মপূজা প্রবর্তন অংশে 'সদাখণ্ড' বা সদাডোমের কাহিনী এবং সাংজাত খণ্ড (<সাংযাত্রিক) অর্থাৎ রামাই পণ্ডিতের কাহিনী এবং (গ) ধর্মপূজা বিধান—যাতে বর্ণিত হয়েছে ধর্মঠাকুরের নিত্য পূজার বিষয় ও 'ঘরভাঙা' গাজনের কথা। এর সঙ্গে অবশ্য মিশে গেছে রামায়ণ বা নাথ সিদ্ধাদের প্রচলিত কাহিনী।

মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে ধর্মমঙ্গল জাতীয় রচনার সাহিত্যিক মূল্য যৎসামান্য। প্রধান রচয়িতারা মুখ্যত ১৮শ শতকের কবি। ধর্মপূজা ও কাহিনীর প্রচলন প্রধানত উত্তরবঙ্গে। ধর্মঠাকুর হলেন নিম্নবর্ণের দেবতা, বিশেষ ক'রে ডোমদের আরাধ্য। ধর্মপূজা ও ধর্মমঙ্গল কাহিনীতে বাঙালীর রহস্যাবৃত অতীত জীবন-ইতিহাসের বিচিত্র উপাদান সংহত হয়েছে। এতে চৈতন্য প্রভাবও যথেষ্ট পড়েনি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, বৌদ্ধধর্মের শেষ স্মৃতি বহন করছে এই ধর্মঠাকুর, ধর্মপূজা ও অব্রাহ্মণ পূজারীরা। মতান্তরে ধর্মঠাকুর শিব, বিষ্ণু অথবা উভয়ের সংমিশ্রণে উদ্ভূত নবীন দেবতা। কেউ কেউ একে সূর্য দেবতার প্রতীক অথবা অষ্ট্রিকসুলভ কূর্ম দেবতার প্রতীক ব'লে মনে করেন। আর এর সঙ্গে মিশেছে মুসলমান যোদ্ধৃ-শক্তির পূজা।

ধর্মমঙ্গলের প্রাপ্ত পুঁথির বিচারে প্রথম কবি সম্ভবত রূপরাম চক্রবর্তী (১৬৪৯-৫৯)। চৈতন্যপর্বের অপর দুই বিখ্যাত কবি হলেনঃ রামদাস আদক (১৬৬২), এবং মনসামঙ্গল রচয়িতা সীতারাম দাস (১৬৯৮ ?)। ১৮শ শতকের প্রসিদ্ধ কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন—ঘনরাম চক্রবর্তী (১৭১১), নরসিংহ বসু (১৮ শতকের প্রথমার্ধ), মাণিকরাম গাঙ্গুলী (১৭৮১), সহদেব চক্রবর্তী (১৭৫০-১৭৭৫), রামকান্ত রায় (১৭৮৩ ?), ইত্যাদি। লক্ষণীয়, উপরোক্ত কবিবৃন্দ সকলেই বর্ধমান-হুগলী অঞ্চলের অধিবাসী।

১৭শ শতকের মধ্যভাগ থেকে শিবকে নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে শিবায়ন বা শিবমঙ্গল জাতীয় রচনার সূত্রপাত হয়েছে। বাঙলার লোকগীত, ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল বা নানা মঙ্গলকাব্যে প্রচলিত শিবঠাকুরের ছড়া অথবা শৈব নাথদের কাহিনী এবং মৌখিক ধারা থেকে উপাদান আহরণ ক'রে এইজাতীয় শিবায়ন রচনার সাহিত্যিক প্রয়াস শুরু হয়েছে। শিবমঙ্গলের প্রথম কাব্য রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ' (১৬৭৪) এবং রামরাজার 'মৃগলুব্ধ সংবাদ'। উভয়ই চট্টগ্রামের কবি। ১৭শ শতকের শেষ দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গেরও লেখক মিলছে, যেমন, হাওড়া জেলার রামকৃষ্ণ রায় বা দাস ও তাঁর সুবৃহৎ 'শিবায়ন' (১৬৮৪), মেদিনীপুরের কবি শ্রেষ্ঠ শিবায়ন কাহিনী রচয়িতা রামেশ্বর চক্রবর্তী ও তাঁর 'শিব সংকীর্তন' (১৭১০-১১)।

১৭শ শতক শেষ হওয়ার আগেই মঙ্গলকাব্যের ছাঁচে ঢালাই করা গতানুগতিক অনেক স্থানীয় দেব-দেবী মাহাত্ম্য রচিত হচ্ছিল, যেমন—শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল (ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণারায়ের কথা), সূর্যমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল ইত্যাদি। এগুলিতে ক্রমশ পৌরাণিক আধিপত্য প্রসারলাভ করছিল, পরিণত হচ্ছিল ব্রতকথা বা পাঁচালির অবয়বে (সুবচনীর পাঁচালী, শনির পাঁচালী ইত্যাদি)।

এদের মধ্যে অবশ্য সত্যনারায়ণের পাঁচালী বিশিষ্টতার দাবী রাখে, কারণ সার্বিক মর্যাদাপুষ্ট এই পাঁচালী হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ী বিবর্তনের স্বাক্ষর।

এই প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র রায় 'গুণাকরে'র (১৭১২-৬০) অন্নদামঙ্গল বা অন্নপূর্ণামঙ্গল (১৭৫২) কাব্যের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। অন্নদামঙ্গল গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত: প্রথম খণ্ডের উপজীব্য শিবায়ন-অন্নদামঙ্গল; দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল এবং তৃতীয় খণ্ডে মানসিংহ-অন্নপূর্ণামঙ্গল। তিনটি খণ্ডের মধ্যে সম্পর্ক অবশ্য ক্ষীণ, কাব্যের যোগসূত্র হলেন আসলে অন্নদা, কারণ অন্নদার কৃপায় কৃষ্ণনগরাধিপ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের ভাগ্যোদয়। ভারতচন্দ্র এই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার সভাসদ ছিলেন। যাই হোক, তিনটি খণ্ডের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডটিই কাব্যগুণে ও রচনাপ্রসাদে উন্নত মানের।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল নামে মঙ্গলকাব্য হলেও একে প্রকৃত মঙ্গলকাব্য বলা যায় না। কাব্যনির্মিতির দিক থেকে তা গেয় নয়, তা রাজসভার রসিকদের উপভোগের জন্যই রচিত। তাই অন্নদামঙ্গল যেমন পালাগান নয়, তেমন পূজাপার্বণে গাওয়াও হতো না। শুধু তাই নয়, মঙ্গলকাব্যসুলভ উন্নত জীবনাদর্শ ও নীতিবোধ এবং স্বাভাবিক সমাজনিষ্ঠা এখানে অনুপস্থিত। বস্তুত, সমাজমনের নিবিড় সংশয়হীন ঐক্য ও যৌথ মনের আবেগে বিধৃত হয়ে মঙ্গলকাব্য এক যৌথ শিল্পে পরিণত হয়েছে, যেখানে দেবতার রোষ, অদৃষ্টের বিধান অথবা জন্মজন্মান্তরের কর্মফলের প্রতি স্থির বিশ্বাস এক অলৌকিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। অন্নদামঙ্গলে কিন্তু এই ধর্মবোধ অপেক্ষা ঐহিক জীবনবোধ, দেবভক্তির স্থলে দেবদ্বিজের প্রতি রসিকতা ও আদিরস সৃষ্টি, যৌথ সামাজিক আবেগ ও সারল্যের স্থলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নাগরিক কৃত্রিমতা ও বুদ্ধির বিকার ও বিলাস-চাতুর্য চিত্রিত হয়েছে অবাধে।

২. জীবনী সাহিত্য:

বৈষ্ণব জীবনীসাহিত্য বাঙলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। জীবনী হিসাবে গ্রন্থগুলি হয়তো সম্পূর্ণ জীবনচরিত নয়, কারণ, তাতে ঘটনা ও প্রকৃত তথ্যের তুলনায় দৈবী মহিমা ও অলৌকিক লীলামাহাত্ম্য বড়ো বেশি ক'রে ধরা পড়েছে। তবু দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন ছেড়ে কবিরা যে রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষকে আশ্রয় করেছেন, এইটেই লক্ষ্য করার।

১৬শ শতকে প্রধানত শ্রীচৈতন্য ও অদ্বৈত মহাপ্রভুর জীবনালেখ্য অঙ্কনের প্রয়াস দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য রচনা হলো, প্রায়-চৈতন্যসমসাময়িক বৃন্দাবন দাসের

'চৈতন্যভাগবত' (খ্রী. ১৫৪০-৪৮), লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল', কৃষ্ণদাস কবিরাজের সুপ্রসিদ্ধ 'চৈতন্যচরিতামৃত' (১৫৭৫-৯৫), চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গবিজয়, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল (১৫৭০-১৬০০), ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ' (১৫৬৮-৬৯) ইত্যাদি। ১৭শ শতকের জীবনীকাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু শ্রীনিবাস ও নরোত্তমদাস। জীবনগুলির মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত হলো নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' (১৬০০-১৬০১), গোপীবল্লভ দাসের 'রসিকমঙ্গল', গতিগোবিন্দের 'বীররত্নাবলী', গুরুচরণদাসের 'প্রেমামৃত', যদুনন্দন দাসের 'কর্ণানন্দ' (১৬০৭-০৮), ইত্যাদি। ১৮শ শতকের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে প্রধান হলেন 'ভক্তিরত্নাকর' রচয়িতা হিসাবে খ্যাত নরহরি চক্রবর্তী (নরোত্তম বিলাস), প্রেমদাস, উদ্ধবদাস ইত্যাদি।

৩. পদাবলী সাহিত্য ঃ

মধ্যযুগীয় রচনাগুলির শ্রেষ্ঠ গৌরব পদাবলী সাহিত্য। সম্ভবত গীতিকবিতাই বাঙালী প্রতিভার নিজস্ব ক্ষেত্র। অবশ্য পদাবলীর প্রধানতম বিকাশের কাল ছিল শ্রীচৈতন্যের যুগসংলগ্ন দুই শতক (খ্রী. ১৫০০-১৭০০)। তারপরে সে-ধারা গতানুগতিক বিচ্ছিন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ১৮শ শতকের সূত্রপাতে শাক্ত পদাবলী পদরচনার নতুন ধারায় বাঙালীর প্রতিভা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পায়।

বৈষ্ণব পদাবলীর আদি পথপ্রদর্শক বিদ্যাপতি (খ্রী. ১৩৮০-১৪৬০) মিথিলার কবি হলেও তাঁকে বাঙালীর কবি বলাই বোধ হয় সঙ্গত। তাঁর রচিত অধিকাংশ পদই বাঙলায় পাওয়া গেছে। এই পদগুলি পুরোপুরি মৈথিলীও নয় (গ্রীয়ার্সন কর্তৃক সংকলিত বিদ্যাপতির অল্পসংখ্যক মৈথিলী পদ রচনার দিক দিয়ে নিম্নমানের)। সর্বভারতীয় অবহট্‌ঠের আধারে মৈথিলী ও বাঙলার সংমিশ্রণে উদ্ভূত ব্রজবুলি (প্রকৃত ব্রজভাষার সঙ্গে সম্পর্ক রহিত) ভাষা অবলম্বিত হয়েছে তাঁর রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদগুলিতে। এই হিসেবে ব্রজবুলি সাহিত্যধারার উৎস হলেন বিদ্যাপতি।

বাঙলা বৈষ্ণব পদাবলী চার ভাগে বিভক্ত ঃ (১) গৌর পদাবলী ; (২) ভজন পদাবলী (বন্দনাগীতি, প্রার্থনাকাব্য, গুরুবন্দনা বা মহাজনবন্দনা) ; (৩) রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী—যা বিভিন্ন রসপর্যায়ে বিভক্ত ; এবং (৪) রাগাত্মিকা পদাবলী—যেগুলিকে চর্যাপদের গুহ্য সাধনতত্ত্বের অবশেষ বলা যায়। বৈষ্ণব সহজিয়াদের রচিত এই রাগাত্মিকা পদগুলিই ক্রমে আউল-বাউল-দরবেশ-সাঁইদের গানে পর্যবসিত হয়েছে।

প্রধানত বৈষ্ণবীয় অলংকার-নিবন্ধ অথবা ১৮শ শতকের বৈষ্ণব মহাজনদের সংগ্রহ গ্রন্থ থেকে বৈষ্ণব পদগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সংকলন-গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' (১৭০৫-এর পূর্ববর্তী), নরহরি চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়', রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসিন্ধু' (১৮শ শতক), বৈষ্ণব দাসের 'পদকল্পতরু', গৌরসুন্দর দাসের 'সংকীর্তনানন্দ' ইত্যাদি। সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীর সংগ্রহ আজও সম্পূর্ণ হয়নি। যা সংগৃহীত হয়েছে তার সংখ্যা ৭।৮ হাজারের বেশি। ১৮শ শতকের পূর্বেই দেখি, অন্তত তিন হাজারের ওপর পদ সংগৃহীত হয়েছে। পদকর্তার সংখ্যা তখনই দেড় শতের ওপর, যাদের মধ্যে অন্তত তিন জন নারী, এবং এগারো জন মুসলমান।

যাই হোক, পদাবলীর সংকলন-গ্রন্থগুলিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাবিষয় সাজানো রয়েছে বৈষ্ণব রসতত্ত্বের নিয়ম অনুযায়ী, যেমন—বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ, দৌত্য, অভিসার, সম্ভোগ, মান, বিরহ, প্রেমবৈচিত্ত্য, ভাবসম্মেলন ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে। নায়িকা-বিভাগের নানা পর্যায়ও দেখা যাবে, যেমন—মানিনী, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা ইত্যাদি। বৈষ্ণবীয় বিধি অনুযায়ী অবশ্য প্রথমে 'গৌরলীলা' বা 'গৌরচন্দ্রিকা' দিয়ে পদাবলীর শুরু। এই রস বিশ্লেষণের মূল হচ্ছে শ্রীরূপ গোস্বামীর সংস্কৃতে লেখা 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'উজ্জ্বলনীলমণি' এবং নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর'।

চৈতন্যপর্বের পদকর্তাদের মধ্যে প্রধান হলেন চণ্ডীদাস (প্রাক্‌চৈতন্য যুগের কবি ?), চৈতন্যসমকালীন সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যজীবনীকার মুরারি গুপ্ত (৭।৮টি পদ), শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ, নরহরি-শিষ্য লোচনদাস, জ্ঞানদাস (১৬শ শতকের শেষার্ধ), 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' রূপে স্বীকৃত গোবিন্দদাস (১৭শ শতক), যদুনন্দন দাস, শ্রীনিবাস-শিষ্য রাধাবল্লভ দাস (চক্রবর্তী), ঘনশ্যাম, গোপাল দাস, সৈয়দ মর্তুজা (জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ), 'পদ্মাবৎ'-খ্যাত সৈয়দ আলাওল প্রমুখ কবি। ১৮শ শতকেও কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা জন্মগ্রহণ করেছেন, যেমন, চন্দ্রশেখর-শশিশেখর, রাধামোহন ঠাকুর, নরহরি চক্রবর্তী। এই বৈষ্ণব গীতিধারার শেষ কবি বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ, যিনি 'ভানুসিংহ' ছদ্মনামে কিছু ব্রজবুলি গীতি রচনা করেছেন (ভানুসিংহের পদাবলী)। তবে ১৮শ শতকের পদাবলী ধারার প্রধান কীর্তি হলো পদাবলীর সংগ্রহ। এ-প্রসঙ্গ পূর্বেই উত্থাপিত হয়েছে।

১৮শ শতকের আর একটি আবির্ভাব শাক্ত পদাবলীর ধারা। ভারতচন্দ্রের পরই ১৮শ শতকের প্রধান কবি রামপ্রসাদ সেন 'কবিরঞ্জন'। তিনি তাঁর কালীকীর্তনের জন্য সর্বজনসমাদৃত হলেও 'বিদ্যাসুন্দরে'রও রচয়িতা। এছাড়া উল্লেখযোগ্য হলেন রাজা

কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর বংশধর শিবচন্দ্র, কুমার নরচন্দ্র, রাজা নন্দকুমার, বর্ধমানের দেওয়ান রঘুনাথ রায় এবং কমলাকান্ত (ভট্টাচার্য)। এঁরা সকলেই শাক্ত সংগীতের ধারাকে পরিপুষ্ট করেন।

৪. অনুবাদ সাহিত্যঃ

ভাগবতঃ রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক আখ্যানকাব্যের আদি কবি হলেন চৈতন্য-পূর্ববর্তী মালাধর বসু—একথা পূর্বেই বলেছি। তাঁর গ্রন্থ 'গোবিন্দবিজয়' বা 'গোবিন্দ-মঙ্গল' মূলত ভাগবতের অনুসরণ ব'লে এটিকে অনুবাদ শাখার অন্তর্গত করা যায়—যদিও এটি মূলত মঙ্গল বা পাঁচালী জাতীয় আখ্যানকাব্য। তাই সেই একই ধারায় কবির আত্মপরিচয়, উৎসাহদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার, রাগ-রাগিণীর উল্লেখ, লৌকিক কাহিনীর অলৌকিক উপস্থাপনা অথবা লোক নিস্তারের প্রতিশ্রুতি এবং ছকে-বাঁধা পৌরাণিক কাহিনীর অসংলগ্ন বিস্তার কাব্যে চিত্রায়িত হয়েছে। তবে লক্ষণীয়, অন্যান্য মঙ্গলসাহিত্যের মতো এই শাখা একেবারে আঞ্চলিক নয়, কারণ তার ঐতিহ্য আরও প্রাচীন এবং সর্বভারতীয় নিঃসন্দেহে।

চৈতন্য অথবা চৈতন্যোত্তর যুগে এইজাতীয় কৃষ্ণমঙ্গল বা ভাগবতের আখ্যান ও কাব্যধারার যে প্রসার ঘটবে, তা সহজেই প্রত্যাশিত। কিন্তু এই শাখার ব্যাপ্তি ঘটেছিল যে-পরিমাণে, সে-পরিমাণে দৃঢ়মূল হতে পারে নি। তার কারণ সম্ভবত এগুলি বাঙালীর জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রাণবস্তু হয়ে ওঠেনি, আর তাই কৃষ্ণলীলার স্থান দখল করেছে বাঙালীর নিজস্ব পারিবারিক চৈতন্যলীলা। তাছাড়া, ষোড়শ শতকে বা তারপরে কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতাদের কেউ-ই মালাধর বসুর কীর্তিকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি। তাই এইজাতীয় রচনাগুলি কেবল শ্রীকৃষ্ণ বা রাধিকার লীলামাহাত্ম্য বর্ণন ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৬শ শতকের লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেনঃ মাধবাচার্য ('কৃষ্ণমঙ্গল' রচয়িতা), দৈবকীনন্দন সিংহ 'কবিশেখর' ('গোপালবিজয়' পাঁচালী), দুঃখী শ্যামদাস ('গোবিন্দমঙ্গল')। ১৭শ শতকে কবির সংখ্যা আরও বেড়েছে কিন্তু কবিত্বের প্রাণধর্ম হয়েছে মন্দীভূত। এঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন কাশীদাসের জ্যেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণদাস ('শ্রীকৃষ্ণবিলাস'), শ্রীহট্টের কবি ভবানন্দ ('হরিবংশ'), বিপ্র পরশুরাম, যশচন্দ্র ইত্যাদি। ১৮শ শতকে এই কাব্যধারায় আরও পৌরাণিক প্রীতি বেড়েছে, সেইসঙ্গে কৃষ্ণমঙ্গল ধারার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে শ্রীহট্ট এবং বিষ্ণুপুর—অবশ্যই সেখানকার রাজাদের উৎসাহ ও আনুকূল্যে। কবিদের মধ্যে মুখ্য হলেনঃ বলরাম দাস

('কৃষ্ণলীলামৃত'), বিষ্ণুপুরী রামায়ণ নামে পরিচিত 'অধ্যাত্মরামায়ণে'র লেখক শঙ্কর চক্রবর্তী 'কবিচন্দ্র' ('কৃষ্ণমঙ্গল') প্রমুখ কবিরা।

রামায়ণ : কৃত্তিবাসের পরে রামায়ণ কাহিনী যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁদের সার্বিক পরিচয় পাওয়া দুঃসাধ্য বললেই চলে। সম্ভবত এঁদের অধিকাংশই ছিলেন দুর্বল লেখক, ফলে কৃত্তিবাসের অন্ধ অনুকরণ হিসেবে এঁদের রচনা কৃত্তিবাসী রামায়ণে শোষিত হয়েছে। রামায়ণের বিষয়বস্তু অবলম্বনে কৃত্তিবাস প্রমুখ কবিরা সব সময় বাল্মীকির প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন নি। ফলে অন্যান্য সংস্কৃত রামায়ণের কাহিনী তাঁরা নির্বিচারে গ্রহণ করেছেন, যেমন—অধ্যাত্মরামায়ণ (দস্যু রত্নাকরের কাহিনী, হনুমান-কালনেমি যুদ্ধবৃত্তান্ত, হনুমানের বক্ষবিদারণ ইত্যাদি), অদ্ভুত রামায়ণ (সহস্রস্কন্ধ রাবণবধ), দেবীভাগবত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ (হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান), বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, কালিকাপুরাণ (রামের অকালবোধন), কূর্মপুরাণ, শিবপুরাণ (সেতুবন্ধের সময় রামের শিবস্থাপনা), পদ্মপুরাণ (লবকুশের যুদ্ধ) ইত্যাদি। এছাড়া লৌকিক কাহিনীর সংযোজনেও এঁদের রামায়ণের কলেবর পুষ্ট হয়েছে (অঙ্গদ রায়বার, তরণীসেন বধ, অহীরাবণ-মহীরাবণ বধ ইত্যাদি)।

১৭শ শতকে তেমন বিশিষ্ট রামায়ণ রচনা আর নজরে পড়ে না, তবে আঞ্চলিক ধারার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছেন কয়েকজন কবি, যেমন—ময়মনসিংহের কবি বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী, উত্তরবঙ্গের নিত্যানন্দ আচার্য (যিনি 'অদ্ভুতাচার্য' নামে পরিচিত), ভুলুয়ার (নোয়াখালী) দ্বিজ ভবানীদাস ('শ্রীরাম পাঁচালী')। ১৮শ শতকে কোচবিহার ও বিষ্ণুপুরে কিছু শক্তিশালী কবি আবির্ভূত হয়েছেন, যেমন—মল্লভূমির শঙ্কর চক্রবর্তী 'কবিচন্দ্র' (বিষ্ণুপুরী রামায়ণ), ফকিররাম 'কবিভূষণ', রামানন্দ ইত্যাদি। ১৮শ শতকের অপর প্রধান কবি হলেন—রামানন্দ ঘোষ (১৭৮০ ?), জগৎরাম রায় (বাঁড়ুজ্জে) ইত্যাদি।

মহাভারত : বাঙলা মহাভারতের একচ্ছত্র কবি বর্ধমান-নিবাসী কাশীরাম দাস তাঁর রচনা শেষ করেছিলেন সম্ভবত ১৬০২-১৬১০-এর মধ্যে। কৃত্তিবাসের মতো তাঁর পরিচয়ও সুবিদিত। কবি সম্ভবত মহাভারতের আঠারটি পর্ব শেষ করে যেতে পারে নি। তাঁর রচনাতেও একাধিক কবির রচনা মিশে গেছে। কাশীরাম দাসে প্রধানত ব্যাস-কৃত মহাভারত এবং জৈমিনী ভারত (যেমন অশ্বমেধ পর্ব) অবলম্বিত হলেও লৌকিক কাহিনী সংযোজনের অভাব ছিল না (দাতাকর্ণের কাহিনী, শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান ইত্যাদি)। ভক্তিমিশ্রিত সহজ ধর্মবোধ ও বাঙালী কাব্য-

মানসের কাহিনী-পিপাসা তাঁর রচনাকে সত্যই জাতীয় মহাকাব্য রূপে গ'ড়ে তুলেছে।

কাশীরাম দাসের পূর্বসূরী হিসেবে অবশ্য কবীন্দ্র পরমেশ্বরের নাম করতে হয়। পূর্ববঙ্গে তাঁর রচনার প্রচলন বড়ো কম নয়। তাঁর রচনা সাধারণত 'পরাগলী মহাভারত' নামে খ্যাত। কারণ, গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ্-এর (১৪৯৩-১৫১৮) লস্কর অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি এবং চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁর আগ্রহে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। কবি মহাভারতের ১৮টি পর্বই সম্পন্ন করে যেতে পেরেছিলেন। পরাগলের পুত্র নুসরৎ খাঁ বা ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী পরাগলী মহাভারতের পূর্ণাঙ্গতা সাধন করেন 'অশ্বমেধ পর্ব'কে বিস্তারিত ক'রে।

মহাভারতের আংশিক ও সম্পূর্ণ রচনা নিয়ে বাঙলা মহাভারতের সংখ্যা ৩০ খানারও বেশি। ১৬শ/১৭শ শতকে আবির্ভূত আরও কবির সাক্ষাৎ মেলে। এঁদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের লেখকও আছেন, যেমন, রাজেন্দ্র দাস, গঙ্গাদাস সেন, ষষ্ঠীবর, গোপীনাথ দত্ত, সুবুদ্ধি রায় প্রমুখ। এছাড়া মল্লভূমির (বাঁকুড়া) কবি শঙ্কর চক্রবর্তী আছেন, আরও আছেন কোচবিহারের মহাভারতকাররা।

৫. নাথ সাহিত্য:

নাথযোগী ও সিদ্ধাচার্যদের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। এঁদের সম্পর্কিত নানা অলৌকিক কাহিনী কেবল বাঙলাদেশে নয়, সারা উত্তর ভারতে এককালে ছড়িয়ে পড়েছিল। নাথ ধারার উৎসকেন্দ্র ছিল সম্ভবত বাঙলাদেশেই। প্রাদেশিক প্রাচীন সাহিত্য সূত্রেই আমরা জেনেছি মীননাথ (মৎস্যেন্দ্রনাথ), জালন্ধরিপাদ (হাড়িপা), গোরক্ষনাথ (গোরখনাথ) বা কানুপা (কাহ্নপাদ) প্রভৃতির কথা। এই সম্প্রদায়ের স্মৃতি ও কাহিনী বহন করে চলেছে বাঙলাদেশের উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের যোগীজাতি, অথবা কানফাটা যোগী ও নানা অবধূত সম্প্রদায়। বাঙালী মুসলমান জনসাধারণের মধ্যেও এঁদের কাহিনী সমাদৃত। তাই মৎস্যেন্দ্রনাথ মুসলমান পীরদের কাহিনীতে মোছন্দর বা মোছর পীরে পরিণত হয়েছেন।

নাথযোগীদের কাহিনীর দুটি ভাগ: (ক) নাথসিদ্ধাদের কাহিনী—মীননাথ ও তাঁর শিষ্য গোরখনাথের কাহিনী এবং (খ) দ্বিতীয় কাহিনী গোপীচন্দ্রের (গোবিন্দ-চন্দ্রের) সন্ন্যাস এবং তৎসম্পর্কিত রাজমাতা ময়নামতী ও গুরু জালন্ধরিপাদের যোগ-বিভূতির কথা। বাঙলা মঙ্গলকাব্যে, বিশেষ ক'রে ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর সঙ্গে যোগীদের যোগশক্তি বা অলৌকিক কীর্তিকলাপের কাহিনীর যোগ ছিল অনেক

পূর্বেই কিন্তু লিখিতাকারে স্বতন্ত্র সাহিত্যধারা হিসেবে তা বাঙলাসাহিত্যে প্রবেশ করেছে অনেক বিলম্বে।

'গোরখবিজয়'-এর পুঁথি পাওয়া যায় ১৮শতকে এসে—সহদেব চক্রবর্তী ও রামাই পণ্ডিতের ধর্মপুরাণে বা অনিলপুরাণে। স্বতন্ত্রাকারে উত্তরবঙ্গ ও ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলেও গোরখবিজয় সম্পর্কীয় পুঁথি পাওয়া গেছে—যাদের লেখক হলেন ফয়জুল্লা, শ্যামদাস সেন, ভীমদাস ইত্যাদি।

পূর্বেই বলেছি, গোপীচন্দ্রের কাহিনী সমস্ত উত্তর ভারতেই প্রচলিত, কাহিনীর স্থানিক ভেদ অবশ্যই স্বীকার্য। তবে এই কাহিনীর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মালিক মুহম্মদ জ্যায়সীর 'পদুমাবত্'–এ (১৬ শতক)। এ-বিষয়ে প্রথম বাঙলা গ্রন্থ বোধহয় নেপালে রচিত ১৭শ শতকের বাঙলা নাটক ''গোপীচন্দ্র নাটক''—যদিও তা নেওয়ারী লিপিতে লেখা।

৬. ইসলামী সাহিত্য ঃ

ধর্মনিরপেক্ষ রোমান্টিক কাহিনীকাব্য ও প্রণয় গাথা (যেমন ইউসুফ-জুলেখা, লায়লা-মজনু, শিরি-ফরহাদ, গোলেবকাওলি, লোর-চন্দানী প্রভৃতি) অপভ্রংশ যুগে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। এই ধারার সার্থক উত্তরসূরী হলেন মুসলমান কবিরা। হিন্দু কবিরা লৌকিক সাহিত্য রচনা করতেন সাধারণত ধর্মীয় আবেদনের আবরণে। নিরঙ্কুশ ধর্মনিরপেক্ষ কাহিনী রচনায় তাঁরা উৎসাহিত হতেন না। তাই হিন্দী ও বাঙলা রোমান্টিক কাহিনী রচনায় মুসলমান কবিদেরই একাধিপত্য বেশি।

বাঙলায় হিন্দী-ফারসী রোমান্টিক কাব্যধারার ভগীরথ হলেন চাটিগাঁ-রোসাঙ্গ (আরাকান) দরবারের দুজন কবি দৌলৎ কাজী ও আলাওল। সুফী কবিসাধক দৌলৎ কাজীর অসমাপ্ত রচনা 'লোর চন্দ্রানী' (বা সতী ময়না) মূল অবধী অনুসরণে রচিত (অবধীর কবি দাউদ রচিত 'চান্দায়ন', ১৪৩৯), রচনাকাল ১৭শ শতকের দ্বিতীয় পাদ। রচনার ভূমিকা অংশে আছে প্রথমে আল্লা ও রসুল বন্দনা, পরে রাজপ্রশস্তি; দ্বিতীয় খণ্ডে সতী ময়নামতীর কথা। সুফী কবি সৈয়দ আলাওল দৌলৎ কাজীর অসম্পূর্ণ কাব্য সম্পূর্ণ করে (১৬৫৯)। আলাওল অন্যান্য বহু আরবী/ফারসী গ্রন্থ বাঙলায় অনুবাদ অথবা ভাবানুবাদ করেছিলেন। এঁর কয়েকটি বিখ্যাত রচনা হলো ঃ ফারসী আখ্যায়িকা কাব্য 'সয়ফুলমুলক্ বদিউজ্জমাল' (১৬৪৫-৫২), তোহ্ফা (১৬৬৩). কবি নিজামীর ফারসী গ্রন্থ 'হপ্ত পয়কর' অবলম্বনে 'সপ্তপয়কর' (আ, ১৬৬০) এবং তাঁর

সর্বশেষ রচনা 'সেকান্দর নামা' (১৬৭৩)। তবে তাঁর প্রধান কীর্তি হলো 'পদ্মাবতী' (১৬৪৫-৫২)। গ্রন্থটি মুহম্মদ জ্যায়সীর 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে লিখিত। তাঁর কবিকৃতি রচনালালিত্য ও ভাবসমৃদ্ধিতে যথেষ্ট উন্নত হলেও কাব্যকলা বিচারে দৌলৎ কাজীর তুলনায় অবশ্যই নিরেস।

বাঙলা হিন্দুদের পুরাণ-পাঁচালীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব ইসলামী-পদ্ধতির লেখকরা খুব বেশি দিন এড়িয়ে চলতে পারেন নি। ফলে ১৭/১৮ শতক থেকে ইসলাম ধর্ম-বিষয়ক রচনা প্রাধান্য পেল। এই রচনাগুলি সাধারণত তিন শ্রেণীর: (ক) পয়গম্বরদের কাহিনী, যেমন, নবী বংশ, রসুল বিজয়, রসুলনামা বা মোহাম্মদ বিজয় এবং নবীদের 'কেচ্ছা' কাহিনী ('কাছাছোল আম্বিয়া'), (২) হজরত্ নবীর পরবর্তী খলিফাদের বিজয় অভিযান ও গৃহবিবাদের কাহিনী অর্থাৎ 'জঙ্গনামা' (যুদ্ধকথা) এবং (৩) পীর মাহাত্ম্য কথা। এইজাতীয় ইসলামীপুরাণ রচয়িতাদের মধ্যে প্রধান হলেন: সৈয়দ সুলতান (নবীবংশ, ১৬৫৪), মহম্মদ খান (মুক্তাল হোসেন, ১৬৪৬), শেখচাঁদের 'রসুল বিজয়' (১৭শ শতক), হায়াৎ মামুদ (আম্বিয়াবাণী ১৭৫৮, জঙ্গনামা ১৭২৩), গরীবউল্লা (জঙ্গনামা ১৭৯২, ইউসুফ-জুলেখা) ইত্যাদি।

৭. 'লোকযান' আশ্রিত সাহিত্য / লোকসাহিত্য:

নিরক্ষর সমাজের মধ্যে প্রচলিত মৌখিক সাহিত্যই লোকসাহিত্য (Folk Literature)। লোকসাহিত্যের সঙ্গে কলাসাহিত্যের (Art Literature) প্রাথমিক পার্থক্য বোধ হয় এই যে, লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে স্থান, কাল ও ব্যক্তিজীবনের স্থিরত্ব অথবা নির্দিষ্টতা নেই, অথবা নেই কোনো সুস্পষ্ট সাহিত্যিক আদর্শ। প্রচলিত রীতি-নীতি, চিরাচরিত ঐতিহ্য এবং সামাজিক বিশ্বাস ও সংস্কার (Custom, tradition and belief) শ্রুতিনির্ভর মৌখিক সাহিত্যের মাধ্যমে কালধর্মে ধারাবাহিত হলেও কবির শিল্পসত্তা সেখানে ধরা পড়ে না, সাহিত্যসৃষ্টিকে কালোত্তীর্ণ করার সজ্ঞান এবং সচেতন প্রচেষ্টাও তাই নজরে পড়ে না। বস্তুত, এই দিক দিয়ে লোকসাহিত্য সর্বদাই নৈর্ব্যক্তিক অথচ সমকালীন এবং প্রায়শই আঞ্চলিক প্রভাবে পুষ্ট। ভাষা বিচারে তাই এগুলির মধ্যে প্রাচীনত্ব আশা করা যায় না, বরং ভাষার মধ্যে ঔপভাষিক বা আঞ্চলিক ধর্মই মুখ্য হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, লোকসাহিত্যের মধ্যে এক সার্বজনীন ধারণা বা সংকল্প (Common motif) আরোপিত এবং সংক্রামিত হতে দেখা যায়, ফলে বিষয়বস্তুর সামাজিক প্রসার অবাধ এবং অনিবার্য হয়ে ওঠে। ব্যক্তি থেকে গোষ্ঠীর অন্তস্তলে প্রসারণশীল এই

চলিষ্ণু ধর্মের (Migratory State) সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে idioleet এবং dialect-এর পারস্পরিক সম্পর্কের।

তৃতীয়ত, লোকসাহিত্যের কাব্যদেহ পরিমার্জিত অথবা সুসংস্কৃত নয়। কারণ, এগুলির মধ্যে বৈদগ্ধ্য প্রকাশের তুলনায় উদ্দেশ্যমূলকতা কিংবা অভিজ্ঞতা বা তথ্য বিতরণের প্রচেষ্টা বেশি। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছন্দের শিথিলতা, গ্রাম্যজীবন-কেন্দ্রিক উপমারীতি, ভাবপ্রকাশের সরল অথবা স্থূল প্রয়াস সহজ দ্রষ্টব্য। মোট কথা, অসংলগ্ন ভাব ও অসম্পূর্ণ রূপ মিলে-মিশে গ'ড়ে তোলে লোকধর্মী সাহিত্যকে। ফলে ভাব ও রূপের শরীরী সামঞ্জস্যের অভাবই (Structural imparity of expression and content) সেখানে দৃশ্য হয়ে ওঠে।

চতুর্থত, এইজাতীয় দীর্ঘ রচনাগুলির মধ্যে সংলাপের ঢঙ্‌টিও লক্ষ্য করার মতো—যদিও সে-সংলাপে পাত্রপাত্রীর নামোল্লেখ থাকে না। ফলে এ-সাহিত্যের আবেদনে এক দিকে যেমন গল্পের আকর্ষণ, অন্য দিকে তেমন নাটকীয় আবেদন স্পষ্ট। অপর দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনাগুলি যথেষ্ট তন্ময়ধর্মী (Objective) এবং স্মরণোপযোগী প্রবচনতায় (Epigram) বিধৃত।

পরিশেষে কলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে লোকসাহিত্যের প্রভাব স্মরণে রাখা দরকার—যদিও এই প্রভাবের যথাযথ বিশ্লেষণ অথবা স্বরূপ নির্ণয় আজও পুরোপুরি সম্ভব হয় নি।

আঙ্গিক বিচারে বাঙলা লোকসাহিত্যকে প্রধানত চারিটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) প্রবচনমূলক; (২) আখ্যানমূলক; (৩) সংগীতমূলক এবং (৪) নাট্য বা সংলাপমূলক।

প্রবচনমূলক রচনার অন্তর্গত হলোঃ (ক) ছড়াজাতীয় রচনাঃ ঘুমপাড়ানি ছড়া, ছেলে ভুলানো ছড়া, খেলার ছড়া ইত্যাদি। (খ) ধাঁধাঁ, বিশেষত বিবাহের ধাঁধাঁ। (গ) প্রবাদ বা প্রবচন, যেমন, গ্রাম্য প্রবাদ, ডাক বা খনার বচন ইত্যাদি।

আখ্যানমূলক রচনার অন্তর্গত বিষয়গুলি হলোঃ (ক) গীতিকা (Ballad), যেমন, উত্তর বাঙলার কাহিনীমূলক রচনাঃ 'রাজা মাণিকচন্দ্রের গান' বা পূর্ব মৈমনসিংহের 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'। (খ) লোককথা (Folktale)ঃ রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, জীবজন্তুকেন্দ্রিক কাহিনী (Beast tales) বা প্রমোদ কাহিনী (Merry tales) ইত্যাদি।

সংগীতমূলক রচনার বিভাগ হলোঃ (ক) লোকসংগীতঃ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে প্রচলিত পটুয়ার গান, ভাদু, টুসু, জাওয়া, ঝুমুর, সাথী, বাঁধনা ইত্যাদি; উত্তর বঙ্গের গম্ভীরা, বাউল, ভাওয়াইয়া, চট্‌কা, জাগ; মধ্যবঙ্গের আল্‌কাপ, ছেঁচরা,

বোলান, পাঁচালি এবং পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালি, ঘাটু ইত্যাদি। (খ) গীতি : আঞ্চলিক গীতি ; ব্যবহারিক (Functional) গীতি, যেমন বিবাহের মেয়েলি গান (কাঁদনা ইত্যাদি); আনুষ্ঠানিক গীতি, যেমন, পালা-পার্বণ উপলক্ষে মনসা পূজার গান, পৌষ-পার্বণের গান, গাজনের গান ইত্যাদি ; প্রেমসংগীত, যেমন রাধাকৃষ্ণ বা হরগৌরী বিষয়ক, বারমাস্যা, অষ্টমাস্যা ; কর্মসংগীত (Work Song), যেমন সারি গান (নৌকা বাওয়ার গান) অথবা সমসাময়িক ঘটনামূলক গান ইত্যাদি।

নাট্যধর্মী লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আলকাপ, বোলান, লেটো, কৃষ্ণযাত্রা, রামযাত্রা, ছৌ, তরজা, কবিগান, খেউড়, আখড়াই ইত্যাদি।

বাঙলা লোকসাহিত্যের প্রাচীন উপাদান ও বীজ অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালী জনমানসে সংহত হয়েছিল। তবে ছাপার অক্ষরে তার সংকলন বের হয় ১৮ শতক থেকে। চন্দ্রকুমার দে সংকলিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' এবং 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' এইরূপ উল্লেখযোগ্য সংকলন। এছাড়া জয়নারায়ণ ঘোষালের 'শ্রীকরুণানিধান বিলাসে'ও (১৮১৩-১৫) নানাধরণের চলিত গীতির কথা আছে। লোকগীতির নাগরিক বিবর্তনের ফলে ১৮ শতকে উদ্ভূত হয়েছে বিবিধ লোকরঞ্জক রচনা, যেমন—তরজা (<আরবী), কবিগান, খেড়্/খেউড়, আখড়াই ইত্যাদি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পুরোনো অধ্যাত্ম লোকগীতির ধারা, যেমন, আউল-বাউল-দরবেশ-সাঁই নামধেয় সাধকগোষ্ঠীর অবদান (লালন ফকির, মদন বাউল, গগন হরকরা, ফকির ভোলা শা, বিশা ভূঞিমালী, গঙ্গারাম বাউল ইত্যাদি)।

৬.১.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

এখন বাঙলাভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি নিচে আলোচিত হবে। বাঙলার ধ্বনিমান (Phonemes) এইগুলি :

স্বরধ্বনি—অ/ɔ/, আ/a/, ই, ঈ/i/, উ, ঊ/u/, এ/e/, এ্যা/æ/, ও/o/। সানুনাসিক এই স্বরধ্বনিগুলিও বাঙলায় ধ্বনিমান। লক্ষণীয়, স্বরের দীর্ঘত্ব বাঙলায় ধ্বনিমানক (Phonemic) নয়।

ব্যঞ্জনধ্বনি—ক/k/, খ/kh/, গ/g/, ঘ/gh/, ঙ, ং/ṅ/ ; চ/cʃ/, ছ/cʃh/, জ, য/ɟʒ/, ঝ/ɟʒh/ ; ট/ṭ/, ঠ/ṭh/, ড/ḍ/, ঢ/ḍh/, ; ত/t/, থ/th/, দ/d/, ধ/dh/, ন, ণ/n/ ; প/p/, ফ/ph/, ব/b/, ভ/bh/, ম/m/, র/r/, ল/l/, ড়/ṛ/, ঢ়/ṛh/, শ, ষ, স/ʃ/, হ/h/।

অর্ধস্বর—ই/i̯/, উ/u̯/, এ/e̯/, ও/o̯/।

বাঙলায় স্ত্রী প্রত্যয় দুটি —ঈ(ই) এবং—(ই) নী, প্রথমটি জাতিবাচক, দ্বিতীয়টি কার্যবাচক। বাঙলায় বচন দুটি। —রা, গুলা/গুলি, —দিগ, এবং সমষ্টিবাচক সব, গণ ইত্যাদি বিশিষ্ট প্রত্যয় ও বহুত্ববাচক শব্দযোগে বহুবচন গঠিত হয়।

আধুনিক বাঙলায় কারক চারটি—কর্তা, কর্ম, করণ-অধিকরণ, ও সম্বন্ধ। কর্তা ও কর্মকারকের বিশিষ্ট বিভক্তি নেই। অধিকরণ ও করণ কারকের বিশিষ্ট বিভক্তি -এ। —র যোগে ষষ্ঠী। ৬ষ্ঠী বিভক্তিতে ৩য়া-৭মীর -এ যোগ ক'রে গৌণ কর্মের -কে/-রে বিভক্তির উৎপত্তি। অধিকরণের বিশিষ্ট বিভক্তি -ত / -তে, -এ। বাঙলা অনুসর্গের দুটি ভাগ—নাম অনুসর্গ (অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ) ও অসমাপিকা অনুসর্গ (সঙ্গে, মাঝে, কাছে, পাশে; দিয়া, করিয়া, থাকিয়া, হইতে ইত্যাদি)। উপসর্গের ব্যবহার বাঙলায় খুব কম।

বাঙলায় সর্বনাম পদ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত—পুরুষ বাচক সর্বনাম (উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ) এবং নির্দেশক সর্বনাম (সংখ্যায় পাঁচটি)।

উৎপত্তির দিক দিয়ে বাঙলা ক্রিয়াপদের কাল দু ভাগে বিভক্ত—মৌলিক ও কৃদন্ত। মৌলিক কাল দুটি—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। কৃদন্তকাল তিনটি—অতীত (-ইল অন্ত), ভবিষ্যৎ (-ইব অন্ত) ও নিত্যবৃত্ত (-ইত অন্ত)। আধুনিক বাঙলার একটি বড়ো বিশেষত্ব যৌগিক কালের ব্যবহার (যেমন, সে শুইয়াছে/শুয়েছে)।

বাঙলা ভাষায় যৌগিক ক্রিয়ারও প্রচলন আছে (যেমন, সে শুইয়া আছে/শুয়ে আছে)। অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয় তিনটি—(ক) -ই, ইয়া যুক্ত ল্যবর্থ অসমাপিকা, (খ) -ইলে যুক্ত সাপেক্ষ অসমাপিকা এবং (গ) -ইতে যুক্ত তুমর্থ অসমাপিকা।

বাঙলা বাক্যগঠনের দুটি অংশ—উদ্দেশ্য ও বিধেয়; উদ্দেশ্য সাধারণত বসে প্রথমে ও পরে বিধেয়। বাঙলা ভাষায় দু'জাতীয় উক্তি—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। বাঙলায় প্রত্যক্ষ উক্তির ব্যবহার বেশি। পরোক্ষ উক্তি সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। বাঙলা বাক্য সাধারণত তিন ধরণের—সরল, জটিল ও যৌগিক।

বাঙলা ভাষায় যে-সব বিদেশী ভাষার শব্দ এসেছে, তার মধ্যে ফারসী-আরবী, পোর্তুগীস্ ও ইংরেজী উল্লেখযোগ্য।[১]

---

(১) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ; বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা; সুকুমার সেনঃ বাংলা ভাষা (ভারতকোষ, ৫ম খণ্ড); E. M. Bykova: The Bengali Language (1981)।

৬.২ ওড়িয়া

৬.২.১ ভাষিক পরিস্থিতি

আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে ওড়িয়া একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ভারতীয় সংবিধানের ৮ম অনুসূচীতে (8th schedule) যে প্রধান ১৫টি ভাষা স্বীকৃত হয়েছে, ওড়িয়া ভাষা তাদের অন্যতম। ১৯৬১ সনের সাম্প্রতিক লোকগণনায় সারা ভারতে ওড়িয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ১৯ হাজার ৩৯৮ অর্থাৎ সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার ৩.৫৮ শতাংশ। আর ওড়িশার ভৌগোলিক পরিমাপ ৬০ ১৭২ বর্গ মাইলের মধ্যে ওড়িয়া ভাষীর সংখ্যা হলো ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫৯৮ (পুরুষ : ৭২,২০,৬৪৯ এবং স্ত্রী : ৭২,২২,৯৪৯ (অর্থাৎ এই রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৮২.৩ শতাংশ লোক ওড়িয়াভাষী। ১৯৭১-এর সমীক্ষায় সর্বভারতীয় ওড়িয়া ভাষাভাষীর আনুমানিক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৯৭ লক্ষ ২৬ হাজার ৭৪৫ (পুরুষ : ৯৯,৬৪,২৩৮ এবং স্ত্রী : ৯৭,৬২,৫০৭)।[১]

অবশ্য ওড়িয়া ভাষার কথা বললেই ওড়িশার ভাষাঞ্চলের সার্বিক চিত্র ফুটে ওঠে না। সংস্কৃত বা সংস্কৃতসুলভ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (Old Indo-Aryan) থেকে উদ্ভূত হয়েছে ওড়িয়া। কিন্তু ওড়িয়া ছাড়াও অন্যান্য আর্যেতর (Non-Aryan) ভাষা ওড়িশার ভৌগোলিক পরিসরে আপন স্থান করে নিয়েছে। ওড়িয়া ভাষার ইতিহাসে তাদের প্রভাবও খুব নগণ্য নয়। অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠী বলতে দ্রাবিড় এবং অস্ট্রিক বা মুণ্ডাগোষ্ঠীর ভাষার কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। ১৯৬১ সনের ভাষাসমীক্ষা ধরেই দেখা যাচ্ছে, উড়িষ্যার প্রধান দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাগুলি হলো—কোন্ধ্/খোন্দ্, গোণ্ডী, কোয়, কুরখ/ওরাওঁ, পর্জী, কুই, পেঙ্গু ইত্যাদি। এদের মধ্যে কুই ভাষা বলা হয় কেবল উড়িষ্যাতেই।

অস্ট্রিক বা মুণ্ডাভাষাগুলির মধ্যে প্রধান হলো—ভূমিজ, ভূয়াঁ, জুয়াঙ্, গদব, হো, কোল, কোডা/কোরা, খড়িআ, মুণ্ডারী, শবর, বিরূজিঅ/বিন্‌ঝিঅ এবং সান্তালী। এছাড়া অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মিশ্রণজাত একটি উপজাতিক (Tribal) ভাষা হলো 'কিসান' (জনসংখ্যা : ৪৯,৩১৬)। বর্গীকরণ (Classification) সম্ভব হয় নি এমন কিছু অবর্গীভূত মুণ্ডা ভাষাও রয়েছে (পারেঙ্গা, একজাতীয় কোল ও মুণ্ডা)।[২]

ওড়িশার দক্ষিণাঞ্চলে তামিল এবং তেলুগু ভাষাও বেশ প্রচলিত। তেলুগু ভাষা সর্বাধিক বলা হয় গঞ্জাম জেলায় (২,৫৪,০৯২)। সারা ওড়িশায় তেলুগুভাষীর

---

১ R. C. Nigam : LH, p. 188.

২ Census of India, 1961, Vol. I, Part II-c(ii), Language Tables,

সংখ্যার হার ২.২৪ শতাংশ। তবে আর্যেতর ভাষাগুলির মধ্যে ঔপজাতিক ভাষাগুলির প্রাধান্য অনেক বেশি, মোট জনসংখ্যার ১২.০৭ শতাংশ। এইজাতীয় ভাষা সর্বাধিক বলা হয় ময়ূরভঞ্জ, কোরাপুট এবং বউধ-কোন্দ্ মল্-এ, শতকরা হার যথাক্রমে ৪৪.৯৫, ৩১.৮১ এবং ৪৬.১৯।[১]

যাই হোক, বর্তমানে আলোচ্য হলো ওড়িয়ার ভাষিক চিত্রের মূল্যায়ন। এই ভাষার ভৌগোলিক পরিসীমা বিচার করলে দেখা যাবে—তার উত্তরে রয়েছে বাঙলা ভাষা এবং রাঁচির দক্ষিণে বিহার-উড়িষ্যার সীমান্ত বরাবর প্রচলিত বিহারী ভাষাগুলি (ভোজপুরী, মগহী), পশ্চিমে ছত্তিশগঢ়ী (কোশলীর উপভাষা অর্থাৎ অবধীর ভগিনীস্থানীয়া) এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে তেলুগু।[২] অনেকগুলি ভাষার সংস্পর্শে ভাষাগত সংমিশ্রণও ঘটেছে প্রচুর। ফলে ভাষার ঔপভাষিক (Dialectal) চিত্রও অনেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বস্তার রাজ্যের সংলগ্ন 'ভত্রী' উপভাষাকে গ্রীয়ার্সন ওড়িয়া ভাষার উপভাষারূপেই চিহ্নিত করেছিলেন। বর্তমান ভাষা সমীক্ষায় (১৯৬১) এই ভাষা সেইভাবে স্বীকৃত হয়েছে (সর্বভারতীয় লোকসংখ্যা : ৮৫,০৬৯)—যদিও 'ভত্রী' ভাষাভাষীদের অধিকাংশই মধ্যপ্রদেশবাসী (৮৫,০৪৮)। কিন্তু ভত্রীর ভাষাঞ্চল মুখ্যত মারাঠী, পূর্বী হিন্দী বা কোশলী (ছত্তিশগঢ়ী) এবং ওড়িশার সংলগ্ন অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। ফলে ভাষাসমীক্ষা বোধ হয় চূড়ান্ত নয় (দ্র. পৃ. ৪৫)।

উপভাষাগত বিভেদ ও বৈচিত্র্য ওড়িয়ায় তেমন লক্ষণীয় নয়। আর নয় বলেই এই ভাষার দৃঢ়সন্নদ্ধ রূপটি যুগ যুগ ধ'রে অবিকৃত হয়ে গেছে। যাই হোক, এই রাজ্যের তেরটি জেলায় প্রচলিত ভাষাঞ্চলে মাত্র চারটি ঔপভাষিক বিভেদ দেখা যায়, যথা—

১. দক্ষিণে গঞ্জাম ও কোরাপুট অঞ্চলের উপভাষা।
২. পশ্চিমে সম্বলপুরী উপভাষা।
৩. উত্তরে বালেশ্বর জেলার উপভাষা এবং
৪. পুরী ও কটক জেলার উপভাষা—যা হলো ওড়িশার আদর্শ সাধু ও কথ্য ভাষা (Standard dialect—literary/spoken)।

দক্ষিণী বা গঞ্জামী উপভাষা গঞ্জাম ও কোরাপুট জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ভিজাগাপট্টম এবং অন্ধ্রপ্রদেশের কয়েকটি জেলায় ওড়িয়া এবং তেলুগুভাষার সংমিশ্রণজাত একজাতীয় সংকর ভাষা (Hybrid) দেখা যায়। পশ্চিমা বা সম্বলপুরী ওড়িয়া

১ CI, Vol. XII, Part IX-A (Census of Orissa), p. 275.
২ Grierson : LSI Vol. V, Part 2.

উড়িষ্যার পাঁচটি জেলায় প্রচলিত, যথা—সম্বলপুর, সুন্দরগড়, বোলাঙ্গীর, বউধ-কোন্দমল্ এবং কালাহাণ্ডী। মধ্যপ্রদেশের রায়পুর এবং পূর্বতন সামন্তরাজ্য সরণগড় ও রায়গড় অঞ্চলের সীমান্তবর্তী অঞ্চলেও সম্বলপুরী চলে। উত্তরাঞ্চলের উপভাষা সাধারণত প্রচলিত: বালেশ্বর জেলার উত্তরাংশে, ময়ূরভঞ্জ এবং পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। মেদিনীপুর জেলার অঞ্চল বিশেষে (কাঁথি মহকুমা) বহুপ্রচলিত ওড়িয়া গ্রন্থ বাঙলা হরফেও মুদ্রিত হতে দেখা যায়, যেমন, জগন্নাথদাসের 'টীকাভাগবত' (কাঁথি নীহার প্রেস, প্রথম সংস্করণ, বাং ১৩২৬ সন)।

৬.২.২ প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস

আধুনিক ভাষা হিসেবে ওড়িয়া আবির্ভূত হয়েছে সম্ভবত একাদশ শতকেই। এর প্রমাণ কলিঙ্গরাজ অনন্তবর্মদেবের (রাজা বজ্রহস্ত? ১০৫১ খ্রীষ্টাব্দ) নাগরী লিপিতে লিখিত প্রস্তরলেখ (অন্ধ্রপ্রদেশের চিআকোল জেলায় ধবলেশ্বর মন্দিরে উৎকীর্ণ)। অবশ্য এই লেখটির রচনাকাল সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে লেখটি ১৩শ শতকের পূর্বে নিশ্চিত রচিত হয়নি।[১] ওড়িয়া ভাষার পূর্ণ বিকাশ ঘটতে দেখা যায় রাজা ৪র্থ নরসিংহদেবের ভুবনেশ্বর লেখটিতে (খ্রী. অ. ১৩৯৬)।[২] এই প্রসঙ্গে অবশ্য বলে রাখা দরকার, ওড়িয়া সুধীজনের অনেকেই 'চর্যাপদ'-এর (১০ম-১২শ শতক) ওপর তাঁদের দাবী জানিয়ে রেখেছেন। চর্যাপদ যে প্রাচীন বাঙলাতেই রচিত হয়েছিল—এই মতবাদের স্বপক্ষে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যে যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন তাঁর অমূল্য গ্রন্থে[৩], তার সামগ্রিক খণ্ডন এখনও সম্ভব হয় নি; তবু একথা স্মরণে রাখা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না যে চর্যাপদ যে-সময়ে রচিত হয়েছিল, তা বাঙলা-অসমীয়া-ওড়িয়া ভাষা আবির্ভূত হওয়ার প্রাক্-স্তরেই সীমাবদ্ধ। কাজেই পূর্বাঞ্চলের ভাষাগুলির সঙ্গে তার পারস্পরিক মিল থাকা মোটেই অসম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, চর্যাপদের রচয়িতারা সকলেই সমসাময়িক ছিলেন না অথবা ছিলেন না একই অঞ্চলের অধিবাসী। সুতরাং কোনো চর্যাকার যে উড়িষ্যা-বাসী ছিলেন না—এমন কথা জোর গলায় বলা চলে না।

সে যাই হোক, ওড়িয়া ভাষার 'পাথুরে প্রমাণ'ও রয়েছে যথেষ্ট। দশম থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে মেলে প্রায় ৬০টি প্রস্তর- বা তাম্র-লেখ। এই লেখগুলির বিবরণ

---

১ S. K. Chatterji : PLCO, pp. 48-50.

২ Tripathi : EOLS, Serial No. 1, pp. 225-27 ; Chatterji : PLCO, pp. 31-34 ; Sircar & Krishnan : EI, Vol. XXXII, No. 29, pp. 229-238.

৩ Chatterji ; ODBL ; আরও দ্র. মজুমদার: বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম) ff ২.৬ (পৃ. ৫৫-৬১)।

ডঃ কুঞ্জবিহারী ত্রিপাঠীর গ্রন্থে[১] বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও ১৫৬৮-১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় আরও ১০০টি লেখ পাওয়া যায়। লেখ্য নিদর্শন হিসেবে প্রাচীনতম ওড়িয়া লেখগুলি অশোকানুশাসন বা খারবেল লেখের সঙ্গে তুলনীয়। শুধু লেখ্য নিদর্শন বলেই নয়, প্রাচীন রচনায় সুলভ কাব্যিক রীতির সর্বভারতীয় ঐতিহ্যকে অস্বীকার ক'রে গদ্যরচনার প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবেও এগুলি আধুনিকতার দাবী করতে পারে।

লেখ্য নিদর্শন ছাড়াও অন্যান্য সাহিত্যরচনা ওড়িয়া ভাষায় মেলে প্রচুর।[২] এগুলি মূলত কাব্যে রচিত। গদ্যে রচিত প্রধান দুটি প্রাচীন গ্রন্থ হলো—উড়িষ্যার রাজবংশ-পঞ্জী "মাদলা পাঞ্জী" (১২শ শতক) এবং অবধূত নারায়ণ স্বামী রচিত "রুদ্রসুধানিধি" (১৩শ শতক)। গ্রন্থগুলির ভাষাতাত্ত্বিক মূল্যায়ন এখনও অসম্পূর্ণ, অথচ প্রাচীন ওড়িয়া লেখমালা এবং এই গদ্যরচনার তুলনামূলক আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। অন্যান্য সাহিত্যধর্মী রচনাসম্ভারকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন লোকধর্মী সাহিত্য বা লোকসাহিত্য: ডাক বা ঢগ-ঢামালী জাতীয় প্রবচন, ব্রতকথা, চৌতিশা (বচ্ছাদাসের কলসা চৌতিশা ইত্যাদি), কোইলি (কেশব কোইলি ইত্যাদি) সম্পর্কিত রচনাবলী। এইজাতীয় সাহিত্যের ভাষাতাত্ত্বিক মূল্য বিশেষ নেই, কারণ এগুলির ভাষা লোকমুখে একেবারেই পরিবর্তিত বা বিকৃত হয়ে গেছে—রয়ে গেছে কেবল রচনার প্রাচীন ছাঁদটি। অপরজাতীয় প্রাচীন রচনা হলো বিশুদ্ধ ও পরিশীলিত পুরাণধর্মী অভিজাত সাহিত্য।

এইজাতীয় সাহিত্যের প্রধান রচনাকার ও তাঁদের বিশিষ্ট সাহিত্যকর্ম নিচে দেওয়া হলো: চতুর্দশ শতকের মহাকবি শারলাদাস (মহাভারত); পঞ্চদশ শতকের অর্জুন দাস (রামবিভা) ও শিশুশঙ্কর (ঊষাভিলাষ); ষোড়শ শতকের কবি চৈতন্যপ্রভাবিত 'পঞ্চসখা'—বলরাম দাস (রামায়ণ, গুপ্তগীতা, বিরাটগীতা, বট অবকাশ), জগন্নাথ দাস (ভাগবত পুরাণ, তুলা ভিণা), অচ্যুতানন্দ দাস (গুরুভক্তি-গীতা, অণাকার সংহিতা, হরিবংশ), যশোবন্ত দাস (নাথ সাহিত্য বিষয়ক 'গোবিন্দচন্দ্র' এবং প্রেমভক্তি-ব্রহ্মগীতা, শিব-স্বরোদয়) ও অনন্তদাস; সপ্তদশ শতকের দীনকৃষ্ণদাস (রসকল্লোল), ভূপতিপণ্ডিত (প্রেমপঞ্চামৃত), দেবদুর্লভ দাস (রহস্যমঞ্জরী),

১ Tripathi : EOLS.

২ Chatterji : LLMI ; M, Mansinha : HOL ; CIL (Sahitya Akademi) : B. C. Majumdar : TSOL (3 Vols.), C.U. ; P. R. Sen : Modern Oriya Literature, C. U.

দ্বারকাদাস (পরচে গীতা); অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত কবি উপেন্দ্র ভঞ্জ (খ্রী. ১৬১৭-১৭২০, প্রায় ৪২টি গ্রন্থের গ্রন্থকর্তা), ভক্তচরণ দাস (মথুরামঙ্গল), অভিমন্যু সামন্ত সিংহার (বিদগ্ধচিন্তামণি), এবং উনিশ শতকের অন্ধ খোন্দ্ কবি ভীম ভোই (ভজনমালা, স্তুতিচিন্তামণি) ও অরক্ষিত দাস (মহীমণ্ডল গীতা) ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে প্রাচীন সাহিত্যিকদের রচনাগুলির ভাষাতাত্ত্বিক মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। কারণ, প্রাচীন রচনাগুলির প্রামাণিক সংস্করণ (Critical edition) এখনও অনেকাংশে অপ্রকাশিত।

আধুনিক ওড়িয়ার সঙ্গে প্রাচীন ওড়িয়ার ভাষাগত পার্থক্যও রয়েছে বেশ কিছু। যেমন আধুনিক ওড়িয়ায় ইংরাজী শব্দের বহুল অনুপ্রবেশ, বহু প্রাচীন ওড়িয়া শব্দের বিলুপ্তি বা অপ্রচলিতি, শ্বাসাঘাত (Stress Accent) সম্পর্কীয় বিধি এবং ধ্বনিগত কিছু নবীনত্ব। রূপতত্ত্ব (Morphology) বা ব্যাকরণগত পার্থক্যও রয়েছে প্রচুর। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে।[১]

উৎপত্তি বিচারে ওড়িয়া ভাষা ভারতীয় আর্যভাষার (Indo-Aryan) তৃতীয় স্তর সূচিত করছে। প্রথম স্তর হলো 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য' (Old Indo-Aryan, সংক্ষেপে OIA)। সময়সীমা খ্রী. পূ. ১৫০০-৫০০ অব্দ। এই সময়কার সংস্কৃত ভাষার একজাতীয় কথ্য রূপ থেকে উদ্ভূত হলো দ্বিতীয় স্তরের আর্য ভাষা অর্থাৎ মধ্য ভারতীয় আর্য (Middle Indo-Aryan, সংক্ষেপে MIA) বা সাধারণ প্রাকৃত। সময়সীমা খ্রী: পূ. ৫০০-খ্রী. অ. ১০০০। স্বাভাবিকভাবেই আর্যভাষার বিবর্তনগত পার্থক্য এবং আঞ্চলিক বিভেদ ছিল। তাই এই যুগের তিনটি উপস্তর স্বীকৃত হয়ে থাকে, যথা—(ক) আদি উপস্তর (খ্রী. পূ. ৫০০-খ্রী. অ. ২০০)—যার নিদর্শন রয়ে গেছে মহারাজ অশোকের শিলা লেখমালা এবং বিপুল পালি সাহিত্যে। (খ) মধ্য উপস্তর (খ্রী. অ. ২০০-৬০০)—যার পরিচয় মেলে বিভিন্ন প্রাকৃতে রচিত সাহিত্য বা সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত সাহিত্যিক প্রাকৃতে। (গ) তৃতীয় উপস্তর (খ্রী. অ. ৬০০-১০০০) বা অপভ্রংশ স্তর, রচনা-নিদর্শন অপভ্রংশ সাহিত্যসম্ভার। আঞ্চলিক বিভেদ বা উপভাষাগত বৈশিষ্ট্য বিচারে দেখা যাবে শৌরসেনী প্রাকৃত বা অপভ্রংশ যেমন পশ্চিমদেশীয়, অথবা মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত যেমন দক্ষিণদেশীয় উপভাষা, মাগধী প্রাকৃত তেমন পূর্বাঞ্চলের প্রচলিত ভাষা। সমগ্র বিহারী ভাষাগুলি (অর্থাৎ ভোজপুরী, মগহী ও মৈথিলী), বাঙলা, এবং ওড়িয়া হলো এই মাগধী প্রাকৃত-উদ্ভূত আধুনিক ভাষা।

---

১ P. C. Majumdar : HPO ; Misra : MOA.

অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মতো ওড়িয়া লিপিরও জননী ব্রাহ্মীলিপি (খ্রী. পূ. ৩য় শতক—খ্রী. অ. ৩য় শতক)। অন্তর্বর্তী গুপ্তলিপি (খ্রীষ্টীয় ৩য়-৬ষ্ঠ শতক) ও কুটিল লিপির (খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ-১১শ শতক) স্তর অতিক্রম ক'রে প্রত্নবাঙলা লিপি (১১শ-১৪শ) উদ্ভূত হয়েছে। এই লিপিই বাঙলা, অসমীয়া, মৈথিলী প্রভৃতি পূবী ভাষার পূর্বতন রূপ। তবে ওড়িয়া লিপির স্বাতন্ত্র্য দেখা গেছে সম্ভবত ১৪শ-১৬শ শতকের মধ্যে। তালপত্রের ওপর লৌহশলাকার দ্বারা লেখনী চালনার ফলে ওড়িয়া হরফগুলি গোলাকার ধারণ করেছে, ফলে তা কতকটা তেলুগু হরফের মতো দেখায়।

ভারতীয় ভাষার ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক আলোচনা উড়িষ্যাকে বাদ দিলে অপূর্ণ থেকে যায়। তার কারণ, উড়িষ্যার ভাষাচিত্র তার পুরাতাত্ত্বিক মহান্ নিদর্শনের মতই বিপুল এবং কালজয়ী, সুরক্ষিত এবং সংহত। প্রাচীনতার প্রতি দুর্বার আকর্ষণ, ধর্মকেন্দ্রিক ঐতিহ্যের প্রতি সুগভীর বিশ্বাস ও চিরন্তন আদর্শের স্বপ্নপ্রয়াণ অথচ বিমূর্ত বাস্তবতার জন্য রূপোন্মুখ পিপাসা এবং স্থপতির দৃঢ়মুষ্ঠি নৈপুণ্য, বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়কামী আবেগ ও দুর্দম প্রাণচাঞ্চল্য উড়িষ্যাবাসীর স্বভাবসিদ্ধ গুণপনা। তাই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রাথমিক স্তরেই দেখা যায় তথাকথিত বেদবিরোধী পূর্বাঞ্চলে বেদাধ্যয়ন থেকে বিরত হন নি উড়িষ্যাবাসী। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ৺দুর্গামোহন ভট্টাচার্য পুরী জেলার বাসুদেবপুর গ্রাম ও বালেশ্বর জেলার মাকন্দা ও মহান্তিপুরা গ্রাম থেকে অথর্ববেদের কয়েকটি পুঁথি আবিষ্কার ক'রে প্রমাণ করলেন যে কাশ্মীর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের অঞ্চলবিশেষ ছাড়াও পূর্ব ভারতে এই বেদের প্রচলন ছিল।[১]

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম উপস্তরের নিদর্শনও রয়েছে উড়িষ্যাদেশে। ধৌলি (পুরী জেলায়, ভুবনেশ্বরের কাছে) ও জৌগড়-এ (গঞ্জাম জেলা) ভারতের আদি লিপি ব্রাহ্মীতে উৎকীর্ণ মহারাজ অশোকের শিলালেখের (খ্রী. পূ. ৩য় শতক) ভাষাতাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম। পূর্ব ভারতের সর্বপ্রাচীন এই সম্পদে তদানীন্তন কথ্য ভাষার উপভাষাগত বিভেদ ও বৈচিত্র্য চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে। আর একটি মূল্যবান সংযোজন হলো, ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ কলিঙ্গরাজ খারবেলের শিলালেখ (খ্রী. পূ. ২য় শতক)। উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের নিকটে উদয়গিরি পাহাড়ের হাথি-গুম্ফার দ্বারশীর্ষে এই লেখটি খচিত আছে। অশোকের গির্নার্ অনুশাসন এবং বিশেষত পালি ভাষার সঙ্গে এই লেখের ভাষার খুব সাদৃশ্য আছে। খারবেল লেখের ভাষাকে ভিত্তি

---

১ D. Bhattacharya : Paippalāda Saṁhitā (Vol. I & II), 1964, 1970, Calcutta.

করেই Oldenberg ও Müller কলিঙ্গ দেশকেই পালি ভাষার উদ্ভব স্থল ব'লে প্রমাণ করেছেন।

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপস্তরের অনেক উপাদান মেলে উড়িষ্যাবাসী বৈয়াকরণ ও কবি মার্কণ্ডেয় (১৭শ শতক)—রচিত 'প্রাকৃতসর্বস্ব' নামক গ্রন্থে।[১] গ্রন্থটি কুড়িটি অধ্যায়ে বিভক্ত একটি বৃহৎ প্রাকৃত ব্যাকরণ। ভাষা, বিভাষা, অপভ্রংশ ও পৈশাচী—এই চারটি ভাগে বিভক্ত ক'রে তিনি বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার বিস্তৃত আলোচনা ক'রে গেছেন।

আধুনিক যুগেও উৎকলবাসীদের ভাষা-প্রীতি স্তব্ধ হয়ে নেই। তার ফলেই 'পূর্ণচন্দ্র ওড়িআ ভাষাকোষ'-এর (১৯৩১-৪০) মতো একটি সপ্তকাণ্ড সুবৃহৎ অভিধান রচনা সম্ভবপর হয়েছে—যা আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির পক্ষে চিরকালীন আদর্শস্বরূপ হয়ে থাকবে সুনিশ্চিত।

এই সীমিত আলোচনার অবসরেই বোঝা যাবে, ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে ওড়িশা-বাসীদের দান কতখানি। সর্বপ্রাচীন লেখ্য নিদর্শনের সংরক্ষণ, ভাষায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার প্রয়াস, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মতই ভাষাসম্পর্কীয় ধ্রুপদী মনোবৃত্তি, বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর ভিন্নমুখী প্রভাব স্বীকরণ ও সমন্বয়ের ঔদার্য অথবা প্রাচীন যুগেই গদ্য রচনার মতো দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ও নৈপুণ্য ওড়িয়া ভাষাভাষীদের ভাষাসম্পর্কীয় ধ্যানধারণার প্রকৃত মানস চিত্রটি তুলে ধরে।

৬.২.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ওড়িয়ার ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণগুলি সংক্ষেপে এই—

১. ওড়িয়ার স্বরধ্বনি: ই, উ, এ, ও, আ, অ /i, u, e, o, ɑ, ɔ/। লক্ষণীয়, বাঙলাসুলভ এ্যা /æ/ ধ্বনি ওড়িয়ায় মেলে না, তবে উপভাষায় এ' /ɛ/ ধ্বনি মেলে। সীমিত ক্ষেত্রে 'আ' /ɑ/ ধ্বনির হ্রস্ব-দীর্ঘ বৈপরীত্য মেলে, যেমন, না "নয়" : নাআ 'নৌকা'।

২. সংস্কৃত ঋ ধ্বনি সমগ্র পূর্বী ভাষায় 'রি' রূপে উচ্চারিত হলেও ওড়িয়াতে তা 'রু' রূপে উচ্চারিত।

৩. ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি বাঙলারই মতো। লক্ষণীয় হলো প্রাচীন ণ /ɳ/ এবং ল় /ɭ/ ধ্বনির সংরক্ষণ, যা পূর্বী ভাষাগুলির কোথায়ও মেলে না। দুটি ধ্বনিই

১ S. R. Banerji : ESPG, pp 49-51

ধ্বনিমানক (তু. মন 'মন' ঃ মণ 'নিয়ন্ত্রণ করা' ; কনা "ছেঁড়া কাপড়" ঃ কণা "কানা" ;[১] বড় ঃ বল. ('বড় ঃ শক্তি') ।[২]

৪. বিহারী ভাষাগুলির মতো মহাপ্রাণিত নাসিক্যধ্বনি ও তরলধ্বনি ম্হ /mh/, ন্হ /nh/, র্হ /rh/, ল্হ /lh/ । তবে এগুলি ধ্বনিমানক নয়, যদিও ড় ঃ ঢ় /ṛ ঃ ṛh/ ধ্বনির বৈপরীত্য অসুলভ নয়, তু. বুড়া ঃ বুঢ়া (ডুবে যাওয়া ঃ বৃদ্ধ), বড়ি ঃ বঢ়ি 'বন্যা' ।[৩]

৫. ওড়িয়ায় শ, ষ, স ধ্বনিত্রয়ের উচ্চারণ বাঙলার মতো নয় । বাঙলায় তা শ/ʃ/ । কিন্তু ওড়িয়ায় তা স্ /s/ (তু. ইংরাজী shop এবং sob) ।

৬. ওড়িয়া শব্দে শ্বাসাঘাত (Stress) পড়ে সাধারণত বাঁ দিক থেকে প্রথম অথবা দ্বিতীয় অক্ষরে (Syllable) ।[৪]

৭. বাঙলার মতই স্বরসংগতি সুলভ (তু. পোখিরি/পোখুরি "পুকুর") । আনুনাসিকতাও ধ্বনিমানক (Phonemic), যেমন না ঃ নাঁ "নাম" ।

৮. ওড়িয়ায় সাধারণত স্বরসংযোগ দেখা যায় অর্থাৎ বাঙলার মতো সন্ধি হয় না, যথা—ঘিঅ (<সং ঘৃত), পুঅ (<সং পোত) ইত্যাদি ।

৯. বাঙলা ও অসমীয়াসুলভ ওড়িয়ার শব্দগুলি লিঙ্গ নিরপেক্ষ ।

১০. বহুবচন প্রত্যয় হলো ঃ -এ (<সং -এভিঃ) এবং অনুসর্গ -মান (<সং মান্য) ।

১১. ওড়িয়ার অনুসর্গীয় প্রত্যয়গুলি এই— -কু (মুখ্য ও গৌণ কর্মে), -ঠুঁ, রু, -উ (অপাদানে), -র, বহুবচনে -ঙ্কর (সম্বন্ধপদে) এবং -ত (অধিকরণে) ।

১২. অতীতকাল ও ভবিষ্যৎ কালের পদগঠনে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় যথাক্রমে -ইল এবং -ইব (তু. কলা <*কইল "করিল", গলা <*গইল "গেল", মলা "মরিল", যাইল, যাইব ইত্যাদি) । উৎপত্তিবিচারে ওড়িয়া ক্রিয়াবাচক পদগুলি কৃদন্ত (Participial) অর্থাৎ এগুলি সংস্কৃত -(ই)ত [ক্ত] এবং তব্য প্রত্যয়ের বিবর্তনজনিত ।

---

১ Majumdar : HPO. p. 233.
২ *ibid.* p. 234
৩ *ibid* p. 235
৪ আবিস্তৃত লোচনা দ্র. HPO : Chapter XIV.

১৩. যৌগিক কাল গঠিত হয় অস্ত্যর্থক (Substantive) অছ্ এবং -থি/থা ক্রিয়াযোগে (করুছি "করিতেছি", করিছি "করিয়াছি" করুথিব, করুথাএ ইত্যাদি)।

৬.৩ অসমীয়া

৬.৩.১ ভাষা, নৃতত্ত্ব এবং ইতিহাস

অসমীয়া আসাম রাজ্যের সরকারী ভাষা। এই ভাষা ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম অনুসূচী-স্বীকৃত ভাষাগুলির অন্যতম। ১৯৬১-সমীক্ষা অনুযায়ী অসমীয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা ৬৮ লক্ষ ৩ হাজার ৪৬৫। আসাম রাজ্যের বাইরে অসমীয়া ভাষাভাষীদের বসবাস নগণ্য বললেই চলে (আসামে ৬৭,৮৪,২৭১; পশ্চিমবঙ্গে ৮২৯৭, অরুণাচলে ৩,৬৩৮)। ১৯৭১-সমীক্ষায় মোট অসমীয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আনুমানিক ৮৯ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯৭৭।

আসাম রাজ্যে অসমীয়া ভাষাভাষীদের সংখ্যার হার সমগ্র জনসমষ্টির ৫৭.১৪ শতাংশ। অন্যান্য ভাষাভাষীদের হার এইরূপ—বাঙালী ১৭.৬০%, হিন্দী ৪.৪০%, খাসী ২.৯৭%, বোডো ২.৮২% এবং গারো ২.৪৭% ইত্যাদি।[১] অসমীয়া বলা হয় প্রধানত ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকা অঞ্চলে, পূর্বে লখিমপুর জেলা থেকে পশ্চিমে গোয়ালপাড়া পর্যন্ত। আসামের সমভূমি অঞ্চলেই অসমীয়ার প্রচলন বেশি, আর এই রাজ্যের পার্বত্যাঞ্চলে অন্যান্য ভাষাভাষীদের বসবাস, কিন্তু তাঁরাও দীর্ঘ দিন ধ'রে অসমীয়া ভাষাকে সমৃদ্ধ করে এসেছেন।

আসামের উত্তরে ভুটান ও উত্তর-পূর্বে অরুণাচল প্রদেশ, পূর্বে নাগাভূমি বা নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর ও ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে ত্রিপুরা ও বাঙলাদেশ, মেঘালয় এবং পশ্চিমে বাঙলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ। আসাম রাজ্যের (রাজধানী দিসপুর) ভাষাতাত্ত্বিক চিত্র যথেষ্ট জটিল। কারণ, অসমীয়া ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও তা অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা দ্বারা পরিবেষ্টিত, যেমন, ভোট-চীনা ও থাই-কাদাই ভাষাসমূহ (নাগা, মিজো/লুশেই, মিকির, গারো কাছাড়ী/বোড়ো ইত্যাদি) এবং অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় মোন্-খ্মের বর্গভুক্ত খাসি (মেঘালয়)।

অসমীয়ার উপভাষাগুলিকে দুইটি প্রধান গুচ্ছে ভাগ করা যায়—(ক) পূর্বী অসমীয়া: পূর্বে গৌহাটী (কামরূপ জেলার পূর্ব প্রান্তস্থিত) থেকে অর্থাৎ নওগাঁও

১ R. C. Nigam : LH, p. 262.

জেলার পশ্চিম প্রান্ত থেকে সদিয়া—এই সমগ্র পূর্বাঞ্চল (অর্থাৎ শিবসাগর, লখিমপুর, ডিব্রুগড় ইত্যাদি জেলা) এবং (খ) পশ্চিমা অসমীয়া ঃ নওগাঁর পশ্চিম প্রান্ত থেকে পূর্বে গোয়ালপাড়া (অর্থাৎ কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জেলা) পর্যন্ত বিস্তৃত ভাষাঞ্চল।

উপরোক্ত পূর্বী উপভাষা পশ্চিমা উপভাষার চেয়ে অনেক সংহত এবং শিবসাগর সংলগ্ন অঞ্চলের ভাষাই অসমীয়ার আদর্শ উপভাষা। এই ভাষাঞ্চল এককালে আহোম রাজাদের প্রাচীন রাজধানী ছিল। গোয়ালপাড়া এবং শিবসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে কামরূপ জেলা অবস্থিত। এই ভাষাঞ্চল পশ্চিমা অসমীয়ার অন্তর্গত কিন্তু পশ্চিমা অসমীয়াকে আবার কতকগুলি বিভাষায় (**Sub-dialects**) ভাগ করা যায়। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলের দক্ষিণ কামরূপী মোটামুটি সংহত (**Uniform**) কিন্তু উত্তর কামরূপীর দুটি বিভাগ ঃ (ক) পূবী´ কামরূপী—যা উত্তর-পূর্ব কামরূপের সমগ্র অঞ্চল এবং দরং ও নওগাঁ জেলার পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল এবং (খ) পশ্চিমা কামরূপী—উত্তর-পশ্চিম কামরূপের ভাষা এবং এর কেন্দ্র বড়পেটা। এইরূপ গোয়াল-পাড়ার পশ্চিমা উপভাষা সংহত (**Uniform**) নয়। গোয়ালপাড়ার পূর্বী উপভাষার সঙ্গে কামরূপীর সাদৃশ্য আছে কিন্তু গোয়ালপাড়ার পশ্চিম উপভাষাগুলির মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট—তা বাঙলা, রাজবংশী এবং গারো দ্বারা প্রভাবিত। এককালে এই অঞ্চল কোচ রাজাদের অধীনে ছিল।

উৎপত্তি বিচারে অসমীয়া ভারতীয় আর্যের অন্তর্গত। মধ্য ভারতীয় আর্যের (**MIA**) পূর্বী উপভাষা অর্থাৎ মাগধী প্রাকৃত থেকে এই ভাষা উদ্ভূত হয়েছে। কাজেই এই হিসাবে তা বাঙলা, ওড়িয়া ও বিহারী ভাষাগুলির সহোদরস্থানীয়। সুনীতিবাবুর মতে প্রত্ন-বাঙলা স্তরে পূর্বাঞ্চলীয় মাগধী প্রাকৃত ও মাগধী অপভ্রংশের চারটি আঞ্চলিক বিভেদ দেখা গিয়েছিল, যথা, রাঢ়, বঙ্গ, বরেন্দ্র এবং কামরূপ। রাঢ় উপভাষাগুচ্ছ থেকে উদ্ভূত হয়েছে পশ্চিম বাঙলার আদর্শ কথ্য উপভাষা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ওড়িয়া। বারেন্দ্র উপভাষাগুলি উত্তর-মধ্য বাঙলা কেন্দ্রিক এবং বঙ্গ উপভাষাগুলি ছিল পূর্ব বাঙলাদেশে প্রচলিত।[১] আর শেষোক্ত কামরূপী থেকে উত্তর বঙ্গ এবং আসামের ভাষাগুলি বিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন কালে উত্তর বঙ্গের ভাষা এবং অসমীয়া একটি উপভাষার অন্তর্গত ছিল। কোচবিহারের দক্ষিণ-পশ্চিমে কামতাপুরের কোচ রাজাদের আনুকূল্যে অসমীয়া ভাষা

---

১ Chatterji : ODBL I ; p. 140

ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটে ১৫শ/১৬শ শতকের কালসীমায়। প্রকৃতপক্ষে অসমীয়া বাঙলা ভাষা থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে আনুমানিক ১৪শ শতক থেকে। তবে পুরোনো অসমীয়া প্রধানত কামরূপের আঞ্চলিক ভাষাকে আশ্রয় ক'রে গড়ে উঠেছে, সে-ভাষা স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গের বাঙলার কাছাকাছি। তাই এখনও উত্তর বঙ্গ এবং পশ্চিম আসাম (কামরূপ ও গোয়ালপাড়া) অঞ্চলের ভাষা একই উপভাষার অন্তর্গত (অর্থাৎ কামরূপী উপভাষা)।

আধুনিক অসমীয়া ও বাঙলা ভাষার মিল যথেষ্ট, লিপির সাধর্ম্যও লক্ষণীয় (পার্থক্য কেবল দুইটি হরফে, যথা অসমীয়া ৰ এবং ৱ)। তবে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বহুক্ষেত্রে, বিশেষত মধ্য যুগে, ওড়িয়া ও অসমীয়ার সাদৃশ্য ধরা পড়ে। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গ্রীয়ার্সন বলেছেন : "Māgadhi Apabhraṃśa, in fact, may be considered as spreading out eastwards and southwards in three directions. To the North-East it developed into Northern Bengali and Assamese, to the south into Oṛiyā and between the two into Bengali. Each of these three descendants is equally directly connected with the common immediate parent and hence we find North Bengali agreeing in some respects rather with Oṛiyā, spoken far away to the south, than with the Bengali of Bengal proper of which it is usually classed as a sub-dialect" (LSI, Vol. I, part i pp. 125-126).

আসাম রাজ্যের ভাষাতাত্ত্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়নের পূর্বে তার নৃতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক পরিচয় সম্পূর্ণ হওয়া দরকার। আসাম প্রাচীনকাল থেকেই (আ. খ্রী. পূ. ১০০০) প্রধানত মঙ্গোলয়েড নৃজাতি (Race)-ভুক্ত জনগণের আবাসস্থল ছিল। অবশ্য আরও পূর্বে অস্ট্রিকভাষী প্রাক্-অস্ট্রালয়েড (Proto-Australoid) নৃজাতির প্রাধান্য এই অঞ্চলে নিশ্চয়ই দেখা গিয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির মতো (নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর ব্রহ্মদেশ, কম্বোডিয়া, অস্ট্রেলিয়ার অঞ্চল বিশেষ)। এই প্রসঙ্গে আসামে অস্ট্রিকভুক্ত খাসির অস্তিত্ব লক্ষণীয়। আরও একটি স্বীকৃত তথ্য, মঙ্গোলয়েড অনুপ্রবেশের পূর্বেই এই অঞ্চলে দ্রাবিড়ভাষী প্রাক্-ভূমধ্যসাগরীয় (Palaeho-Meditarranean) বা ভেদ্দীদ্ নৃজাতির সঙ্গে এই অস্ট্রালয়েড জাতির নৃতাত্ত্বিক সংমিশ্রণ এবং সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটেছিল (বিশেষত পশ্চিমাঞ্চলে)। খ্রী. পূ. ২য় শতকের কাছাকাছি সময়ে এই অঞ্চল আবার নর্ডিক বা ককেশীয় নৃজাতিভুক্ত আর্য

ভাষাভাষীদের (এই আর্যরাও অবশ্য আর অবিমিশ্র নর্ডিক নয়) হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাষার (ই. ইউ) অবাধ প্রভাব স্বীকার করে নিল (আর্যভাষা স্বীকরণের কারণ, বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষার দুর্বোধ্যতা)। অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়-আর্য অনুশীলিত সংস্কৃতির সমন্বয় সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই সম্ভবত মঙ্গোলয়েড জাতির প্রাধান্য ঘটতে থাকে ভারতের পূর্বাঞ্চলে। আর এদের তুলনায় যে মঙ্গোলয়েড নবাগত, তা বোঝা যায় ভারতে তাদের সীমিত প্রান্তিক প্রাধান্য দেখে। হিমালয়ের দক্ষিণদেশে, আসামে, উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলায় এদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকলেও আরও পশ্চিমে তা প্রসারিত হতে পারে নি, আর তার কারণ একটিইঃ এখানে এক সংহত, নিবিড় ও বিশাল সংস্কৃতি-সাম্রাজ্য পূর্বেই গড়ে উঠেছিল, যাকে প্রতিহত ও পরাভূত করা এই নবাগতদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, বরং বিপরীত পক্ষে পূর্ববঙ্গ-উত্তরবঙ্গ-আসাম অধ্যুষিত এই মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠী নিজেরাই ক্রমে প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির কুক্ষিগত হচ্ছিল। বলা বাহুল্য, আসামে এবং পূর্বদেশীয় রাজ্যে এই আর্যীভবন এখনও ঘটে চলেছে অলক্ষিতে—যদিও নৃতাত্ত্বিক সংমিশ্রণ ঘটেছে আসামের পশ্চিমাঞ্চলেই অধিক (তাই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বরাবর যতই পূর্ব দিকে যাওয়া যায় ততই অধিকতর পরিমাণে মঙ্গোলীয় শারীর লক্ষণ লক্ষ্য করা যায়)।

বাস্তবিক পক্ষে আসামের ইতিহাস এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। নৃতাত্ত্বিক বিচারে মঙ্গোলয়েড উপাদান উপজাতীয়দের (Tribal) মধ্যে সহজলভ্য। ধর্মীয় আবহে তা প্রধানত হিন্দু-বৌদ্ধ ধ্যানধারণায় আক্রান্ত (যদিও লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানে তা স্থানিক), আর ভাষাগত নিরীক্ষায় তা ভিন্নধর্মী ভাষার সহ-অবস্থান কেন্দ্র, যেমন, অষ্ট্রিক (খাসি), ভোট-বর্মী (বোড়ো-নাগা), তাই-চীনা (আহোম, খাম্‌তী) এবং ইন্দো-ইউরোপীয় (বাঙলা, অসমীয়া)।

এই প্রসঙ্গে পূর্বতন আসাম রাজ্যের ভাষাতাত্ত্বিক বিন্যাস স্মরণ রাখা দরকার। পূর্বেই বলা হয়েছে (দ্র. পৃ. ৬৫) ভোট-চীনা গোষ্ঠীর (Sino-Tibetan) দুইটি শাখা—ভোট-বর্মী এবং তাই-চীনা। ভারতের উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে এরা আসাম রাজ্যে প্রবেশ করে। ভোট-বর্মী শাখার (ক) ভোট-হিমালয়ী উপশাখা বোধ হয় সর্বপ্রথম ভারতে প্রবেশ করে এবং হিমালয়ের দক্ষিণ অধিত্যকা বরাবর নেপাল ইত্যাদি অঞ্চলে অধিষ্ঠিত হয়। ভোট-বর্মী শাখার দ্বিতীয় উপশাখা (খ) উত্তর-পূর্ব আসাম উপগোষ্ঠীর ভাষাগুলি (অক, আবোর (আদি), মিরি, দফ্‌লা, মিশ্‌মি ইত্যাদি) ঔপজাতিক ভাষা (Tribal Language) হিসেবে ভুটানের পূর্ব থেকে সদিয়া সীমান্ত পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে বিস্তৃত। এই ভাষাগুলি বর্তমানে অরুণাচল (পূর্বতন নেফা)

রাজ্যের অন্তর্গত হয়েছে (রাজধানী ইটানগর)। (গ) ভোট-বর্মী শাখার আসাম-বর্মী উপশাখা উপরের উপশাখাগুলির মতই হোয়াংহো নদীর দক্ষিণ উপত্যকা থেকে দক্ষিণ দিক অভিমুখে যাত্রা ক'রে ব্রহ্মদেশের উত্তর অঞ্চলে এসে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের একটি দল আরও দক্ষিণে ব্রহ্মদেশে এবং দক্ষিণ-পূর্ব আসামে ছড়িয়ে পড়ে (কাচিন বা সিংফো, লোলো, কুকি-চিন, ম্রন্মা বা বর্মী, মণিপুরী ইত্যাদি)। অপর দল—বোডো ও নাগারা—ব্রহ্মপুত্র বরাবর আসাম ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে।

উপরোক্ত আসাম-বর্মী উপশাখার বোড়ো ভাষাভাষীদের ঐতিহাসিক ভূমিকা অসমীয়া সংস্কৃতি ও ভাষা বিচারে অপরিহার্য। প্রায় হাজার বছর আগে খাসি এবং জৈন্তিয়া পার্বত্যাঞ্চল, প্রত্যন্ত-পূর্বী নাগা এবং দক্ষিণ-পূর্বী কুকি-চিন ভাষাঞ্চল বাদে সর্বত্রই এই বোড়ো ভাষীরা ছড়িয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ প্রাচীনকালে এরা সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং পশ্চিম আসাম (গারো পার্বত্যাঞ্চল, শ্রীহট্ট, কাছাড়), পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে (উত্তর মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা, কুমিল্লা এবং সম্ভবত নোয়াখালি) একটি সংহত ও অবিছিন্ন ভাষাঞ্চল গড়ে তুলেছিল। বলা বাহুল্য, এই বোড়ো ভাষাভাষীরা বর্তমানে বাঙলা বা অসমীয়া-ভাষীরূপে একাকার হয়ে গেছে। এখন বোড়ো ভাষীদের কিছু কিছু গোষ্ঠী বিছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে নানা স্থানে, যেমন ত্রিপুরী/টিপ্‌রা বা ম্রুঙ্‌, গারো, কাছাড়ী, রাভা, কোচ, মেচ, মিকির ইত্যাদি। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্য (রাজধানী আগরতলা) ছাড়াও প্রধানত গারো ভাষী মেঘালয় (রাজধানী শিলং) পৃথক রাজ্যরূপে সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে।

এই উপশাখার অন্তর্গত নাগারা প্রধানত আসামের পূর্বদেশস্থ নাগা পার্বত্যাঞ্চলে এবং মণিপুরের অধিবাসী। নাগারা মঙ্গোলয়েড প্রবংশের (Race) অন্তর্গত হলেও সম্ভবত নিগ্রোয়েড জাতির উপাদানে সংমিশ্রিত। এরা উন্নত সভ্যতা গড়ে না তুললেও নিজেদের ঔপজাতিক তথা ভাষিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে কতকটা বিচ্ছিন্নভাবে। বর্তমানে ভাষাতাত্ত্বিক রাজ্য পুনর্গঠনের নীতি অনুসৃত হওয়ায় নাগাল্যাণ্ড রাজ্য স্বীকৃত হয়েছে (রাজধানী কোহিমা)।

কুকি-চিন উপজাতি ব্রহ্মদেশে অধ্যুষিত হলেও প্রাচীন কাল থেকেই তারা মণিপুর এবং লুশেই পার্বত্যাঞ্চলের অধিবাসী, পরে ত্রিপুরা রাজ্যেও প্রসারলাভ করে। এই উপজাতিকে বাঙালী ও অসমীয়ারা বলে কুকি এবং বর্মীরা বলে চিন। তাই এদের কুকি-চিন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কুকি-চিন অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলির (লুশেই বা মিজো, কুকি, মণিপুরী ইত্যাদি) মধ্যে মণিপুরী বা মেইতেই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব আলোচনার সূত্র ধ'রে মণিপুরীর গোত্র নির্ধারণ করা

হবে এইভাবে ঃ মণিপুরী চীনা-তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠীর শাখা ভোট-বর্মী র উপশাখা কুকি-চিনের অন্তর্গত। এই ভাষার ভাষাঞ্চল-সীমানা হলো—উত্তরে নাগাল্যাণ্ড, পূর্বে ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে ব্রহ্মদেশ ও মিজোরাম এবং পশ্চিমে আসামের কাছাড় জেলা। ১৯৬১-সমীক্ষায় মণিপুরী ভাষাভাষীর সংখ্যা ৬,৩৬,৪০০ (১৯৭১-সমীক্ষায় ৭,৮০,৮৭১)। আসাম ও ত্রিপুরাতেও মণিপুরী ভাষাভাষী যথেষ্ট মেলে। পূর্ব ভারতে প্রধানত মঙ্গোলয়েড বা কিরাতজন যে বিশিষ্ট সংস্কৃতিগুল গড়ে তুলেছে তার মধ্যে প্রধান হলো মণিপুরী সংস্কৃতি—ভোট-বর্মীভুক্ত বোড়ো, ভোট-হিমালয়ী নেওয়ারী এবং তাই-চীনাভুক্ত আহোম-সংস্কৃতির পাশেই এর স্থান। তবে পার্থক্য হলো, মণিপুরী এখনও সজীব এবং উদীয়মান সংস্কৃতির অগ্রদূত। বস্তুত, পূর্ব ভারতে বাঙলা-অসমীয়ার পরেই মণিপুরীর স্থান। এমনকি সর্বভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতেও মণিপুরীর অবদান অনস্বীকার্য। মণিপুরী বৈষ্ণবীয় নৃত্য (রাসলীলা কেন্দ্রিক) সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি মহান অবদান। মণিপুরী বা মেইতেই পৌরাণিক যুগ থেকেই হিন্দুসংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। মণিপুরের রাজারা মহাভারতে বর্ণিত তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের বংশধর ব'লে কথিত। অধিকাংশ মণিপুরী নিজেদের ক্ষত্রিয় ব'লে মনে করেন। এদের একশ্রেণী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী নামে পরিচিত।* তবে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতক থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অনুপ্রেরণায় মণিপুর বৈষ্ণবধর্মে অনুপ্রাণিত। মণিপুরীর নিজস্ব লিপি আছে, যদিও তা ব্রাহ্মী থেকে উদ্ভূত। তবে ১৮শ শতকের মধ্যপাদ থেকে মণিপুরে বাঙলা লিপি গৃহীত হয়েছে। মণিপুরী সাহিত্যও যথেষ্ট প্রগতিশীল। বর্তমানে নাগা ও কুকিরাও এই ভাষা আয়ত্ত করতে শুরু করেছে। বর্তমানে মণিপুর স্বতন্ত্র রাজ্য, এবং রাজধানী ইম্ফল।

কুকি-চিন উপশাখাভুক্ত অপর প্রধান ভাষা মিজো বা লুশেই অবিভক্ত আসামের দক্ষিণতম জেলার অধিবাসীদের ভাষা। ১৯৬১-সমীক্ষায় মিজো উপজাতিদের এই ভাষার জনসংখ্যা ২,২২,২০২ (১৯৭১ সমীক্ষায় ২,৭০,৩১২)। এদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী, শিক্ষিতের হার বোধ হয় ভারতে সর্বোচ্চ, রাজনৈতিক সচেতনতাও যথেষ্ট। বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী মিজো-অধ্যুষিত মিজোরাম নতুন স্বীকৃত রাজ্য (রাজধানী আইজল)।

---

* প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুপুরিয়া বা বিষ্ণুপ্রিয়া ও মণিপুরী পৃথক ভাষা। মণিপুরীরা বিষ্ণুপ্রিয়াদের মণিপুরী ব'লে গণ্যও করে না। বিষ্ণুপুরিয়া আসলে বাঙলা ভাষার একটি বর্গীয় উপভাষা (class dialect)। গ্রীয়ার্সন এটিকে "Vulgar Bengali' বলেছেন (LSI, vol. III part iii, p, 20)। ১৯৭১ জনগণনায় বিষ্ণুপুরিয়ার জনসংখ্যা ৪৩ হাজার ৮১৩।

চীনা-তিব্বতীয় ভাষী মঙ্গোলয়েড নৃজাতির ভারতে অনুপ্রবেশ কখন ঘটেছিল, তার ইতিহাস অজ্ঞাত। কিন্তু এই ভাষাগোষ্ঠীর একটি শাখা তাই-চীনাদের ভারত আগমন ঐতিহাসিক ঘটনা। ব্রহ্মদেশ থেকে পৎকাই পর্বতমালা পেরিয়ে এবং নোয়া-দিহং নদী বরাবর এরা ভারতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। এদের একটি উপশাখা খামতী (ভাষাভাষীর সংখ্যা ২৯৬) এখনও অরুণাচলে প্রচলিত, কিন্তু অপর উপশাখা আহোম বর্তমানে সম্পূর্ণ লুপ্ত—যদিও বহুদিন ধ'রে আসামে এই আহোমরা ছিল রাজনৈতিক ঘটনাবর্তের কেন্দ্রবিন্দু। 'আহোম' নামকরণ থেকেই সম্ভবত আসাম নামের উৎপত্তি।[১] প্রকৃতপক্ষে ইং ১২২৮ থেকে ১৮২৪ সাল (ইংরাজ শাসনের সূচনা) পর্যন্ত আসামে এদেরই আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে আসাম প্রধানত বোড়োদের দ্বারাই শাসিত হতো। কিন্তু ১২৫০ থেকে ১৭০০ পর্যন্ত কালসীমা বাস্তবিক পক্ষে হয়ে দাঁড়িছে ভোট-বর্মী ভুক্ত বোড়ো এবং তাই-চীনাভুক্ত আহোম জাতির সংঘর্ষের ইতিহাস। এই রাজনৈতিক ঘটনাবর্তের উপসংহারে আহোমদেরই প্রাধান্য ঘটেছিল, বিশেষত আসামের পূর্ব দিকে। এই সময়ে তুর্ক-পাঠান-আফগানদের আক্রমণও অব্যাহত ছিল পশ্চিম দিকে, কিন্তু কোনো সময়ই তার প্রভাব ভারতের অন্যান্য অংশের মত সুদূরপ্রসারী হয় নি। সে যাই হোক, লক্ষ্য করার বিষয় খ্রী. পূ ২য় শতক থেকে আসামে যে আর্যীভবন এবং হিন্দুসংস্কৃতির আগ্রাসী প্রভাব দেখা যাচ্ছিল, তা শেষ পর্যন্ত আহোম সংস্কৃতিকেও কুক্ষিগত করেছিল। তাই ১৭শ শতক থেকে আহোমরা ক্রমে হিন্দুসংস্কৃতি ও ধর্মে অনুপ্রাণিত হতে থাকে। আর আনুমানিক ১৭৫০ সালের মধ্যেই এই আর্যীভবন পূর্ণাঙ্গ হয়। ফলস্বরূপ, আসামে ক্রমশই প্রাচীন আর্যভাষার সন্ততি অসমীয়ার প্রসার ও বোড়ো-ভাষাঞ্চলের ক্রমিক সংকোচন এবং সেই সঙ্গে আহোম ভাষার অবলুপ্তি।

আসামের আর একটি বিশেষ ভাষার নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। উপজাতিক ভাষা 'খাসি' (১৯৬১ এবং ১৯৭১ অনুযায়ী ভাষাভাষীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩,৬৪,৯৯৩ এবং ৩,৮৪,০০৬) আসামে অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্র 'ভাষাদ্বীপ' রচনা করেছে। বস্তুত, নৃতত্ত্ব বিচারে খাসি-ভাষীরাও মঙ্গোলয়েড কিন্তু ভাষার দিক দিয়ে তা অষ্ট্রিক গোত্রের মোন্-খ্মের উপশাখার অন্তর্ভুক্ত। চারিদিকে ভোট-বর্মী (বোড়ো) এবং আর্য (অসমীয়া-বাঙলা) ভাষাগুচ্ছের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েও এই 'ভাষাদ্বীপ' কীরূপে টিঁকে রইলো, তা বাস্তবিকই বিস্ময়াবহ ও গবেষণাসাপেক্ষ। খাসিয়া ভাষা আসামের খাসি ও জৈন্তিয়া

১ বিভিন্ন মতবাদ সম্পর্কে দ্র. Kakati : AFD, ff 2-3 ; Chatterji : KJK, p. 102.

পার্বত্য অঞ্চলে প্রচলিত, পার্শ্ববর্তী শ্রীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চলেও খাসিয়া ভাষীদের দেখা যায়। ভাষাতাত্ত্বিক রাজ্য পুনর্গঠনের বিধান অনুযায়ী খাসি-ভাষাকেন্দ্রিক 'মেঘালয়' রাজ্য (রাজধানী শিলং) বর্তমানে পুনর্গঠিত হয়েছে (১৯৭২) গারো, খাসি এবং জৈন্তিয়ার পার্বত্য জেলাগুলিকে একত্রিত ক'রে।

খাসি চারটি উপভাষায় বিভক্ত: (ক) আদর্শ খাসি (চেরাপুঞ্জি ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল) ; (খ) ল্যঙ্-ঙাম্ (Lyng-ngam) [খাসি পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে গারো পাহাড়ের সীমানা পর্যন্ত] ; (গ) স্যন্তেঙ্ বা প্নার্ (Synteng or Pnur) [শিলং-এর পূর্বে] এবং ওয়ার (War) [দক্ষিণের নিম্ন-উপত্যকা]। গত শতকের মধ্য ভাগ থেকে খাসির রীতিমত চর্চা শুরু হয়। ওয়েলশ্ খ্রীষ্টান মিশনারীদের বাইবেল অনুবাদের মাধ্যমেই তার সূত্রপাত। খাসির নিজস্ব লিপি নেই, তাই বর্তমানে রোমান বর্ণমালা প্রচলিত। রাজ্যে উচ্চশিক্ষারও যথেষ্ট প্রসার হয়েছে, অধিকাংশ খাসি ভাষীরাই খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী।

আসামের ঐতিহাসিক পটভূমিও এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। পূর্বেই বলেছি, আসাম প্রদেশে আর্যীভবন ঘটেছে অন্তত খ্রী. পূ. ২য় শতকের কাছাকাছি সময়ে। তবে এইসময় পশ্চিম আসাম প্রাগ্জ্যোতিষপুর নামে অভিহিত হতো। কেবল রামায়ণ মহাভারত নয়, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও এই নাম উল্লিখিত হয়েছে। রামায়ণের সাক্ষ্য অনুসারে অমূর্তরায় ধর্মারণ্য প্রাগ্জ্যোতিষ প্রতিষ্ঠা করেন। মহাভারতেও প্রাগ্জ্যোতিষ শক্তিশালী দেশরূপে বর্ণিত হয়েছে, এখানকার রাজা ভগদত্ত ছিলেন ম্লেচ্ছ। ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যে ক্রমে প্রাগ্জ্যোতিষ-পুরের পাশাপাশি কামরূপ নামেরও প্রচলন ঘটলো। কালিদাসের রঘুবংশে এই দুই নামেরই উল্লেখ আছে (৪র্থ সর্গ, শ্লোক, ৮১, ৮৩)। কালিকাপুরাণে (খ্রী, ১০ম শতক) আবার কামরূপ নামকরণেরও পৌরাণিক ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। তবে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষাশেষি হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে কামরূপ রাজ্যের প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া গেল। এখানে কামরূপকে সমুদ্রগুপ্তের করদ মিত্ররাজ্য ব'লে অভিহিত করা হয়েছে। হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক কামরূপ-নৃপতি ভাস্করবর্মার রাজত্বকালে চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ্ (৬৪৩ খ্রী) যখন এই দেশে আসেন, তখন তিনি এই দেশকে কামরূপ বলেই জানতেন (ক-মো-লু-পো)। আর এর পশ্চিম সীমানায় ছিল করতোয়া নদী (ক-লো-তু)। তিনি এ-ও লক্ষ্য করেছিলেন যে এদের ভাষা ভারতের মধ্যদেশীয় ভাষা থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। যাই হোক, ভাস্করবর্মার পর শতাব্দী কালের ইতিহাস অস্পষ্ট। এরপর 'ম্লেচ্ছাধিনাথ' শালস্তম্ভ বংশের সূচনা

(খ্রী. ৬৫০-৮০০)। পরবর্তী শালস্ত বা প্রালম্ভ রাজবংশের [৮০০-১০০০] (এরাও জাতিতে মঙ্গোলয়েড) শেষ নৃপতির এক জ্ঞাতি ব্রহ্মপাল একাদশ শতকের প্রথম দিকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা হন (রাজধানী দুর্জয়া অর্থাৎ বর্তমান গৌহাটী)। এই বংশের শেষ রাজা ধর্মপাল (১২শ শতকের প্রথম পাদ) গৌড়ের রাজা রামপালের বশ্যতা স্বীকার করেন। অতঃপর খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষাবধি চন্দ্রবংশীয় নৃপতিরা সম্ভবত কামরূপ শাসন করেছিলেন। লক্ষণীয়, উপরোক্ত নৃপতিগণ জাতিতে মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত হলেও ধর্মে ছিলেন হিন্দু।

ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে (খ্রী. ১২০৫) মুসলমান আক্রমণ ও আধিপত্যের ফলে পূর্ব ভারতে যখন নতুন ইতিহাস রচিত হতে থাকলো, তখনও কিন্তু কামরূপ তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলো। তাই বখ্‌তিয়ার খিলজী (খ্রী. ১২০৫), গিয়াসুদ্দীন ইওয়াজ (১২২৭), মুগীসুদ্দীন ইউজবক (১২৫৭) প্রমুখ মুসলমান অভিযানকারীরা বারবার পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে কামরূপে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়। ঐ সময় ইলিয়াস শাহ্‌ (১৩৪২-১৩৫৭) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা আক্রমণ ক'রে কামরূপ পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল জয় করেন।

এদিকে ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে শান্‌ জাতির অন্যতম শাখা আহোমরা (তাই-চীনা ভাষাভাষী) পূর্ব দিক থেকে আসামে প্রবেশ করে এবং শতাধিক বৎসর ধ'রে বিভিন্ন শক্তিশালী উপজাতিদের দমন করতে থাকে। আহোমরাজ সুহুংমুং-এর রাজত্বকালে (১৫২৭-১৫৩৩) আহোম রাজ্যে (রাজধানী বর্তমানে শিবসাগর) বারবার মুসলমান আক্রমণ ঘটলেও তারা পরাভূত হয়। এঁর রাজত্বকাল আসামের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। এঁর দুঃসাহসিক প্রতিরোধের জন্যই আসামকে পরবর্তী ১৩০ বছর নতুন ক'রে মুসলমান আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়নি। তাঁর রাজত্বকালে আহোমদের ওপর হিন্দুধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং শঙ্করদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণবমত প্রাধান্য লাভ করে। যাই হোক, ১৭১৫ সালের পর থেকে আহোম প্রাধান্য ক্ষীয়মাণ হতে থাকে এবং বোডো ও আহোম-ভাষীরা ক্রমে ক্রমে অসমীয়া ভাষা ও হিন্দুধর্মাবলম্বী হয়ে উঠতে থাকে।

অপরদিকে পশ্চিমে মুসলমান ও পূর্বে আহোমদের আক্রমণ সত্ত্বেও ১৫শ শতকের প্রথম দিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশ্বাসী খেন্‌ উপজাতিদের নেতৃত্বে কামতা রাজ্য (রাজধানী বর্তমান কুচবিহারের সন্নিকটস্থ কামতাপুর) শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই রাজ্য পূর্বে গোয়ালপাড়া ও কামরূপ এবং দক্ষিণ-পূর্বে ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ১৪৯৮-১৫০২-এর মধ্যে বাঙলার সুলতান হুসেন শাহ কামতারাজ নীলাম্বরকে

পরাজিত ক'রে কামরূপ পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করেন। হিন্দুরাজ্য কামতা ধ্বংস হলেও বছর দশেক বাদে কুচবিহার রাজ্যের উদয় হয় (১৫১৫)। যাই হোক, কামতা রাজ্য মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত হলেও আহোমদের আধিপত্য চূর্ণ করা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। শাহজাহানের আমলে আহোমদের সঙ্গে মুঘলদের তীব্র সংগ্রাম হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ১৬৬১ অব্দে বাঙলার সুবেদার মীরজুমলার আসাম অভিযান সফল হলেও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। মীরজুমলার মৃত্যুর (১৬৬৩) দু' বছর পরে আহোমরা কামরূপ পুনরায় উদ্ধার করে। আসামে আহোমদের সার্বভৌমত্বের অবসান ঘটে (১৮২২) ব্রহ্মরাজ্যের আক্রমণের ফলে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগে ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যবাহিনী অসমীয়া সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত ক'রে তৎকালীন রাজধানী জোড়হাট দখল করে। ১৮২৪ সালে ব্রিটীশ বাহিনী ব্রহ্মরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে সমগ্র আসাম তাদের অধিকারে আসে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে অন্তত এইটুকু প্রতিভাত হয়েছে যে বৃহত্তর আসাম রাজ্যের নৃতাত্ত্বিক সংযোগ যেমন বিচিত্র, ভাষাতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার তেমন জটিল। আসামের বহুজাতিক উপাদান (মঙ্গোলয়েড, অষ্ট্রালয়েড, ভূমধ্যসাগরীয় এবং নর্ডিক) যুগাবর্তনে সমন্বিত হলেও ভোট-বর্মীভুক্ত ভাষাগুলির উপর নবীন আর্য-ভাষার (বাঙলা-অসমীয়া) ক্রমিক নিষ্পেষণ এবং সেই সঙ্গে হিন্দুধর্মের অসম্পূর্ণ সমীভবন (হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ও মুসলমান) এবং আর্য ভাষাভাষীদের রাজনৈতিক প্রাধান্য এই প্রদেশকে বহুধা বিভক্ত করে ফেলেছে। তাছাড়া, অতীতে যেমন পূর্ব ও পশ্চিম থেকে বহিরাগতদের সতত আক্রমণে এই রাজ্যের রাজনৈতিক স্থিরত্ব ব্যাহত হয়েছে, বর্তমানেও তেমন ভাষাবিভেদ, সমতল ও অসমতলবাসীদের পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অর্থনৈতিক বিভেদ, বাঙলা ও অসমীয়াদের সংঘর্ষ, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে বিরোধ, শ্রীহট্টের পাকিস্তানভুক্তি (অধুনা বাঙলাদেশ) ইত্যাদি বহুরকমের সমস্যা আসামকে বিদীর্ণ করে ফেলেছে, আর তারই ফলশ্রুতি বৃহত্তর আসাম রাজ্যের স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ক্রমিক অঙ্গচ্ছেদ।

আসামের ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষার জন্য উপরোক্ত নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক তথ্যগুলি অবশ্যই স্মরণীয়। কারণ, এই সীমিত আলোচনা থেকে অসমীয়া ভাষা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি সমর্থিত হচ্ছে :

প্রথমত, আসামের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা তাকে ভাষিক স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। শুধু তাই নয়, আসাম হয়েছে অষ্ট্রিক, ভোট-বর্মী ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষীদের মিলনস্থল।

দ্বিতীয়ত, পশ্চিম আসামের সঙ্গে বঙ্গদেশের ঐতিহাসিক বন্ধন পূর্ব আসামের চেয়ে অনেক বেশি নিবিড় আর তাই পশ্চিম অসমীয়া মধ্যযুগে বাঙলা ভাষার উপভাষা (কামরূপী) রূপে চিহ্নিত হতো। তাছাড়া রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও ভাষা-সংযোগের বহুমুখী সম্ভাবনার ফলে এই অঞ্চলে ঔপভাষিক বৈচিত্র্যও ঘটেছে সমধিক, তাই কামরূপ জেলায় অন্তত পাঁচটি উপভাষা দেখা যায়।

তৃতীয়ত, ইতিহাসের নিরিখে পূর্ব আসামের প্রাধান্য ঘটেছে তুলনামূলক ভাবে আরও পরবর্তী সময়ে এবং বলা বাহুল্য, আহোমদের আধিপত্যের ফলে তা ঘটেছে। বর্তমানে এই প্রাধান্য অটুট বলেই শিবসাগরের ভাষা হয়ে উঠেছে আদর্শ ভাষা আর তার উপভাষা-বৈচিত্র্যও কম। কারণ দীর্ঘ ছয় শত বৎসরের আধিপত্য ও আহোম রাজদরবারের প্রভাবে এখানকার ভাষা হয়ে উঠেছে সংহত ও দৃঢ়পিনদ্ধ।

চতুর্থত, আহোম থেকে 'আসাম' নামের উৎপত্তি স্বীকার ক'রে নিলে বলতে হবে, ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে এই নাম সৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম। আর পুরোনো নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও কামরূপ পরিত্যক্ত হওয়ায় 'আসাম' অভিধাই হয়ে উঠেছে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলির সার্বিক পরিচয়।

পঞ্চমত, আসামে মুসলমানদের আধিপত্য কোনো যুগেই প্রাবল্য লাভ না করায় উভয়ের ভাষিক যোগাযোগও সীমিত। তাই অসমীয়া ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ বিরল বললেই চলে।

ষষ্ঠত, প্রধানত বোড়ো ও আহোম ভাষার প্রভাব অসমীয়ায় সহজ দ্রষ্টব্য। এই প্রভাবের উপাদান কেবল শব্দগত (Lexical) নয়, কোথায়ও কোথায়ও ধ্বনিতত্ত্বগত (Phonological) অথবা রূপতত্ত্বগত (Morphological)। পণ্ডিতদের মতে, অসমীয়ায় ভোট-বর্মী (বোড়ো) প্রভাব নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে দেখা গেছে—

(ক) অসমীয়ায় দন্ত্য ও মূর্ধন্য ধ্বনির পার্থক্য নেই, উভয় ধ্বনিই হয়ে উঠেছে দন্ত্যমূলীয় (যদিও বর্ণমালায় মূর্ধন্যধ্বনি বজায় আছে)।

(খ) তালব্য ঘৃষ্টধ্বনির দন্ত্য উষ্মধ্বনিতে পরিণতি, যথা—চ, ছ>স /s/, জ, ঝ>জ. /z/।

(গ) 'স' ধ্বনির 'হ' ধ্বনিতে এবং পরে কণ্ঠোষ্ম খ. /x/ ধ্বনিতে পরিণতি।

(ঘ) অসমীয়া-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কাকতির মতে অসমীয়ায় দুটি বোড়ো প্রত্যয়ও লক্ষ্য করা যায়; প্রত্যয় দুটি হলো -ম এবং -শ, ব্যবহৃত যথাক্রমে

বৃহদর্থে এবং ক্ষুদ্রার্থে, যথা—রুঙ্গ-ম 'বড় নৌকা' : রুঙ্গ-স 'ছোটো নৌকা', দিখং-ম 'বড় নদী' : দিখং-স 'ছোট নদী' ইত্যাদি।[১]

(ঙ) সম্পর্কবাচক কিছু শব্দে অধিকার বা সম্পর্ক বোঝাতে অনুসর্গীয় সর্বনাম-প্রত্যয়ের (Post-positional Pronominal Suffixes) ব্যবহার সম্ভবত বোড়ো প্রভাবজাত—যদিও অধ্যাপক কাকতির মতে এই বৈশিষ্ট্য অস্ট্রিক প্রভাবজাত।[২] যথা, বোপাই "আমার পিতা" : বাপের্ "তোর পিতা" : বাপেরা "আপনার পিতা" : বাপেক্ "তাহার পিতা" ; আই "আমার মা" : মার্ "তোর মা" : মারা "আপনার মা" : মাক্ "তার মা" ইত্যাদি।[৩]

(চ) শব্দসম্পদের ক্ষেত্রে অসমীয়ায় কিছু কিছু বোড়ো নদ-নদী ও স্থানের নাম পাওয়া যায়, যেমন—দিবরু, দিবং, দিগবই (নদী), হাজো, দিসপুর ইত্যাদি।[৪] অসমীয়ায় আহোম প্রভাব দেখা যাবে কেবল শব্দভাণ্ডারের ক্ষেত্রে, যেমন—বুরঞ্জি "কালপঞ্জী", ফাঙ্ "কৌশল", বঙ্ 'গর্ত', নাম-দাও-ফি (ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ববর্তী নাম) ইত্যাদি।[৫]

৬.৩.২ প্রাচীন সাহিত্য

প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্য প্রধানত কামরূপ অঞ্চলের ভাষাকে আশ্রয় ক'রে গড়ে উঠেছিল। এই ভাষা উত্তরবঙ্গের ভাষার কাছাকাছি। কাজেই এক হিসাবে প্রাচীন অসমীয়া বাঙলা ভাষারই উপভাষা—যদিও তাকে বলা যায় আঞ্চলিক আদর্শ বাঙলা (Regional Standard)। দ্বিতীয়ত, বাঙলা ভাষার মধ্যযুগ অর্থাৎ ১৪শ শতক থেকেই কামরূপী বাঙলা-অসমীয়ার স্বতন্ত্র অনুশীলনের সূত্রপাত ঘটায় প্রাচীন বাঙলার চর্যাগীতি সাহিত্যকেও অসমীয়ারা সম্পূর্ণ নিজস্ব বলে দাবী করতে পারেন। চর্যাকারদের কেউ কেউ যে কামরূপ বা প্রত্যন্ত পূর্ব অঞ্চলের কবি ছিলেন, তাও অস্বীকার করা যায় না।

অসমীয়ার প্রাচীনতম কবি হলেন হেম সরস্বতী। এঁর রচিত 'প্রহ্লাদ চরিত' একটি ক্ষুদ্র কবিতা। কবি তাঁর উৎসাহদাতা কামতাপুরের রাজা দুর্লভনারায়ণের

১ Kakati . FA ff 70, p. 45
২ Chatterji : ODBL ff 724 ; Kakati : FA p. 34, 284-89
৩ Kakati : FA p. 286
৪ *ibid* ff 79-80
৫ *ibid* ff 73, 81

(১৩শ শতকের শেষ পাদ) নাম উল্লেখ করে গেছেন। রাজা দুর্লভনারায়ণের পুত্র রাজা ইন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে আরও দুই জন কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন ঃ হরিহর বিপ্র এবং কবিরত্ন সরস্বতী যথাক্রমে মহাভারত অবলম্বনে 'অশ্বমেধ পর্ব' ও 'জয়দ্রথ বধ' কাব্য রচনা করেছিলেন। রুদ্র কন্দলী নামে আর এক কবি রঙ্গপুরের নৃপতি তাম্রধ্বজের আনুকূল্যে মহাভারতের দ্রোণপর্বের অংশবিশেষ রচনা করেছেন।

বৈষ্ণব-পূর্ব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অসমীয়া কবি হলেন মাধব কন্দলী। ইনি অসমীয়া ভাষায় প্রায় সমগ্র রামায়ণের অনুবাদ সম্পন্ন করেন। মাধব কন্দলী ছিলেন মধ্য আসামের অধিবাসী (বর্তমান নওগাঁ জেলা)। জয়ন্তাপুরের কাছাড়ী রাজা মহামাণিক্য ছিলেন এঁর পৃষ্ঠপোষক। শঙ্করদেবের রচনায় এর নাম সশ্রদ্ধে উল্লেখিত হওয়ায় মনে হয় ইনি শঙ্করদেবের পূর্ববর্তী, কাজেই তাঁর আবির্ভাব কাল ১৪শ শতক হওয়া বিচিত্র নয়।

পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে অসমীয়ার শ্রেষ্ঠ সাধক-কবি শঙ্করদেবের (খ্রী. ১৪৪৯-১৫৬৮) নব্য বৈষ্ণব আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে সমগ্র আসামে এক বিরাট নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। শঙ্করদেব বাঙলার চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ; চৈতন্যদেব যেমন বাঙলা ও উড়িষ্যায়, শঙ্করদেব তেমন আসামে ভক্তিধর্মের প্লাবন ঘটিয়ে ছিলেন—যদিও উভয়ের অনুশীলিত বৈষ্ণব ধর্মের কিছু পার্থক্য আছে। শঙ্করদেব-প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্মের মূলতত্ত্ব একেশ্বরবাদ, তা 'একশরণ নামধর্ম' নামে পরিচিত, এই বৈষ্ণববাদে রাধা-কৃষ্ণ শাখাও স্বীকৃতি পায় নি। তবে তা কীর্তন-প্রধান ভক্তি মার্গের অন্তর্গত। শঙ্করদেব-প্রচারিত এই বৈষ্ণবধর্মের আন্দোলন 'মহাপুরুখিয়া' নামে পরিচিত। এই ভক্তিধর্ম প্রচারের জন্য শঙ্করদেব প্রায় ২৭ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে সুপরিচিত গ্রন্থগুলি হলো—পুরাণের সারাংশ অবলম্বনে রচিত 'কীর্তন ঘোষা', বিষ্ণু ও কৃষ্ণমাহাত্ম্য-বিষয়ক ৩০টি কবিতা, কিছু ভক্তিধর্মী নাটক, যেমন, 'রুক্মিণীহরণ', 'পারিজাত হরণ', 'রামবিজয়' ইত্যাদি, বৈরাগ্য-প্রধান ভক্তিমূলক গীতি 'বরগীত', 'দেহ-বিচার', একাঙ্ক নাটক 'অণিকিয়া নাট' ইত্যাদি। শঙ্করদেবের নাটকে অবশ্য কোথায়ও কোথায়ও ব্রজবুলি বাগ্‌ধারাও গ্রহণ করা হয়েছে।

শঙ্করদেবের প্রধান শিষ্য মাধবদেব (খ্রী. ১৪৮৯-১৫৯৬) যুগধর্মী ভক্তিধারা-সিঞ্চিত সাহিত্যেরই পুষ্টিসাধন করেন। তবে শঙ্করদেবের রচনায় যেমন দাস্যরসের স্ফূর্তি অধিক, মাধবদেবের রচনায় তেমন বাৎসল্য রসের প্রাধান্য। সহস্রশ্লোকযুক্ত কাব্যগ্রন্থ 'নামঘোষা' তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। শঙ্করদেবের সমসাময়িক অন্য আর এক প্রধান কবি অনন্ত কন্দলীর অবদান ভাগবতের উত্তরার্ধ (দশম স্কন্ধ) অনুবাদ ও

জনপ্রিয় কাব্য অনিরুদ্ধ-উষার প্রণয় কাহিনী 'কুমর হরণ'। এঁর রচনায় মাধব কন্দলীর প্রভাব সুস্পষ্ট। যাই হোক, এইরূপ রামায়ণ-মহাভারত, হরিবংশ এবং প্রধানত ভাগবত আখ্যান অবলম্বন ক'রে আরও অনেক কবি প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এঁদের মধ্যে দুই জনের নাম অবশ্য বিশেষভাবে স্মর্তব্য: রাম সরস্বতী ও শ্রীধর কন্দলী, কারণ এঁদের রচনা যথাক্রমে 'ভীমচরিত' ও 'কানখোয়া' উপভোগ্য কৌতুক কাব্য।

পূর্বেই বলা হয়েছে অসমীয়া গদ্যের প্রাথমিক নিদর্শন শঙ্করদেব ও মাধবদেবের নাটকাবলীর ব্রজবুলি বাগ্‌ধারার মধ্যে পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের আরও অনেক লেখকই অবশ্য গদ্যরচনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ছিলেন, যেমন, বৈকুণ্ঠনাথ ভাগবত ভট্টাচার্য (১৫৫৮-১৬৩৮: ভাগবত পুরাণ), রঘুনাথ মহন্ত (কথা রামায়ণ ১৬৫৮) ইত্যাদি। তবে বৈষ্ণবদের 'কথা-গুরু-চরিতাবলী' এবং আহোমদের কুলপঞ্জী (Chronicle) 'বুরঞ্জী'তেই আটপৌরে গদ্যের সাবলীল রীতি প্রথম স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই গদ্যের ধারা ১৬৫০ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, অসমীয়া সাহিত্যের প্রারম্ভিক কেন্দ্রবিন্দু ছিল পশ্চিম আসাম। পশ্চিম আসামে কামতাপুর বা কোচবিহারের রাজাদের আনুকূল্যে অসমীয়া সাহিত্যের জোয়ার এসেছিল। কিন্তু পশ্চিমে কোচ রাজাদের প্রাধান্য স্তিমিত হলে এবং সেই সঙ্গে পূর্বে আহোম রাজাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকলে পূর্ব আসাম সাহিত্যসৃষ্টির বৃত্ত হয়ে উঠলো। আহোম রাজদরবারে আহোম ভাষাতেই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর রোজনামচা রাখা হতো। শুধু গদ্য সাহিত্য ব'লে নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা তথ্যেরও আকর এই বুরঞ্জি গ্রন্থাবলী। যাই হোক, পরবর্তী যুগে অসমীয়া ভাষা রাজদরবারের ভাষারূপে গ্রাহ্য হলে বুরঞ্জী-জাতীয় গদ্য রচনা অসমীয়াতেই লেখা হতে লাগলো (১৭শ শতক-১৯শ শতক)। বলা বাহুল্য, এই হলো অসমীয়া ভাষার দ্বিতীয় পর্ব—গদ্য রচনা ও ধর্মনিরপেক্ষ রচনার সূত্রপাত ক'রে যা প্রকৃতপক্ষে উত্তরবঙ্গীয় ভাষার বাঁধন কেটে প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য অর্জন করলো।

আধুনিক অসমীয়ার শুরু উনিশ শতক থেকে। আমেরিকার ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের প্রচেষ্টায় অসমীয়া গদ্যে বাইবেল অনূদিত হলো (১৮১৯)। এঁরা এই সময় শিবসাগরের ভাষাকেই আদর্শ ভাষারূপে গ্রহণ করলেন। প্রথম অসমীয়া ব্যাকরণ অবশ্য ছাপা হয় পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুর প্রেস থেকে, লেখক উইলিয়ম রবিনসন, রচনাকাল ১৮৩৯।

৬.৩.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

অসমীয়ার ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণগুলি সংক্ষেপে এই—

১. অসমীয়ার স্বরধ্বনিগুলি[১] হলো এই—সম্মুখ স্বর : ই/i/, এ/e/, এ্যা/ɛ/ (লিখিত এ); পশ্চাৎ স্বর উ/u/, ও/o/, অ'/ɔ/, অ/ɒ/ এবং কেন্দ্রিক স্বর আ/a/; তুলনীয় বিল/bil/ 'হ্রদ', বেল/bel/ 'ঘণ্টা', বে'ল/bɛl/ "ফল-বিশেষ", বাল/bal/ "চুল", বল/bɒl/ "শক্তি", বল/bɔl/ "যাওয়া যাক্", বোল/bol/ "বুলি", বুল/bul/ "চল!"

২. স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ ধ্বনিমানক (Phonemic) নয়, কিন্তু আনুনাসিকতা ধ্বনিমানক। যথা, বাঁও 'বাম' : বাও 'পার্শ্ব', চা 'দেখ' : চাঁ "ছাওয়া"।

৩. স্বরসংগতি (Vowel Harmony) বাঙলার মতই সহজদ্রষ্টব্য (রোগী : রুগী)।

৪. লিপিবিধিতে ট, ঠ, ড, ঢ ধ্বনি থাকলেও উচ্চারণে এগুলি দন্ত্য ধ্বনি অর্থাৎ ত, থ, দ, ধ। অনুরূপভাবে বর্ণমালাসম্মত চ, ছ, জ, ঝ—এই তালব্য ঘৃষ্টধ্বনিগুলি উষ্মধ্বনিতে পরিণত অর্থাৎ চ, ছ>স/s/ এবং জ, ঝ>জ./z/। উষ্মধ্বনি শ, ষ, স>খ. /x/ (আদিতে) অথবা হ/h/ (মধ্যে), যেমন সিহঁত /xĩhɔt/, শেষ /xekh/; ড়, ঢ়>র্/r/, র্হ/rh/। আদর্শ অসমীয়ায় মহাপ্রাণতার অভাব দেখা যায় (শিকে /xike/ 'শেখে'; সোন্দা /xonda/ "সোঁদা" <সুগন্ধ)।

৫. বহুবচনের প্রত্যয়গুলি হলো : বোর (তুচ্ছার্থে), বিলাক (মান্যার্থে), -হঁৎ (সংকীর্ণ অর্থে) ইত্যাদি। যথা, ধেনুবোর, মানুহবিলাক, দেউতা হঁত ইত্যাদি।[২]

৬. প্রধান কারকবাচক অনুসর্গ : ষষ্ঠীতে—অর্, -এর, -সাক (<*সৎক<সন্ত), এবং অধিকরণে -ত্, কর্মকারকে -অক্, গৌণকর্মে -লৈ, করণে -এ ইত্যাদি।

৭. অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের প্রত্যয় বাঙলাসুলভ : -ইল এবং -ইব (করিল, করিব)।

৮. কর্তৃবাচক শত্রর্থ প্রত্যয় -ওঁত্ (<-অন্ত) বাঙলায় মেলে না, যেমন, করোঁতা "করে যে"।

---

১ G. C. Goswami : IAP pp. 76-77, 126

২ প্রত্যয়গুলির ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে দ্র. মজুমদার : বাভাপ (২য়), পৃ. ২৮৮-৮৯

৯. যৌগিক কাল গঠনে 'অছ' ধাতুর ব্যবহার, যেমন, "করিছোঁ" ইত্যাদি।

১০. আদর্শ অসমীয়ার শ্বাসাঘাত পড়ে পদের মধ্যে, কিন্তু পশ্চিমা অসমীয়াতে এই শ্বাসাঘাত পড়ে আদিতে।

কামরূপী উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—

(১) কামরূপী উপভাষায় শ্বাসাঘাত সর্বদাই আদ্যক্ষরে পড়ে। (২) তুলনামূলকভাবে অপিনিহিতির আধিক্য। (৩) আদর্শ অসমীয়ার মধ্য স্বরগুলি কামরূপীতে উচ্চ স্বরধ্বনিতে পরিণত, যেমন—কাপোর "কাপড়">কাপুর, মোল "মূল্য" >মুল ইত্যাদি। (৪) মহাপ্রাণতার প্রবণতা। (৫) বহুবচন প্রত্যয়েরও পার্থক্য আছে। আদর্শ অসমীয়াসুলভ -বোর, -বিলাক স্থলে -গিলান্, গিলাক্, -হুন্, -অহুন্ ইত্যাদি। তবে -ইং উভয় উপভাষাতেই মেলে। (৬) সকর্মক অতীত কালের প্রথম পুরুষের বিভক্তি -ইলাক, -ইলা (=আদর্শ অসমীয়া -ইলে)। (৭) নিত্যবৃত্ত অতীতের ক্রিয়া 'হয়' (=আদর্শ অসমীয়া হেঁতেন)।[১]

৬.৪ বিহারী ভাষাবর্গ

বিহারী ভাষাগুলির সামগ্রিক আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে (দ্র. পৃ. ৪৫-৪৬)। ঐতিহাসিক বিচারে এই ভাষাগুলি বাঙলা-অসমীয়া-ওড়িয়ার মতো প্রাচীন মাগধী প্রাকৃত থেকেই উদ্ভূত। এখন বিহারীর তিনটি শাখা—ভোজপুরী, মগহী ও মৈথিলী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হচ্ছে।

৬.৪.১ ভোজপুরী

ভোজপুরী মাগধী-প্রাকৃত উদ্ভূত নবীন ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির (**NIA**) অন্যতম। গ্রীয়ার্সনের মতানুসারে ভোজপুরী বিহারীর উপভাষা। ভোজপুরীর ভগিনীস্থানীয় অন্য দুটি ভাষা হলো মগহী ও মৈথিলী। আধুনিক লোকগণনা অনুযায়ী (১৯৬১) ভোজপুরীর লোকসংখ্যা ৭৯ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭৫৫ (বিহার: ৭৮,৪২,১২২; উত্তর প্রদেশ ১,২০,১১৯)। তবে ১৯৭১ সনের জনসমীক্ষায় ভোজপুরীভাষীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আনুমানিক ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৫৬৪। ভোজপুরী বিহারের সর্বাধিক লোকের কথ্য ভাষা (অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশি)। ভাষাঞ্চল-পরিধি প্রায়

---

১ Kakati : FA pp. 19-21

৪৩ হাজার বর্গ মাইল। এই ভাষা প্রধানত বলা হয় পশ্চিমে বিহারের বিস্তৃত অঞ্চলে এবং উত্তরপ্রদেশের পূর্ব দিকের জেলাগুলিতে। ভাষার বিস্তৃতি সাধারণত এই অঞ্চলগুলিতে—বেনারস, মির্জাপুর, জৌনপুর, গাজীপুর, বালিয়া, গোরক্ষপুর, বস্তী, আজমগড় (উত্তরপ্রদেশ), শাহাবাদ, চম্পারণ, সারণ, রাঁচি এবং পালামৌর অংশ-বিশেষ (বিহার); এবং সর্‌গুজা (মধ্যপ্রদেশ)। বর্তমানে এই ভাষা সংবিধানে স্বীকৃত নয়।

ভোজপুরীর লিখিত সাহিত্যিক নিদর্শন বিরল। প্রাচীনকালে সংস্কৃত, ব্রজভাখা (পশ্চিমা হিন্দী) এবং অবধী (পূর্বী হিন্দী) এবং অধুনা খড়ীবোলী-হিন্দীর ভাষা-সমূহের নিরন্তর নিষ্পেষণে ভোজপুরী সাহিত্য গ'ড়ে উঠতে পারেনি। তবে দৈনন্দিন জীবনে, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-আচরণে, বিবাহ ও উৎসব-অনুষ্ঠানে, এমনকি আমন্ত্রণ লিপির বয়ানে ভোজপুরী ভাষাভাষীরা সর্বদাই তাঁদের নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। লোকগীতি ও লোকসাহিত্য রচনায় এই ভাষার মাধুর্য সহজেই নজরে পড়ে।

প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে কবীর (খ্রীষ্টাব্দ ১৩৯৮-১৫২০) রচিত দোহাগুলি উল্লেখযোগ্য (কবীর গ্রন্থাবলী, সম্পাদিত শ্যামসুন্দর দাস, নাগরী প্রচারিণী সভা)। কবীরের মাতৃভাষা ছিল 'বনারসী-বোলী' (পশ্চিমা ভোজপুরী)। তবে এর ওপর পাঞ্জাবী, ব্রজ অথবা খড়ীবোলীর প্রভাব ছিল যথেষ্ট। কবীরের ভাষা যে মূলত ভোজপুরী, তা বর্তমানে প্রমাণ করা গেছে।[১] কবীরের সমসাময়িক শিষ্য সন্তকবি ধরমদাসের রচনাও অবশ্য কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে। আঠারো শতকের কবি শিবনারায়ণ ও ধরণীদাসের রচনা এখনও অপ্রকাশিত।

বর্তমান সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে ছাপরা জেলার ভিখারী ঠাকুর রচিত একজাতীয় লৌকিক 'বিদেসিয়া নাটক' সাধারণ্যে যথেষ্ট প্রচলিত। সম্প্রতি অবশ্য কিছু কিছু মননশীল সাহিত্য সৃজনের প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে, যেমন—রাহুল সাংকৃত্যায়ন রচিত আটটি নাটিকা, 'ভোজপুরী সংসদ' (বেনারস) প্রকাশিত 'ভোজপুরী কহানিয়াঁ' (মাসিক পত্রিকা, সম্পাদক রামবলী পাণ্ডেয়), রহনীদার বেটী (উপন্যাস, লেখক জগদীশ ওঝা 'সুন্দর'), বয়ার পুরবইয়া (গীতিসংকলন, রচয়িতা ভোলানাথ 'গহমরী') ইত্যাদি। এছাড়া চলচ্চিত্র মাধ্যমেও ভোজপুরী সাহিত্য লোকমুখী করে তোলা হচ্ছে (যেমন, 'গঙ্গা মাইয়া তেরে পিয়ারী চঢ়াইবোঁ' ইত্যাদি)।

---

১ U. N. Tewari : ODBH p xxviii-xxix.

ভোজপুরীর নিজস্ব লিপি 'কইথী', কিন্তু মুদ্রণে 'নাগরী' লিপিই প্রচলিত।

ভোজপুরীর ভাষাতাত্ত্বিক কয়েকটি লক্ষণ হলো: 'অ' ধ্বনির দ্বিবিধ উচ্চারণ—প্রাচীন বিবৃত 'অ' [ʌ] এবং নবাবির্ভূত সংবৃত 'অ' [ɔ]। লিঙ্গানুশাসনের শিথিলতা (তু. হমার/হমারি গাই)। -অন্হি/-অন্হ্ বিভক্তি যোগে বহুবচন (ঘর: ঘরন্হি)। শব্দমূলের হ্রস্ব-দীর্ঘ-অতিদীর্ঘ ভেদ: মালী: মলিয়া: মলিয়ৱা। ক্বচিৎ দুটি রূপও ব্যবহৃত। বিভিন্ন কারকে অনুসর্গীয় প্রত্যয়ের ব্যবহার, যথা— -কে (২য়া-৪র্থী-৬ষ্ঠী), -সে, -সেঁ (৩য়া-৫মী), -মেঁ, পর (৭মী)। সর্বনামমূল উ পু: ১ব—কর্তৃ মেঁ, তির্যক মোহি, সম্বন্ধে মোর, বহুবচনে মেঁ: হমনিকা: হমরি ইত্যাদি। এছাড়া আদরার্থক হম, হমরা, হমার, হমরন্ ইত্যাদি। -অল ও -অব -যোগে যথাক্রমে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল গঠন (তু. হম্ দেখলীঁ/দেখবি, উ দেখলে)। তবে ভবিষ্যৎ কালে প্রথম পুরুষে প্রাত্যয়িক -হ-যুক্ত বিভক্তি রক্ষিত (তু. উ চলিহেঁ/উ লোগ চলী <*চলিহিই<চলিষ্যতি)। যৌগিক কালে সহায়ক রহ্ ও বাড়্/বাট্ ধাতুর প্রয়োগ (উ আৱত্ রহে, হম্ দেখত্ বাটী ইত্যাদি)। তবে প্রাচীন ভোজপুরীতে অস্ত্যর্থক 'আছ' ধাতুর ব্যবহার ছিল। অস্ত্যর্থক ধাতুর সঙ্গে -থে প্রত্যয় যোগ ভোজপুরীর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ (তু. নহীথে/নঈথে "হয় না, থাকে না", হোথে "হয়" ইত্যাদি।[১]

৬.৪.২ মগহী / মগধী

মগহী গ্রীয়ার্সন-চিহ্নিত 'বিহারী'র অন্যতম ভাষা। কাজেই মগহী, বিহারীর অন্য দুই ভাষা—ভোজপুরী ও মৈথিলীর মতই মাগধী-প্রাকৃত উদ্ভূত। তবে বিহারী ভাষাগুলির মধ্যে এই ভাষা সবচেয়ে অবহেলিত—যদিও প্রাচীনকালে বৌদ্ধ যুগের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রধান পীঠস্থান ছিল মগধ। পুরাযুগের মগধ বলতে বোঝাতো দক্ষিণ বিহারের পাটনা ও গয়া জেলা। এর সীমানা ছিল উত্তরে গঙ্গা, পশ্চিমে শোণ, পূর্বে চম্পা নদী এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতের শাখাসমূহ। প্রধানত দ্বাদশ শতকে তুর্কী আক্রমণের ফলে প্রাচীন জনাকীর্ণ মগধ হতগৌরব হয়ে পড়ে, সেইসঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীরা সংস্কৃতির মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আরও পরবর্তী যুগে রাজনৈতিক হীনমন্যতার ফলে এখানকার অধিবাসীদের ভাষাতাত্ত্বিক সচেতনতাও ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। তাই এখানকার শিক্ষিতজন হিন্দী, ব্রজ, অবধী ও উর্দু ভাষার মতো সমৃদ্ধ ভাষার শরণাপন্ন হন। তাই চর্চার অভাবে ও শিক্ষিত জনের উপেক্ষার

১ Grierson : LSI, Vol. V, part ii, pp, 43, 53 ; Tewari : ODBH p. xli.

ফলে মগহী একটি অমার্জিত আঞ্চলিক ভাষায় পরিণত হয়েছে। মগহীর ভাষাঞ্চল সেই পূর্বতন মগধেরই ভৌগোলিক সীমানায় সংহত; মগহী নামটিও মগধের সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু প্রাচীন মগধের এই নবীন ভাষাটি তার অতীত হৃতগৌরব আর উদ্ধার করতে পারে নি।

বর্তমানে, এমনকি জয়কান্ত মিশ্র, সুভদ্র ঝা, কৃষ্ণকান্ত মিশ্র প্রভৃতি বিদ্বজ্জন মগহীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে মগহী হলো মৈথিলীর উপভাষা। অবশ্য এঁরা গ্রীয়ার্সনকেই প্রামাণ্য মানছেন। গ্রীয়ার্সনের মতে "...**Magahī indeed might very easily be classed as a sub-dialect of Maithilī rather than a separate dialect" (LSI, Vol V, part ii p.4)**। কিন্তু উদয় নারায়ণ তিওয়ারী, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়, সম্পত্তি অর্যাণী, সূর্যদেও শাস্ত্রী প্রমুখ বিদ্বানদের মতে, মগহী একটি স্বতন্ত্র ভাষা।

যাই হোক, ১৯৬১ সনের জনসমীক্ষায় দেখা গেছে মগহী ভাষাভাষীর সংখ্যা ২৮ লক্ষ ১৮ হাজার ৬০২ জন। ১৯৭১-এর সমীক্ষায় কিন্তু এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪৯৫। ভাষাভাষীর এই বিপুল পার্থক্য দেখে মনে হয়, মগহীদের ভাষাগত সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও এই ভাষা বর্তমানে সংবিধান-স্বীকৃত নয়।

মগহীর প্রধান কেন্দ্রস্থল বিহারের পাটনা, গয়া, মুঙ্গের, ভাগলপুর এবং পালামৌ জেলার পশ্চিমাঞ্চল। গয়া জেলা সন্নিহিত অঞ্চলের ভাষা হলো আদর্শ (**Standard**) মগহী। মগহীর ভাষাতাত্ত্বিক সীমানার চিত্র দাঁড়ায় এইরূপ—উত্তর সীমা অবশ্য গঙ্গা নদী এবং গঙ্গার উত্তর পারের মৈথিলী উপভাষাসমূহ (তিরহুতিয়া)। পশ্চিমে শাহাবাদ ও পালামৌ অঞ্চলে প্রচলিত ভোজপুরী উপভাষা। উত্তর-পূর্বে মুঙ্গের, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণায় প্রচলিত মৈথিলীর 'ছিকাছিকী' উপভাষা। দক্ষিণ-পূর্বে মানভূম (বর্তমান ধানবাদ ও পুরুলিয়া) এবং সিংভূমের বাঙলা উপভাষা। দক্ষিণে রাঁচী অঞ্চলে প্রচলিত ভোজপুরীর উপভাষা 'সদানী'।

মগহীর প্রাচীন সাহিত্যিক নিদর্শন দুর্লভ। তবে কথ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে লোক-গীতি, গাথাসাহিত্য ইত্যাদি রচনায় এই ভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। বর্তমানে সাহিত্যিক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলছে, যেমন নওদা জেলার লেখক স্বর্গত জৈনাথ পতি দু'টি ছোট গল্প (সুনীতা, ফুলবাহাদুর) লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। এছাড়া 'বিহার মগহী মণ্ডল' প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'বিহান' এখনও স্বগৌরবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। অন্যান্য রচনার মধ্যে বিশিষ্ট হলো: মগহী কহানী সেংগরণ (সম্পাদিত শ্রীকান্ত শাস্ত্রী ও রামচন্দন), মগহী লোকগীত (সম্পাদিত শ্রীকান্ত শাস্ত্রী), অদমী আ দেওতা

(উপন্যাস, রামনন্দন), মগহী লোকগীত (সম্পত্তি অর্যানী), কৌমুদী মহোৎসব নাটক (রামনন্দন) ইত্যাদি। বর্তমানে সম্পত্তি অর্যানী মগহীর একখানি ব্যাকরণও হিন্দীতে রচনা করেছেন ('মগহী ব্যাকরণ কোশ')।

মগহীর ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে হলো এই—'অ' ধ্বনির সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণ অর্থাৎ [ɔ, ʌ]। অতিহ্রস্ব 'অ' ধ্বনিও সুলভ [ə]। ধ্বনিগুলির হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ আছে। লিঙ্গশাসন শিথিল (তু. রামকে ঘর/বহিন্, ভুকৃথল গইয়া/বৈলা "গাই/বলদ")। শব্দমূলের হ্রস্ব-দীর্ঘ-দীর্ঘতর ভেদ, যেমন ঘোড়্/ঘোড়া/ঘোড়ৱা/ঘোড়ৌৱৱা। বহুবচন-প্রত্যয় -ন্, যেমন, ঘোড়া ঃ ঘোড়ন্। অনুসর্গীয় বিভক্তি ২য়ায় -কে, ৩য়া/৫মী -সে, ৬ষ্ঠীতে -কে, -কের্, ৭মীতে -মে, গৌণ কর্মে -লা, লাগি। সর্বনামমূল ঃ কর্তৃ ঃ হম, তির্যক মোরা, সম্বন্ধে হমরা, বহুবচনে হমনী/হমরনী ইত্যাদি। অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ামূল যথাক্রমে -অল ও -অব বিকরণ যোগে গঠিত হয় (হম্ তস্বীর দেখলী/দেখব)। যৌগিক কালের সহায়ক ক্রিয়ারূপে বর্তমান ও অতীতে হো -ধাতুর সংযোগ, যথা—দেখইত হে/হই (তু, মৈথিলী দেখৈত অছ, ভোজপুরী দেখত বাটে)।

৬.৪.৩ মৈথিলী

বর্তমান বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত মিথিলা বা প্রাচীন বিদেহ অঞ্চলের ভাষা মৈথিল বা মৈথিলী। ভাষাতত্ত্বগত ইতিহাস বিচারে মৈথিলী মাগধী প্রাকৃত-উদ্ভূত নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির (NIA) প্রাচ্য শাখার অন্তর্গত। পূর্বেই বলা হয়েছে, গ্রীয়ার্সনের মতানুসারে এই ভাষা "বিহারী"র উপভাষা। মৈথিলীর ভগিনীস্থানীয়া অন্য দুটি ভাষা হলো ভোজপুরী ও মগহী। বিহারী ভাষাগুলির মধ্যে সংখ্যাগুরুত্বে যেমন ভোজপুরী প্রধান, সাহিত্যিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিচারে তেমন মৈথিলী অগ্রগণ্য। তবে ভোজপুরী অপেক্ষা মগহীর সঙ্গে এর সাদৃশ্য বেশী। এইজন্য অনেকে মগহীকে মৈথিলীর উপভাষা ব'লে মনে করেন। বর্তমানে ভোজপুরী ও মগহীর মতই মৈথিলীকে ভারতীয় সংবিধানের ৮ম অনুসূচী স্বীকৃত ভাষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, তবে সম্প্রতি দিল্লীর সাহিত্য একাডেমী এই ভাষাকে স্বতন্ত্র সাহিত্যিক ভাষার মর্যাদা দান করেছেন।

সাম্প্রতিক ভাষা-সমীক্ষায় মৈথিলী তথা অন্যান্য বিহারী ভাষাগুলিকে হিন্দীর উপভাষারূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে, যদিও তাদের পৃথক ভাষাভাষীর সংখ্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯৬১ সনের লোকগণনা অনুযায়ী মৈথিলীর লোকসংখ্যা

৪৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮১১ জন অর্থাৎ সমগ্র বিহারী ভাষাভাষীর মোট সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মৈথিল ভাষী। ১৯৭১-এর সমীক্ষায় মোট ভাষাভাষীর সংখ্যা আরও বেড়েছে (৬১,২১,৯২২)।

এই ভাষার বিস্তৃতি সাধারণত বিহারের এই জেলাঞ্চলগুলিতে : দ্বারভাঙ্গা, মজফ্‌ফরপুর, মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, উত্তর সাঁওতাল পরগণা, পূর্ব চম্পারণ। ভাষাতাত্ত্বিক সীমানা চিহ্নিত করা যায় এইভাবে—পশ্চিমে ভোজপুরী, পূর্বে বাঙলা, উত্তরে নেপালী এবং দক্ষিণে মগহী। মৈথিলীর আদর্শ রূপ (Standard) উত্তর দ্বারভাঙ্গার উপভাষাবিশেষ।

মৈথিলী সাহিত্যের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন, চর্যাগীতি-সংকলন যে প্রাচীন মৈথিলীতে রচিত—এমন দাবী অনেক মৈথিল পণ্ডিত করে থাকেন। এই বিতর্কিত রচনার কথা বাদ দিলেও মৈথিলীতে রচিত প্রাচীন রচনার নিদর্শন যথেষ্ট। জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর বিরচিত 'বর্ণরত্নাকর' বা 'বর্ণন রত্নাকর' (১৪ শতকের প্রথম পাদে রচিত) এইরূপ একটি প্রাচীনতম গদ্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থটিতে নানা ধরণের বর্ণনার প্রচলিত রীতি সংকলন-কোষের আধারে পরিবেশিত হয়েছে। রাজসভা, ঋতুচক্র, দেব-দেবী, শিকার অভিযান, নারীরূপ, বিভিন্ন লেখক প্রভৃতির বর্ণনাকালে লেখক বিভিন্ন সমান্তরাল প্রয়োগ ও রীতি উপস্থাপিত করেছেন। মৈথিলীর শ্রেষ্ঠ কবি অবশ্য বিদ্যাপতি (১৩৮০-১৪৬০ খ্রী. অ.)। তাঁর রচিত পদাবলী সাহিত্য ও ভাষার প্রভাব এক কালে সারা পূর্ব ভারতে বিস্তৃত হয়েছিল। এছাড়া আরও অনেক কবি মিথিলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। মৈথিলী প্রথম নাট্যকার উমাপতি ওঝার 'পারিজাতহরণ' (১৭শ শতক) একখানি বিখ্যাত নাটক। প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন গোবিন্দ ঠাকুর, কাশীনাথ, রামনাথ ও শ্রীধর প্রভৃতি।

ভাষা ও যৌথ সংস্কৃতি রচনায় বাঙলা ও ওড়িয়ার সঙ্গে মৈথিলীর সাধর্ম্য থাকলেও মৈথিলীভাষীরা এককালে হিন্দীকেই সাংস্কৃতিক মাধ্যম রূপে গ্রহণ করেছিলেন, ফলে হিন্দী ভাষার চাপে আধুনিক মৈথিলীর অগ্রগতি ব্যাহত, যদিও স্তব্ধ নয়। বর্তমানে মৈথিলীর পুনর্জাগরণ ঘটছে, ক্রমশই তা উন্নয়নশীল ভাষারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে চলেছে।

মৈথিলীর নিজস্ব লিপি তিরহুতিয়া (তিরুটে, মৈথিল) এবং কৈথী, কিন্তু বর্তমানে নাগরী লিপিই অধিক প্রচলিত।

মৈথিলী ভাষার কয়েকটি ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ হলো : পদান্ত অ, ই, উ ধ্বনির অতিহ্রস্ব উচ্চারণ। ভোজপুরীসুলভ শব্দমূলের হ্রস্ব-দীর্ঘ-অতিদীর্ঘ ভেদ : ঘর, ঘরবা, ঘরউবা।

তির্যক কারকে -আ (পহর : পহরা সোঁ)। অ-কারের সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণ [ɔ, ʌ]। লিঙ্গশাসনের শিথিলতা (তোর / তোরী বেটী)। সবহি / সভ্ এবং 'লোকনি' শব্দ যোগে যৌগিক বহুবচন গঠন (চাকর সভ আএল, দেবতা লোকনি)। বিভিন্ন কারকে অনুসর্গীয় প্রত্যয়ের ব্যবহার, যেমন, -কে, -কাঁ (২য়া), -স (৩য়া-৫মী), -ক, -কের (৬ষ্ঠী), -মে (৭মী)। -অল- ও -অব- প্রত্যয়যোগে যথাক্রমে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল গঠন (হম্ খ্যাএল, আএব)। যৌগিক কালে সহায়ক 'আছ' ও 'রহ' ধাতুর ব্যবহার (দেখইত ছথি, অবইত রহব) ইত্যাদি। সহায়ক ক্রিয়ারূপে 'থিক' রূপও মেলে (থিকহু, থিকহ, থিক ইত্যাদি <সং অস্তি)। ভবিষ্যৎ কালের প্রথম পুরুষে প্রাত্যয়িক বিভক্তির সংরক্ষণ (উত্তর দ্বারভাঙ্গার জোলহী উপভাষায়), যেমন, উ চলহই 'সে যাবে' (: -হ- <সং স্য)। বিশ্লেষমূলক বা যৌগিক পদের সাহায্যে কর্মবাচ্য গঠন (ই কাজ কএল অছি "একাজ করা হয়েছে"; হমরা সুতল ভ / ভএ গেলা "আমার শোওয়া হয়েছে")। ভাববাচক বিশেষ্য পদ -ব, -ল যোগে গঠিত হয় (দেখব, দেখল)।

॥ ৭ ॥

মধ্য ভারতের প্রধান ভাষা

৭.১ উর্দু

৭.১.১ ভাষিক পরিস্থিতি

উর্দু ভারতের সংবিধান-স্বীকৃত (৮ম অনুসূচী) ভাষাগুলির অন্যতম। ১৯৬১ সনের জনগণনা অনুযায়ী উর্দু ভাষাভাষীর সংখ্যা ২ কোটি ৩৩ লক্ষ ২৩ হাজার ৪৭ জন (উত্তর ভারতে ৭৮,৯১,৭১০, বিহারে ৪১,৪৯,২৪৫, মহারাষ্ট্রে ২৭,২৫,৬৮৯)। ১৯৭১ সালের জনসমীক্ষায় এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আনুমানিক ২ কোটি ৮৬ লক্ষ ৪২৮ অর্থাৎ সমগ্র ভারতীয় ভাষার ৫.২২ শতাংশ। এই ভাষা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সরকারী ভাষা—যদিও সংখ্যাবিচারে উর্দু ভাষীরা সেখানে নগণ্য (০·২৮%)। এই ভাষা উত্তরপ্রদেশ রাজ্যেও সরকারী ভাষা হিসেবে অনুমোদিত। উত্তরপ্রদেশের জনগণের ১০.৭০% এবং কর্ণাটকের ৭.০৪% অংশ উর্দু ভাষা ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যেও বহু উর্দুভাষী আছেন। বলাবাহুল্য, পশ্চিমে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাও উর্দু।

উর্দু এবং হিন্দী একই ভাষার দুই রূপ। এদের উৎসও অভিন্ন। উভয় ভাষার প্রতিষ্ঠাভূমি দিল্লী এবং উত্তর গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চল। এই অঞ্চলের কথ্যভাষা খড়ীবোলী (Standard Speech) হিন্দোস্তানীর সাহিত্যিক রূপান্তর এই দুইটি ভাষা। উভয় ভাষার প্রধান পার্থক্য দেখা যাবে শব্দভাণ্ডার, প্রত্যয়বিধান ও লিপিবিধিতে। উর্দু ও হিন্দীর শাব্দিক উপাদান যথাক্রমে আরবী-ফারসী এবং সংস্কৃত থেকে সংগৃহীত। উর্দুর লিপিরীতি সেমিটিক—অক্ষর লেখা হয় ডান থেকে বাঁয়ে। অপর পক্ষে হিন্দীর লিপি প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি থেকে উদ্ভূত। নচেৎ ব্যাকরণগত বিচারে উভয়ের সাধর্ম্য নিরঙ্কুশ। কেবল শব্দসম্পদ বিচার ক'রে দুটি ভাষার স্বাতন্ত্র্য নিরূপণ করা ভাষাশাস্ত্র-সম্মত নয়। কিন্তু ভারতের এই যুগল ভাষার ক্ষেত্রে তাই-ই ঘটেছে।

উর্দু ভাষা উদ্ভবের একটি বিশেষ ইতিহাস আছে। দিল্লী এবং তৎসংলগ্ন উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের কথ্যভাষা ত্রয়োদশ থেকেই 'খড়ীবোলী' নামে অভিহিত হতো। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকেই এই ভাষার নিদর্শন কিছু কিছু মেলে। প্রাচীন সাক্ষ্য থেকে

জানা যায়, এই ভাষা 'দহল্‌রী' বা 'হিন্দরী'/হিন্দ্বী' নামেও পরিচিত ছিল—যদিও হিন্দরী ছিল একটি ব্যাপক অভিধা (কেন-না পাঞ্জাবী, দিল্লী বোলী, সাহিত্যিক অবহট্‌ঠ এবং বিশেষত ব্রজভাষা—সবই পরিচিত ছিল এই নামে)। এই সময়ে তুর্কীভাষী মোগল সম্রাটরা রাজদরবারী ভাষা হিসেবে ফারসীকে স্বীকার করে নিলেও ব্যবসায়িক, সামাজিক এবং প্রশাসনিক কাজকর্মে সুবিধার জন্য তাঁরা স্থানীয় ভাষারই আশ্রয় নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এই ভাষায় একদিক যেমন ছিল স্থানিক ভাষার প্রভাব, অপরদিকে তেমন ছিল পাঞ্জাবী, তুর্কী এবং ফারসীর অল্পবিস্তর প্রভাব। দিল্লী, পূর্ব পাঞ্জাব এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশভুক্ত মীরাট, রোহিলখণ্ড অঞ্চলে প্রচলিত এই স্থানীয় ভাষা সম্ভবত ১৭শ শতকের শেষে নবাগত বিদেশীদের কাছে হিন্দোস্তানের ভাষা বা হিন্দোস্তানী/হিন্দ্‌স্তানী নামে জনপ্রিয় হয়ে থাকবে। এই ভাষা ব্রজভাষা, অবধী, ডিঙ্গল (রাজস্থানী) প্রভৃতি ভাষার মতো সাহিত্যিক মর্যাদা অর্জন না করলেও রাজকার্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে এর ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল বিদেশী শাসকদের কাছে। সাহিত্যের ভাষা না হলেও মুসলমান রাজশক্তি সম্পর্কিত ও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ব্যবহৃত আদর্শ কথোপকথনের ভাষারূপে এই ভাষার নতুন নামকরণ হলো খড়ীবোলী (অর্থাৎ যে ভাষা খাড়া বা উন্নীত)। তুলনায় অন্য কথ্যভাষাগুলি, এমনকি সাহিত্যে-প্রযুক্ত ব্রজভাখা, কোশলী, ডিঙ্গল (রাজস্থানী), পুরাতন পাঞ্জাবী প্রভৃতি পড়ীবোলী (**Patois**) রূপে বিবেচিত হলো। কিন্তু ক্রমে ক্রমে খড়ীবোলী হিন্দোস্তানী সাহিত্যিক আসরেও স্থান পেতে লাগলো। ১৩শ-১৫শ শতকের অবসরে অবিমিশ্র খড়ীবোলীতে রচিত সাহিত্যকর্ম উত্তর ভারতে না পাওয়া গেলেও তার নিদর্শন অন্যান্য সাহিত্যিক ভাষায় কিছু কিছু মেলে—যেমন কবীর-এর (খ্রী. ১৩৯৮-১৫২০) রচনা মুখ্যত ব্রজ ও কোশলী আশ্রিত হলেও খড়ীবোলী প্রভাব সেখানে অসুলভ নয়। অনুরূপভাবে তুর্কী গজনবী আমলের বহু পাঞ্জাবী কবিদের (ফারুখী, মনুচেহারী, মুখ্‌তারি, হাকিম সনাই), এমনকি আমীর খসরু (খ্রী. ১২৫৩-১৩২৫) ও সুফীসাধু বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জ-শকর (খ্রী. ১১৭৩-১২৬৬) অথবা খাজা মৈনুদ্দীন চিশ্‌তীর রচনাতেও খড়ীবোলী প্রয়োগ দুর্লভ নয়।

৭.১.২ সাহিত্যের ইতিহাস

(ক) প্রথম পর্ব (খ্রী. ১৫০০-১৭০০): দখনী-হিন্দোস্তানীর যুগ

উত্তর ভারতে হিন্দোস্তানীর সাহিত্যিক মর্যাদা পুরোপুরি অর্জিত না হলেও দক্ষিণে কিন্তু তা ফলপ্রসূ হলো। উত্তর ও দক্ষিণের ঐতিহাসিক সংযোগ ঘটালেন পরোক্ষভাবে

আলাউদ্দীন খিলজী (খ্রী. ১২৯৬-১৩১৬)। আলাউদ্দীন খিলজী এবং পরবর্তী উত্তর ভারতীয় মুশলিম শাসক সম্প্রদায়ের নিরন্তর আগ্রাসী অভিযান (১৪-১৬শ শতক) দক্ষিণাঞ্চলকে উত্তরাপথের সঙ্গে একসূত্রে আবদ্ধ করলো। বহু স্বফী সন্ত ও দরবেশও দক্ষিণে এলেন তাঁদের ধর্মপ্রচারের অভিযানকে সার্থক ক'রে তুলতে। দক্ষিণে ফারসী ছিল প্রায় অজ্ঞাত ভাষা। দিল্লী থেকে বহু দূরে বসবাসের ফলে এই প্রবাসী শাসকেরা উত্তর ভারত থেকে আনীত দহলৃবী বা হিন্দোস্তানী ভাষাতেই তাঁদের সাহিত্যিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করলেন। কিন্তু ১৫শ শতকের শুরুতেই এই ভাষায় ঐশ্লামিক বিষয়বস্তু, আরবী-ফারসী শব্দসম্পদ, লিপিরীতি, এমনকি ফারসী ছন্দোবিধির প্রভাব পড়তে শুরু করে। বলতে গেলে এই সময় থেকেই উর্দু ভাষার উদ্ভব। এই যুগের ভাষা সাধারণত 'দখ্‌নী' নামে অভিহিত হতো—উত্তর ভারতের ভাষা অর্থাৎ হিন্দোস্তানী থেকে পার্থক্য রক্ষা করার জন্যই এই নামকরণ। উর্দু সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস এই দখ্‌নী সাহিত্যেরই ইতিহাস। তবু মনে রাখা দরকার, এই যুগের সাহিত্যিক বাতাবরণ ঐশ্লামিক হলেও তার প্রভাব নিষ্পেষণী নয়, ভাষাও তাই স্বচ্ছ, সাবলীল ও প্রাণধর্মে ভরপুর; ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানও সংগৃহীত হতো সংস্কৃত ও আরবী-ফারসী থেকে স্বচ্ছন্দ ও সহজভাবে কিন্তু সমদূরত্ব বজায় রেখে। কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল মূলত স্বফীধর্ম বিষয়ক, তা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল। এই দখ্‌নী ভাষার আঞ্চলিক প্রসারও লক্ষণীয়। এর লেখকরা প্রধানত গুজরাট, বিদর, গোলকণ্ডা, বিজাপুর, ঔরঙ্গাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসী—যদিও এখানকার প্রধান ভাষাগুলি হলো মারাঠী, তেলুগু ও কানাড়ী।

উর্দু সাহিত্যের গোড়াপত্তন করেন সম্ভবত সর্বপ্রথম খ্বাজা-নবাজ. গীস্থ-দরাজ. (মৃত্যু ১৪৪২)। তৈমুর কর্তৃক পাঞ্জাব আক্রান্ত হলে (খ্রী. ১৩৯৮) ইনি দক্ষিণে উপনিবিষ্ট হন। এঁর রচিত দু'খানি বইয়ের মধ্যে স্বফীতত্ত্ব ও ধর্মপ্রকরণ-সংক্রান্ত একখানি ছোট গদ্য বই (মি'রাজুল আশিক্বীন) ঠিক সাহিত্য পদবাচ্য নয়। এর পরে আবির্ভূত হন প্রখ্যাত বীজাপুরের শাহ্‌ মীরন্‌জী (মৃতুকাল ১৪৯৬) ও তৎপুত্র শাহ্‌ বুরহানুদ্দীন জানম্‌ (মৃত্যু ১৫৭৫) ও গুজরাট-আহমদাবাদের মিয়াঁ খুব মুহম্মদ (এঁর রচিত কাব্য 'খুবতরঙ্গ' অর্থাৎ শুভতরঙ্গ, ১৫৭৫ সালে লিখিত)। গুজরাটের অপর কবি শাহ্‌ আলম মুহম্মদ জান গমোধানি (মৃত্যু ১৫৭৫) জবাহির-ল-আসরার্‌ (=রহস্যরত্ন) নামক কাব্য রচনা করেন। হায়দ্রাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠাতা ও গোলকণ্ডার কুতবশাহী আমলের (খ্রী. ১৫৯০-১৬১৭) প্রখ্যাত স্থলতান মুহম্মদ কুলী কুতব শাহ (খ্রী. ১৫৮০-১৬১১) দখ্‌নী সাহিত্য রচনার কেবল একজন উৎসাহী সমর্থকই ছিলেন না, তিনি নিজেও ছিলেন

একজন কৃতী লেখক। তেলুগু ভাষাঞ্চলের অন্তর্গত গোলকণ্ডার অপরাপর লেখক হলেন মুল্লা ওয়াজ্‌হী, ইনি কুতবশাহ ও ভাগ্যমতীর প্রেম অবলম্বনে 'কুতব মুস্তারী' (১৬০৯) এবং স্ফূকী সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ "সব রস্" (১৬৩৪) রচনা করেন। গোলকণ্ডার অন্যান্য রচনাকার হলেনঃ ঘওয়াসী (১৭শ শতক) [আরব্য রজনীর রোমান্স ও তুতীনামা অবলম্বনে রচিত দুটি গ্রন্থের লেখক], ইবন-ই-নিশাতী ('ফুলবান' কাব্য, ১৬৫৫) এবং তব্রঈ (ফারসী কবি নিজামীর 'হপ্তপৈকর' তাঁর বিষয়, ১৬৭০)।

মারাঠী এবং কন্নড় ভাষাঞ্চলের অন্তর্গত বিজাপুরের সুলতানদের (খ্রী. ১৫৯০-১৬৮৬) সাহিত্যিক প্রচেষ্টাও ছিল অপরিসীম। সুলতান ২য় ইব্রাহিম আদিল শাহ্ (খ্রী. ১৫৮০-১৬২৬) স্বয়ং সঙ্গীত সম্পর্কিত 'নব রসনামা' রচনা করেন। তাঁর পরবর্তী মহম্মদ আদিল শাহ্-এর আমলে হাসান শওকী তালিকোটার যুদ্ধ (১৫৬৫) ও বিজয়নগর ধ্বংস অবলম্বনে লেখেন বীরগাথা 'ফতেনামা নিজাম শাহ'; রুস্তমী লেখেন 'খবরনামা' (১৬৪৯, হজরত্ মহম্মদের জামাতা হজরৎ আলীর কাহিনী); মালিক খুসনুদ লেখেন ফারসী থেকে গৃহীত 'বহরম' ও 'ইয়ুসুফ-জুলেখা'র রোমান্স। এরপর আলী আদিল শাহ-এর রাজত্বে (খ্রী. ১৬৫৭-৭৩) তাঁর প্রশস্তিসূচক "আলিনামা" কাব্য রচনা করেন 'নুসরাতি' ছদ্ম নামে এক ব্রাহ্মণ কবি। তাঁর রচিত অপর গ্রন্থ 'গুলসন্-ই-ইশক্' মনোহর-মধুমালতীর রোমান্স অবলম্বনে লিখিত একটি স্ফূকী ধারার রূপক কাব্য। আওরঙ্গজেবের আমলেও (খ্রী. ১৬৫৮-১৭০৭) এই দখ্‌নী ধারার কাব্যের গতি ছিল অব্যাহত। তাঁর রাজত্বকালে অন্তত আরও সাত জন কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বিষয়বস্তু বিচারে এই পর্বের সাহিত্যকর্মকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ মস্‌নবী, ক়সিদা এবং মর্‌সিয়া। মস্‌নবী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে রহস্যঘন আখ্যানকাব্য, রোমান্স ও জীবনীমূলক রচনাংশ। ক়সিদা হলো প্রধানত প্রশস্তিমূলক রচনা। এতে একদিকে যেমন আছে পীর-পয়গম্বর ও ধর্মগুরুদের প্রশস্তি, অপরদিকে তেমন সুলতান বা রাজারাজড়াদের প্রতি স্তুতিবাচন। দীর্ঘতম রচনা মরসিয়ায় কারবালা কাহিনীর ট্রাজেডি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, রোমান্সের বিস্ময় ও রহস্যময়তা, যুদ্ধযাত্রার বর্ণবহুল সমারোহ অথবা বীরত্বের অসাধারণ উচ্ছ্বাস ও গৌরবময় মুহূর্তগুলি আবেগের উঁচু সুরে অথচ নিরলংকৃত ভাষায় ঝংকৃত হয়েছে এই মর্‌সিয়া-জাতীয় সাহিত্যে।

(খ) মধ্য পর্ব (খ্রী. ১৭০০-১৮৭৫): দিল্লী-উর্দুর যুগ

সতের শতকের শেষার্ধ থেকে ঐতিহাসিক স্রোতের নতুন গতিপথ দেখা গেল, আর সেই সঙ্গে উর্দু ভাষারও দ্বিতীয় পর্ব (১৭০০-১৮৭৫) শুরু হলো, উর্দু আঞ্চলিক

স্তর পেরিয়ে প্রাদেশিক বিস্তৃতি লাভ করলো। এই সময় আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রী) বিজাপুর ও গোলকণ্ডা জয় করলেন। দক্ষিণ ও উত্তরের প্রশাসনিক সংযোগের ফলে দক্ষিণের কবিরা উত্তরে যাতায়াত শুরু করলেন। ফলস্বরূপ, দখ্‌নী-হিন্দোস্তানী (অর্থাৎ ফারসী প্রভাবিত হিন্দোস্তানী) উত্তর ভারতে পরিচিত হলো। সম্রাটদের দরবারে ফারসী প্রচলিত থাকলেও হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ী প্রতিভূ হিসেবে এই ভাষা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলো। কারণ, দিল্লী ও উত্তর ভারতের মুসলমানদের মধ্যে দখনীর অনুকরণ ছিল সহজ ও স্বাভাবিক।

মোগল সম্রাটগণ এতাবৎ প্রধানত ব্রজভাষারই পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তাঁরা নিজেরাও এই ব্রজভাষাতেই রচনা করতেন। আওরঙ্গজেবের সময় দিল্লীর মোগল দরবারের অভিজাত রাজন্যবর্গের শিক্ষার জন্য ব্রজভাষার সাহিত্য, অলঙ্কার ও ব্যাকরণ-বিষয়ক বহু গ্রন্থ ফারসী ভাষাতেই রচিত হয়েছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে সাহিত্য-মাধ্যমের পালা বদল হলো। দরবারী মুসলমান আমীর-ওমরাহেরা ব্রজভাষা ছেড়ে এই সৃজ্যমান নবীন মুসলমানী ভাষার দিকে ঝুঁকলেন; তাঁদের কাছে আরবী-ফারসী মিশ্রিত ফারসী সাহিত্যের অনুকারী, ফারসী অক্ষরে লেখা নব-সৃষ্ট উর্দু সাহিত্যই গ্রহণীয় হলো। এইভাবে একদা যা ছিল উত্তর ভারতের প্রবাসী ও ঔপনিবেশিক ভাষা, সেই দক্ষিণের দখ্‌নী-হিন্দোস্তানীর পুনর্বাসন ঘটলো আবার উত্তরে, কিন্তু উর্দুরূপে; প্রথম যুগের হিন্দোস্তানীই নতুন করে উর্দু অভিধায় চিহ্নিত হতে লাগলো। উর্দু নাম অবশ্য দখনীভাষীদেরই দেওয়া। দখনীর কবিরাই প্রথমে উর্দু রচনা শুরু করেছিলেন। দক্ষিণের লোকদের কাছে পরিচিত মুসলমানী বা দখনীর সঙ্গে পার্থক্য রক্ষা করার জন্য সম্ভবত দাক্ষিণাত্যেই এই নামকরণ উদ্ভাবিত হয়। খ্রীষ্টীয় ১৭ শতকের মাঝামাঝি অথবা শেষাশেষি দক্ষিণে নবাগত মোগল বাদশাহের ফৌজ কর্তৃক ব্যবহৃত এই ভাষার (অর্থাৎ হিন্দোস্তানীর) রাজমান্য পোশাকী নাম দেওয়া হলো "জবান্‌-ই-উর্দ্‌-ই-মু'অল্লা" অর্থাৎ "মহনীয় রাজশিবিরের ভাষা" (উর্দু শব্দটি আসলে তুর্কী, অর্থ "ফৌজের ছাউনি")। এই বর্ণনাত্মক সম্ভ্রমসূচক নাম ক্রমে "জবান-ই-উর্দ্" এবং পরে আরও সংক্ষিপ্ত হয়ে 'উর্দ্' নামে প্রচলিত হলো। অবশ্য কেবল উর্দু নাম ১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। এই পর্বে অর্থাৎ দিল্লী-উর্দু প্রতিষ্ঠার যুগে এই ভাষা পূর্বের মতো কবিতাতেও ব্যবহৃত হতো এবং এই কাব্যিক ভাষা অনেক সময় 'রেখ্‌তা' হিন্দী বা রেখ্‌তা খড়ীবোলী নামেও অভিহিত হতো। 'রেখ্‌তা' শব্দের অর্থ "ছড়ানো" অর্থাৎ এই ভাষায় ফারসী শব্দ ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রয়োগ করা হতো।

মোট কথা, উত্তর ভারতের আদর্শ কথ্যভাষা খড়ীবোলী বা হিন্দোস্তানী (প্রাচীনকালে দহল্‌বী বা হিন্দবী নামে পরিচিত) এবং উর্দু ছিল সমার্থবাচক। কিন্তু দরবারী ও সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং মুশলিম ও নবাগত বিদেশী অভিজাত ও বুদ্ধিজীবীদের ক্রমবর্ধমান উৎসাহ ও আনুকূল্যে তা ক্রমশ ফারসী-আরবী অতিশয্যের দিকে অতিরিক্তভাবে ঝুঁকে পড়লো। ১৮শ শতকের দ্বিতীয় পাদে উর্দুকে খাড়া করে দেওয়ার এক সজ্ঞান প্রচেষ্টা দেখা গেলো। শব্দসম্পদ ও প্রত্যয় গঠন (এবং যথারীতি লিপিরীতি) প্রবর্তনে মাত্রাতিরিক্ততা তাকে দখনীর তুলনায় বিশিষ্ট করে তুললো। ফলে একদিকে যেমন দখনীর সঙ্গে তার বিশেষ পার্থক্য সূচিত হলো, অপরদিকে তেমনি প্রতিক্রিয়াশীল ভাষা হিসেবে হিন্দী (অর্থাৎ সংস্কৃত-প্রভাবিত হিন্দী বা সাধু/সাহিত্যিক হিন্দী—**High Hindi**) ভাষার আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে উঠলো। খড়ীবোলী হিন্দোস্তানীর মূল কাঠামোর ওপর রঙ্‌ চড়ানো হলো হিন্দুয়ানীর। ভাষার শব্দসম্পদ হলো সংস্কৃতাশ্রিত, লিপি হিসেবে গৃহীত হলো নাগরী। মোট কথা, কথ্য হিন্দোস্তানী থেকে জন্ম নিল দুটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা—যে দুটি ভাষা ভাষাতত্ত্ববিচারে অভিন্ন কিন্তু সামাজিক বাতাবরণে ভিন্ন।

এই কৃত্রিমতা থেকে হিন্দোস্তানীকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বিশুদ্ধীকরণের এক উদগ্র প্রতিক্রিয়াও শুরু হয়েছিল উনিশ শতকে। মূল কথ্য হিন্দোস্তানী থেকে সংস্কৃত/আরবী-ফারসী ছাঁটাই ক'রে কেবল তদ্ভব-জ বা দেশী উপাদানে ভাষা নির্মাণ করা ছিল এই "ঠেঠ-হিন্দী" সৃষ্টির আদর্শ, কিন্তু কৃত্রিম ভাষা হিসেবে এর বিস্তার মোটেই ফলপ্রসূ হয় নি। এই 'ঠেঠ-হিন্দী'র প্রধান প্রবক্তা হলেন: ইন্‌শা আল্লাহ খান্ (মৃত্যু ১৮১৭) [কহানী ঠেঠ হিন্দী মেঁ] এবং অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায় বা হরি ঔধ [ঠেঠ হিন্দী কা ঠাট, ১৮৯৯ ও অধখিলা ফুল, ১৯০৫]।

দিল্লী-উর্দু কাব্য ধারার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রথমেই নাম করতে হয় ঔরঙ্গাবাদের দখ্‌নী কবি শামসুদ্দীন ওয়ালিউল্লা বা ওয়ালীর (? ১৬৮৮-১৭৪১)। সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে তিনি বিশুদ্ধ দখনীতেই রচনা শুরু করেছিলেন। পরে দিল্লীতে বসবাস শুরু করলে (১৭২১ ?) তিনি দখনী-উর্দু মিশ্রিত এবং পরে বিশুদ্ধ উর্দু লেখার সূত্রপাত ক'রে দিল্লী-উর্দু ধারার গোড়াপত্তন করেন। এঁর শিষ্য ঔরঙ্গাবাদের সিরাজুদ্দীন সিরাজও তাঁর সার্থক উত্তরসূরীরূপে বহু ছোট কবিতা (প্রায় ১০ হাজার পংক্তি) এবং একটি রোমান্সধর্মী কাব্য 'বুস্তন-ই-খিয়াল' (কল্পনার উদ্যান) রচনা করেন।

আঠারো শতকের শেষাশেষি উর্দু রীতিমতো সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষা—যদিও তা কথ্য ভাষা থেকে বেশ দূরে সরে গিয়েছে। দিল্লীকে কেন্দ্র ক'রে এই সময় দিল্লী-আগ্রা ঘরানাও গ'ড়ে

উঠেছে। প্রাচীনতর কবিদের মধ্যে যে কবি চতুষ্টয়কে উর্দু সাহিত্যের চারিটি স্তম্ভ বলে মনে করা হয়, তাঁরা হলেন : দিল্লীর মির্জা জান্-ই-জানান্ মজ়্হর (খ্রী. ১৬৯৯-১৭৮১), আগ্রার মীর তকী (১৭২০-১৮০৮), মুহম্মদ রফ়ী সৌদা (১৭৩০-১৭৮০), মীর দর্দ্ (১৭১৯-১৭৮৫)। প্রাচীন ঘরানার অন্যান্য প্রখ্যাত কবিরা হলেন মীর হাসান (১৭৩৬-৮৬), গু.লাম হমদানী মস্‌হফ়ী (১৭৫০-১৮২৪), হায়দর আলী আতিশ (মৃত্যু ১৮৪৭), ইমাম বখ্‌শ্ নাসিখ (মৃত্যু ১৮৩৮), সলামৎ আলী দবীর (১৮৩০-৭৫), বাবর আলী অনিস্ (১৮০২-৭৪) এবং আরও অনেকে। তবে প্রথম পর্বের কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন আগ্রার মুহম্মদ নজ়ীর (১৭৪০-১৮৩০)। চিরাচরিত স্থফীধর্ম, প্রেমগীতি ও ফারসী বিষয় তাঁর উপজীব্য হলেও, ভারতীয় ধ্যানধারণা তাঁর রচনায় বিস্ময়কর রূপে প্রতিফলিত, হিন্দুধর্মীয় পৌরাণিক বিষয়বস্তুও তাঁর স্বীকৃত আদর্শ (যেমন কৃষ্ণের শৈশবলীলা, যোগী, হোলি উৎসব ইত্যাদি)। তাঁর ভাষাও ফারসীর অতিরেকে ভারাক্রান্ত নয়।

উর্দু সাহিত্য চর্চা ও প্রসারে লখনৌ দিল্লীর প্রতিদ্বন্দী হয়ে উঠেছে ১৭২২ সাল থেকে, যখন দিল্লীর অভিজাত পরিবারভুক্ত গ়াজীউদ্দীন হায়দর লখনৌতে এলেন অযোধ্যার নবাব হয়ে। তিনি উর্দুর লখ্‌নৌ ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা। লখ্‌নৌ-র নবাবী আমলে (খ্রী. ১৭২২-১৮৫৬) দরবারী উর্দু প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অবধী ভাষাঞ্চল-রূপে চিত্রিত উত্তর প্রদেশের মধ্য ও পূর্ব অঞ্চলে উর্দুর সম্প্রসারণ ঘটলো।

অনুরূপভাবে রামপুরের নবাবদের উৎসাহ ও আনুকূল্যেও উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে উর্দু প্রসারলাভ করেছে। রামপুর ঘরানার বিখ্যাত কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মুহম্মদ মুমিন খান (১৮০০-১৮৫১), আমীর আহ্‌মদ মীনাই (১৮২৮-১৯০০), নবাব মির্জা খান দাঘ (১৮৩১-১৯০৫) ইত্যাদি।

এইভাবে ক্রমে ক্রমে লাহোর, পাটনা, কলকাতা, এমনকি দখনীর জন্মভূমি হায়দ্রাবাদও উর্দু চর্চার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠলো। কেবল দাক্ষিণাত্যে দখনী প্রাচীন মুসলমান পরিবারদের মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু ভাষা হিসাবে এখনও বেঁচে আছে।

কলকাতায় উর্দু চর্চার সূত্রপাত হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার (ইং ১৮০০) পর্বে, ইংরেজদের আনুকূল্যে। কলকাতায় ইংরেজ আমলে যে উর্দু গদ্যের জন্ম হয় তার প্রথম গ্রন্থ 'চহার দরবেশ'। গ্রন্থখানি একটি রোমান্টিক প্রেমোপাখ্যান। লেখক মীর অম্মন।

প্রাক্-আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ দু'জন কবির নাম উল্লেখ না করলেই নয়। এঁরা হলেন দিল্লীর মুহম্মদ ইব্রাহিম জ়ৌক় (১৭৮৯-১৮৫৪) এবং মীর্জা আসাদুল্লা খাঁ গ়ালিব

(খ্রী. ১৭৯৭-১৮৬৯)। গালিব সম্ভবত আধুনিক-পূর্ব যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কাব্যে মানবতাবোধ, সুফী রহস্যবাদ ও প্রেম-তন্ময়তা নিবিড়ভাবে উপলব্ধ হয়েছে। পত্র-সাহিত্য, ইতিহাসগ্রন্থ ও সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অসামান্য। নানা প্রকার ফারসী ও উর্দু কবিতা লিখলেও গ.ালিব উর্দু গজলেই (ঘ.জ.ল 'প্রেমকাব্য') অবশ্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন। এ-বিষয়ে তাঁর "দীওয়ানে-ঘ.ালিব" চিরপ্রসিদ্ধ।

এই প্রসঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের রচনার সাহিত্যিক মূল্যায়ন অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথম পর্বের রচনাগুলি মূলত কাব্য। এগুলি রচিত হয়েছিল বিশেষ কাব্যিক ছন্দোবন্ধে, যা সাধারণত ক.সীদা, মরসিয়া ও মসনবী নামে অভিহিত। মসনবীর উপজীব্য হলো পৌরাণিক কাহিনী বা পুরাকল্প (Myth), রোমান্স্ এবং জীবনীসংক্রান্ত বিষয়-বস্তু। ক.সীদা হলো প্রশস্তিমূলক রচনা—হজরত্ মহম্মদ বা কোনো ধর্মগুরু, এমনকি নবাব বা সুলতানদের প্রশস্তি। মরসিয়া কারবালার বিষাদময় গাথাকাব্য। ধর্ম, রোমান্স, বীরগাথা, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি রূপায়িত হয়েছে এইজাতীয় দীর্ঘ রচনায়, এগুলি মৌলিক আবেগসংকুল ঘটনাবর্তের চিত্রবিশেষ। প্রথম পর্বের রচনায় ঘটনা থাকলেও তার আবিলতা নেই, জীবন-সংগ্রাম এবং তার দহনজালা থাকলেও নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নত জীবনবোধের মহান্ আকর্ষণও আছে; এই পর্বের রচনারীতি তাই স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক ভাষায় রূপায়িত হয়েছে। বহু রচনা ফারসী বা উত্তর ভারতীয় রচনার অনুবাদকর্ম হলেও সেগুলির মৌলিকতা কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নি।

সপ্তদশ শতকের শেষপাদ এবং ১৮শ শতক থেকে কিন্তু কাব্যের মেজাজ এবং বিষয়বস্তু নির্বাচন বহুলাংশে বদ্‌লে গেছে। এই যুগে নতুন ক'রে আবির্ভূত হয়েছে গজল জাতীয় রচনা। পূর্বতন মসনবী, ক.সীদা বা মরসিয়া জাতীয় রচনা একেবারে পরিত্যক্ত হয় নি, কিন্তু আগেকার সত্যানুসন্ধান, হৃদয়াবেগ, আকূতি ও নিষ্ঠা অথবা নৈতিক মহত্ত্ববোধ অসার প্রতিপন্ন হয়েছে। চরিত্রায়ণ এবং শৈল্পিক নির্মাণক্ষমতাও বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে (যেমন মির হাসানের 'শিরুল বয়ান' নামক রচনায়)। তার জায়গায় স্থান নিয়েছে কেবল হৃদয়াবেগের ফেনিল উচ্ছ্বাস এবং কৃত্রিম শিল্পরীতির চমৎকৃতি। বলা বাহুল্য, ধার-করা ফারসী বাতাবরণ এবং বিদেশী আবহাওয়ায় ফলিত শিল্পসৃজনে কৃত্রিম সৌন্দর্য আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু নেই স্বভাবজ প্রাণধর্ম।

পূর্বেকার মসনবীগুলিতে যেমন মানবিক প্রেম, তার সুখ ও দুঃখানুভূতি ক্ষণমুহূর্তের সৃষ্টিবেদনায় মূর্ত হতো, সেই সঙ্গে তেমন তাৎক্ষণিক আবেদন ছাড়িয়ে চিরসত্যের শাশ্বত সত্তাটিকে উদ্বোধিত করতো। কিন্তু এই পর্বের মসনবীতে কেবল আছে পলাতক

ইন্দ্রিয়রতি ও তৃপ্তি। এখানে সুফীধর্ম-সুলভ অনন্তের প্রতি চিরন্তন পিপাসার স্থলে কেবল বিষাদ ও স্মৃতিচারণার করুণ সুর বেজে উঠেছে। তাই সৌদা ও জৌকের ক.সীদাগুলিতে আরবী-ফারসী সমুচ্ছ্রিত বাগাড়ম্বর-সজ্জা থাক্লেও আবেদনে তা বন্ধ্যা (অবশ্য গালিব প্রমুখ এর ব্যতিক্রম)। মনে হয়, যেন এই যুগের কবিরা সহজ সরল ভাষায় বক্তব্যকে উপস্থাপিত করার রীতি বিস্মৃত হয়েছেন। ভাষারীতি তাই যেমন জটিল, উপস্থাপনার ভঙ্গীও তেমন বঙ্কিম। মরসীয়া রচনাগুলি গঠনরীতির দিক দিয়ে আরও সংহত ও পরিণত হলেও প্রত্যক্ষ অনুভূতি এবং সংবেদনশীলতা হারিয়ে ফেলেছে, আবেগের সংযমও হয়েছে শিথিল। এ-যুগের কবিরা গজল রচনাতেই মনঃসংযোগ করেছেন। এগুলির বিষয়বস্তু ও বিন্যাস গতানুগতিক—শব্দনির্বাচনের অপরিমিত সুযোগসৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই যুগে গদ্যরচনার অভাবও প্রমাণ করছে, সাহিত্য এখন কেবল কৃত্রিম কল্পবিলাসী কাব্যসাধনার বাহন মাত্র।

(গ) আধুনিক পর্ব (১৮৭৫—) : ভারতীয় উর্দু'র যুগ

উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের তৃতীয় পর্ব বা আধুনিক যুগের (১৮৭৫—) গোড়াপত্তন করেন স্যর সৈয়দ আহম্মদ (খ্রী. ১৮১৭-৯৮)। মুশ্ লিম নবজাগরণের উদ্গাতারূপে তিনি ইসলামী আরবী-ফারসীর সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য ধ্যানধারণার সমন্বয় ঘটালেন, উদ্বুদ্ধ করলেন উনিশ শতকের ভারতীয় মুসলমান জনগণকে। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। কিন্তু এই নবজাগরণের পাঞ্চজন্য ঘোষণায় তিনি বেছে নিয়েছিলেন উর্দু মাধ্যমকে। তিনি নিজেও ছিলেন একজন সুলেখক। তাঁর নিজের কীর্তি তাঁর চিঠিপত্র বা পত্রসাহিত্য এবং একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ (অসারু-স্-সনদিয়া)। তাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু কবি, কথাকার ও প্রবন্ধ রচয়িতা উর্দু রচনায় আত্ম-নিয়োগ করলেন। আধুনিক নবজাগরণের প্রেরণায় বহু শিক্ষিত হিন্দুরাও উর্দু সৃজন-কর্মে অনুপ্রাণিত হলেন। উনিশ ও বিশ শতকীয় লেখকদের মধ্যে অগ্রগণ্য কয়েকজন হলেন : জাকাউল্লা, শিব্ লি, (ঐতিহাসিক), নজির আহম্মদ (ঔপন্যাসিক), কবি হালী (মুহম্মদ আলতফ হোসেন, ১৮৩৭-১৯১৭), রামনাথ শর্মা (ফিসান্-এ-আজাদ—লখ্ নৌ জীবনের রোমান্স), কবি ব্রিজনারায়ণ চক্বস্ত্ ইত্যাদি।

এই পর্বের উর্দুসাহিত্য হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষ সাহিত্যিকদের অন্তঃপ্রেরণায় সঞ্জীবিত হলেও ১৯২০ থেকে এই ভাষা যেন মুসলমান ধ্যানধারণার প্রতীকী হয়ে উঠলো, জন্ম নিল ভাষাতাত্ত্বিক ভেদবুদ্ধি। এই ভাবধারার প্রবর্তক হলেন কবি মুহম্মদ ইক্বাল (খ্রী. ১৮৭৫-১৯৩৫)। এককালের ভারতপ্রেমিক ইক্বাল মুসলমানদের পাকিস্তানী

স্বপ্নের দীক্ষাগুরু হয়ে উঠলেন। ইক্‌বাল নিজেও ছিলেন ফারসী লেখক। ফলে তাঁর উর্দু'তে ফারসী-আরবী প্রভাব যথেষ্ট। তবে তাঁর ভাষার শক্তিমত্তা আধুনিক উর্দু'কে বলীয়ান্ করে তুলেছে। তাই বোধহয় উর্দু শিক্ষিতেরা নতুন কালের জীবনস্বপ্নকে হিন্দীর চেয়েও উর্দু'ভাষায় অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত করতে পেরেছিলেন। এখনও বহু প্রতিভাধর সংস্কৃতিবান্ হিন্দু ও মুসলমান লেখকবৃন্দ সদ্যজাগ্রত উর্দু সাহিত্যকে চিরন্তনী ভাবধারায় পুষ্ট করে চলেছেন। আর তাই উর্দু সাহিত্য আঞ্চলিক সীমানা অতিক্রম করে সর্বভারতীয় মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে।

৭.২ হিন্দী

৭.২.১ ভাষিক পরিস্থিতি

হিন্দী ভারতরাষ্ট্রের সরকারী (Official) ভাষা হিসেবে ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত (অপর রাষ্ট্রভাষা হলো ইংরেজী)। ১৯৬১ সনের জনগণনা অনুযায়ী হিন্দী ভাষাভাষীর সর্বভারতীয় সংখ্যা হলো ১৩ কোটি ৩৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৬০। ১৯৭১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ কোটি ৩৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৬২। হিন্দী এক বিশেষ সীমিত ভাষাক্ষেত্রের মৌখিক ভাষার (খড়ীবোলী) শিষ্ট ও পরিশীলিত আদর্শরূপে ব্যবহৃত হলেও তা এক বিস্তৃত ভাষাঞ্চলের আদর্শ সাহিত্যিক ভাষা (Literary Standard)। এই ভাষাঞ্চলের অন্তর্গত হলো—উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, দিল্লী, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ এবং বিহার। হিন্দী এই রাজ্যগুলির কেবল সরকারী ভাষা নয়, মান্যভাষাও (Prestige Language) বটে। বর্তমানে আদর্শ হিন্দী ভাষাঞ্চল ব'লে যে বিস্তৃত ভূখণ্ডকে চিহ্নিত করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তা কতকগুলি সুস্পষ্ট ভাষা (অবধী, ভোজপুরী, মৈথিলী, মারোয়াড়ী ইত্যাদি) এবং মুখ্য/গৌণ উপভাষাঞ্চল (ব্রজভাষা, বুন্দেলী, ছত্তিশগঢ়ী ইত্যাদি) নিয়ে গঠিত। অবশ্য সর্বত্র তা মাতৃভাষা (Mother Tongue) বা প্রাদেশিক ভাষা (Regional Language) হিসেবে স্বীকৃত নয়। এই প্রাদেশিক ভাষা/উপভাষাগুলির সঙ্গে আদর্শ হিন্দীর নিকট সম্বন্ধও নেই, আর তাদের সাহিত্যিক ইতিহাসও ভিন্ন। তবু যে এগুলিকে এক অখণ্ড ভাষাতাত্ত্বিক ঐক্যসূত্রে (যদিও তা ক্ষীণ) বিধৃত করার চেষ্টা হয়েছে বা হচ্ছে, তার কতকগুলি বিশেষ কারণ (অবশ্য অরাজনৈতিক) রয়েছে।

প্রথমত, এই ভাষাঞ্চলের ভাষাভাষীদের ভাষাসচেতনতার অভাব ও অজ্ঞতা। লক্ষণীয়, ১৯৬১ সনের আদমশুমারি অনুযায়ী হিন্দী ভাষাঞ্চলে সাধারণ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন

জনগণের হার ২৭.১ শতাংশ (দ্র. পৃ. ৪৯)। এই নিরক্ষর জনসাধারণ সাধারণত নিজের মাতৃভাষাকে গ্রাম্য ব'লে মনে করতে অভ্যস্ত। তাঁদের অবচেতন ধারণা, তাঁরা আদর্শ ও বিশুদ্ধ কোনো এক সার্বজনীন হিন্দীর গ্রাম্য উপভাষায় কথাবার্তা বলে থাকেন—যা সভ্য সমাজে অচল। পূরবৈয়া (=পূর্বী), পছাহাঁ (পশ্চিমী), খড়ীবোলী, পড়ীবোলী, ঠেঠ (বিশুদ্ধ), রেখ্‌তা (=মিশ্রিত) ইত্যাদি অভিধা এঁদেরই সৃষ্ট। আর্যভাষার প্রাচীন ও মধ্যযুগে ঠিক এই ভাবেই আদর্শ ভাষা হিসেবে সংস্কৃত (যা ছিল প্রকৃতপক্ষে কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর সংস্কৃত থেকে বিচ্যুত অন্যান্য সব ভাষাই তাঁদের কাছে ছিল 'অপভ্রংশ' (পতঞ্জলি ঃ মহাভাষ্য ১.১.১)।

দ্বিতীয়ত, প্রাচীন স্তরের অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ভাষার সঙ্গে ক্ষীণ সাযুজ্য আবিষ্কার। আর্যাবর্ত ব'লে চিহ্নিত উত্তর ভারতের এই মধ্যাঞ্চল বহুদিন যাবৎ প্রথমে সংস্কৃত ও উত্তরকালে শৌরসেনী অপভ্রংশের পীঠভূমিরূপে বিবেচিত হতো। আধুনিক ভাষাগুলির জন্মলগ্নেও বিভিন্ন প্রাদেশিক কবিরা মাতৃভাষা ছাড়াও অপভ্রংশ-অবহট্‌টে সাহিত্য রচনা করতেন। রাজস্থানের পিঙ্গল সাহিত্য, পূর্ব ভারতের ব্রজবুলি সাহিত্য অথবা দোহা সাহিত্য, এমনকি চন্দ্‌ বর্দাঈ রচিত 'পৃথ্বীরাজ-রাসৌ' প্রভৃতি ১০ম-১৩শ শতকের রচনাবলী এই মিশ্র অপভ্রংশ (কেননা কিছুটা নব্য ভাষা দ্বারা প্রভাবিত) ভাষার সাক্ষ্য দেয়। অপর পক্ষে, তদানীন্তন নব্য ভাষাগুলির ছন্দোরীতি, কাব্যিক সংস্কার ও আদর্শ, ধর্মীয় অথবা ধর্মনিরপেক্ষ আবেদন অপভ্রংশধারা থেকেই গৃহীত, তার বিষয়বস্তুও যেন অপভ্রংশ সাহিত্যের প্রলম্বন (**Extension**)। নাগর বা শৌরসেনী অপভ্রংশের ভাষাঞ্চলও (গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পূর্ব পাঞ্জাব) ছিল বিস্তৃত, এবং তার প্রভাবও ছিল ব্যাপক। কারণ, তখনও আধুনিক ভাষাগুলি যথার্থ বিশ্লিষ্ট অথবা বিশিষ্ট হয়ে ওঠেনি। সুতরাং বিভিন্ন অশিক্ষিত ভাষাভাষীরা যে শৌরসেনী সংস্কার ও তাদাত্ম্যবোধ থেকে রাতারাতি মুক্ত হয়ে উঠবেন, তা আশা করা যায় না। সুতরাং এই অঞ্চলের ভাষাভাষীরা একই ভাষা-ভাবনায় অভ্যস্ত।

তৃতীয়ত, লিপির সাধর্ম্য। জন্মলগ্ন থেকেই নাগরী লিপির একটা প্রতিষ্ঠা ছিল, কারণ তখন (৮ম-১১শ শতক) উত্তর ভারত জুড়ে রাজপুত রাজাদের প্রতিষ্ঠা, সাধারণ শৌরসেনী অপভ্রংশ (অবহট্‌ঠ) ছিল তাঁদের রাজ্যভাষা আর নাগরী ছিল তাঁদের নিজস্ব লিপি। তথাপি তা ছিল একান্তই আঞ্চলিক লিপি এবং অন্যান্য লিপির (যেমন বাঙলা, ওড়িয়া, মৈথিলী ইত্যাদি) সহোদরস্থানীয়া। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান যুগে দিল্লী-উর্দু প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে (১৭০০ খ্রী.) ফারসী লিপিই রাজমান্য হয়ে উঠেছিল। এমনকি স্বাধীনতা লাভের কিছু পূর্বেও হিন্দী অথবা উর্দুভাষী শিক্ষিত

জনসাধারণের কাছে এই ফারসী লিপিই ছিল অধিক গ্রহণযোগ্য। তাই উর্দু অথবা ইংরেজী না-জানা লোকদের চিহ্নিত করা হতো নিরক্ষররূপে। যে যাই হোক, নাগরী হরফের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন আচার্য ম্যাক্স্ম্যুলর। তিনি ঋগ্‌বেদ সংহিতা প্রকাশ (ইং ১৮৪৯) করবার সময় কাশী অঞ্চলে ব্যবহৃত লিপি হিসেবে নাগরী লিপিকেই নির্বাচন করেছিলেন আর সেই থেকে সংস্কৃত গ্রন্থের লিপি হিসেবে নাগরী 'দেবনাগরী' রূপে চিহ্নিত হতে লাগলো। এই প্রতিষ্ঠাই পরে তাবৎ হিন্দীভাষীদের সর্বজনগ্রাহ্য একক লিপিরূপে মান্য হওয়ার সহায়তা করেছে। উনিশ শতকে আবার ইউরোপীয় শাসকদের উৎসাহে হিন্দু-হিন্দী চেতনার আদর্শ মাধ্যম হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে এই লিপি। কাজেই লিপির সাধারণীকরণের ফলে নিরক্ষর অজ্ঞ জনসাধারণ লিপিকেই ভাষারূপে মনে করতে লাগলেন।

চতুর্থত, কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক সাধর্ম্য। উত্তর ভারতের মধ্যাঞ্চলের ভাষাগুলিতে (Central group) কিছু কিছু সাধর্ম্য (Common core) দেখা যায়—যেগুলি অন্যান্য অঞ্চলের ভাষা থেকে এদের বিশিষ্ট করেছে। উদাহরণস্বরূপ, স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ—যা বাঙলা, অসমীয়া, ওড়িয়া বা গুজরাটী, মারাঠীতে দেখা যায় না; মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলির সঠিক উচ্চারণ (Stability of aspirates), দন্ত্য-ঘৃষ্ট ব্যঞ্জনের (Dental affricate) অস্তিত্ব, হ্-ধ্বনির পূর্বস্থিত স্বরের বিকৃতি (কহ্‌না > ক্যাহ্‌না), এ, ও ধ্বনির দীর্ঘত্ব [e: o], /ɛ:/ এবং /ɔ:/ (= এ্যা, অ') ধ্বনি দুইটির যৌগিক স্বররূপে পরিণত হওয়ার প্রবণতা ইত্যাদি।

৭.২.২ 'হিন্দী' অভিধার সংজ্ঞা ও ইতিহাস

বর্তমানে 'হিন্দী' অভিধার সংজ্ঞাও অস্পষ্ট। বহু যুগ ধরে 'হিন্দী' অভিধা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, ফলস্বরূপ সৃষ্ট হয়েছে এই অস্পষ্টতা। সংস্কৃত, প্রাকৃত অথবা আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন গ্রন্থে 'হিন্দী' শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায় না। স্পষ্টতই শব্দটি এসেছে ফারসী থেকে, ঠিক যেমনটি এসেছিল, সিন্ধু থেকে ইরানীয় উচ্চারণে হিন্দু। কাজেই ফারসী 'হিন্দী' শব্দের অর্থ দাঁড়াচ্ছে হিন্দ্ বা অখণ্ড ভারত-সম্পর্কীয় ভাষা। সুতরাং শব্দার্থের নিরিখে হিন্দী শব্দের অর্থ ভারতের যে-কোনো ভাষা। আর্য, দ্রাবিড় অথবা অন্য যে-কোনো গোত্রের ভাষাই হিন্দবী/হিন্দী বা হিন্দুঈ। এক্ষেত্রে হিন্দী ভাষার অর্থ ভারতীয় ভাষা।

দশম-ত্রয়োদশ শতকের পরিসরে অর্থাৎ তুর্কী আধিপত্যের যুগে দিল্লী-লাহোর

অঞ্চলে অধ্যুষিত মুসলমানরা সর্বপ্রথম হিন্দী শব্দের বহুল প্রচলন ঘটালেন। এই সময় হিন্দী/হিন্দবী শব্দের অর্থসংকোচন ঘটতে দেখা গেল। ইং ১২২৮ সালে মুহম্মদ আওফীর একটি কবিতাসংকলনে খ্বাজ.া মাসুদ সাদ সলমন রচিত একটি দীওয়ান্ হিন্দী ভাষায় রচিত ব'লে উল্লিখিত হয়েছে। আলাউদ্দীন খিল্জীর রাজত্বকালে (১২৯৫-১৩১৫ খ্রী.) ফকরুদ্দীন মুবারক গজ.নবী নামে জনৈক শব্দকোষ-প্রণেতা তাঁর গ্রন্থে ফারসী শব্দের "হিন্দী" প্রতিশব্দগুলি লিপিবদ্ধ করেন। সম্ভবত আমীর খুস্রৌ-ই (১২৫৪-১৩২৫ খ্রী.) সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে উত্তর ভারতের বিভিন্ন আর্যভাষাগুলির (যেমন ব্রজভাষা, অবধী, দিল্লী বোলি ইত্যাদি) পরিবর্তে এই অভিধা ব্যবহার করেন। মোটকথা, এই সময় উত্তর ভারতের সমগ্র কথ্য ও সাহিত্যিক আর্যভাষাগুলি হিন্দী নামে অভিহিত হতে শুরু করেছে—যার সীমানা হলো পশ্চিমে সির্হিন্দ্ থেকে পূর্বে বারাণসী এবং উত্তরে হিমালয়ের তরাই অঞ্চল থেকে দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল। বলা বাহুল্য, এই বিস্তৃত ভূ-ভাগ প্রাচীনকালে মধ্যদেশ এবং কোশল নামে অভিহিত হতো।

ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে এই তথাকথিত হিন্দী (<প্রাচীন হিন্দী/হিন্দবী) পূর্বী হিন্দী ও পশ্চিমা হিন্দীর ভাষাঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত—যার অন্তর্গত হলো—(১) বুন্দেলী (২) কনৌজী, (৩) ব্রজভাষা, (৪) বাঙ্গরু, (৫) হিন্দুস্তানী (গ্রীয়ার্সন-গৃহীত) বা খড়ীবোলী (ঐতিহ্যানুগত এবং ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্র ব্যবহৃত) বা দহল্বী (শেখ বজন্ এবং আমীর খুস্রৌ ব্যবহৃত), (৬) অবধী, (৭) বঘেলী, (৮) ছত্তিশগঢ়ী, (৯) রাজস্থানী (পণ্ডিত সূর্য করণ পরীখ্ ও নরোত্তম দাস স্বামী ব্যবহৃত) এবং মগহী (রাহুল সাংকৃত্যায়ন ব্যবহৃত)।

এই প্রসঙ্গে 'হিন্দুস্তানী' নামের ইতিহাস পর্যালোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৬শ-১৭শ শতকের কালসীমায় দহল্বী বা খড়ীবোলীর স্থানে 'হিন্দুস্তানী' অভিধার ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। এমনকি দিল্লী-উর্দুর স্থলেও এই নামকরণ অসুলভ নয়। রজহীর রচনায় (১৬৩৫ খ্রী), ফেরিস্তার (জন্ম ১৫৭০) ইতিহাসে অথবা আবদুল হামিদ লাহোরি-র (মৃত্যু ১৬৫৪ খ্রী) 'বাদশাহ্ নামা' গ্রন্থে এই 'জবান-ই-হিন্দুস্তান'-এর উল্লেখ প্রায়শই দেখা যায়। তবে প্রধানত ইউরোপীয়দের বহুল ব্যবহারে ১৮শ শতক থেকে এই হিন্দুস্তানী—যা লেখা হতো প্রধানত ফারসী হরফে—প্রতিষ্ঠা পেল। গ্রীয়ার্সনের পূর্বেই এই 'হিন্দুস্তানী' নাম ইউরোপীয় পণ্ডিতরা ব্যবহার করেছিলেন, যেমন—**Terry** (খ্রী ১৬১৬), **Fryer** (খ্রী ১৬৭৩), প্রথম হিন্দুস্তানী ব্যাকরণ প্রণেতা **Ketelaer** (ডাচ ভাষায় লিখিত, খ্রী ১৭১৫) এবং **Gilchrist (Angrezi Hindustani Dictionary)**,

ঐতিহাসিক Garcin de Tassy ('Hindouié' and 'Hindoustanié') ইত্যাদি।

আধুনিক স্তরে অর্থাৎ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে হিন্দী শব্দের আরও অর্থসংকোচন ঘটেছে। বর্তমানে হিন্দী ভাষা বলতে বোঝায় হিন্দুস্তানী/খড়ীবোলী/দহল্‌বী নামে চিহ্নিত কথ্য ভাষার সাহিত্যিক আদর্শ। তা পশ্চিমা হিন্দীর অন্যান্য ভাষা থেকে বিশ্লিষ্ট এবং পূর্বী হিন্দী থেকে স্বতন্ত্র। এই পর্বে হিন্দী উর্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে স্বীকৃত, যদিও তাদের ব্যাকরণগত কাঠামো অভিন্ন। এখন এই ভাষা আর আঞ্চলিক নয়, তা কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা বা আদর্শ, যার মূল আধার হলো হিন্দুস্থানী। এই হিসেবে আধুনিক হিন্দীর বয়স দেড়শো বছরের কিছু বেশি।

যাই হোক, ভাষাতাত্ত্বিক মানদণ্ডে সংবিধান-স্বীকৃত হিন্দী এক সাধারণ উপাধি, ফলে তা অস্পষ্ট এবং নিরাকার। এই হিন্দী বিভিন্ন ভাষিক অথবা ঔপভাষিক স্তর নিয়ে গঠিত। এর সাংগঠনিক বিন্যাস এইভাবে সূত্রায়িত করা যেতে পারে:

হিন্দী = পশ্চিমা হিন্দী + পূর্বী হিন্দী + বিহারী + রাজস্থানী + পাহাড়ী + পাঞ্জাবী (মিশ্রিত)
পশ্চিমা হিন্দী = হিন্দুস্থানী + ব্রজভাষা + বুন্দেলী + বাঙ্গরু/হরিয়ানী + কনৌজী
হিন্দুস্থানী = (সাধু) হিন্দী + দখ্‌নী + উর্দু
পূর্বী হিন্দী = কোশলী = অবধী + বঘেলী + ছত্তিশগঢ়ী
বিহারী = ভোজপুরী + মৈথিলী + মগহী
রাজস্থানী = প্রাচীন মারোয়াড়ী (ডিঙ্গল) + আধুনিক রাজস্থানী উপভাষাসমূহ
পাহাড়ী = পশ্চিমা পাহাড়ী + মধ্য পাহাড়ী
পাঞ্জাবী = পশ্চিমা পাঞ্জাবী + পূর্বী পাঞ্জাবী + পশ্চিমা হিন্দী (খড়ীবোলী)

গোঁড়া হিন্দী-প্রেমিকদের কাছে উপরের সব ভাষাগুলিই হিন্দীর উপভাষা। ভাষাতাত্ত্বিক ক্ষীণসূত্রে বেঁধে এগুলিকে হিন্দী আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে 'হিন্দী' অর্থের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে।* যেহেতু ১২শ-১৩শ শতকে 'হিন্দী' নামটি মেলে (তার অর্থ

---

* এই প্রসঙ্গে সুনীতিবাবুর মন্তব্য স্মরণীয়: If in Europe we could conceive of Portuguese, Spanish and Catalan ceasing to produce literature (like Galician and Provencal) and the speakers of all these accepting French as their main literary language, studying only French at School and reading and writing only French, and if on that basis we are to lump together the earlier (and even modern) literatures in all these languages and dialects as 'French' literature, then we would be in an analogous situation for 'Hindi'. (Chatterji : LLMI p. 111, 1st edition 1963).

যাই হোক না কেন) এবং যেহেতু 'হিন্দুস্তানী' নামটি কিছুটা অর্বাচীন, সেই হেতু উপরোক্ত সব ভাষাগুলিই হিন্দীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত এবং উপরোক্ত সব ভাষাগুলির প্রাচীন সাহিত্যই হিন্দীর অন্তর্গত হওয়ার যোগ্য—এই হলো তাঁদের অভিমত। বলা বাহুল্য, উর্দু প্রেমিকেরাও ঠিক একই যুক্তি দেখাতে পারেন। কারণ, উর্দু সাহিত্যের প্রায় চারশো বছরের ধারাবাহিকতা দীর্ঘ দিন ধ'রে বজায় আছে।

ভাষাবিজ্ঞানীর বিশ্লেষণে কিন্তু পূর্বী হিন্দী এবং বিহারী পুরোপুরি পৃথক বর্গের ভাষাগুচ্ছ। এদের মধ্যে পূর্বী হিন্দীভুক্ত অবধীর (লখ্‌নৌ-ফৈজাবাদ) বহু পূর্বেই স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠেছে, তার সাহিত্যিক ঐতিহ্যও প্রাচীন (১২শ শতক)। বঘেলী এবং ছত্তিশগঢ়ী অবশ্য তার উপভাষা। বিহারী বর্গভুক্ত ভাষাগুলির মধ্যে মৈথিলী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে দীর্ঘ দিন। তার সাহিত্যিক উত্তরাধিকারও সুপ্রাচীন (১৪শ শতক)। মগহী (দক্ষিণ বিহার) এবং ভোজপুরী (বেনারস-গোরখপুর) বর্তমানে উদীয়মান ভাষা। অবশ্য মগহীকে মৈথিলীর উপভাষা হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা রয়েছে মৈথিলীভাষীদের। বর্তমানে পশ্চিমা পাহাড়ী ও মধ্য পাহাড়ীকে হিন্দীপরিবারের ঔপভাষিক জ্ঞাতি বলে অবশ্য চালিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু রাজস্থানীর স্বাধিকার অর্জনের প্রচেষ্টা প্রবল। আর পাঞ্জাবী তো এখন পুরোপুরি স্বতন্ত্র ভাষা। রাজস্থানী এবং পাঞ্জাবীর প্রাচীন সাহিত্যে খড়ীবোলী বা ব্রজভাষার কম-বেশি প্রভাব দেখিয়ে এদের হিন্দী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা কতখানি যুক্তিযুক্ত, তার বিচার ও মীমাংসা আজও শেষ হয় নি। যাই হোক, এই ভাষাগুলির আলোচনা যথাস্থানে করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমা হিন্দীভুক্ত ভাষাগুলিই হিন্দীরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন রয়েছে। বুন্দেলী, বাঙ্গরু, কনৌজীকে হিন্দীর উপভাষা ব'লে চিহ্নিত করা গেলেও ব্রজভাষাকে (মথুরা-আগ্রা) বোধহয় উপভাষা ব'লে চালানো যাবে না। বর্তমানে তা পড়ীবোলী (**Patois**) হলেও প্রাচীনকালে তা রাজমান্য ভাষা ব'লে গণ্য হয়েছিল। এককালে মোগল সম্রাটরা এই ভাষাকে রাজসভা বা দরবারী ভাষা (**Court Language**) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে রচয়িতারা ব্রজভাষাতে লিখেছেন প্রচুর, যদিও তা ছিল প্রধানত কাব্যের ভাষা। কিন্তু এককালে কৃষ্ণভক্তি প্রচারের মাধ্যম হিসেবে তা সারা উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার সাহিত্যের ইতিহাসও সুপ্রাচীন (১৪০০-১৮০০ খ্রী.)।

অপরদিকে হিন্দুস্থানী বা খড়ীবোলীর (দিল্লী-মীরাট-বিজনৌর) প্রাচীন সাহিত্যিক উত্তরাধিকার বিশেষ কিছু নেই। দক্ষিণ ভারতে যখন হিন্দুস্থানী ফারসী-প্রভাবিত

সাহিত্যের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ালো (১৪শ শতক), বলতে গেলে তখন থেকেই দখনী-উর্দুর প্রতিষ্ঠা, হিন্দীর নয়—যদিও নব্য হিন্দী-প্রেমিকরা দখনী উর্দুকে (ফারসী প্রভাবিত হিন্দুস্থানী) নাগরী হরফে ছাপিয়ে তাকে হিন্দীর প্রাচীন গৌরবে মণ্ডিত করতে চাইছেন (দখনী হিন্দুস্থানী)। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো এই একশো বছর আগেও, এমনকি খড়ীবোলীও উর্দু নামে অভিহিত হতো [ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের মন্তব্য স্মরণীয় (১৮৭১খ্রী): ইন্‌কি বোলী স্ত্রী ঔর পুরুষ সবকি, খড়ীবোলী অর্থাৎ উর্দু হৈ]। তা ছিল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শিক্ষিত জনসাধারণের Lingua franca। হিন্দী অর্থাৎ সংস্কৃত-প্রভাবিত হিন্দী অর্থাৎ সাধু হিন্দীর উদ্ভব হয়েছে পাশ্চাত্ত্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায়। বাঙালী পণ্ডিতেরাও এই ভাষার বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। এই হিন্দীর বয়স দেড়শো বছরের কিছু বেশি। অবশ্য রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে তার অগ্রগতি এখন অবাধ এবং আপোষহীন।

মোট কথা, ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে নিম্নলিখিত বাস্তব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হবে—

১॥ বর্তমান হিন্দী অঞ্চলনিরপেক্ষ একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা (বর্তমান উর্দুও তাই)।

২॥ এই ভাষার মূল আধার ও ভিত্তি হলো দিল্লী-মীরাট অঞ্চলের কথ্য খড়ীবোলী বা লৌকিক হিন্দুস্থানী (Vernacular Hindustani) [অবশ্য উর্দুরও তাই]।

৩॥ হিন্দী ও উর্দুর ব্যাকরণগত গঠনরূপ (Structure) এক, যদিও লিপি ও শব্দ-ভাণ্ডার পৃথক।

৪॥ সাধু হিন্দীর প্রতিদ্বন্দ্বী ভাষা হলো উর্দু এবং সাহিত্যিক হিন্দুস্থানী (যা সাধারণত সিনেমা, পত্র-পত্রিকা, গজল-খেয়াল গানে প্রচলিত)। এবং এই সাহিত্যিক ভাষাগুলি একই কথ্য ভাষার (খড়ীবোলী) তিনটি সাহিত্যিক ভেদমাত্র।

৫॥ হিন্দী ভাষার ইতিহাস আসলে হিন্দুস্থানী উপভাষার ইতিহাস (উর্দুরও তাই)।

৭.২.৩ ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস

বৃহত্তর হিন্দীগোষ্ঠীভুক্ত ভাষার বিবর্তনে তিনটি স্তর দেখা যায়। স্তরগুলির কালানুক্রমিক বিভাগ নিচে দেখানো হচ্ছে:

(ক) প্রাচীন যুগ (১৩০০-১৫০০ খ্রী.): এই স্তরকে বলা যায় হিন্দুস্থানী (খড়ীবোলী) পর্ব। এই পর্বে হিন্দী স্পষ্টভাবে বিকশিত হয়নি। ভাষাতে অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের

প্রভাব প্রচুর। লিখিত নিদর্শনও বিশেষ কিছু নেই। রচনারীতির দিক দিয়ে এই পর্ব "বীরগাথা" কাল নামে অভিহিত হয়ে থাকে। লেখকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন চন্দ্ বর্দাঈ ও আমীর খুস্রৌ।

(খ) মধ্য যুগ (১৫০০-১৮০০ খ্রী.): এই যুগকে বলা যায় উপভাষা-প্রাধান্যের পর্ব। এই যুগে হিন্দী ভাষা অপভ্রংশ প্রভাব থেকে মুক্তি পেয়েছে। এই যুগের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে দখনী-উর্দু, ব্রজভাষা, অবধী এবং মৈথিলী উপভাষার জাগরণের যুগ। রচনারীতির দিক দিয়ে এই যুগকে আবার দুটি পর্বে ভাগ করা যায়, যথা—

১॥ ভক্তি কাল (১৫-১৭শ শতক): এই পর্বে ব্রজভাষা ও অবধীতে ভক্তিকাব্য ও নির্গুণপন্থী কাব্যধারার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ (প্রধান লেখক: কবীর, সূরদাস, তুলসীদাস, কেশব দাস ইত্যাদি)।

২॥ রীতি কাল (১৭শ-১৮শ শতক): প্রধানত ব্রজভাষায় রচিত আলংকারিক 'রীতি' আশ্রিত কাব্যসম্ভার (প্রধান লেখক: বিহারীলাল, ভূষণ ইত্যাদি)।

(গ) আধুনিক কাল (৮০০—): এই যুগকে বলা যায় হিন্দীর (খড়ীবোলী) প্রাধান্যের যুগ। গদ্যের আবির্ভাব এই যুগের শ্রেষ্ঠ অবদান। এই যুগের উদ্গাতা—লল্লূলাল এবং সদল মিশ্র, সদাসুখলাল ও ইন্শা অল্লা—গদ্য রচনার চারিটি প্রধান স্তম্ভ। তবে আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের আদি পুরুষ হলেন ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র (১৮৫০-৮৫ খ্রী.)।

৭.২.৪ পশ্চিমা হিন্দী ও হিন্দী

[১] হিন্দুস্থানী (খড়ীবোলী)

পূর্বেই বলেছি, হিন্দুস্থানী (খড়ীবোলী) হচ্ছে সাধু-হিন্দী (**High Hindi**) ও উর্দুর লৌকিক ভিত্তিস্বরূপ। তা হিন্দী ও উর্দুর কৃত্রিম স্থির আদর্শ ও লক্ষ্যে কখনই পৌঁছয় না।* এই মধ্যপন্থী ভাষা একটি সংহত আদর্শ কথ্য (**Standard Colloquial**) ভাষারূপে যে-বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত তার সীমানা হলো—পশ্চিমে পাঞ্জাবী এবং বাঙ্গরু, উত্তরে পাহাড়ী ভাষাগুচ্ছ, দক্ষিণ-পূর্বে ব্রজভাষা। এই ভাষা বলা হয়

* "The spoken language naturally stands midway between the two and never reaches the ideal standards, showing a greater uniformity throughout the area" (Ghatage: HL p. 140)

রামপুর, মুরাদাবাদ, বিজনৌর, মীরাট, মুজফ্ফরনগর, সাহারাণপুর, দেরাদুন ইত্যাদি উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম জেলাগুলিতে। বলা বাহুল্য, এই লৌকিক ভাষার সাহিত্যিক আদর্শ (Literary Standard) উচ্চতর জীবনযাত্রায়, প্রশাসনিক কাজকর্মে, শিক্ষাদীক্ষায় অথবা আনুষ্ঠানিক আদানপ্রদানে বিশেষ মান্য ভাষা (Prestige Language) হিসেবে স্বীকৃত—যদিও ব্যক্তিগত রুচি ও সংস্কৃতি অনুযায়ী তা হিন্দী বা উর্দু রচনারীতির (সেই সঙ্গে লিপি—প্রথম যুগে প্রধানত ফারসী) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ১৯৬১ সনের জনগণনা অনুযায়ী হিন্দুস্থানী ভাষাভাষীর সংখ্যা ১ লক্ষ ২২ হাজার ১১। ১৯৭১ গণনায় কিন্তু হিন্দুস্থানীভাষীর সংখ্যা ১১,০৫৩।

প্রাচীন যুগের যথার্থ হিন্দুস্থানী রচনার নিদর্শন পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য। খড়ীবোলীতে লেখা কিছু রাসো / রাসৌ কাব্য অর্থাৎ বীরগাথা ১৩০০ খ্রীষ্টীয় শতকের পূর্বেই রচিত ব'লে মনে করা হলেও ভাষা কিন্তু সে-সাক্ষ্য দেয় না। এইজাতীয় দীর্ঘ কাব্যের উপজীব্য হলো মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যসর্বস্ব প্রাচীন রাজপুত বা ক্ষত্রিয় শৌর্যবীর্যের কাহিনী —যা আবেদনে আবার রোমান্স-রসে পুষ্ট। প্রধান রাসো-কাব্য অবশ্য চন্দ্ বর্দাঈ রচিত "পৃথ্বীরাজ-রাসৌ" (পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তার রোমান্টিক কাহিনী ও বীরগাথা)। বর্দাঈ দিল্লী ও আজমীরের শেষ হিন্দু চৌহান নরপতি পৃথ্বীরাজেরই (খ্রী. ১১৫৯-৯৩) সভাকবি ছিলেন। এই গ্রন্থের কিছু অংশ হয়তো চোদ্দ শতকের ভাষার সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু অধিকাংশ অংশই প্রক্ষিপ্ত। বর্তমান পাঠে পুরোনো রাজস্থানী, পশ্চিমা হিন্দী ও অপভ্রংশের যথেচ্ছ মিশ্রণ দেখা যায়। এর ভাষা দেখে রচনার স্থান ও কাল সম্পর্কে কিছুই সঠিকভাবে বলা যায় না। কেউ কেউ মনে করেন, এই গ্রন্থ ১৬ শতকে সংকলিত। কারোর মতে আবার এটি হয়তো মূলে ছিল ১২-১৩শ শতকের অপভ্রংশে রচিত।

অপর রাসো-গ্রন্থ হলো অজ্ঞাতনামা কবির "খুমাণ-রাসৌ" (১৪শ শতক ?) এবং নরপতি নল্হা (১১৬৩ খ্রী.) রচিত "বিশালদেব-রাসৌ"। কিন্তু রচনাগুলি ১৭ শতকের ভাষায় রক্ষিত। জগনিক-রচিত "পরমল-রাসৌ" (১১৭০ খ্রী.) মহাকাব্যের বিষয়বস্তু আল্হা ও উদল নামে পরিচিত দুই বীর ভ্রাতার যুদ্ধগাথা। এই কাব্য মৌখিক সাহিত্য হিসেবে রক্ষিত হলেও মূল রচনা পাওয়া যায় নি। তবে এই কাহিনীর প্রধানত বুন্দেলী ও ভোজপুরী এবং অবধী পাঠ (Version) সমগ্র হিন্দী এলাকায় এখনও প্রচলিত আছে।

নাথপন্থীদের আদিগুরু গোরখনাথ (আনু. ১১৫০ খ্রী.) এবং অন্যান্য সমসাময়িক সাধকদের গোরখনাথ-গোপীচন্দ্র কাহিনী সম্পর্কিত কিছু পদ ও বাণী এই যুগে রচিত

হয়েছিল ব'লে মনে হয়, কিন্তু ভাষা দেখে এর প্রাচীনত্ব অথবা ভাষার স্থানিক লক্ষণ বোঝার উপায় নেই।

খড়ীবোলীতে রচিত প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির মধ্যে স্থফী কবি আমীর খুসরৌ (১২৫৪-১৩২৫ খ্রী.) রচিত নিদর্শনগুলিই বোধ হয় সর্বপ্রাচীন। তিনি প্রধানত ফার্সী কবি ও পণ্ডিত হলেও কিছু কিছু খড়ীবোলীতে কবিতা ও গান রচনা করেছিলেন—যদিও তা পরিমাণে নগণ্য। এই নিদর্শনগুলি প্রধানত কিছু দীর্ঘ কবিতা ও চতুষ্পদী প্রহেলিকাজাতীয় রচনা। তবে মূল পুঁথি অনিশ্চিত, ভাষাও বিকৃত এবং নবীকৃত। তবে স্বল্প নিদর্শন দেখেই বোঝা যায়, তাঁর রচনা প্রাচীন হিন্দী-ই, অপভ্রংশ নয়। তাঁর রচনায় দিল্লী-মীরাটসুলভ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য (যথা, -আ প্রত্যয়ান্ত পদ) এবং ব্রজভাষাসুলভ বৈশিষ্ট্যের (যথা, -ঔ প্রত্যয়ান্ত পদ) সংমিশ্রণ দেখা যায়।

ড. রাজগুরুর সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে আরও কিছু প্রাচীন খড়ীবোলীর গদ্য-নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি প্রধানত পাঞ্জাব অঞ্চলে রচিত হয়েছিল, রচনার লিপি তাই গুরুমুখী। অধুনা-আবিষ্কৃত প্রাচীন লেখকদের মধ্যে প্রধান হলেন—সোধি মিহিরবন (খ্রী. ১৬৪০-৮০), হরিজী (১৬৮০-১৭২০), এবং দিআল অনেমি (১৭২০-৭১৭৫)।[১]

খড়ীবোলী উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এইগুলি—

১. ঐ এবং ঔ ধ্বনির অভাব এবং হিন্দীর তুলনায় এর স্থানে যথাক্রমে এ এবং ও ধ্বনি, যথা—ওর (=হিন্দী ঔর), হে (=হিন্দী হৈ)।

২. অধিকাংশ স্থলে 'ন' ধ্বনির স্থলে 'ণ' ধ্বনির ব্যবহার।

৩. রাজস্থানী ও পাঞ্জাবীসুলভ ল. (*ḷ*) ধ্বনির অস্তিত্ব। কিন্তু খড়ীবোলী অঞ্চলের পূর্বাঞ্চলে এই ধ্বনি নেই।

৪. ব্যঞ্জন দীর্ঘত্ব অর্থাৎ ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব রূপ, যথা রন্নী (=রানী), পুচ্ছা (=পুছা) ইত্যাদি।

৫. 'আ' ধ্বনি ছাড়া দীর্ঘ ব্যঞ্জনের পূর্বস্থিত দীর্ঘ স্বরের হ্রস্বতা প্রাপ্তি, যথা—বেট্টী, লোট্টা। এ,ও = ĕ, ŏ।

৬. নাম, সর্বনাম, বিশেষণ, কৃদন্তপদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে অন্ত্য স্বর ব্রজভাষায় -ঔ, বুন্দেলীতে -ও কিন্তু হিন্দুস্থানীতে -আ, যথা—ভলা (=ভলৌ, ভলো), মেরা (=মেরৌ, -মেরো), গয়া (=গয়ৌ, গয়ো) ইত্যাদি।

---

১ দ্র. CHI (Vol. V), p. 500

৭. নাম শব্দের বহুবচনের তির্যক বা গৌণ মূলে -ওঁ স্থলে হিন্দুস্থানীতে সর্বদাই -আঁ, যথা—লড়্কাঁ- (=লড়কোঁ-), ঘরাঁ (=ঘরোঁ-)।

৮. কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়ার বর্তমান কালের সহায়ক ক্রিয়া সামান্য বর্তমান রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়, কৃদন্ত রূপের সঙ্গে নয়, যেমন, মীরাট ও তার আশেপাশে ব্যবহৃত খাউঁ হূঁ (=হিন্দী খাতা হূঁ), মারূ হূঁ (=মারতা হূঁ)।

৯. অনুরূপভাবে নিত্যবৃত্ত (অতীত) পদ গঠনে সহায়ক ক্রিয়া -এ অন্তক কৃদন্ত পদের সঙ্গে যুক্ত হয়, যথা—বহ্ পঢ়ে থা (=পঢ়্তা থা), মৈঁ মারে থা (=মার্তা থা)।

১০. অন্যান্য উপভাষার তুলনায় খড়ীবোলীতে আরবী ও ফারসী শব্দের আধিক্য দেখা যায়।

[২] ব্রজভাষা

গ্রীয়ার্সন তাঁর Linguistic Survey of India নামধেয় গ্রন্থে ব্রজভাষার পরিচয় দিয়েছেন 'অন্তর্বেদী' ভাষারূপে, অর্থাৎ এই ভাষা গঙ্গা-যমুনা বিধৌত অববাহিকা অঞ্চলের প্রচলিত ভাষা। ব্রজভাষা কেবল ব্রজমণ্ডল (যার পরিধি ৮৪ ক্রোশ ব'লে প্রচলিত) প্রদেশের ভাষা নয়। এর বিস্তার আরও ব্যাপক। তবে এর বিশুদ্ধ খাঁটি রূপ মথুরা, আগ্রা, আলীগড় তথা ধৌলপুর অঞ্চলে দৃষ্ট হয়। এই ভাষা এককালে বিশেষ সাহিত্যিক মর্যাদা অর্জন করেছিল। তার কারণ, প্রাচীন "শূরসেন" জনপদের কেন্দ্র ছিল মথুরা আর শৌরসেনী অপভ্রংশ ছিল এখানকার প্রচলিত ভাষা। ব্রজভাষা এই শৌরসেনী অপভ্রংশের যথার্থ উত্তরসূরী। বুলন্দ্‌শহর, বদাউন এবং নৈনিতালের তরাই ভূমিতে অবশ্য খড়ীবোলীর প্রভাব যথেষ্ট। অপরদিকে এটোয়া, মৈনপুরী, বেরিলীর ব্রজভাষায় কনৌজী বৈশিষ্ট্য বেশ সুলভ। গুড়গাঁও, ভরতপুর এবং গোয়ালিয়রের পশ্চিমোত্তর ভূভাগের ব্রজভাষায় বুন্দেলী এবং রাজস্থানীর কিছু বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। প্রসিদ্ধ হিন্দী ভাষা-বিজ্ঞানী শ্রীধীরেন্দ্র বার্মার মতে, পীলীভীত এবং এটোয়ার ভাষা কনৌজীর চেয়ে ব্রজের বেশি কাছাকাছি।

ব্রজ ভাষাঞ্চলের উত্তরে বাঙ্গরূ এবং খড়ীবোলী, পূর্বে কনৌজী ও অবধী, দক্ষিণে বুন্দেলী এবং পশ্চিমে রাজস্থানী ভাষাসমূহ অবস্থিত। ৩৮ হাজার বর্গমাইল আয়তন-বিশিষ্ট এই ভাষাঞ্চলের ভাষাভাষী-সংখ্যা সাম্প্রতিক জনগণনায় (ইং ১৯৭১) আনুমানিক ২৫ হাজার ৮৬৪ কিন্তু ১৯৬১ সনের জনগণনায় ৭৬ হাজার ১৮৯।

ব্রজভাষার সাহিত্যিক মর্যাদা প্রকৃতপক্ষে ১৩শ শতকের উত্তরার্ধেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ভাষার জনপ্রিয়তা একদা সারা উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল ভক্তিধর্ম

প্লাবনের সঙ্গে তাল রেখে। তাই বিভিন্ন ভাষাভাষী সাধক-কবিরা মাতৃভাষার পরিবর্তে এই ব্রজভাষাকেই তাঁদের ভাবপ্রকাশের বাহন করে নিয়েছিলেন। রাজস্থানের ভক্তসাধিকা মীরাবাই (খ্রী. ১৪৯৮/১৫০৩-১৫৪৬), শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক (খ্রী. ১৪৬৯-১৫৩৮), অবধীভাষী তুলসীদাস (খ্রী. ১৫৩২-১৬২৩) অথবা ভোজপুরীভাষী কবীর (খ্রী. ১৩৯৯-১৫১৮) প্রমুখ অধ্যাত্মবাদীদের রচনা মুখ্যত ব্রজভাষা অথবা মিশ্রিত ব্রজভাষা অবলম্বনে গ'ড়ে উঠেছিল। ব্রজভাষার লোকসাহিত্য-সম্ভারও বিপুল।

ব্রজভাষার প্রাচীনতম লেখক বোধ হয় প্রসিদ্ধ গীতকার গোপাল নায়ক। ইনি ছিলেন আমীর খুসরোর (খ্রী. ১২৫৪-১৩২৫) সমসাময়িক। ব্রজবুলিতে রচিত তাঁর কিছু কিছু ধ্রুপদ গান এখনও প্রচলিত আছে। উত্তর যুগের সংগীতসাধক বৈজু বাওরা এবং তানসেনও ব্রজবুলিতে সংগীত রচনা করেছিলেন।

গোরখনাথ (আনু. ১১৫০ খ্রী.) প্রবর্তিত নাথধর্মের অন্যতম প্রবক্তা নির্গুণমার্গী সন্ত কবীর (খ্রী. ১৩৯৯-১৫১৮) সম্ভবত ব্রজভাষার প্রথম পূর্ণাঙ্গ লেখক। বারাণসীর এই ভক্তকবি জাতে জোলা মুসলমান হলেও ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য রামানন্দের (খ্রী. ১৪০০-১৪৭০) শিষ্য। তাঁর অধ্যাত্ম ধ্যানধারণা নাথ, সুফী ও বৈষ্ণব ধর্মের সমন্বয়ে চিরায়ত। বৈষ্ণবীয় সানুরাগ প্রেম ও ভক্তি, সুফি রহস্যবাদ ও নাথপন্থীসুলভ নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা তাঁর আদর্শে একাকার হয়ে গেছে। একই ব্রহ্ম তাঁর কাছে রাম (আনন্দস্বরূপ) এবং রহিম (করুণাস্বরূপ)। মাতৃভাষা ভোজপুরীতে বেশ কিছু দোহা রচনা করলেও তিনি অধিকাংশ রচনাতে মিশ্রিত বা সংকর ভাষা প্রয়োগ করেছেন—যা 'সাধুক্কড় বোলী' নামে ভক্তদের কাছে অভিহিত হয়ে থাকে। এই ভাষা প্রধানত স্বচ্ছ ও সরস ব্রজভাষা কিন্তু এর সঙ্গে "দিল্লী বোলী" (অন্তে -আ যুক্ত পদ) এবং অবধীর মিশ্রণ আছে। হয়তো ভাষা ছিল মূলে ভোজপুরী, পরে তাতে পশ্চিমা হিন্দীর আস্তরণ পড়েছে। মাঝে মাঝে ইস্‌লামিক প্রসঙ্গে আরবী-ফারসী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে (রেখ্‌তা)—ফলে তাতে ভাবী উর্দুর অস্ফুট সম্ভাবনা দেখা গেছে। তাঁর রচিত দোহাগুলি "বীজক" (তিনভাগে বিভক্ত) এবং "বাণী" আকারে সংকলিত হয়েছে। কবীরের বহু কবিতা শিখধর্মগ্রন্থ 'আদিগ্রন্থ'-এ (খ্রী. ১৬০৪) সংকলিত হয়েছে (সংকলক পঞ্চম শিখগুরু অর্জুন)। রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন সেনের প্রসাদে কবীরের রচনা বাঙালীদের কাছে আজ আর অজানা নয়।

কবীরের অনুগামী কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যে হলেন ধর্মদাস (১৬শ শতক), রইদাস বা রবিদাস, গুরু নানক (১৪৬৯ ১৫৩৮ খ্রী.) এবং দাদূ দয়াল (১৫৪৪-১৬০৩ খ্রী.)। ধর্মদাস অবশ্য ভোজপুরীতেও কবিতা লিখেছিলেন। কবীরের

সমসাময়িক এবং রামানন্দ-শিষ্য রইদাস ছিলেন রামভক্ত। গুরু নানক প্রধানত পশ্চিমা হিন্দীতেই রচনা করেছিলেন কিন্তু তাতে পাঞ্জাবীর মিশ্রণ আছে। কবীরের মরমিয়া মত ও পথ অনুকারী সূফীসাধক দাদূ দয়াল জন্মসূত্রে গুজরাটী হলেও অম্বরে (রাজস্থান) জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। রাজস্থানী তাঁর নিজস্ব মাতৃভাষা হলেও তাঁর কাব্য ব্রজভাষার রচিত—যদিও তাতে প্রাচীন খড়ীবোলীর (দিল্লী বোলী) মিশ্রণ অসুলভ নয়। এঁর ভাষাও 'সাধুক্কড় বোলী' নামে পরিচিত।

কবীরের নির্গুণ ব্রহ্ম ও সূফী অধ্যাত্মধারার পাশাপাশি সগুণ ভক্তি ও কৃষ্ণ বা রামবিষয়ক ভক্তিকাব্য রচনারও বিরাম ছিল না। রামায়ত ধারা প্রধানত তুলসীদাস (খ্রী. ১৫৩২-১৬২৩) ও অবধী সাহিত্যকে আশ্রয় ক'রে গ'ড়ে উঠেছিল। কিন্তু কৃষ্ণবিষয়ক কাহিনীর প্রধান অবলম্বন ছিল ব্রজভাষা। ব্রজভাষায় কৃষ্ণলীলার অগ্রণী কবিরা 'অষ্টছাপ' নামে পরিচিত। অষ্টছাপভুক্ত আটজন কবি হলেন—সূরদাস (১৪৮৪/১৫০৩-১৫৬৩), নন্দদাস, কৃষ্ণদাস, পরমানন্দদাস, কুম্ভনদাস, চতুর্ভুজদাস (জন্ম ইং ১৫১৬), ছীত স্বামী ও গোবিন্দ স্বামী। বল্লভাচার্য (খ্রী. ১৪৭৯-১৫৩১)-অনুগামী উপরোক্ত ভক্তকবিদের কীর্তন এককালে বৃন্দাবনের গোবিন্দ মন্দিরে গীত হতো। এঁদের মধ্যে বল্লভাচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য সূরদাস ছিলেন কৃষ্ণায়ত ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও গোপীপ্রেমের ওপর তাঁর কয়েক হাজার পদ আছে। এগুলি ব্রজভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাঁর রচনাগুলি হলো সূরসাগর, সূর-সারাবলী এবং সম্ভবত সাহিত্য-লহরী। নন্দদাস বল্লভাচার্যের পুত্র বিঠ্‌ঠল নাথের শিষ্য। তাঁর রচিত প্রাপ্ত ১৬টি গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রাসপঞ্চাধ্যায়ী এবং ভন্‌বর-গীত। তাঁর ভাষায় আলংকারিক চাতুর্য স্পষ্ট। অপর কবিত্রয় পরমানন্দ দাস (ধ্রুবচরিত, দানলীলা), কৃষ্ণদাস (ভ্রমর-গীত, প্রেমতত্ত্ব নিরূপণ) এবং চতুর্ভুজ দাস (দ্বাদশ যশ, ভক্তি প্রতাপ, হিতু কো মঙ্গল) অবশ্য সাহিত্যপ্রেরণায় কিছুটা বিমলিন। অপর তিনজন কবিদের কিছু বিক্ষিপ্ত পদ ছাড়া বিশেষ কোনো সাহিত্যকৃতির পরিচয় মেলে না। ব্রজভাষার অপরাপর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান গদাধর ভট্ট এবং ষড়্ গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্ট স্মরণীয়। ভক্তকবি হিত হরিবংশ (জন্ম ১৫০৩ খ্রী.) প্রথমে শ্রীচৈতন্যপন্থী কিন্তু পরে রাধাবল্লভীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তাঁর রচিত ৮৪টি পদের সংকলন 'হিত চৌরাশী' নামে পরিচিত।

ভক্তসাধিকা মীরাবাই (খ্রী. ১৪৯৮/১৫০৩-১৫৪৬) কৃষ্ণায়ত ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। ইনি মাধুর্যভাবের উপাসনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীব গোস্বামীর দ্বারা প্রভাবিত। কৃষ্ণ প্রেমে (গিরিধারীলাল) অনুরঞ্জিত তাঁর ভজনাবলী রাজস্থানীর মারোয়াড়ী উপভাষাতেই

রচিত হয়েছিল নিশ্চয়—তিনি নিজেও ছিলেন মেবারের রানী ও রাজপুতপ্রধানের দুহিতা। তবে তাঁর রচনা ব্রজভাষা পাঠেই অধিক প্রচলিত। মীরাবাই রচিত রচনাসম্ভার এইগুলি—নর্ সীজী কা মহেরো, গীতগোবিন্দ কী টীকা, রাগগোবিন্দ, গর্বগীত এবং রাগ বিহাগ।

সম্রাট আকবরের (খ্রী. ১৫৫৬-১৬০৫) আমলেও সম্রাটের সহায়তায় ব্রজভাষা পুষ্টিলাভ করেছে। তিনি নিজেও যেমন ব্রজভাষায় কবিতা রচনা করেছেন, তেমন তাঁর উৎসাহ ও আনুকূল্যে বহু কবি ও গায়ক ব্রজভাষা চর্চা করেছেন। রাজসভাতেও ব্রজভাষা উৎসাহিত হতো। আকবরের রাজসভার 'নবরত্ন' কবিদের অন্যতম কবি অবদুর রহীম খান্-খানান্ (খ্রী. ১৫৫৬-১৬২৭) ছিলেন সম্রাটের শিক্ষক বৈরাম খাঁর পুত্র। তাঁর কবিতাগুলি নির্ভেজাল ব্রজবুলিতেই লিখিত (যদিও এঁর অবধী কবিতাও লভ্য)। এগুলি মূলত কৃষ্ণবিষয়ক, যদিও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য তাঁর রচনার অন্যতম গুণ। তাঁর রচনাসম্ভারের প্রধান গ্রন্থগুলি হলো—রহিম দোহাবলী, বর্বে নায়িকা ভেদ, মদনাষ্টক, শৃঙ্গার সোরঠ এবং রাসপঞ্চাধ্যায়ী। আকবরের রাজসভার অন্যান্য কবিরা হলেন—নরহরি, বীরবল, টোডরমল, অলম, গঙ্গ (১৫৭৮-১৬১৭), মনোহর কবি, বলভদ্র মিশ্র, কেশবদাস।

শেষোক্ত কবি কেশবদাস (খ্রী. ১৫৬৫-১৬১৭) আলংকারিক কাব্যরীতির প্রবর্তক হিসেবে স্মরণীয়। তাঁর প্রধান কাব্য রসিক প্রিয়া (ইং ১৫৯১), কবি প্রিয়া (১৬০১)। "রীতিকালের" (নামটির প্রবর্তক রামচন্দ্র শুক্ল) কবিরা (১৭শ-১৮শ) মৌলিক ভাবনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দীন, রচনাগুলি তাই অলংকারপ্রিয়তায় ক্লিষ্ট ও পণ্ডিতী কাব্যাদর্শে নিপীড়িত। রস, অলংকার, নায়ক-নায়িকাভেদ, নায়িকার রূপবর্ণনা, ঋতুবর্ণন ইত্যাদি অলংকারশাস্ত্রের ছকবাঁধা প্রথার বাইরে কবিরা পথ খুঁজে পান নি।

রীতিধারার কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন কবি বিহারীলাল (খ্রী. ১৬০৩-৬৩)। তাঁর "সতসঈ" অর্থাৎ সাতশত শ্লোকসংগ্রহ প্রাকৃত ভাষার কবি হাল-এর "সত্তসঈ" এবং গোবর্ধনাচার্যের "আর্যাসপ্তশতীর" অনুগামী। জনপ্রিয় কবি বিহারীলাল ছিলেন অম্বররাজ জয়সিংহের সভাকবি। অপর কবি ভূষণ (খ্রী. ১৬১৩-১৭১২) শিবাজীর আদর্শ ও স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে চমৎকার কল্পনাকুশল ব্রজভাষায় সুমধুর একখানি বীরকাব্য (শিবা-বাবনী) রচনা করেছিলেন—যা বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সত্যই অভিনব।

রোমান্টিক কয়েকজন কবি অবশ্য এই যুগে কিছুটা অভিনবত্ব দাবী করতে পারেন, যেমন—ঘনানন্দ (খ্রী. ১৬৯৯-১৭৪০)। নির্গুণপন্থীরাও সুলভ, যেমন দাদূ-শিষ্য সুন্দরদাস

(খ্রী. ১৫৯৭-১৬৮৯), মলূকদাস (খ্রী. ১৫৭৪-১৬৮২), অক্ষর অনন্য (১৬৫৩) ইত্যাদি। তবে রীতিধারার শেষ শ্রেষ্ঠ কবি বোধ হয় পদ্মাকর (খ্রী. ১৭৫৩-১৮৩৩)।

ব্রজভাষায় গদ্যরচনায় সূত্রপাত হয়েছে ১৬শ শতকেই, বিশেষত চুরাশি বৈষ্ণবের জীবনী রচনায় ('চৌরাশি বৈষ্ণবোঁ কী বার্তা') অথবা বৈষ্ণব ভক্তের কাহিনীতে ('দো সৌ বাওন বৈষ্ণবোঁ কী বার্তা')। তবে উনিশ শতক থেকেই ব্রজভাষার ধারা শীর্ণ হয়ে যায় আর তার স্থান দখল করে খড়ীবোলী হিন্দুস্থানী।

এখন ব্রজভাষার কিছু ভাষিক বৈশিষ্ট্য আলোচিত হবে :

ব্রজভাষার স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হলো হ্রস্ব ও দীর্ঘ এ্যা /æ/ এবং অ' /ɔ/ ধ্বনি, যা আদর্শ হিন্দীতে মেলে না। ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো, ব়>ব, য>জ এবং ষ>হ, শ,ষ>স। নাসিক্যধ্বনির মহাপ্রাণিত উচ্চারণ অর্থাৎ ন্‌হ, ম্‌হ। মহাপ্রাণিত ল, র, ড় অর্থাৎ ল্‌হ, র্‌হ, ঢ়। শব্দের আনুনাসিকতার প্রায়ই লোপ, যা বুন্দেলীর বিপরীতধর্মী।

শব্দমূল (**Stem**) গঠনের ক্ষেত্রে হিন্দীর সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে। হিন্দী ছাড়া সর্বত্রই শব্দমূলের তিনটি বিকল্প ভেদ দেখা যায়, যেমন, হ্রস্ব, দীর্ঘ ও অতিরিক্ত (**Redundant**) যথা,—চমার : চমরা চমরৱা। এছাড়া নাম, সর্বনাম, কৃদন্ত ইত্যাদি পদের অন্তে ব্রজভাষায় সর্বত্র -ঔ (কিন্তু হিন্দীতে -আ, বুন্দেলীতে -ও), যেমন, গরৌ (হি. গলা), মেরৌ (মেরা), কৌ (কা), গয়ৌ (গয়া) ইত্যাদি।

লিঙ্গবিধানের ক্ষেত্রে ব্রজ, বুন্দেলী ও হিন্দী অভিন্ন। উভয় ক্ষেত্রে লিঙ্গ দুটি—পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ। স্ত্রীপ্রত্যয় সাধারণত -নী, -ন, -ইয়া, -ঈ(আ)ঈ।

বচনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, নাম শব্দের তির্যক বহুবচনের অন্তে -(অ) ন এবং মূল বহুবচন স্ত্রীলিঙ্গ রূপের অন্তে -এঁ অথবা আনুনাসিকতা এবং পুংলিঙ্গে অন্তে -এ যুক্ত হয়, যথা—লরিকন, গইয়ন (তির্যক বহুবচন), লট – লটেঁ, ঘুড়িয়া—ঘুড়িয়াঁ, কাণ্টৌ—কাণ্টে (মূল বহুবচন)।

সর্বনাম গঠনে ব্রজভাষা ও বুন্দেলীর মিল যথেষ্ট। হিন্দীর মানদণ্ডে ব্রজভাষার সর্বনামগুলি এই : উত্তম পুরুষ—হৌঁ, মৈঁ, হম, মোঁ, মোয়, হমেঁ, মেরৌ, হমারৌ। মধ্যম পুরুষ—তূঁ, তৈঁ, তুম, তো, তোয়, তুম্‌হেঁ, তেরৌ, তুম্‌হারৌ।

দূর ও নিকট নির্দেশক সর্বনামে বুন্দেলী ভাষাসুলভ লিঙ্গভেদ (পুং/স্ত্রী) আছে, যথা—বৌ (হিন্দী বহ্‌) রাজা, বা (বহ্‌) রাণী, জৌ (য়হ্‌) রাজা, জা (য়হ্‌) রাণী।

কারকবাচক অনুসর্গের ক্ষেত্রে আদর্শ হিন্দীর সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে, যেমন—কর্তৃকারকে করণবাচক -নৈ (হিন্দী -নে), মুখ্য ও গৌণ কর্মে -কৌঁ (হিন্দী কো), করণ-অপাদানে -সৈঁ (হিন্দী -সে) ইত্যাদি।

ক্রিয়াগঠনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো, বর্তমান কাল ব্রজভাষায় মৌলিক বা প্রাত্যয়িক (Flectional) নয়, তা কৃদন্ত (Participial)। স্মরণীয়, বাঙলা ইত্যাদি অন্যান্য আধুনিক পূর্বী আর্য ভাষায় এই বর্তমান কাল প্রাত্যয়িক। ফলে ব্রজভাষার বর্তমান কালে লিঙ্গ ও বচনভেদ থাকলেও পুরুষ ভেদ নেই, যথা—খেলত শ্যাম অপনে রঙ্গ, হৌঁ খেলত ইত্যাদি। হিন্দীর মতো এখানে অবশ্য অস্ত্যর্থক ক্রিয়া অনিবার্য নয় (তু. হিন্দী খেলতা হৈ)।

অতীতকাল অবশ্য কৃদন্ত অর্থাৎ ক্রিয়ার লিঙ্গ ও বচনভেদ আছে, কিন্তু পুরুষভেদ নেই, যথা—পুংলিঙ্গ একবচন গয়ৌ (হি. গয়া), বহুবচন গয়ে (=গএ)। স্ত্রীলিঙ্গ একবচন গঈ (গঈ), বহুবচন গঈঁ (গঈঁ)। অনুরূপ ক্রমে ভয়ো, ভয়ে, ভঈ, ভঈঁ (=হিন্দী হুআ, হুএ, হুঈ, হুঈঁ)।

ভবিষ্যৎ কাল দু'ভাবে গঠিত হয়। প্রথম প্রকার যৌগিক পদগঠনে হিন্দীসুলভ -গো -গী, -গে (=হিন্দী -গা, -গী, -গে) যুক্ত হয়। যথা—হৌঁ জাউ গো (=হি. মৈঁ জাউঁঙ্গা)। দ্বিতীয় প্রকার ভবিষ্যৎ হলো প্রাত্যয়িক। এইজাতীয় ভবিষ্যৎ পদের প্রত্যয় হচ্ছে -হ- (<সং -স্য-), কাজেই তা তিঙন্তমূলক। প্রথম পদ্ধতিতে লিঙ্গ ও বচন ভেদ আছে কিন্তু পুরুষ ভেদ নেই, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বচনভেদ আছে কিন্তু লিঙ্গভেদ নেই, যথা—হৌঁ জৈহোঁ, খৈহোঁ ইত্যাদি (=হিন্দী মৈঁ জাউঙ্গা, খাউঙ্গা), জৈহৈ, খৈহৈ (=হিন্দী বহ্ জাএগা, খাএগা) ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, প্রথম প্রকার পদগঠন অর্বাচীন এবং হিন্দী প্রভাবজাত।

অস্ত্যর্থক (Substantive) ক্রিয়ার প্রয়োগ এইরূপঃ বর্তমান কাল—একবচনঃ বহুবচন হৈঁ / হৌঁ। অতীতকাল—হো, হী, হে (=হিন্দী থা, থী, থে)। হুতৌ, হুতী, হুতে (=থা, থী, থে)। পরের রূপটি প্রাচীন সাহিত্যে অধিক প্রযুক্ত।

ক্রিয়াবাচক নাম (Verbal Noun) গঠিত হয় -ন অথবা -ব যুক্ত ক'রে, যেমন— "চলিনৌঁ" কেতিক দূর পর্ণকুটী করিহো কিত হৈব। "অংখমূদনৌঁ" সঙ্গ তুম্হারে ন খেলিহৌঁ। "হঁসিবৌ" "রমিবৌ" "বলিবৌ" গয়ৌ বীরবল সাথ। "খেলিবৌ" অচ্ছো হৈ (তু, হিন্দী খেল্না অচ্ছা)। -ব যুক্ত ভাববাচক নামপদ হিন্দীতে মেলে না, যদিও ব্রজভাষাঞ্চলের পূর্বে অবস্থিত সমস্ত ভাষাতেই এই প্রত্যয় মেলে।

ল্যবর্থক অসমাপিকা (**Conjunctive**) গঠনে হিন্দীর সঙ্গে পার্থক্য আছে, যথা—খা কৈঁ, খায় কৈঁ, সুনিকৈঁ (= হিন্দী খা কর্, সুন্ কর্) ইত্যাদি।

[৩] বুন্দেলী / বুন্দেলখণ্ডী

বুন্দেলী বা বুন্দেলখণ্ডী নামকরণ বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কিত। মধ্যপ্রদেশের এই ভূখণ্ড যমুনা নদীর দক্ষিণে বিস্তৃত, যা ছিল একদা রাজপুতগোষ্ঠীভুক্ত বুন্দেলা কৌমদের (**Clans**) নিবাসস্থল। অবশ্য বুন্দেলাদের আগমনের পূর্বেও (১৪শ শতক) এখানে অন্যান্য রাজপুত উপজাতির বসবাস ছিল, যেমন, গহরওয়ার, পরিহার এবং চন্দেলা।

বুন্দেলী ভাষাঞ্চল সমগ্র পশ্চিমা হিন্দী ভাষাঞ্চলের প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে আছে। বর্তমানে বুন্দেলী ভাষার প্রচলন মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের অংশবিশেষে, যেমন, জলাউন, হমীরপুর, ঝাঁসী, বান্দা, গোয়ালিয়র, ওরছা, সাগর, দমোহ, নরসিংহপুর, সিওনী, জব্বলপুর, হুশংগাবাদ ইত্যাদি। মোট কথা, বুন্দেলী ভাষাঞ্চল প্রধানত তিনটি নদী—যমুনা, চম্বল ও নর্মদা দ্বারা পরিবেষ্টিত অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ—যার বিস্তার প্রায় ৪০ হাজার বর্গমাইল। যাতায়াতের অসুবিধা ও দুরধিগম্যতার জন্য বিচ্ছিন্ন উপভাষাও সৃষ্ট হয়েছে তুলনামূলকভাবে বেশি।

১৯৫১ সালের জনসমীক্ষায় বুন্দেলী ভাষীর সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ। কিন্তু ১৯৬১-র সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ১২টি মাতৃভাষাসমেত বুন্দেলখণ্ডীর জনসংখ্যা ৫৪ হাজার ১৪৭ (বুন্দেলখণ্ডী ২২,০৬৫, লোধী ২৭,৩৯৩, রঘোবংশী ২,৪৮৪)। ১৯৭১ সমীক্ষায় আবার দেখা যাচ্ছে, বুন্দেলী ভাষীর সর্বভারতীয় সংখ্যা ৩,৭৬,০৩৬। গ্রীয়ার্সন কিন্তু প্রায় কুড়িটি বুন্দেলী বিভাষার উল্লেখ করেছেন (পঁওয়ারী, খটোলা, রাঠৌরী, লুঘাঁতী ইত্যাদি)। বুন্দেলী ভাষাবিশেষজ্ঞ **M.P. Jaiswal**-এর মতে[১] এই বিভাষার সংখ্যা ১৩টির বেশি নয়। আদর্শ বুন্দেলী মধ্য বুন্দেলখণ্ডের উপভাষা, প্রচলিত প্রধানত টিকমগড়, সাগর (মধ্যপ্রদেশ), ঝাঁসী, জলাউন, হমীরপুর (উত্তরপ্রদেশ) জেলাগুলিতে অথবা তৎসন্নিহিত অঞ্চলে। অন্যান্য উপভাষাগুলির মধ্যে লোধী লোধীসম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকদের ভাষা। নাগপুরী হিন্দী (নাগপুর, মহারাষ্ট্র) প্রকৃতপক্ষে হিন্দী নয়। তা বুন্দেলী ও মারাঠীর সংমিশ্রণজাত উপজাতিক (**Tribal**) বিভাষা। গাওলী, রঘোবংশী এবং কিরারী আনুক্রমিক বর্ণবিভাগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তিনটি বর্ণবিভাষা (**Caste Dialect**)। রেশম ও বয়নশিল্পে পারদর্শী কোষ্টী উপজাতিদের বিভাষা কোষ্টী। এছাড়া অপর বিভাষা হলো কুম্ভারী—যা কুমোর গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত।

---

১. M. P. Jaiswal : A Linguistic Study of Bundeli, Leiden, 1962.

ভাষাতত্ত্ব বিচারে বুন্দেলীর স্থান অনন্য। এই ভাষাঞ্চলের সীমানা হলো—পূর্বে অবধী / বৈসওয়াড়ী এবং বঘেলী (পূর্বী হিন্দী), পশ্চিমে মালবী এবং জয়পুরী (রাজস্থানী), উত্তরে ব্রজভাষা ও কনৌজী (পশ্চিমা হিন্দী) এবং দক্ষিণে মারাঠী। কাজেই বুন্দেলীতে ভাষা সংমিশ্রণ ঘটেছে সর্বাধিক—যদিও বুন্দেলীর সঙ্গে ব্রজভাষার সাদৃশ্যই অধিক। সীমান্তবর্তী ভাষাগুলি স্বাভাবিকভাবেই ব্রজ, অবধী এবং রাজস্থানী ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বান্দা জেলার ভাষায় আবার বুন্দেলীর সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে বঘেলী ও অবধীর।

পশ্চিমা হিন্দী সাহিত্যের প্রখ্যাত কবিবৃন্দ, যেমন, কেশবদাস (খ্রী.১৫৬৫-১৬১৭), 'লালকবি' নামে পরিচিত গোরেলাল পুরোহিত (খ্রী. ১৬৫৭-১৭০৭, ছত্রপ্রকাশ), বিহারী (খ্রী. ১৬০৩-৬৩), ভূষণ (খ্রী. ১৬১৩-১৭১২), পদ্মাকর (খ্রী. ১৭৫৩-১৮৩৩) প্রমুখ কবিরা বুন্দেলখণ্ডে জন্মগ্রহণ করলেও সাহিত্য রচনা করেছেন ব্রজভাষায়। কিন্তু এঁদের রচনায় বুন্দেলী প্রভাব স্পষ্ট। জগনিক-এর রচনা আল্হাখণ্ড (পূর্বে দ্র, পৃ. ১৪৬) খড়ীবোলীতে পাওয়া গেলেও তা ছিল মূলে বুন্দেলী। তবে তা "বনাফরী" উপভাষায় লিখিত, যা মহোয়া অঞ্চলের আশেপাশে কথিত।

যাই হোক, এই শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বুন্দেলীর চর্চা বেড়ে চলেছে ; এই রচনাগুলির অধিকাংশ হয় লোকগীতি, না হয় লোককাহিনী—মোটকথা 'লোকযান' আশ্রিত। এছাড়া বনারসীদাস চতুর্বেদী সম্পাদিত 'মধুকর' নামে একটি সাময়িক পত্রিকাও প্রকাশিত হচ্ছে (লোকবার্তা পরিষদ আনুকূল্যে)। বুন্দেলী শব্দকোষ প্রণয়নের চেষ্টাও চলছে (মধুকর, ১৯৪০-৪২ খ্রী.)।

লিপি প্রধানত হিন্দী অঞ্চলসুলভ নাগরী, কইথী, মুড়িয়া, মৈথিলী, মহাজনী, আরবী ব্যবহৃত হলেও মুড়িআ ও মহাজনী ব্যবহৃত হয় বুন্দেলী ভাষী ব্যবসায়ীদের হিসাব-নিকাশের খাতায়।

বুন্দেলীর কিছু ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচিত হলো—

বুন্দেলীর স্বরবর্ণ—অ, অ', ই,উ / ʌ, ɔ, i, u / , হ্রস্ব ও দীর্ঘ এ, ও / e, eː, o, oː / এবং এ্যা /æ, æː/। লক্ষণীয়, এ্যা /æ/ ধ্বনি ব্রজ, বুন্দেলী ও কনৌজীতে থাকলেও আদর্শ হিন্দীতে নেই ; অ /ɔ/ ধ্বনিও হিন্দীতে নেই। আনুনাসিকতা সর্বত্রই লভ্য (তু. বুন্দেলী কা "কী" ঃ কাঁ 'কোথায়)।

ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে বাঙলার মতো সব ধ্বনিগুলিই সুলভ, তবে মহাপ্রাণিত ল, র, ড় অর্থাৎ lh, rh, ṛh, এবং ম্‌হ, ন্‌হ হিন্দী ভাষাগুলির মতো সর্বত্র সুলভ। শিশ্‌ধ্বনি কেবল একটি স/s /। সাধু হিন্দী এবং বুন্দেলীর অপর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো—

হিন্দী ঙ, ণ>বুন্দেলী ন ; য়, র>জ, ব ; সং.শ, ষ, স>স। হিন্দীর তুলনায় বুন্দেলীতে আনুনাসিকতার প্রয়োগ অধিক [হাঁত, পাঁর, কাঁন ইত্যাদি]।

শব্দমূল (Stem) গঠনের ক্ষেত্রে হিন্দীর সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে। হিন্দী ছাড়া সর্বত্র শব্দমূলের তিনটি ভেদ দেখা যায়—হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং অতিরিক্ত (Redundant), যথা—চমার ঃ চমরা ঃ চমরবা, কহার "জলবাহক" ঃ কহরা ঃ কহরবা। এছাড়া নাম, সর্বনাম, কৃদন্ত ইত্যাদি পদমূল বুন্দেলীতে সর্বত্র -ও অন্তক [কিন্তু হিন্দীতে -আ, ব্রজে -ঔ], যেমন—হিন্দী/ব্রজ/বুন্দেলী গলা/গরৌ/গরো ; বুরা/বুরৌ/বুরও ; মেরা/মেরৌ/মোও ; গয়া/ গয়ৌ/গও ইত্যাদি।

লিঙ্গবিধানের ক্ষেত্রে বুন্দেলী ও আদর্শ হিন্দী অভিন্ন, উভয়ক্ষেত্রে লিঙ্গ দুটি—পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ। স্ত্রীপ্রত্যয় সাধারণত এইগুলি— -(আ) নী, -ন, -ইয়া, -ঈ(আ)ঈ ; উদাহরণস্বরূপ, মোর খেত (পুং) ঃ বড়ী বখরী (স্ত্রী) ; সূঁগর ঃ সুঁগরিয়া (শূকর ঃ শূকরী), লোগ ঃ লুগাঈ (=স্ত্রীলোক), দেবরানী (শ্যালিকা), মাষ্টারনী ইত্যাদি।

বচনের ক্ষেত্রে বুন্দেলীর বৈশিষ্ট্য ব্রজসুলভ। শব্দমূলের অন্তে -ন্, -অন্ অথবা আনুনাসিকতার সহায়তায় বহুবচন গঠিত হয়, যথা—গইয়া, গইয়ন (হি. গায়) ; মোঁড়া, মোঁড়ন (=লড়কা) ; গোড়ো, গোড়ন (=পৈর) ; মোঁড়ী, মোঁড়ীঁ (লড়কী), বিন্নূ, বিন্নূঁ (বহিন্) ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য বচনের পার্থক্য দেখা যায় না, যেমন, পেড় "গাছ" (একবচন ও বহুবচন)।

সর্বনাম গঠনে ব্রজভাষা ও বুন্দেলীর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সর্বনাম-মূলের যথারীতি চারটি রূপ—মুখ্য (Direct), করণবাচক (Agentative), তির্যক্ (Oblique) এবং সম্বন্ধমূল।

মুখ্য কারকে একবচন ঃ বহুবচন ক্রমে সর্বনামগুলির রূপ ঃ উত্তম পুরুষ—মৈঁ ঃ হম; মধ্যম পুরুষ—তৈঁ ঃ তুম ; প্রথম পুরুষ তথা নির্দেশক সর্বনাম—বৌ (পুং), বা (স্ত্রী) ঃ বৈঁ। তির্যক কারকে মো-, মোয়- ঃ হম ; তুম- ঃ তো- ; উ, উঁ-, ও- ঃ উন-। করণবাচক মূলে -নৈঁ যুক্ত হয় (মৈনৈঁ ঃ হমনৈঁ ; তুমনৈঁ ঃ তৈনৈ; উননৈঁ ইত্যাদি)। সম্বন্ধমূলক পদে হিন্দীসুলভ -র যুক্ত পদের পাশাপাশি -র হীন পদ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে, যথা—মুখ্য, তির্যক ও স্ত্রীবাচক মূল অনুক্রমে একবচনে মোরৌ/মোও ঃ মৌরৈ-/মোএ- ঃ মোরী/মোঈ ; বহুবচনে হমারৌ/হমাও (=হিন্দী হমারা) ঃ হমারৈ-/হমাএ ঃ হমারী/হমাঈ ; অনুরূপভাবে তুমারৌ/তুমাও (=হিন্দী মৃতুহারা) ইত্যাদি।

কারকের অর্থ স্পষ্ট ক'রে তুলতে নিম্নলিখিত অনুসর্গের প্রয়োগ বুন্দেলীতে দেখা যায়, যথা—করণবাচক -নৈঁ (হি. নে) [রামনৈঁ রাবণখোঁ মারা], কর্মকারক -খোঁ,

-খঁা (=হি. কো) [রাবণখেঁা], করণ-অপাদানে -সৈঁ,-সৌঁ (=হি. সেঁ) [দূরসৈঁ]; গৌণ কর্মে -কে লানৈঁ, -কে নানৈঁ (হি. -কে লিএ), সম্বন্ধপদে -কৌ, -কে (বহুব), কী (স্ত্রী)/খৌ, -খে, -খী (=হি. কা, কে, -কী), অধিকরণে -মৈঁ, পৈ (হি. মে, পর)।

উৎপত্তিবিচারে অন্যান্য আধুনিক ভাষার মতই বুন্দেলীতে দুটি কাল—(১) মৌলিক বা প্রাত্যয়িক কাল (Radical Tense) এবং (২) কৃদন্ত কাল (Participial Tense)। মৌলিক কালের 'ভাব' (Mood) দুইটি—নির্দেশক (Indicative) এবং অনুজ্ঞা (Imperative)। মৌলিক বর্তমানে দুইটি 'ভাব' ই মেলে কিন্তু মৌলিক ভবিষ্যৎ কালে মেলে কেবল অনুজ্ঞা। উদাহরণস্বরূপ—বর্তমান নির্দেশক (Present Indicative): চলত (<চলন্ত্, হিন্দী চলতা) কিন্তু চলউঁ (<চলামি, হিন্দী চলূঁ)। বর্তমান অনুজ্ঞা (Present Imperative): চলৈ (<চলতু), চল (<চল)। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা (Future Imperative): চলহই, চল্হই (<চলিষ্যতি), চলিহউঁ, চলহউঁ (<চলিষ্যামি)।

কৃদন্ত কালের ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের সকর্মক এবং অকর্মক ভেদ আছে এবং তা হিন্দীর মতই কর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে, যেমন—মৈঁ গও, বৈ আএ "তারা এসেছিল" কিন্তু 'তুমনৈঁ এক আম খাও'; 'বা আঈ' কিন্তু 'মৈনৈঁ এক রোটী খাঈ' ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ কালের ক্ষেত্রে ব্রজভাষার মতো প্রাত্যয়িক বিভক্তি রক্ষিত হয়েছে। এই ভবিষ্যৎ প্রত্যয় হলো -হ- (<সং -স্য-), উদাহরণস্বরূপ, মৈঁ জৈহৌঁ (=মৈঁ জাউঙ্গা), হম জৈহন (=হম জায়েঙ্গে), তৈঁ জৈহত (=তূ জায়েগা), তুম জৈহো (=তুম জাওগে), বো জৈহৈ (=বহ্ জায়গা), বৈঁ জৈহৈঁ (= বে জায়েঙ্গে)।

শত্রর্থ (Participial) পদগঠনের ক্ষেত্রে হিন্দীর মতো -ত প্রত্যয় (<সং অন্ত্) যুক্ত হয়, যেমন—বৈ লিখত হৈঁ (=হি. বে লিখ্তা হৈঁ) ইত্যাদি।

অস্ত্যর্থক (Substantive) ক্রিয়া হিসেবে নিম্নলিখিত প্রয়োগ লক্ষণীয়—বর্তমান কাল—আয় (হিন্দী হৈ, অবধী আহি, আয়), আঁয় (হিন্দী হৈঁ), আঁব (হি. -হেঁী), আত (হিন্দী তু হৈ), আব (হি, হেঁী)। অতীত কাল—তো (হিন্দী থা, ব্রজভাষা -থো), -তী (হি. থী), তে (হিন্দী থে) ইত্যাদি।

[৪] কনৌজী

ড. গ্রীয়ার্সন কনৌজীর অঞ্চলভিত্তিক বিস্তার এই এই জেলাগুলিতে লক্ষ্য করেছেন: এটোয়া, ফরাক্কাবাদ, ফতেপুর, শাহজাহানপুর, কানপুর, হরদোই,

পীলীভীত ইত্যাদি। ফরাক্কাবাদ এই ভাষাঞ্চলের কেন্দ্র—যা প্রাচীনকালে পাঞ্চাল ও কনৌজের অন্তর্গত ছিল। পীলীভীত এবং এটোয়া ভাষাঞ্চলে ব্রজ এবং হরদোই ও কানপুরের কনৌজীর ওপর অবধীর প্রভাব দেখা যায়। কনৌজী ভাষাঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমে ব্রজ, দক্ষিণে বুন্দেলী, পূর্বে এবং উত্তর-পূর্বে অবধীর ভাষাক্ষেত্র। কনৌজী ভাষাভাষীর সংখ্যা ১৯৬১-র জনগণনায় মাত্র ১১জন।

কনৌজী কখনই সাহিত্যিক ভাষার মর্যাদা অর্জন করেনি। এখানকার প্রাচীন কবিরা সাধারণত ব্রজভাষাতেই কবিতা রচনা করতেন। আধুনিক কনৌজী ভাষীরা প্রধানত হিন্দীতেই সাহিত্যরচনা করে থাকেন। চিন্তামণি, মতিরাম, ভূষণ এবং আকবরের 'নবরত্ন' সভার প্রখ্যাত বীরবল (যিনি 'ব্রহ্ম' ছদ্মনামে লিখতেন) প্রমুখ প্রাচীন কবিরা কানপুরের অধিবাসী ছিলেন।

ব্যাকরণগত বিচারে ব্রজভাষার সঙ্গে কনৌজীর পার্থক্য খুব স্পষ্ট নয়। ড. ধীরেন্দ্র বর্মার মতে, কনৌজী প্রকৃতপক্ষে ব্রজভাষার পূর্বী উপভাষা।

কনৌজীর ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচিত হলো :

হিন্দীর র/ল্ যুক্ত স্পর্শবর্ণের উচ্চারণ বুন্দেলীতে প্রাকৃতের মতো সমীকৃত হয়, যেমন—মির্চ>মিচ্চ, উর্দ>উদ্দ, হল্দী>হদ্দী।

নাম, সর্বনাম, অনুসর্গ কৃদন্ত ইত্যাদি পদমূলের শেষে সাধারণত -ও যুক্ত হয়, কিন্তু তৎস্থলে ব্রজভাষায় -ঔ এবং হিন্দীতে -আ দেখা যায়, যেমন—হিন্দী/ব্রজ/কনৌজী ক্রম অনুসারে ছোটা/ছোটৌ/ছোটো, বড়া/বড়ৌ/বড়ো, দিয়া/দিয়ৌ/দও, লিয়া/লিয়ৌ/লও ইত্যাদি।

হিন্দী, ভোজপুরী প্রভৃতি ভাষার ক্ষেত্রে সাকল্যবাচক সভ, লোগ প্রভৃতি শব্দযোগে বহুবচন গঠিত হয়, কিন্তু কনৌজীতে যুক্ত হয় -হর,-হ্বার, যথা—হম হর, হম হ্বার (=হিন্দী হমলোগ)।

অস্ত্যর্থক সহায়ক ক্রিয়ারূপে হ-ধাতুর সঙ্গে -গ ধ্বনি (<গম্ ?) যুক্ত হয়, যথা—হৈ গো (=হিন্দী হৈ)। অন্যান্য তিঙন্ত ও কৃদন্ত ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

অতীতকালের রূপ হিন্দীর মতই কৃদন্ত, তবে এই রূপের আঞ্চলিক ভেদ আছে, যেমন পশ্চিম, মধ্য এবং পূর্ব আঞ্চলিক ভেদে থোঁ, থে, থী (=হিন্দী থা, থে, থী) [পশ্চিমা]; হতো, হতে, হতী [মধ্যদেশীয়]; রহোঁ, রহে, রহী [পূর্বী]।

ভবিষ্যৎ কালের রূপ হিন্দীর মতোই যৌগিক, তাই ক্রিয়াপদের পরে -গো, গী,-গে

যুক্ত হয় (তু. হিন্দী জাউঙ্গা)। কিন্তু ব্রজভাষার মতো প্রাত্যয়িক রূপও দেখা যায়। এরূপক্ষেত্রে ভবিষ্যতের প্রত্যয় হলো -হ- (<সং স্য)।

কৃদন্ত অতীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে হিন্দীর সঙ্গে কনৌজীর একটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষণীয়। অকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও কর্মবাচ্যক প্রয়োগ (অর্থাৎ -নে যোগে কর্মবাচ্যের কর্তা) কনৌজীতে দেখা যায়, যেমন, লরিকা নে চলো গও (=হিন্দী : লড়কা গয়া)। সকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য ক্রিয়া কর্মের অনুগামী, কিন্তু "কহ্না" ও পুছ্না ধাতুর ক্ষেত্রে ক্রিয়া সর্বদাই স্ত্রীলিঙ্গবাচক (সম্ভবত কর্ম "বাত্" উহ্য থাকে বলে), যথা— উস্নে কহী (=উসনে বাত্ কহী), উসনে পুছী ইত্যাদি।

[৫] বাঙ্গরূ / হরিয়ানী

পাঞ্জাবের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত হরিয়ানা রাজ্যের ভাষা বাঙ্গরূ। ১৯৬১ সনের জনগণনায় একে হিন্দীর অন্তর্ভুক্ত উপভাষারূপে দেখানো হয়েছে—যার লোকসংখ্যা মাত্র ১১৫। স্থান ও জাতিভেদে বাঙ্গরূ উপভাষা বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। হরিয়ানা রাজ্যে এর নাম হরিয়ানী বা দেশাড়ী। হরিয়ানা রাজ্যভুক্ত রোটক ও দিল্লীর জাটদের নাম অনুযায়ী এর অপর নাম জাটূ। অন্যত্র এইভাষা বাঙ্গর প্রদেশ সম্পর্কিত বাঙ্গরূ নামে প্রচলিত। এর ভাষাঞ্চল দিল্লী, কর্ণাল, রোটক, হিসার, পাতিয়ালা এবং ঝিন্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। ভাষাঞ্চলের সীমানা হলো এই—পশ্চিমে পাঞ্জাবী, দক্ষিণে মারোয়াড়ী, দক্ষিন-পূর্বে ব্রজভাষা এবং উত্তর-পূর্বে খড়ীবোলী।

বাঙ্গরূ ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি নিচে আলোচিত হলো :

মূর্ধন্য-ণ ধ্বনির ব্যাপক ব্যবহার, যেমন, অপণা (হিন্দী অপনা), হোণা (=হোনা)। এইরূপ ল. /ḷ/ ধ্বনি রাজস্থানীর মতই সুলভ, যথা—কাল. (=কাল)। এইরূপ ধ্বনির সংরক্ষণশীলতা ড, ঢ ধ্বনির ক্ষেত্রেও দেখা যায়। স্বরমধ্যগত ড, ঢ হিন্দী প্রভৃতি ভাষার মতো কখনোই ড়, ঢ় ধ্বনিতে পরিণত হয় না, যথা—বডা (=বড়া)।

খড়ীবোলীর মতো সমীকৃত একক ব্যঞ্জনের স্থলে যুগ্ম ব্যঞ্জন দেখা যায় ; আ-ভিন্ন সর্বত্রই এই যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বস্থিত দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব স্বরে পরিণত হয়, যথা—মুক্কা (মূকা), ভিত্তর (ভীতর), কিন্তু চালনণা, চাল্যা, ঘাল্লণা, ঘাল্যা।

শব্দরূপের ক্ষেত্রে তির্যক মূলের অন্তে -আঁ কিন্তু হিন্দীতে -ওঁ, যথা, ঘোড়াঁ- (=ঘোড়োঁ-), দিনাঁ- (=দিনোঁ-), ছোরয়াঁ- (=ছোরিয়োঁ-) ইত্যাদি।

অনুসর্গ-প্রয়োগের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো—হিন্দীর করণবাচক কর্তার -নে পাঞ্জাবীর

মতো মুখ্য ও গৌণকর্মে প্রযুক্ত, যথা, পরদেস নৈ (=পরদেস কো)। অপাদানের অনুসর্গ -তী, তৈ এবং সম্বন্ধপদের অনুসর্গ কা, কৈ অধিক প্রযুক্ত হয়।

সর্বনামমূলের ক্ষেত্রে কনৌজীর সঙ্গে রাজস্থানীর মিল যথেষ্ট, যেমন—মন্নৈ (=হিন্দী মুঝকো), তন্নৈ (=তুঝকো), তূঁ/থূঁ, ত্হারো/থারো ইত্যাদি।

অস্ত্যর্থক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কনৌজীর মিল পাঞ্জাবীর সঙ্গে বেশী, যেমন—সৈঁ, স্যূঁ (হিন্দী হৈ, হূঁ) ইত্যাদি।

ক্রিয়ার বর্তমানকালিক কৃদন্ত রূপও পাঞ্জাবীসুলভ, যেমন—জান্দা (=হিন্দী জাতা) ইত্যাদি।

অতীতকালিক কৃদন্ত পদের অন্তে -য়া প্রত্যয়ের প্রয়োগও লক্ষণীয়, যেমন চাল্যা (=হিন্দী চলা, খড়ীবোলী চাল্লা) ইত্যাদি।

লক্ষণীয়, দখনী উর্দু ভাষার সঙ্গে বিচার করলে দেখা যাবে, নামশব্দের তির্যক রূপ, মন্নৈ, তন্নৈ জাতীয় সর্বনাম এবং -য়া যোগে কৃদন্ত অতীতপদ গঠন ইত্যাদি দখ্নী উর্দুরও বৈশিষ্ট্য। তাই মনে হয়, দক্ষিণ ভারতে যে উত্তরদেশীয় মুসলমান ও পাঞ্জাবীরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তারা ছিল বাঙ্গরূ ও খড়ীবোলী ভাষাঞ্চলের মধ্যস্থলের অধিবাসী।[১]

[৩] আদর্শ (সাধু) হিন্দী

রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত আধুনিক হিন্দীভাষাকে একটি স্বতন্ত্র ভাষারূপে চিহ্নিত করাই উচিত। কেবল প্রাচীন হিন্দী/হিন্দবী নামকরণের সাদৃশ্যে এই ভাষার ইতিহাস প্রাচীন হয়ে যেতে পারে না। কারণ পূর্বেই বলেছি, হিন্দবী অভিধা উত্তর ভারতের যে-কোনো অথবা সমগ্র আর্যভাষাগুলি সম্পর্কে প্রযুক্ত হতো। আর দ্বিতীয়ত, খড়ীবোলী হিন্দুস্তানী যদি আধুনিক হিন্দীর পূর্বপুরুষ বলে স্বীকৃত হয়, তবে উর্দুরও পূর্বপুরুষ এই হিন্দুস্তানী—বরং উর্দুর সঙ্গে এই হিন্দুস্তানীর সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ। এমনকি স্বাধীনতা লাভের (ইং ১৯৪৭) আগে পর্যন্ত এই হিন্দুস্তানী, উর্দু নামেই অধিক পরিচিত ছিল, তা লেখাও হতো ফারসী হরফে। তা ছিল শিক্ষিত ও অভিজাত জনগণের সর্বমান্য ভাষা এবং উত্তর ভারতের যথার্থ **Lingua Franca**। আগেই বলেছি, সম্প্রতি-সৃষ্ট আদর্শায়িত (**Idealised**) হিন্দী ও উর্দুর মূল আশ্রয়ভূমি ছিল এই হিন্দুস্তানী।

---

১ S. Agrawal : Bhāṣā Vijñān aur Hindi, p. 197

আধুনিক হিন্দীতে খড়ীবোলী হিন্দুস্তানীর কাঠামো মোটামুটি রক্ষিত হয়েছে—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ; কিন্তু তা ব'লে এই আদর্শ হিন্দী যে মৌখিক খড়ীবোলীর সাধু ও সাহিত্যিক উত্তরণ তা-ও নয় (উর্দু রও এই একই অবস্থা)। প্রকৃতপক্ষে এই হিন্দী কারুর কথ্যভাষা নয়। অপরপক্ষে খড়ীবোলী (হিন্দুস্তানী)-ভাষী সাধারণ মানুষ নাগরী অথবা ফারসী যে-কোনো হরফই যথেচ্ছ ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু গোঁড়া হিন্দীপ্রেমিক কখনই ফারসী হরফ অথবা গোঁড়া উর্দু প্রেমিক কখনই নাগরী হরফ ব্যবহার করবেন না।

আসলে আধুনিক হিন্দী একটি কৃত্রিম ভাষা। উর্দু ভাষীরা যখন হিন্দুস্থানীকে ফারসী প্রভাবের মোড়কে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হলেন, তখনই বিপরীত প্রতিক্রিয়া হিসেবে আধুনিক সাধু হিন্দীর জন্মলগ্ন সূচিত হলো, আবির্ভূত হলো সংস্কৃতায়িত হিন্দী। বলা বাহুল্য, এই হিসেবে এই ভাষার বয়স দেড় শো বছরের কিছু বেশি।

এই ভাষা প্রতিষ্ঠার পিছনে আছে প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয়দের বিভেদাত্মক নীতি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার (ইং ১৮০০) সঙ্গে সঙ্গে উর্দু কে তারা মুসলিম সংস্কৃতির প্রতিনিধিস্থানীয় ব'লে চিহ্নিত করলেন। সেই সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাবজগতের বাহন হিসেবে হিন্দুস্থানীকে সংস্কৃতায়িত করার প্রবণতা দেখা গেল—যেমন দেখা গিয়েছিল ১৮শ-১৯শ শতকের পণ্ডিতী বাঙলায়। এই বিষয়ে হিন্দী প্রেমিকরা বাঙলাভাষার অভ্যুদয়ে উৎসাহ বোধ করেছিলেন। বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের অবদানও এই ব্যাপারে যথেষ্ট।

ইং ১৮০০ সাল থেকে ব্রজভাষার পাশাপাশি খড়ীবোলীও মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তা পেয়েছে। উইলিয়ম কেরীর প্রযত্নে খড়ীবোলীতে বাইবেল অনূদিত হলো। সেই সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রবর্তনায় পাঠ্যপুস্তক রচনারও তাগিদ দেখা গেল। আগ্রার পণ্ডিত লল্লূজী-লাল (খ্রী. ১৭৬৩-১৮৩৫) রচিত "প্রেমসাগর" (ভাগবতপুরাণের ১০ম স্কন্ধ অবলম্বনে রচিত, ইং ১৮০৩) খড়ীবোলীর প্রথম সার্থক গদ্য রচনা। এই গ্রন্থের উপজীব্য শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা কাহিনী। এ-গ্রন্থ ব্রজভাষার প্রভাব-নির্মুক্ত নয়। লেখক নিজে ব্রজভাষাতেও রচনা করেছিলেন তাঁর "হিতোপদেশ"। মুন্শী তারিণীচরণ মিত্রও সংস্কৃতায়িত হিন্দীতে "বৈতাল পচীশী" (খ্রী. ১৮০৫) প্রণয়ন করেন। আরা জেলার (বিহার) ভোজপুরীভাষী পণ্ডিত সদলমিশ্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইংরেজ ছাত্রদের জন্য খড়ীবোলীতে লেখেন কঠোপনিষদ থেকে আহৃত নচিকেতা উপাখ্যান ("নাসিকেতোপাখ্যান")। এতে অবশ্য ব্রজভাষার প্রভাব ততটা নজরে পড়ে না। এই প্রসঙ্গে আরও দুইজন উল্লেখযোগ্য সমসাময়িক লেখক হলেন সদাসুখলাল এবং ইন্‌শা অল্লা।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে সাময়িক পত্রিকার আবির্ভাব ঘটলো। কানপুরের অধিবাসী পণ্ডিত যুগলকিশোর মিশ্র কলকাতা থেকে "উদণ্ড্ মার্তণ্ড" (ইং ১৮২৬) সাপ্তাহিক প্রকাশ করলেন (এর আয়ুষ্কাল অবশ্য মাত্র নয় মাস)। বারাণসী থেকে এক বাঙালীর উদ্যোগে প্রকাশিত হলো "সুধাকর" (ইং ১৮৫০)। অপর উল্লেখযোগ্য মুন্সী সদাসুখলালের সাময়িক পত্র "বুদ্ধি প্রকাশ" (ইং ১৮৫৬) আগ্রা থেকে প্রকাশিত হলো; এছাড়া ১৮৩৩ সালে আগ্রায় প্রতিষ্ঠিত "স্কুল বুক সোসাইটি" হিন্দী পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। মোট কথা, উনিশ শতকের প্রথমার্ধের রচনাগুলি মূলত অনুবাদমূলক নতুবা পাঠ্যপুস্তক। ইং ১৮৫৭-র পর থেকে খড়ীবোলী আদর্শ হিন্দীরূপে দাঁড়িয়ে যায়। তবে এই ভাষা প্রধানত ছিল গদ্যের ভাষা। পদ্যের মাধ্যম হিসেবে তখনও কিন্তু ব্রজভাষার দাপট ছিল বেশি, তখনও তা সর্বজনমান্য ভাষা। উর্দু ভাষার তুলনায় সমসাময়িক হিন্দী হয়তো ততটা সুসংস্কৃত (Polished) ছিল না, কিন্তু নবীন প্রাণধর্মে এবং নমনীয় গ্রহণযোগ্য ক্ষমতায় তা অবিলম্বে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করলো।

'ভারতেন্দু' হরিশ্চন্দ্রকে (খ্রী. ১৮৫০-৮৩) আধুনিক হিন্দীর জনক বলা হয়ে থাকে। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল বারাণসী কিন্তু নিজে বাঙলা সাহিত্যের অগ্রগতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশই ছিল: "বঙ্গভাষার অক্ষয় রত্নভাণ্ডারের সহায়তায় হিন্দী ভাষার উন্নতিবিধান"। লেখক হিসেবে হরিশ্চন্দ্রের দান অতুলনীয়। গল্প, পদ্য, নাটক, উপন্যাস লিখেছেন তিনি অজস্র; সংস্কৃত-বাঙলা-ইংরেজী থেকে অনুবাদও করেছেন অক্লান্তভাবে। ফলে তাঁর প্রেরণা, তাঁর অনুবর্তীদের জন্য এক নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত হিন্দী সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে বাঙালীর অবদানও অনস্বীকার্য। বাঙলা সাহিত্যের প্রেরণায় হিন্দী সাহিত্য ক্রমশ ইংরেজী প্রভাবও অঙ্গীকৃত করে নিয়েছে। হিন্দীর প্রথম যৌবনে বাঙালী মনস্বীদের অনেকে সর্বভারতীয় যোগাযোগ মাধ্যম আবিষ্কারের অনুপ্রেরণায় অথবা সর্বভারতীয় অখণ্ড সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বোধিত হয়ে হিন্দী ভাষার উদ্বোধন ও জাগরণে যথেষ্ট সহায়তা করে গেছেন। রাজা শিবপ্রসাদ (ইং ১৮২৩-৯৫) উত্তরপ্রদেশে এবং সেইসঙ্গে তখনকার প্রখ্যাত বাঙালী নবীনচন্দ্র রায় (আ. ১৮৭০) পাঞ্জাবে খড়ীবোলী হিন্দীকে প্রতিষ্ঠিত করতে থাকেন। রাজা শিবপ্রসাদ ফারসী প্রভাবিত অর্থাৎ রেখ্‌তা হিন্দী এবং দেবনাগরী হরফের প্রবক্তা ছিলেন। রাজা লক্ষ্মণ সিং (খ্রী. ১৮২৬-৯৬) কিন্তু মনে করতেন, হিন্দী এবং উর্দু দুই ভিন্ন ভাষা। তিনি ছিলেন অবশ্য সংস্কৃতান্বিত হিন্দীর প্রবক্তা।

ইনি অভিজ্ঞান শকুন্তলার অনুবাদক ও অপরাপর গ্রন্থের রচয়িতা। এঁকে কেন্দ্র ক'রে একদল শক্তিমান হিন্দী সাহিত্যিক আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে স্মরণীয় হলেন—রাধাকৃষ্ণ দাস, প্রতাপনারায়ণ মিশ্র (খ্রী. ১৮৫৬-৯৪), বালকৃষ্ণ ভট্ট (খ্রী. ১৮৪৪-১৯১৪), বদ্রীনারায়ণ চৌধুরী "প্রেমঘন" এবং সুধাকর দ্বিবেদী। বাঙালী উদ্যোগী পুরুষদের মধ্যে প্রধান হলেন—কেশবচন্দ্র সেন (সুলভ সমাচার, ১৮৭৬), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (বিহারে হিন্দী স্বীকৃতির উদ্যোক্তা, ১৮৮৫), কতকাংশে বঙ্কিমচন্দ্র এবং পরবর্তীকালে অমৃতলাল চক্রবর্তী, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাংবাদিকেরা।

যাই হোক, 'ভারতেন্দু'র যুগের পর থেকে হিন্দী সাহিত্যের অগ্রগতি অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে, কৈশোর থেকে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যৌবনে। আশা করা যায়, তা এককালে অগ্রগণ্য ভাষা হিসেবে বিশ্বের সাহিত্যদরবারে নিজের স্থান ক'রে নেবে।

আধুনিক বাঙলা ও হিন্দীর যাত্রাপথ এককালে গদ্যসাহিত্যের আবির্ভাব-লগ্নেই সূচিত হয়েছিল। উভয় ভাষাই ছিল সংস্কৃত-প্রভাবিত। উভয়েরই পুঁজি ইংরেজী ও সংস্কৃত রচনা অনুবাদের বাঁধা অনুসৃত পথ। কিন্তু তফাতের মধ্যে আধুনিক বাঙলার সাধু আদর্শ যখন ক্রমশই সংস্কৃত প্রভাব থেকে মুক্তির চেষ্টা করে চলেছে, হিন্দী তখন সংস্কৃতায়নের দিকে অতিরিক্তভাবে ঝুঁকে পড়েছে। এতে ক'রে হয়তো সে উর্দু থেকে দূরে থেকে পার্থক্য বজায় রাখতে পারছে, কিন্তু সেই সঙ্গে হিন্দুস্থানী তথা জনগণের ভাষা থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে নিজের ভারসাম্য হারিয়ে। ফলে একটি আদর্শ সাধু ভাষা হিসেবে, অঞ্চল-নিরপেক্ষ ভাষামাধ্যম হিসেবে তার ব্যবহার প্রসারিত হচ্ছে ঠিকই—যেমনটি হয়েছিল সংস্কৃতের ক্ষেত্রে, কিন্তু তার পরিণতি পরিশীলিত বিদগ্ধজনোচিত প্রাচীন আদর্শ সংস্কৃতের পথ ধরেই অপমৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে কিনা, তার সাক্ষ্য দেবে ভাবী ইতিহাস।

ইতিমধ্যেই হিন্দী সাম্রাজ্যের যে ফাটল ধরেছে, তা ক্রমশই উন্মোচিত হচ্ছে; হিন্দী সংসারেই বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ভোজপুরী, মগহী, মৈথিলী, রাজস্থানী ইত্যাদি ভাষাভাষীরা ক্রমশই তাদের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতির দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। উর্দু তো পূর্বেই পৃথগন্ন! এখন কেবল সাধারণ লিপি (অর্থাৎ নাগরী) এবং ফাঁপানো সংখ্যাগরিষ্ঠতার মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে এই অবিভক্ত যৌথ পরিবার কতদিন টিঁকে থাকে, তাই-ই বিচার করার। হিন্দীসাম্রাজ্য স্থাপনের আগ্রাসী ও অনড় মনোভাব, অভিন্ন হিন্দু-হিন্দ্-হিন্দী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা অর্জনের অযথা আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিপত্তি লাভের

প্রমত্ততা এবং সরকারী আনুকূল্য ও বৈষয়িক সুবিধা আদায় করার সামর্থ্য হয়তো তার প্রভাব প্রসারিত করে চলেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে ভাষিক বিচ্ছিন্নতার বীজও বপন করার পালা শুরু হয়েছে—এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই।

এখন হিন্দুস্থানী (হিন্দী, উর্দু) ভাষার কিছু ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ নিচে আলোচিত হবে[১]—

ধ্বনি: আদর্শ হিন্দীর ধ্বনিমালা এই—হ্রস্ব ই / i /, উ / u / এবং অ / ʌ /, দীর্ঘ ঈ / iː /, ঊ /uː/, আ / a /, এ / eː /, ও / oː /, এ্যা / ɛː /, অ / ɔː /। স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ অর্থান্তর ঘটায়। হ্রস্ব 'অ' ধ্বনির উচ্চারণ বাঙলার চেয়ে বিবৃত, ইংরেজী hut-শব্দের [u] ধ্বনির মতো। 'এ' এবং 'ও' ধ্বনির দীর্ঘত্ব অবস্থানসূচক (Positional)। স্বরের আনুনাসিকতাও বাঙলার মতো অর্থান্তর ঘটায় (হৈ "সে হয়" : হৈঁ "তাহারা হয়")। আদর্শ হিন্দীর /ɛː/ এবং / ɔː / ধ্বনি পূর্বাঞ্চলীয় উচ্চারণে যৌগিকস্বরে পরিণত হয়, যেমন, বিহারী /əɛ̆/ এবং /əŏ/। সংস্কৃত ঐ, ঔ উচ্চারণে কতকটা 'এ্যায়, অও'।

সংরক্ষণশীল উচ্চারণে ণ>ড় (উর্দুতে ণ নেই)। প্রাচীন উচ্চারণে শ>স, ষ>খ কিন্তু বর্তমানে শ, ষ>স / s /। হিন্দীতে কিছু ফারসী ধ্বনি নবাগত, যেমন ফ. / f /, খ. / x /, গ. / γ /, জ. / z /। মহাপ্রাণধ্বনি ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ হিন্দীতে শুদ্ধ বা পূর্ণরূপে উচ্চারিত হয়। হিন্দীতে বর্গীয় ব / b / এবং অন্তঃস্থ ব / w / ধ্বনির পৃথক অস্তিত্ব আছে। বাঙলার মতো তাড়িত ড়, ঢ় ধ্বনিও লভ্য। বাঙলার তুলনায় হিন্দীর কয়েকটি যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণ লক্ষণীয়—জ্ঞ>গ্যঁ, ক্ষ>ক্ষ, ক্বচিৎ চ্ছ। অনুস্বার হিন্দীতে আছে, উচ্চারণ ন্ এর মতো (বাঙলার ঙ-র মতো নয়)।

শব্দরূপ: হিন্দীতে কেবল দুটি লিঙ্গ—পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ (ক্লীবলিঙ্গ নেই)। শব্দের লিঙ্গানুশাসন ব্যাকরণ-শাসিত, যেমন, ভাত, হাথ (পুং), কিন্তু রোটী, কিতাব (স্ত্রী)। বিশেষণ অথবা সম্বন্ধবিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গে -ঈ প্রত্যয় গ্রহণ করে, যেমন—অচ্ছা কাগজ : অচ্ছী কিতাব ; ঘরকা বেটা : ঘরকী বহূঁ ; ছোটা কাম : বড়ী বাত।

হিন্দী বহুবচন গঠিত হয় বিভক্তি -এ/এঁ এবং -আঁ অথবা সমষ্টিবাচক শব্দ যোগে, যথা—ঘোড়া—ঘোড়ে, বাত—বাতেঁ, লাঠী—লাঠিয়াঁ, রাজা—রাজালোগ।

হিন্দী নামশব্দের দুটি মূল (Stem)—কর্তৃকারকের মূল এবং তির্যক কারকের মূল। এই তির্যকমূলের (Oblique Stem) একবচন ও বহুবচন ভেদ আছে (-এ : -ওঁ), যেমন—ঘোড়া—ঘোড়ে- (ঘোড়ে-কা, -সে, -পর ইত্যাদি), বহুবচনে -ওঁ (ঘোড়োঁ-কা, -সে, -পর)।

---

১ চট্টোপাধ্যায় : ভাপ্র প. ৫৩০-৫৩৫ ; Ghatage ; HL. p. 140-41,

এছাড়া করণবাচক কর্তা (Agenlative Case) সকর্মক ধাতুর অতীত কালের ক্রিয়ার কর্তা রূপে -নে অনুসর্গ যোগে প্রযুক্ত হয়, এবং ক্রিয়া উক্ত কর্ম অনুযায়ী লিঙ্গান্তরিত হয়, যেমন— রাম-নে শ্যামকো দেখা, মৈঁনে ভাত খায়া, উস্‌নে রোটী খাঈ।

অন্বিত নামপদের বিশেষণ হিসেবে সম্বন্ধপদের প্রত্যয় হলো পুংলিঙ্গ কর্তৃকারকের একবচনে -কা ও বহুবচনে -কে এবং তির্যক কারকে বচননির্বিশেষে -কে, যথা—সিপাহীকা ঘোড়া খড়া হৈ, সিপাহীকে ঘোড়েপর জীন লগাও; সেঠজীকে তীন ঘোড়ে হৈঁ, সেঠজীকে তীন ঘোড়োঁমে এক ভী অচ্ছা নহী ইত্যাদি। এছাড়া অন্যান্য অনুসর্গ—সে (৫মী), -মেঁ (৭মী), -কো (গৌণকর্ম) ইত্যাদি।

সর্বনাম: সর্বনামের ক্ষেত্রেও দুটি মূল—কর্তৃ- এবং তির্যক মূল, যথা—মৈঁ—মুঝ; হম্—হম্, তু—তুঝ্; তুম্—তুঝ্, ৱহ্—উস্, ৱে—উন্, য়হ্—ইস্, য়ে—ইন্, কৌন্—কিস্, বহুবচনে কিন্; জো—জিস্, জিন- ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদ: বর্তমান ও ভবিষ্যতের ক্রিয়ার বচনভেদ কর্তার বচন-অনুসারে হয়: মৈঁ জাউঙ্গা—হম্ জায়েঙ্গে; মৈঁ জাউঁ—হম্ জাএঁ; মৈঁ জাতা হুঁ—হম্ জাতে হৈঁ।

সকর্মক ক্রিয়ার অতীতে কর্মের সঙ্গে ক্রিয়া অন্বিত হয় অর্থাৎ ক্রিয়া যেন কর্মের বিশেষণ। অকর্মক ক্রিয়ার অতীতে ক্রিয়া কর্তার বিশেষণের মতো—যথা, অকর্মক: মৈঁ চলা—হম্ চলে; তু চলা—তুম্ চলে; ৱহ্ চলা—ৱে চলে। সকর্মক: মৈঁ-নে এক লড়কা দেখা—হম্‌নে এক লড়কা দেখা। মৈঁ নে চার লড়কে দেখে—হম্ নে চার লড়কে দেখে। ভবিষ্যৎ কালে অবশ্য ক্রিয়া কর্তার বিশেষণ। মোটকথা, হিন্দীর ক্রিয়াপদে বিশেষণের গুণ বর্তমান। তা সংস্কৃতের মতো কর্তৃবাচ্যক অথবা কর্ম/ভাববাচ্যক।

বাক্যরীতি: এই ক্ষেত্রে হিন্দীর সঙ্গে বাঙলার মিল আছে। বিশেষ কয়টি বাক্যরীতির পদক্রম হলো—

(১) কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া: উস্‌নে খানা খায়া।

(২) সংযোজক অস্ত্যর্থক ক্রিয়া বাঙলার মতো উহ্য থাকে না: ৱহ্ মেরা ভাঈ হৈ।

(৩) নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার পূর্বে বসে: মৈঁ নহী দূঙ্গা।

(৪) প্রত্যক্ষ উক্তির অধিক ব্যবহার।

(৫) বাংলার চেয়ে হিন্দীতে কর্মবাচ্যের ক্রিয়া বেশি ব্যবহৃত হয়।

৭.৩ পূর্বী হিন্দী (Eastern Hindi) / কোশলী

৭.৩.১ ভাষিক পরিস্থিতি

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যপ্রাচ্য আঞ্চলিক ভেদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে পূর্বী হিন্দী। গ্রীয়ার্সন একে অন্তরঙ্গ (Inner) এবং বহিরঙ্গ (Outer) বর্গের অন্তর্বর্তী (Intermediate) বর্গরূপে প্রতিপন্ন করেছেন। পূর্বী হিন্দীর একটি উপভাষা হলো অবধী। 'অবধী' শব্দটি বলতে বোঝায় 'অবধ' বা অযোধ্যার ভাষা, যদিও এই ভাষাটি কেবল এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়। অবধী অবশ্য বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন—পূর্বী[১], কোশলী[২], বৈসওয়াড়ী[৩] ইত্যাদি। অবধীর আরও দুইটি ভগিনী-স্থানীয়া উপভাষা আছে, যথা, বঘেলী বা বঘেলখণ্ডী এবং ছত্তিশগঢ়ী। এই তিনটি উপভাষার সাধারণ নাম 'পূর্বী হিন্দী'। 'পূর্বী হিন্দী' নামটিই গ্রহণযোগ্য।

ঐতিহাসিক বিচারে পূর্বী হিন্দী এসেছে অর্ধমাগধী প্রাকৃত থেকে। কিন্তু বর্তমানে একে পশ্চিমা হিন্দীর উপভাষারূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলেছে। ফলে খড়ীবোলী-উদ্ভূত আদর্শ হিন্দীর চাপে পূর্বী হিন্দী, বিশেষত অবধীর ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রাচীন সাহিত্যাদর্শ নির্বাসিত হতে চলেছে।

পূর্বী হিন্দীর ভাষাঞ্চলের পশ্চিমে পশ্চিমা হিন্দীর দুটি উপভাষা—কনৌজী, বুন্দেলী, পূর্বে বিহারীর উপভাষা ভোজপুরী, দক্ষিণে পূর্বী হিন্দীর অপর উপশাখা ছত্তিশগঢ়ী এবং উত্তরে নেপাল রাষ্ট্রের ভাষা নেপালী। পূর্বী হিন্দীর বিভিন্ন উপভাষাগুলি সাধারণত বলা হয় উত্তরপ্রদেশের মধ্য ও পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলিতে এবং মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে।

পূর্বী হিন্দীর প্রতিনিধিস্থানীয় অবধী ভাষাগুলিকে তিনটি শাখায় ভাগ করা যায়—পশ্চিমা, মধ্যা এবং পূর্বী। পশ্চিমা বলতে এই উপভাষাগুলি বোঝায়ঃ খেরী (লখিমপুর), সীতাপুর, লখ্‌নৌ, উনাও এবং ফতেপুর। মধ্যদেশীয় ভাষাগুলি হলোঃ বহ্‌রৈছ, বড়াবাঙ্কী, রাএ বেরিলি। আর পূর্বীর অন্তর্গত হলো গোণ্ডা, ফৈজাবাদ, সুলতানপুর, প্রতাপগঢ়, এলাহাবাদ, জৌনপুর এবং মির্জাপুর। তবে বিশুদ্ধ আদর্শ অবধী বলা হয় মির্জাপুর শহরের সন্নিহিত পশ্চিমের ভাষাঞ্চলে।

---

১ LSI V, ii p. 43, VI p. 10

২ LSI VI p. 9

৩ LSI VI p. 9

বর্তমান সমীক্ষায় (ইং ১৯৬১) অৱধী ভাষাভাষীর সংখ্যা ৫,২৮,২৮১ জন। বঘেলী/বঘেলখণ্ডী এবং ছত্তিশগড়ীর ভাষাভাষীর সংখ্যা যথাক্রমে ৫,৫৭,০৩৪ এবং ২৯,৬২,০৩৮ জন। তবে ১৯৭১-এর জনসমীক্ষায় এদের আনুমানিক সংখ্যা দেখানো হয়েছে এইভাবে ঃ অৱধী (১,৩৬,২৫৯), ছত্তিশগঢ়ী (৬৬,৯৩,৪৪৫) এবং বঘেলখণ্ডী (২,৩১,২৩১)। ছত্তিশগঢ়ী প্রকৃতপক্ষে বলা হয় দক্ষিণ কোশল দেশে (মধ্যপ্রদেশের ছোটনাগপুর, বিলাসপুর, রায়পুর)। এই অঞ্চল মুসলমান শাসনপর্বে 'গণ্ডোয়ানা' নামে অভিহিত হতো।

৭.৩.২ প্রাচীন সাহিত্য

অৱধীর প্রাচীন সাহিত্যসম্পদ বিপুল। প্রাচীনতম রচনা পণ্ডিত দামোদর বিরচিত 'উক্তিব্যক্তি-প্রকরণ' (খ্রী.অ. ১১৫৮)। বইখানি রচনার উদ্দেশ্য সংস্কৃত মাধ্যমে অৱধী ব্যাকরণ শিক্ষাদান। অৱধী-রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বোধ হয় তুলসীদাস রচিত 'রামচরিত-মানস' (ইং ১৫৭৫)। আর একখানি বহুল-প্রচলিত গ্রন্থ হলো মালিক মুহম্মদ্ জ্যায়সী রচিত 'পদ্মাৱৎ' বা 'পদুমাৱৎ' (ইং ১৫৪০)। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা হলো ঈশ্বরদাসের 'সত্যবতী কথা' (খ্রী. ১৫০০), কুত্‌বনের 'মৃগাবতী' (খ্রী. ১৫১২), লালদাস গুপ্তের 'অৱধ বিলাস' (খ্রী. ১৬৪৩), নুর মহম্মদের 'ইন্দ্রাবতী' (খ্রী. ১৭৫৭), শেখ নিসার রচিত 'য়ুসুফ-জুলেখা (খ্রী. ১৭৯০) ইত্যাদি। বর্তমান অৱধীতে গদ্য রচনার ব্যাপকতা না থাকলেও সরল সহজ কবিতা লেখা হয় সর্বসাধারণের উপভোগ্য ক'রে, কিন্তু হিন্দী পাঠকেরা এইজাতীয় রচনাকে হিন্দীর উপভাষা বা লোকসাহিত্য ব'লে ঢক্কানিনাদ করেন।

৭.৩.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে বঘেলীর সঙ্গে অৱধীর বিশেষ পার্থক্য নেই। **LSI** গ্রন্থে একে জনশ্রুতির আধারে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।[১] সুতরাং বঘেলী অৱধীর উপভাষা ব'লে বর্তমান সমীক্ষায় স্বীকৃত হয়েছে। তবে পূর্বী হিন্দীর অপর শাখা ছত্তিশগঢ়ীর সঙ্গে অৱধীর পার্থক্য সুস্পষ্ট। তাছাড়া ছত্তিশগঢ়ীর ওপর মারাঠী ও ওড়িয়ার যথেষ্ট প্রভাব পড়ায় তা বিশিষ্টতা লাভ করেছে। ছত্তিশগঢ়ীর সঙ্গে অৱধীর বিশেষ কয়েকটি পার্থক্য হলো ঃ (১) ছত্তিশগঢ়ীতে ব্যবহৃত আশ্রিত নির্দেশক (**Definitive Enclitic**)

---

১ "Its separate existence has only been recognised in deference to popular speech" (LSI, Vol. VI. pt. 1).

-হর্ [hʌr]। (২) বহুবচন প্রত্যয় -মন্, কিন্তু অবধী পঞ্চ্ / লোগ্ (হম্‌পঞ্চ্, হম্‌লোগ "আমরা")। (৩) মুখ্য/গৌণ কর্মে -লা (কচিৎ -কা) কিন্তু অবধীতে -কা/ক/কই/কর/কের্ ইত্যাদি। (৪) অবধীর করণকারকের বিভক্তি -সে স্থলে বহুল-ব্যবহৃত -লে। (৫) সম্বন্ধপদে ছত্তিশগঢ়ীতে বচন/লিঙ্গ নির্বিশেষে ব্যবহৃত অনুসর্গীয় প্রত্যয় -কে কিন্তু অবধীতে -কে, -ক [kə], কের (পুং), -কি, -কেরী (স্ত্রী)।[১]

পূর্বী হিন্দী তথা অবধীর সঙ্গে পশ্চিমা হিন্দীরও পার্থক্য যথেষ্ট। সে-পার্থক্য প্রধানত রূপতত্ত্ব-আশ্রিত। ধ্বনিমালা এবং শব্দভাণ্ডারের দিক দিয়ে অবশ্য পশ্চিমা হিন্দী ও পূর্বী হিন্দীর সাদৃশ্য দেখা যায়। মোট কথা, ভাষাতত্ত্ব বিচারে পূর্বী হিন্দীর স্থান বিহারী ও পশ্চিমা হিন্দীর মাঝামাঝি। যাই হোক, অবধী ও পশ্চিমা হিন্দীর বিশেষ পার্থক্যগুলি কী, তা নিচে দেখানো হলো[২]—

১. অবধীতে বিহারীসুলভ 'দুর্বল' (Unstressed) অক্ষরস্থিত হ্রস্ব স্বর অতিহ্রস্ব /ə/ স্বরে পরিণত হয়। পদান্তে এইজাতীয় অবধী হ্রস্ব স্বর অনক্ষরী (Non-syllabic) অস্পষ্ট স্বরে (Whispered Vowel) পরিণত হয় (অর্থাৎ *i, u, e*)। বিহারী ও অবধীতে সংস্কৃত ঐ, ঔ ধ্বনিদ্বয় উচ্চারিত হয় [æĕ, ɔŏ]-রূপে।[৩] এছাড়া অবধীতে স্বরসংযোগ সুলভ কিন্তু হিন্দীতে তা যৌগিক স্বরে পরিণত, যথা—কউৱা (=হি. কৌআ), গইয়া (হি. গৈয়া), গুআল (হি. গ্বাল)।

২. নাম শব্দের মূল গঠনে (Stem Formation) হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং দীর্ঘতর মূল দেখা যায় উপরোক্ত ভাষাগুলিতে, কিন্তু পশ্চিমা হিন্দীতে সাধারণত হ্রস্ব মূল (তু. ঘোড়া), অবধীতে হ্রস্ব এবং দীর্ঘ (তু. ঘোড়া/ঘোড়ৱা) এবং বিহারীতে হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং দীর্ঘতর মূল (তু. ঘোড়া/ঘোড়ৱা/ঘোড়ৱৱা) দেখা যায়।

৩. বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে লিঙ্গশাসন পশ্চিমা হিন্দীতে কঠোর কিন্তু অবধীতে তা শিথিল আর বিহারীতে তা প্রায় লুপ্ত।

৪. শব্দরূপের ক্ষেত্রে অবধীর তির্যক কারকে তির্যকমূল পরিবর্তিত হয় না,[৪] যেমন, 'তুম্ অপনে লরিক ক মারেউ' ('তুমি নিজের ছেলেকে মেরেছিলে')।

---

১ Hiralal & Grierson : A Grammar of the Chhattisgaṛhī Dialect of Hindi, C. P. Govt.

২ B. Saksena : EAW, pp. 5-6.

৩ মজুমদার : বাভাপ (১ম), পৃ. ১৮৩, ১৮৫।

৪ S. K. Chatterji : LLMI p. 41

৫. পশ্চিমা হিন্দীতে সকর্মক ক্রিয়া কর্মবাচ্যে ব্যবহৃত হয়, তাই কর্তার সঙ্গে কারকবাচক অনুসর্গ (Agentative Postposition) যুক্ত হয়, কিন্তু অৱধী ও বিহারীতে তা কর্তৃবাচ্যেই ব্যবহৃত হয়, যেমন, অৱধী : মই দেখেউঁ কিন্তু পশ্চিমা হিন্দী : ম্যয়্‌নে দেখা।

৬. উভয় ভাষার মধ্যে কারক-অনুসর্গেরও পার্থক্য যথেষ্ট, যেমন—মুখ্য/গৌণ কর্ম : -ক, -কা (অৱধী) কিন্তু -কো, -কউ (পশ্চিমা হিন্দী) এবং -কে (বিহারী)। অধিকরণে -মা (অৱধী) কিন্তু বিহারী—পশ্চিমা হিন্দী -মে। সম্বন্ধপদে -কর (রাম কর দাসা), প্রাচীন অৱধীতে—ক(া), কৈ, কের/কেরী/কেরে (তু. রামচরিতমানস : ধরম ক টীকা, রামকৈ প্রতীতী, রাম কা ঘোরৱা)।

৭. সর্বনাম-রূপের পার্থক্য উল্লেখযোগ্য, যেমন সর্বনামস্থানীয় বিশেষণ তোর-, মোর- (অৱধী) কিন্তু তের-, মের- (পশ্চিমা হিন্দী)। তির্যক মূল হমরে- (অৱধী) কিন্তু হমারে (পশ্চিমা হিন্দী)। অপর পক্ষে সম্বন্ধনির্দেশক (Relative) এবং প্রশ্নবাচক (Interrogative) সর্বনামের ক্ষেত্রে বিহারীর সঙ্গে এর পার্থক্য সহজদ্রষ্টব্য, যেমন—অৱধী : জো, কো, কিন্তু বিহারী জে, কে।

৮. ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে পশ্চিমা হিন্দীর সহায়ক ক্রিয়া হ- (হৈ) এবং অৱধীর হ- (হই-) ছাড়াও অহ-(অহই) [তুঃ পূর্বী অৱধী আহি, আয়], বাট্‌ (বাটই) [তুঃ পশ্চিমা অৱধী বা, বাটৈ] বর্তমানকালে ব্যবহৃত হয়। আর বিহারীর সহায়ক ক্রিয়াগুলি হলো : বাড় (বাড়ে) এবং আছ (আছে)। অতীতকালের সহায়ক ক্রিয়া রহ্‌ (উ আৱা রহা=হিন্দী ৱহ্‌ আয়া থা)।

৯. ভবিষ্যৎ কালে অৱধীতে সংস্কৃত-আগত দুই জাতীয় ভবিষ্যৎ পদ দেখা যায়—যথা, প্রাত্যয়িক ভবিষ্যৎ (সংস্কৃত -স্যতি, স্যন্তি ইত্যাদি বিভক্তি--আগত) এবং কৃদন্ত ভবিষ্যৎ (-তব্য আগত), যেমন—অবধী : মই দেখিহউ (১ব)/হম্‌ দেখিবা (বহুব); হম্‌ জাব (হি.মৈঁ জাউঙ্গা), উ জাঈ/জইহৈ (=হি. ৱহ্‌ জাএগা)। কিন্তু পশ্চিমা হিন্দীতে (ব্রজ, কনৌজী, বুন্দেলী) এবং বিহারীতে যথাক্রমে প্রাত্যয়িক ও কৃদন্ত ভবিষ্যতের রূপ দেখা যায়, যেমন—ভোজপুরী, হম্‌ দেখিবি ইত্যাদি।

১০. ভাববাচক বিশেষ্য পদগঠনেও পার্থক্য আছে, যথা—দেখব (=হি. দেখ্‌না), ঘ্‌মব (=হি. ঘ্‌মনা)।

পূর্বী হিন্দী ভাষাভাষীদের মধ্যে শিক্ষিতজন ফারসী বা নাগরী লিপি ব্যবহার করলেও সাধারণ লোকেরা কইথী লিপি ব্যবহার করে। তবে বানিয়ারা ব্যবহার করে 'হুণ্ডীওয়ালী' বা 'মুড়িয়া' লিপি।

৭.৪ রাজস্থানী

৭.৪.১ ভাষিক পরিস্থিতি

উৎপত্তি বিচারে রাজস্থানী শৌরসেনী প্রাকৃত এবং পরবর্তী স্তরের (শৌরসেনী) অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত। গ্রীয়ার্সন এই ভাষাকে পশ্চিমা হিন্দীর মতো 'অন্তরঙ্গ' (Inner) ভাষাবর্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অবশ্য শৌরসেনী অপভ্রংশের বিভিন্ন উপভাষাগত বিভেদ ছিল। সুতরাং নাগর, সৌরাষ্ট্রী অথবা গুর্জর—কোন্ অপভ্রংশ থেকে রাজস্থানীর উদ্ভব, তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়ে গেছে। গ্রীয়ার্সনের মতে রাজস্থানী নাগর অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত, অপর পক্ষে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে তা সৌরাষ্ট্রী অপভ্রংশজাত। কন্‌হৈয়ালাল মাণিকলাল মুন্সী ও নরসিংহ রাও দিবেটিয়া মনে করেন, রাজস্থানীর উদ্ভব গুর্জরী অপভ্রংশ থেকে। যাই হোক, সাম্প্রতিক লোকগণনা (ইং ১৯৬১) অনুযায়ী রাজস্থানীর লোকসংখ্যা ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৩৩ হাজার ১৬ জন। ভারতীয় সংবিধানেব অষ্টম অনুসূচীতে যে-প্রধান ১৫টি ভাষা স্বীকৃত হয়েছে, রাজস্থানী তার অন্তর্গত হয় নি, রাজস্থানের ভাষা রাজস্থানীকে করা হয়েছে হিন্দী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে কিন্তু এ হলো একটি স্বতন্ত্র ভাষা। আর প্রকৃতপক্ষে হিন্দী অপেক্ষা গুজরাটীর সঙ্গে এর সাদৃশ্য অধিক।

রাজস্থানীর ভাষাঞ্চল সীমানা হলো এই: পশ্চিমে সিন্ধী ও লহ্ন্দা, উত্তরে লহ্ন্দা, পাঞ্জাবী, পূর্বে ব্রজভাষা, বুন্দেলী (পশ্চিমা হিন্দীভুক্ত) এবং দক্ষিণে মারাঠী, খান্দেশী ও গুজরাটী।

প্রাচীন রাজপুতানাকে 'রাজস্থান'-রূপে পরিচিতি ঘটান সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক টড্ (Tod)। আর স্বাধীন ভাষা হিসেবে রাজস্থানীর স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন সর্বপ্রথম গ্রীয়ার্সন। 'রাজস্থানী' নামকরণও তাঁর। অবশ্য 'বিহারী' নামকরণের মতো 'রাজস্থানী'ও একটি কল্পিত নাম, তা একটি কোনো বিশেষ ভাষার নাম নয়। প্রাচীন রাজপুতানা বা রাজস্থানের আয়তন যেমন বিশাল, ভাষাঞ্চলও তেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ—বিভিন্ন উপজাতি ও প্রাক্তন সামন্তরাজ্যের অবস্থান এর ভাষাঞ্চলের চিত্রটিকে জটিল করে তুলেছে; তাই বর্তমান ভাষাসমীক্ষাও বোধহয় চূড়ান্ত নয়। গ্রীয়ার্সন রাজস্থানীর অন্তত ১৬টি উপভাষা স্বীকার করে গেছেন।[১] প্রধান উপভাষা চারটি: মেওয়াটী (ভরতপুর, রোটক, আলোয়ার, গুড়গাঁও), মালবী (মালব), জয়পুরী/ঢূণ্ডারী এবং মারোয়াড়ী।

---

১ G. A. Grierson: LSI. Vol. I, Vol, IX part 2; Notes on the Principal Rajasthani Dialects.

রাজস্থানীর উপভাষাগুলির মধ্যে মারোয়াড়ীর স্থান অগ্রগণ্য। সম্প্রতি তাই অনেকে মারোয়াড়ী ও রাজস্থানীকে অভিন্নরূপে ব্যবহার করে থাকেন। ১৯৬১ সনের গণনা অনুযায়ী মাতৃভাষারূপে রাজস্থানী ও মারোয়াড়ীর পৃথক ভাষাভাষীর সংখ্যা যথাক্রমে ৮ লক্ষ ৪ হাজার ৭৪ এবং ৬২ লক্ষ ৪২ হাজার ৪৪৯। কিন্তু ১৯৭১ সনের সমীক্ষায় এদের মাতৃভাষীর সংখ্যা দেখানো হয়েছে আনুমানিক ২০ লক্ষ ৯৩ হাজার ৫৫৭ এবং ৪৭ লক্ষ ১৪ হাজার ৯৪ জন।

সে যাই হোক, ভাষাঞ্চলের আয়তন, লোকসংখ্যা, সর্বভারতীয় প্রসার ও সাহিত্যিক মর্যাদা অথবা প্রাচীন নিদর্শনের প্রাচুর্য—যে-কোনো দিক দিয়েই মারোয়াড়ী নবীন ভারতীয় আর্যভাষাগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মারোয়াড়ী রাজস্থানের আদর্শ সাহিত্যিক (Standard Literary) কথ্য/লেখ্য ভাষা—যোধপুর এর কেন্দ্র। মূল ভাষাঞ্চল হলো পশ্চিম রাজস্থান: মারোয়াড়, মেবার, বিকানীর, উদয়পুর, জয়সলমীর। পশ্চিমা উপভাষা মারোয়াড়ীর সঙ্গে সিন্ধীর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। অপরদিকে উত্তর-পূর্বী উপভাষা মেওয়াটী ও আহীরবাটী এবং দক্ষিণ-পূর্বী মালবী ও নিমাড়ী উপভাষার সঙ্গে পশ্চিমা হিন্দীর (ব্রজভাষা, বুন্দেলী ও খড়ীবোলী) নৈকট্য এবং প্রভাব (এমনকি প্রাচীন স্তরেই) সহজলভ্য। সাম্প্রতিক লোকগণনা অনুযায়ী এই উপভাষাগুলির ভাষাভাষীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এইরূপ—মেওয়াটী: ৪৮,৪২৭ (ইং ১৯৬১), ৯৪,৬৮৭ (ইং ১৯৭১); আহিরবাটী: ২১,১১৯ (ইং ১৯৬১); মালবী: ১১,৪২,৪৭৮ (ইং ১৯৬১), ৬,৪৪,০৩২ (ইং ১৯৭১); নিমাড়ী: ৫,২৮,১৭২ (ইং ১৯৬১), ৭,৯৪,২৪৬ (ইং ১৯৭১)।

উৎপত্তি বিচারে পশ্চিমা রাজস্থানী অর্থাৎ মারোয়াড়ী এবং গুজরাটী 'প্রাচীন পশ্চিমা রাজস্থানী' (Old Western Rājasthānī) থেকে বিবর্তিত। খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতক থেকে রাজস্থানী (বিশেষত মারোয়াড়ী) ও গুজরাটী পৃথক হয়ে গেছে।[১]

জয়পুরী বা ঢূণ্ঢারী পূর্ব রাজস্থানের প্রতিনিধিস্থানীয় ভাষা। বর্তমান সমীক্ষায় অবশ্য প্রতিবেদকের (Informant) ইচ্ছাধীনে জয়পুরী এবং ঢূণ্ঢারী পৃথক পৃথক মাতৃভাষারূপে চিহ্নিত হয়েছে। মাতৃভাষাভাষীর সংখ্যা: জয়পুরী ৮১,৫১৪ (ইং ১৯৬১), ১০,৮৬৯ (ইং ১৯৭১); এবং ঢূণ্ঢারী: ১৫,৯১,৮২৬ (ইং ১৯৬১), ১,৫৫,০৪০ (ইং ১৯৭১)। জয়পুরী/ঢূণ্ঢারী জয়পুর, লাওয়া, কিসনগড় এবং আজমীর-মেরোয়াড়ের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এবং এর বিভাষা হাড়ৌতী, কোটা ও বুন্দী অঞ্চলে প্রচলিত। মারোয়াড়ী, গুজরাটী

---

১ L. P. Tessitori : Notes on the Grammar of Old Western Rajasthani, Indian Antiquary, Vols. 43,44,45, Bombay, 1914-16.

এবং ব্রজভাষার প্রভাব এতে যথেষ্ট পরিমাণে দৃশ্য। দাদূ দয়াল এবং তাঁর শিষ্যদের রচনা এই উপভাষাতেই রচিত। মারোয়াড়ীর সঙ্গে এর বিশেষ কয়েকটি ব্যাকরণগত পার্থক্য হলো—ঢূণ্ঢারীতে বর্তমান কালে '-ছৈ', অতীতকালে -'ছো', সম্বন্ধপদে -কা, -কো, -কী, কিন্তু মারোয়াড়ীতে যথাক্রমে '-হৈ/ছৈ,' '-হা/ছো,' '-রা/-রো/-রী' ইত্যাদি।

রাজস্থানীর কিছু উপভাষা অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়েছে, মুখ্যত যাযাবর-ভুক্ত উপজাতির মাধ্যমে। এইজাতীয় ঔপজাতিক (Tribal) উপভাষা হলো: লমনী/লম্বড়ী (ইং ১৯৬১ সমীক্ষায় ৬,৭৯,৩৬৩ ; ইং ১৯৭১-এ ১২,০৩,৩৩৮), প্রচলিত অন্ধ্রপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ এবং মহীশূরে ; বঞ্জারী (মহারাষ্ট্র, মহীশূর, অন্ধ্র), ভাষাভাষী সংখ্যা : ৫,৯২,৬৫৪ (ইং ১৯৬১), ৪,৭১,৮৫৩ (ইং ১৯৭১) ; এবং গুজরী (জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব)। গ্রীয়ার্সন অবশ্য লমনী/লম্বড়ী ও বঞ্জারীকে অভিন্ন মনে করেছিলেন, বর্তমান লোকগণনার সমীক্ষকের ধারণাও তাই। গোজরী/গুজরী/গুজ্জরী সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, দ্র. পৃ. ৬০। বর্তমান সমীক্ষায় (ইং ১৯৭১) এদের পৃথক সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। যথা—গোজরী (৩,৩০,৪৮৫), গুজরী (২৪,৬২৪) এবং গুজ্জরী (৮,৫৬৬)।

৭.৪.২ প্রাচীন সাহিত্য

প্রাচীনত্বে, প্রসারে ও বৈচিত্র্যে রাজস্থানীর সাহিত্যিক ঐতিহ্য উপেক্ষণীয় নয়, তবে মৌখিক সাহিত্য বা লোকসাহিত্য হিসেবে এর ভাষা অবিকৃত রূপে রক্ষিত হয় নি—পশ্চিমা হিন্দীর প্রভাবে তো বটেই। প্রাচীন মারোয়াড়ীতে রচিত সাহিত্যধর্মী রচনাগুলি 'ডিঙ্গল' নামে অভিহিত হতো। বীররসাত্মক ঐতিহাসিক এই গাথা-সাহিত্য প্রধানত ভাট ও চারণ-কবিদের দ্বারা গীত হতো। এর ভাষা অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ, প্রাচীন গুজরাটী ও রাজস্থানীর বিমিশ্র রূপ। ১১শ-১৪শ শতকের সময়সীমায় রচিত রাজস্থানী সাহিত্য প্রধানত এই ভাষায় লিখিত। জৈন ধর্ম-আশ্রিত রচনাও এই পর্বে মেলে। সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রাজস্থানী গ্রন্থ হলো ১৫শ শতকের কবি কল্লোল-বিরচিত প্রেমগাথা "ঢোলা-মারু-রা দূহা"। ডিঙ্গল সাহিত্যের অপর একখানি প্রসিদ্ধ কাব্য বিকানীরের কবি পৃথ্বীরাজ রাঠোড়-এর "বেলি. কৃষ্ণ রুক্মনীরী", এর উপজীব্য হলো শ্রীকৃষ্ণ-রুক্মিণীর বিবাহ। ১৬শ শতক থেকে রাজস্থানী সাহিত্য ভক্তিরসধারায় সিঞ্চিত। সন্তকবি দাদূ দয়াল (১৬শ শতক) এবং তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের রচনাও রাজস্থানীর বিশেষ সম্পদ। ভক্তসাধিকা মীরাবাঈ (১৬শ শতক) রচিত পদাবলী সাহিত্য সারা ভারতে বিস্তৃত হয়েছিল—যদিও মূল ভাষার অনেকাংশ খড়ীবোলী ও ব্রজভাষার প্রভাবে বিকৃত হয়ে গেছে (দ্রঃ পৃ.১৫০-৫১)। আধুনিক কবিদের

মধ্যে কন্হৈলাল সেঠিয়া, রামনিবাস হারীত, মেঘরাজ গণপতি স্বামী প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। রাজস্থানীর গদ্যসাহিত্য কিন্তু অকিঞ্চিৎকর বললেই চলে।

রাজস্থানী বর্তমানে দেবনাগরী হরফে লিখিত হয়, তবে দৈনন্দিন ব্যবহারে রাজস্থানীর নিজস্ব লিপি 'মহাজনী' এখনও প্রচলিত আছে।

৭.৪.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

রাজস্থানীর ভাষাতাত্ত্বিক কয়েকটি লক্ষণ হলো[১]—

১. প্রায়শই স্বরধ্বনির বিপর্যয়, যেমন, সরদার>সিরদার, হরিণ>হিরণ, পণ্ডিত> পিণ্ডত দিন>দন, মানুষ>মাণস্, মিলাপ>মলাপ ইত্যাদি।

২. ওড়িয়া সুলভ 'ণ' ও ল. (ḷ) ধ্বনির অস্তিত্ব (কাল., ফল., মাণস)।

৩. অন্তঃস্থ ব্র ও বর্গীয় 'ব' ধ্বনিদ্বয়ের পার্থক্য বিচার।

৪. ক্বচিৎ ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণের নিরুদ্ধ ব্যঞ্জনে পরিণতি (ঘ>গ', ভ>ব' ইত্যাদি)।[২]

৫. দুইটি লিঙ্গ (পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ), যথা—ঘোড়ো, স্ত্রীলিঙ্গে ঘোড়ী, বাত্ (স্ত্রী)।

৬. বহুবচন ও তির্যককারকের একবচনে—আঁ বিভক্তি (ঘোড়া, ঘোড়্যাঁ, বাতাঁ)।

৭. অনুসর্গীয় প্রত্যয়ের উপভাষাগত প্রাচুর্য, যথা—নৃঁ, -নে, -না (২য়া), -রে, -কৈ (৪র্থী), -সূঁ, -ঊঁ (৩য়া-৫মী), -রো/ -রা/ -রী এবং -কো/ -কা/, কী(৬ষ্ঠী), -মে (৭মী)।

৮. সর্বনাম মূল—উ পু একবচনে ম্হারো, ম পু একবচনে থারো ইত্যাদি।

৯. অতীতকাল কৃদন্ত পদজাত (ম্হৈঁ খায়ো "আমি খাইয়াছিলাম"<খাদিতঃ)।

১০. -ল যোগে নবীন ভবিষ্যৎকাল গঠন (ম্হৈঁ জাউলোঁ, -লী) ছাড়া সংস্কৃত -স্য -জাত প্রাত্যয়িক বিভক্তির সংরক্ষণ (ম্হৈঁ জাস্যূঁ) ইত্যাদি।

১১. সহায়ক ক্রিয়া হিসেবে আছ ধাতুর ব্যবহার বিশেষত জয়পুরীতে মেলে (ছূঁ, ছাঁ, ছ্য ইত্যাদি)।

---

১ হীরালাল মাহেশ্বরী : রাজস্থানী ভাষা ঔর সাহিত্য (হিন্দীতে রচিত), কলিকাতা ১৯৬০। পণ্ডিত রামকর্ণ শর্মা : মারবাড়ী ব্যাকরণ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩। সময়প্রসাদ অগ্রবাল : ভাষাবিজ্ঞান ঔর হিন্দী (২য় সংস্করণ, পৃঃ ১৯৪)।

২ মজুমদার : বাভাপা. (১ম), পৃঃ ১৮৯।

॥ ৮ ॥

পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা

৮.১ গুজরাটী

৮.১.১ ভাষিক পরিস্থিতি

গুজরাটী গুজরাট রাজ্যের সরকারী ভাষা। তা ভারতীয় সংবিধানের ৮ম অনুসূচী স্বীকৃত ১৫টি ভাষার অন্যতম। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর গুজরাট দুটি রাজ্যে বিভক্ত হয়--'খ' পর্যায়ভুক্ত রাজপ্রমুখ-শাসিত সৌরাষ্ট্র এবং 'গ' পর্যায়ভুক্ত কচ্ছ রাজ্য। পরে (১৯৫৬ খ্রী.) তা রাজ্য পুনর্গঠন আইনে বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। Bombay Reorganisation Act অনুসারে বোম্বাই বিভাগের ফলে ১লা মে, ১৯৬০ থেকে সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ ও বোম্বাইয়ের কিছু অংশ নিয়ে নতুন গুজরাট রাজ্য গঠিত হয়েছে। ১৯৬১ সনের জনসমীক্ষায় গুজরাটী-ভাষীর সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৩ লক্ষ ৪ হাজার ৪৬৪। বর্তমান ১৯৭১-সমীক্ষায় এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আনুমানিক ২ কোটি ৫৬ লক্ষ ৫৬ হাজার ২৭৪।

গুজরাটের ভৌগোলিক সীমানা কতকটা প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণে পরিবেষ্টিত, ভাষাঞ্চলও তাই সংহত। এর পশ্চিমে আরব সাগর, উত্তর-পূর্বে রাজস্থানের মরু অঞ্চল, উত্তর-পশ্চিমে পাকিস্তান, দক্ষিণ-পূর্বে মধ্যপ্রদেশের পার্বত্যাঞ্চল এবং দক্ষিণে মহারাষ্ট্র। গুজরাটের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভূ-খণ্ড জুড়ে রয়েছে যেমন কচ্ছের জনবিরল 'রাণ'-এর (<অরণ্য) নিম্নভূমি এবং আরাবল্লী পর্বতমালা, তেমনি উত্তর-পূর্ব, পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্তে বিস্তৃত হয়েছে ভীল-উপজাতি অধ্যুষিত অরণ্যসংকুল পার্বত্যাঞ্চল (আরাবল্লী, বিন্ধ্য, সাতপুরা, সহ্যাদ্রি পর্বতমালার বিচ্ছিন্ন অংশ)। গুজরাটের ভাষাঞ্চল সীমানাও লক্ষণীয় ঃ দক্ষিণ ও পূর্বে মারাঠী ও খান্দেশী, উত্তরে রাজস্থানীর উপভাষা মারোয়াড়ী ও পশ্চিমা হিন্দীর অন্যান্য উপভাষা, পূর্বে কচ্ছী (সিন্ধীভুক্ত) এবং পশ্চিমে ভিলী ইত্যাদি।

গুজরাটীর উপভাষা-বিভেদ খুব স্পষ্ট নয় এবং তা মোটামুটি ভৌগোলিক সীমানায় চিহ্নিত। তাই উপভাষাগুলিও বরোদা ও রাজকোট বিভাগ অনুযায়ী বিন্যস্ত। এই হিসাবে গুজরাটীর উপভাষা দুইটি—(ক) সৌরাষ্ট্র উপভাষা (হলই/হলদি সমেত) ঃ প্রকৃতপক্ষে রাজকোট (সৌরাষ্ট্রের পূর্বতন রাজধানী)-কেন্দ্রিক

গুজরাট উপদ্বীপের উপভাষা এবং (খ) মূল ভাষাঞ্চল অর্থাৎ বরোদা বিভাগের প্রধান ভূমি। এই ভাষাঞ্চলকে তিনটি বিভাগে ভাগ করা যায়—(১) উত্তরদেশীয়ঃ বানস নদী থেকে সবরমতী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল। (২) মধ্যদেশীয়ঃ সবরমতী ও নর্মদার মধ্যবর্তী অঞ্চল এবং (৩) দক্ষিণদেশীয়ঃ নর্মদা থেকে তাপ্তী নদীর দক্ষিণ ভূভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল। আদর্শ সাহিত্যিক গুজরাটী বোম্বাইয়ের পারসী এবং আমেদাবাদের হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত। তবে সাধারণ গুজরাটীর (আমেদাবাদ) তুলনায় পারসীদের গুজরাটীতে (বোম্বাই) আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার কিছু বেশি। ধ্বনিতত্ত্বগত পার্থক্যও যথেষ্ট (যেমন, পারসীদের উচ্চারণে মূর্ধন্য ও দন্ত্য ধ্বনি দন্তমূলীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়)। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ জরথুষ্ট্রধর্মীয় পারসীকরা আরব ও অন্যান্য মুসলিমদের আক্রমণে ইরান থেকে ১২শ শতকে উদ্বাস্তুরূপে ভারতে প্রবেশ করেছিল।

যাই হোক, গুজরাটীর কথ্য ভাষার বিভেদও সহজদ্রষ্টব্য, যেমন, বোম্বাইয়ের মিশ্রিত বা সংকর বিভাষা, আমেদাবাদ, সুরাট, কাথিয়াবাড়ে প্রচলিত বিভিন্ন কথ্য উপভাষা। এছাড়া সামাজিক, বৃত্তিমূলক বা বর্ণগত পার্থক্যের ফলেও নানা উপভাষা উদ্ভূত হয়েছে। দক্ষিণ ও মধ্যদেশীয় গুর্জরাটের বহু অনুন্নত অনগ্রসর উপজাতি, সৌরাষ্ট্রের মের সম্প্রদায়, পারসী, খোজা প্রভৃতিদের মধ্যে প্রচলিত বিভাষারও পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। তাছাড়া বিশেষ ধরণের শব্দসম্পদের পার্থক্যও লক্ষণীয়। আরও দ্র. পৃ. ৫৮।

গুজরাটী প্রথমে নাগরী লিপিতেই লেখা হতো কিন্তু এখন কইথী ও নাগরীর সংমিশ্রণে উদ্ভূত গুজরাটীর নতুন লিপি ব্যবহৃত হচ্ছে।

৮.১.২ ঐতিহাসিক পটভূমি

গুজরাটের সাংস্কৃতিক ইতিহাস খুবই প্রাচীন। স্বতন্ত্র গুজরাট রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাম্প্রতিক কালে, কিন্তু এই অঞ্চলের ইতিহাস শুরু হয়েছে সিন্ধু সভ্যতার উষালগ্নে। তারপর সেই প্রাচীনকাল থেকেই গুজরাটে বৈদেশিক অনুপ্রবেশ অব্যাহত থেকেছে। মহাভারতে উল্লিখিত দ্বারকায় যাদবদের অনুপ্রবেশ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এর পরে ক্রমে ক্রমে গ্রীক, মৌর্য এবং শকদেরও আক্রমণ ও অধিকার ঘটতে থাকে খ্রীষ্টীয় শতক শুরু হওয়ার কিছু পূর্বে ও পরে। অবশ্য গুজরাটে মৌর্য নৃপতিরাই প্রথম ঐতিহাসিক অধিকারের সূত্রপাত করেন। ঐতিহাসিক পর্বেই গুর্জর উপজাতিরা

পাঞ্জাব, রাজপুতানা ও মালব দেশ অতিক্রম ক'রে গুজরাটে প্রবেশ করেছে। সাধারণত গুর্জরদের ভারতে-আগন্তুক মধ্য এশিয়ার একটি উপজাতি ব'লে মনে করা হয়। এরা সম্ভবত হূনদের পিছন পিছন ভারতে এসে উপস্থিত হয়। অপর মতে, গুর্জররা রাজপুতানার একটি অখ্যাত জাতিবিশেষ। সর্বপ্রথম রাজা হরিচন্দ্র আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে যোধপুরে গুর্জর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র প্রথম দদ্দ সর্বপ্রথম গুজরাটে রাজ্যস্থাপন করেন। এই গুর্জরদের নাম থেকেই গুজরাট (<গুর্জররাষ্ট্র) অথবা গুজরাত (<গুর্জরত্রা) নামকরণের উদ্ভব। এই দেশের প্রাচীন নাম ছিল 'লাট', ভাষার নাম ছিল 'লাটী' (দণ্ডী : কাব্যাদর্শ ১.৩৫)। গুর্জর-উপজাতি ছাড়াও আরব, পারসীক, তুর্ক (১২৯৯ খ্রী.), এমনকি পর্তুগীজ (দমন, দিউ) গুজরাট অঞ্চলে ক্রমে উপনিবিষ্ট হলো। সুতরাং, এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায়, গুজরাটী ভাষা একধারে দণ্ডী-উল্লিখিত লাটী প্রাকৃত, শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং অন্যান্য অনুপ্রবেশকারীদের ভাষার বিচ্ছিন্ন উপাদানের সমবায়ে প্রভাবিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে গুজরাট অঞ্চল প্রাচীন হলেও ভাষা হিসেবে গুজরাটী কিন্তু তুলনামূলক ভাবে নবীন। প্রকৃতপক্ষে আনুমানিক ষোড়শ শতকে গুজরাটী স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে গুজরাটী প্রাচীন ভারতীয় আর্য তথা সংস্কৃত, অশোক-প্রাকৃত (গিরনার লেখ স্মরণীয়), শৌরসেনী প্রাকৃত, শৌরসেনী বা নাগর অপভ্রংশ স্তর পেরিয়ে ক্রমবিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, এই সমগ্র ভাষাস্তরের ধারাবাহিক রচনা-নিদর্শনই এই অঞ্চলে মেলে—যা অন্যত্র দুর্লভ বললেই চলে।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য (OIA) স্তরেই ভারতীয় ভাষাগুলি প্রধানত তিনটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, যথা—উত্তর বা উত্তর-পশ্চিমা, মধ্যা এবং পূর্বী (অশোকলেখেই এর সাক্ষ্য মেলে)। পরে মধ্য ও দক্ষিণ ভাষাঞ্চলের মধ্যে বিভেদ দেখা গেল। এই দক্ষিণদেশীয় ভাষা থেকেই মারাঠী, কোঙ্কণী এবং সম্ভবত সিংহলী উদ্ভূত হয়েছে। দক্ষিণদেশস্থ ভাষাগুলি বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে এই মধ্যদেশীয় ভাষাগুলির মধ্যে আবার ভাষাতাত্ত্বিক বিচ্ছিন্নতা ঘটলো—এর ফলে গুজরাটী-রাজস্থানী -ভিলী ভাষাঞ্চল সৃষ্ট হলো। আরও পরে গুজরাটী, মারোয়াড়ী, মেবাটী, জয়পুরী, ভিলী বা অন্যান্য উপভাষা ধীরে ধীরে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করলো। গুজরাটীর স্বাতন্ত্র্য দেখা গেছে সম্ভবত ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে—যদিও মারোয়াড়ী ও গুজরাটীর ভাষাঞ্চল-সীমানা তখনও পর্যন্ত সুচিহ্নিত নয়। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে তাই প্রাচীন গুজরাটী ও প্রাচীন মরোয়াড়ীর (রাজস্থানী) সম্পর্ক নিবিড়। প্রকৃতপক্ষে ১৬শ শতকের আগে লভ্য গুজরাটীর

পূর্বতন রূপকে বলা যায় গুজরাটী-মারোয়াড়ী; মীরাবাঈয়ের ভজনগীতিগুলিও তাই মারোয়াড়ী ও গুজরাটীর সাধারণ সম্পত্তি। ইতালীয় পণ্ডিত **L. P. Tessitori** তাই এই প্রাচীন স্তরের গুজরাটী-মারোয়াড়ী ভাষার নামকরণ করেছেন **'Old Western Rājasthānī'** (সংক্ষেপে **OWR**) এবং অবশিষ্ট ভাষা/উপভাষাগুলির প্রাচীন রূপ **'Old Eastern Rājasthānī'** বা **'Old Western Hindī'** নামে চিহ্নিত হয়েছে।[১] অবশ্য এই সময়-সীমায় গুজরাটী-মারোয়াড়ী স্বাতন্ত্র্যলাভ করতে থাকলেও, গুজরাট ও পশ্চিম রাজস্থানের লেখকরা শৌরসেনী বা নাগর অপভ্রংশ মাধ্যমে সাহিত্য সৃষ্টিতে কখনই বিরত থাকেন নি। এইজাতীয় সাহিত্য 'পিঙ্গল' সাহিত্য নামে পরিচিত, অপর পক্ষে প্রাচীন রাজস্থানী-মারোয়াড়ী রচনাগুলি 'ডিঙ্গল' সাহিত্য নামে অভিহিত। যাই হোক, পরবর্তী যুগে প্রধানত ব্রজভাষা ও হিন্দুস্থানীর (হিন্দী ও উর্দু) প্রভাবে মারোয়াড়ী পশ্চিমা হিন্দীর দিকে ঝুঁকেছে আর সেই সঙ্গে ১৬শ শতকে গুজরাটী পৃথক ও স্বতন্ত্র ভাষিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৮.১.৩ প্রাচীন সাহিত্য

গুজরাট-রাজস্থান অঞ্চলে রচিত সাহিত্যসম্ভার ভারতের পরম সম্পদ।[২] বহু শতক ধ'রে দীর্ঘকাল এই অঞ্চলে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য ও ধারাবাহিক ইতিহাস রক্ষিত হয়েছে, রচনাকারদেরও অনেকে সর্বভারতীয় মর্যাদা লাভ করেছেন। নব্য স্তরে গুজরাটী উদ্ভবের পরেও সেই ধারা এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। গুজরাটী সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা যায়, যথা—(১) প্রাচীন পর্ব (—১৪৫০ খ্রী.); (২) মধ্য পর্ব (খ্রী. ১৪৫০-১৮০০) এবং (৩) আধুনিক পর্ব (খ্রী, ১৮০০—)।

প্রাচীন গুজরাটীর সাহিত্যিক ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে জৈন কবি ও প্রাকৃত বৈয়াকরণ হেমচন্দ্রের (১০৮৯-১১৭৩ খ্রী.অ.) রচনা দিয়েই শুরু। হেমচন্দ্রের সমকালীন ভাষা ছিল অবশ্য অপভ্রংশ—যা হিন্দী (ব্রজভাষা ও খড়ীবোলী) এবং মারোয়াড়ী

১ IA. 43 p. 21

২ G. A. Grierson : LSI, Vol. IX, Part II, pp. 340-43 ; L. P. Tessitori : Some Notes on the Grammar of Old Western Rajasthani, IA, Vol. XLIII, 1914 ; Turner : Gujrati Phonology, JRAS, July, 1921 ; T. N. Dave : A Study of the Gujrati Language in the 16th Century, London, 1935 ; N. B. Divatia : Gujrati Language and Literature.

(রাজস্থানী) -গুজরাটীর জননী। হেমচন্দ্র নিজেও ছিলেন গুজরাটের অধিবাসী, তাই তাঁর সংকলিত অপভ্রংশ-শ্লোকসংগ্রহে প্রাচীন মারোয়াড়ী-গুজরাটীর নিদর্শন আবিষ্কার করা মোটেই দুঃসাধ্য নয়। হেমচন্দ্রের উত্তরকালীন অন্যান্য জৈন লেখকরা কিন্তু প্রধানত গুজরাটীতেই সাহিত্য সৃষ্টি করতে থাকেন। তাঁদের রচনাগুলি কেবল ছন্দোবদ্ধ কাব্যিক সৃষ্টি অথবা গদ্যাশ্রিত আখ্যানকাহিনী নয়, নিবন্ধমূলক পারিভাষিক রচনাও বটে (যেমন, ব্যাকরণ, দর্শন ইত্যাদি)। যাই হোক, ১২শ শতকেই গুজরাটী ভাষা তথা সাহিত্য সুস্পষ্ট আকার পেতে থাকে, ফলে সাহিত্যে বিভিন্ন রীতি অবলম্বনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। এই সময়ের রচনাগুলি প্রধানত লোকধর্মী এবং মূলত কাব্যিক, যেমন—(১) রাস : বর্ণনামূলক বা আবেগধর্মী দীর্ঘ কবিতা বা বীরগাথা। (২) কথা : গদ্য ও পদ্যে রচিত প্রেম বা বীরত্বব্যঞ্জক আখ্যান। (৩) ফাগু : প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক গীতি। (৪) বারমাসী, এবং (৫) রাসক : নারীজাতির আনুষ্ঠানিক গীতি, যা পরে 'গরবা' নামে পরিচিত। এছাড়া গুজরাট-মারোয়াড়-মালব অঞ্চলে একজাতীয় লোকধর্মী গদ্য-আখ্যান রচিত হতে থাকে। এগুলি ১৩৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তরুণপ্রভ নামে জনৈক জৈন সাধু 'বাল.বোধ' নামক গ্রন্থে সংকলন করেন। ১৪শ শতকের শেষার্ধে আরও দু'জন জৈন লেখক—সোমসুন্দর সূরি (খ্রী. ১৩৯৯) এবং জিনসাগর মুনি—নেমিচন্দ্র ভাণ্ডারীর জৈনধর্ম সংক্রান্ত মূল প্রাকৃত গাথা অবলম্বনে দু'খানি টীকাগ্রন্থ লিখেছিলেন প্রাচীন গুজরাটী গদ্যে। হিন্দু লেখকদের মধ্যে এক অজ্ঞাত কবির (গুণবন্ত ?) কবিতা 'বসন্তবিলাস' (খ্রী. ১৩৫০) উল্লেখযোগ্য, কারণ বাঙলার কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রভাব এতে স্পষ্ট। এছাড়া গুজরাটে উপনিবিষ্ট পারসী ধর্মাবলম্বী লেখকরাও ১৪শ শতক থেকে গুজরাটীতে লিখতে শুরু করেন। মোট কথা, জৈন, হিন্দু, পারসী—সবাই মিলে গদ্যে ও পদ্যে প্রাচীন গুজরাটীর অনুশীলন করেছিলেন—সে-ধারা ১৭শ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। নতুন প্রবণতা অবশ্য দেখা গিয়েছিল পদ্মনাভ-রচিত 'কাহ্নড-দে প্রবন্ধ' (১৪৫৬ খ্রী.) নামক একটি বীররসের ঐতিহাসিক আখ্যানে। গ্রন্থটি গুজরাটস্থিত ঝালোরের শেষ হিন্দু নরপতি কর্ণ (করণ সহেলো) এবং পাঠান আলাউদ্দীন খিলজীর গুজরাট আক্রমণ ও সংঘর্ষ অবলম্বনে লিখিত।

গুজরাটী সাহিত্যের মধ্য পর্বের (খ্রী. ১৪৫০-১৮০০) সূত্রপাত করলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নরসিংহ মেহ্‌তা (সন্ত নর্‌সী মেহ্‌তা, খ্রী. ১৪১৫-১৪৮১)। তদানীন্তন ভারতে ভক্তিরসের যে-প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল, নরসিংহ মেহ্‌তা হলেন গুজরাটে সেই ভক্তি-ধর্মের ভগীরথ। তিনি সম্ভবত মারাঠী সাধক-কবি জ্ঞানদেব, নামদেব (১৩শ-১৪শ শতক)

প্রভৃতি জ্ঞানবিধা ভক্তিমার্গীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'ঝুলন' ছন্দে রচিত তাঁর গীতিগুলি ভক্তিরসে সিঞ্চিত ('শৃঙ্গারমালা')। পরবর্তী যুগে গুজরাটের বল্লভাচার্য (খ্রী. ১৪৭৩-১৫৩১) ও তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব 'পুষ্টিমার্গী'রা নিশ্চয়ই মেহ্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

নরসিংহ মেহ্তার প্রায় সমসাময়িক ভক্ত-সাধিকা মীরাবাঈ (খ্রী. ১৪৯৮/১৫০৩-১৫৪৬) যে-গীতিকবিতা বা ভজনগুলি রচনা করেছিলেন, এক হিসেবে সেগুলি গুজরাটীর সম্পদ। তবে মূলত এগুলি মারোয়াড়ী-গুজরাটী ভাষায় রচিত হয়েছিল। পরে গুজরাটী ও হিন্দীতে সেগুলি অনূদিত হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। [এ-বিষয়ে আরও দ্র. পৃ. ১৫০-৫১]। ১৫শ শতকের আর একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব-কবি হলেন ভালণ (খ্রী. ১৪৩৪-১৫১৪)। ইনি ভাগবতপুরাণের ১০ম স্কন্ধের আখ্যানভাগ গীতিকাব্যে রূপান্তর করেছিলেন। ভাষা নিশ্চিতরূপেই গুজরাটী, কিন্তু স্থানে স্থানে ব্রজভাষার নিদর্শন মেলে, কারণ তিনি সমসাময়িক ব্রজভাবার কবি সুরদাসের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত। এই গ্রন্থটির শেষে পৌরাণিক কিছু আখ্যান গদ্যরচনা হিসেবে সংযোজিত হয়েছে। তিনি বাণভট্টের 'কাদম্বরী'ও অনুবাদ করেছিলেন বিশ্বস্তভাবে।

১৭শ-১৮শ শতকের সময়সীমার অন্যান্য বিখ্যাত কবিদের মধ্যে অক্ষয়দাস বা আখো ছিলেন জাতিতে স্বর্ণকার (খ্রী. ১৫৯১-১৬৫৬)। তিনি ব্যঙ্গাত্মক ও নীতিধর্মী কাব্য ও বেদান্তদর্শন সম্পর্কীয় রচনায় পারঙ্গম ছিলেন। প্রেমানন্দ ভট্ট (খ্রী. ১৬৩৬-১৭৩৪) প্রধানত পৌরাণিক আখ্যানকাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ৪০টি। শ্যামল বা সামল ভট্ট (খ্রী. ১৬৯৯-১৭৬৯) পৌরাণিক কাহিনী, রোমান্টিক আখ্যান এবং গার্হস্থ্যবিষয়ক গীতিকবিতা রচনা করেছিলেন। এই পর্বের শেষে বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের দয়ারাম বা দয়াশঙ্কর (খ্রী. ১৭৬৭-১৮৫২) সম্ভবত মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ গুজরাটী কবি।

বর্তমানে গুজরাটী সাহিত্য মারাঠী বা বাঙলার মতো সমৃদ্ধ না হলেও তার গুরুত্ব যথেষ্ট বেড়েছে। তার কারণ বোধ হয়, গুজরাটী ধনী বণিক সম্প্রদায় প্রায় সমগ্র ভারতে, এমনকি আফ্রিকা ও মরিশাসেও এই ভাষা বহন ক'রে নিয়ে গেছেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গুজরাটী সাহিত্য পূর্ব থেকেই যথেষ্ট পুষ্ট, ধারাবাহিকতায় সঞ্জীবিত, বর্তমানে ধনীসম্প্রদায়ের উদ্যোগে তার প্রচার আরও জোরদার হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর মাতৃভাষা গুজরাটী হওয়াতেও গুজরাটী আরও সমৃদ্ধ ও প্রচারিত হতে পেরেছে।

৮.১.৪. ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

গুজরাটীর ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণগুলি সংক্ষেপে এই—

গুজরাটী ধ্বনিতত্ত্বের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই ভাষায় স্বরের হ্রস্ব ও দীর্ঘ ভেদ অর্থান্তর ঘটায় না। 'এ' এবং 'এ্যা' [ɛ], 'শ' ও 'স', 'ব' ও 'ৱ' ধ্বনির পার্থক্য আছে। 'অ' ধ্বনি বাঙলাসুলভ অর্থাৎ [ɔ]। 'ড' ও 'ড়' ধ্বনির পার্থক্য বাঙলার মতো (অর্থাৎ স্বরান্ত/স্বরমধ্য ড>ড়)। এছাড়া ওড়িয়াসুলভ ল. [ḷ] এবং ণ [ṇ] ধ্বনিদ্বয়ের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বজায় আছে।

রূপতত্ত্বের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য হলো : মারাঠীর মতো এখানে তিনটি লিঙ্গ—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ (তু. ঘোড়া : ঘোড়ী ঃ ঘোড়ুঁ "ঘোড়া জাতি")। তাই বিশেষণ, সম্বন্ধ-বিশেষণ ও কৃদন্ত ক্রিয়া লিঙ্গানুযায়ী পরিবর্তিত হয়, যথা—পাকী কেরে "পাকা আম" (স্ত্রী), মেঁ দূধ লীধুঁ "আমি দুধ পান করেছিলাম" কিন্তু মেঁ চা লীধী ইত্যাদি।

গুজরাটীতে বচন দুটি : একবচন ও বহুবচন। লিঙ্গভেদে একবচনের সাধারণ বিভক্তি -ও(পুং), -উঁ(ক্লী) বহুবচনে হয় -আ(ও) এবং -আঁ (ছোকরো : ছোকরা/ছোকরাও "বালকরা"; ঘেটুঁ "ভেড়া" ঃ ঘেটাঁ/ঘেটাঁও)। বিভিন্ন কারকের বিভক্তি বা অনুসর্গ-বিভক্তি এইগুলি : -নেঁ (২য়া), -এ (৩য়া), -থী (৫মী), -নেঁা, -নী, -নুঁ (সম্বন্ধ-বিশেষণ), -মাঁ (৭মী)। তির্যক কারকে সাধারণত শব্দমূল (Stem) পরিবর্তিত হয় না, কিন্তু ৩য়া-৭মীতে ক্বচিৎ -এ যোগে তির্যকমূল গঠিত হয়, যথা—দেৱ থী/দেৱে থী।

সর্বনাম মূল : উ পু ১ব—হুঁ : মজ-; বহুব—অমে : অম-, অমো- (কর্তৃকারক : তির্যক কারক)। ম পু ১ব—তূঁ : তুজ-; বহুব—তমে : তম-, তমো- (কর্তৃ : তির্যক)।

-য়ো, -ঈ, -য়ুঁ এবং ল প্রত্যয় যোগে কৃদন্ত বিশেষণ ও কৃদন্ত অতীতকাল গঠিত হয় (তু. ছোড্যো/ছোড়ী/ছোড়ুঁয/ছোড়েলো)। -ত্ যোগে সাপেক্ষ অতীতকাল (করত "যদি করিত") এবং -তো, তী, -তুঁ যোগে শত্রর্থমূল এবং ভাববচন গঠিত হয় (মারে আৱতাঁ "আমার আসিবার সময়", করতাঁ শিখৱেছে "সে করিতে শিখাইতেছে")। সং -তব্য প্রত্যয়জাত -ব প্রত্যয়ের সাহায্যে ভবিষ্যৎ বিশেষণ (Future Participle) গঠিত হয় কিন্তু ভবিষ্যৎ কালে সংস্কৃত প্রাত্যয়িক বিভক্তি (-স-<-ইষ্য-) বজায় আছে [তু. মারে/মেঁ ছোড়ৱো "আমার ছেড়ে দেওয়া উচিত"<ময়া ছর্দিতব্যম্; তুঁ করশে (<করিষ্যসি), হুঁ করীস্ (<করিষ্যামি)]। -ই, -ইনে (<বৈদিক -ত্বীন) যোগে সম্পন্ন অসমাপিকা (বোলী, বোলীনে "বলিয়া")। আছ্ ধাতু যোগে যৌগিক কাল গঠন : হুঁ লখ্যুঁ ছুঁ "আমি লিখিতেছি"; মেঁ কাগল. লখ্যো/লখেলো ছে "আমি চিঠি লিখিয়াছি"।

৮.২ পাঞ্জাবী

৮.২.১ ভাষিক পরিস্থিতি

পাঞ্জাবী সাধারণভাবে পাঞ্জাব রাজ্যের ভাষা। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে এই রাজ্য ছিল অবিভক্ত এক ভৌগোলিক অঞ্চল। বর্তমানে 'পাঞ্জাব' বলতে ভারতভুক্ত খণ্ড পাঞ্জাব রাজ্যই বুঝতে হবে। স্বাধীনতা-উত্তর যুগেও এই অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় ও ভাষাগত বিরোধ আরও নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তাই ভাষা আলোচনার পূর্বে তার ভৌগোলিক তথা ঐতিহাসিক পটভূমি রচিত হওয়া দরকার।

পূর্বতন পাঞ্জাবের ছিল দুটি ভাষাঞ্চল, যথা—পশ্চিম পাঞ্জাব, ভাষা পশ্চিমা পাঞ্জাবী বা হিন্দ্‌কী/লহ্‌ন্দা ('লহ্‌ন্দা' শব্দের অর্থ সূর্যাস্তের দিক অর্থাৎ পশ্চিম) এবং পূর্ব পাঞ্জাব, ভাষা পাঞ্জাবী এবং হিন্দু-উর্দু। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে পশ্চিমা ও পূর্বী পাঞ্জাবীর সাধর্ম্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন স্তর (OIA) থেকেই লক্ষ্য করা যায়। কারণ, এই ভাষাঞ্চল, এমনকি মহারাজ অশোকের সময়েই উত্তর-পশ্চিমার অন্তর্গত ছিল (এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম 'কেকয়')। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা (MIA) স্তরে এই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের প্রাকৃতকে বলা হতো পৈশাচী প্রাকৃত, বর্তমানে তার নাম দেওয়া হয়েছে 'গান্ধারী প্রাকৃত' (**H. W. Bailey**-র নামকরণ)। প্রাকৃত বৈয়াকরণরা আবার তৃতীয় স্তরের উত্তর-পশ্চিমা অপভ্রংশের নামকরণ করেছেন 'কেকয় অপভ্রংশ'। বর্তমানে এই প্রাকৃত-অপভ্রংশ উদ্ভূত ভাষাগুলি হলো পাঞ্জাবী, লহ্‌ন্দা, সিন্ধী ও কচ্ছী।

ঐতিহাসিক বিচারে লহ্‌ন্দা ও পাঞ্জাবীর সাধর্ম্য স্বাভাবিক। তাই উভয় ভাষাই অন্যান্য নবীন আর্যভাষাগুলির তুলনায়, বিশেষত ধ্বনিতত্ত্বে সংরক্ষণশীল। এছাড়া বেশ কয়েকটি ভাষিক লক্ষণ উভয় ভাষাতেই মেলে, যেমন—প্রাকৃতসুলভ যুগ্ম ব্যঞ্জনের সংরক্ষণ (চম্ম্, হথ্ <সং চর্ম-, হস্ত ইত্যাদি), 'হ' ধ্বনি ও মহাপ্রাণিত সঘোষ ধ্বনির (ঘ, ভ, ধ) অঘোষ নিরুদ্ধ উচ্চারণ (**Recursive**), প্রাত্যয়িক (**Inflectional**) প্রাচীন ভবিষ্যতের বিভক্তি সংরক্ষণ, সম্বন্ধ-বিশেষণ -দা, -দে, -দী প্রত্যয়ের ব্যবহার ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে পূর্বী পাঞ্জাবী ভাষাঞ্চল মধ্যদেশীয় ভাষার প্রভাবে ক্রমশই তার সহোদর-ভাষা থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছে। পূর্ব পাঞ্জাব অঞ্চল অবশ্য দীর্ঘদিন যাবৎ এই প্রভাব অস্বীকার করতে পারে নি। তাই প্রথম যুগে সংস্কৃত, দ্বিতীয় যুগে শৌরসেনী প্রাকৃত এবং তৃতীয় যুগে অপভ্রংশ (আ. ১৪শ শতক), এমনকি আধুনিক যুগে পশ্চিমা হিন্দুস্থানীর (খড়ীবোলী, ব্রজ, হিন্দী-উর্দু) প্রভাবে তা মধ্যদেশীয় ভাষাঞ্চলের অন্তর্গত হয়ে পড়েছে। গ্রীয়ার্সন তাই পূর্বী পাঞ্জাবীকে মধ্যদেশীয় বিভাগের

'অন্তরঙ্গ' শাখার অন্তর্ভুক্ত করেছেন, আর লহ্‌ন্দা হয়েছে উত্তরদেশীয় বিভাগের 'বহিরঙ্গ' শাখাভুক্ত।

স্মরণ রাখা দরকার, পাঞ্জাব বিশেষভাবে পশ্চিম পাঞ্জাব, বহুদিন যাবৎ বিদেশী বহিরাক্রমণের বিশাল দ্বার (Gateway) রূপে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। খ্রীষ্টীয় ১০ম শতক থেকে এই অঞ্চল দিয়ে একাদিক্রমে মুসলিমধর্মী তুর্ক, পারসীক, আফগান, মোগল, পাঠান প্রভৃতি জাতি ভারতের অভ্যন্তরে হানা দিয়েছে। প্রথম দিকে তুর্ক গজনবী রাজ্যভুক্ত হওয়ায় পাঞ্জাব প্রদেশ তুর্কী মুসলমানদের ভারতীয় ঘাঁটি হয়ে দাঁড়ায় (আ. ১২শ শতক)। [এর পূর্বে অবশ্য প্রথম মুসলমান-বিজিত ভারতীয় প্রদেশ ছিল সিন্ধু-প্রদেশ (৮ম শতক), পরে তারা বিতাড়িত হয়]। এই নিরত বহিরাক্রমণ ও বিদেশী অধিকারের নিরন্তর পালাবদলের ফলে ভাষাতাত্ত্বিক তাৎপর্যও সুদূরপ্রসারী হয়েছে, যেমন—প্রথমত, নিরবচ্ছিন্ন বহিরাক্রমণ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে পাঞ্জাব দেশের মাতৃভাষাগুলি সাহিত্যিক উন্নয়ন ও ভাষাচর্চার সুযোগ পায়নি, ভাষা কোনো-না-কোনো ভাবে পরতন্ত্র রয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, এই ভাষাগুলির মধ্যে আরবী-ফারসীর সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার ঐতিহ্য ক্রমশই ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়েছে, অথচ এই অঞ্চলেই আটক জেলার প্রাচীন সালাতুর-এ (>হলাউর>লাহোর) পাণিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন (আ. খ্রী. পূ. ৫ম শতক)। তৃতীয়ত, দিল্লী ও পূর্ব পাঞ্জাব রাজশক্তির কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমানদের ভাষায় (হিন্দুস্থানী) পাঞ্জাবী প্রভাব দেখা গেছে, কারণ দিল্লীতে তুর্কী বিজেতৃগণ যে-ভারতীয় কথ্য ভাষার সংস্পর্শে এলেন, তা কতকগুলি বিষয়ে পাঞ্জাবের কথ্য ভাষার সঙ্গে বিশেষ সমতা রক্ষা করতো (ফলে মথুরা অঞ্চলের ব্রজভাষা ও রাজস্থানীর সাহিত্য-ধারা মূল কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্রভাবে বর্ধিত হতে লাগলো)। অপর পক্ষে, পাঞ্জাব অঞ্চলের অধিবাসীরা দৈনন্দিন জীবনে পাঞ্জাবী ব্যবহার করলেও মাতৃভাষাকে নগণ্য গ্রাম্য উপভাষাবোধে দিল্লীর 'পা-ই-তথ্‌ত্‌' বা খড়ীবোলী-হিন্দুস্থানীকেই তাদের আদর্শ ভাষা হিসেবে বরণ করলেন।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে পাঞ্জাবের ইতিহাস ও ভাষাতাত্ত্বিক পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠলো। ইং ১৯৪৭ সালে ভারত-বিভাগের ফলে পূর্বতন পাঞ্জাব বিভক্ত হলো হিন্দু-মুসলিম ধর্ম-বিভেদকে স্বীকার ক'রে নিয়ে। পশ্চিম পাঞ্জাব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলো। সেখানে রাষ্ট্রভাষা উর্দুর দাপটে পশ্চিমা পাঞ্জাবী অর্থাৎ লহ্‌ন্দা বা হিন্দ্‌কী, উপভাষা স্তরের উর্ধ্বে উঠতে পারলো না, উর্দু সেখানকার লেখ্য ও কথ্য ভাষা হওয়ায় পাঞ্জাবীর সাহিত্যিক চেহারা স্পষ্ট হলো না—যদিও পাঞ্জাবীর চর্চা সেখানে

একেবারে রুদ্ধ হয় নি (অবশ্য লিপি ফারসী)। এদিকে ভারতভুক্ত পাঞ্জাব প্রদেশের রাজনৈতিক বা ভাষাতাত্ত্বিক অবস্থাও অপরিবর্তনীয় রইলো না। ইং ১৯৫৬ সনে 'পেপসু' রাজ্য পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত হলো। কিন্তু ১৯৬৬ সালে পাঞ্জাব আবার বিভক্ত হলো, নতুন রাজ্য হলো হরিয়ানা (রাজধানী দিল্লী, বর্তমানে চণ্ডীগড়) ও পাঞ্জাব (রাজধানী চণ্ডীগড়)। পূর্বে ধর্মীয় বিভেদের ফলশ্রুতিস্বরূপ ঘটেছে রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগ ; আর এবার ধর্মীয় বিভেদ ভাষা ও লিপির ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয়েছে, ঘটেছে ভৌগোলিক বিভাগ ; শিখধর্ম ও গুরুমুখী লিপি, হিন্দুধর্ম ও নাগরী লিপি এবং মুসলিম ধর্ম ও আরবী-ফারসী লিপির কৃত্রিম বিভেদের ওপর ভিত্তি ক'রে যথাক্রমে পাঞ্জাবী, হিন্দী ও উর্দু ভাষার সীমানা জোর ক'রে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলেছে।

এই রাজনৈতিক তথা ভাষাতাত্ত্বিক ঘটনাবর্তের পূর্ব ইতিহাস এই : ভারত-বিভাগের (ইং ১৯৪৭) পূর্বে পাঞ্জাব রাজ্যের অধিকাংশ লোকের কথ্য ভাষা ছিল পাঞ্জাবী, কিন্তু হিন্দু ও মুসলিম নির্বিশেষে তাঁরা উর্দুকেই সাহিত্য ও শিক্ষার মাধ্যম ব'লে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁদের ব্যবহৃত লিপিও ছিল ফারসী। কেবল শিখরা তাঁদের মাতৃভাষা পাঞ্জাবীর চর্চা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন কথ্য বা সাহিত্যিক আদর্শরূপে। তাঁদের লিপিও ছিল পৃথক (গুরুমুখী)। অপরদিকে পশ্চিমা হিন্দীর বিভিন্ন উপভাষীরা মাতৃভাষা হিসেবে যে-উপভাষাই ব্যবহার করুন না কেন, উর্দুকে (লিপি নাগরী বা ফারসী) সাহিত্যিক আদর্শরূপে মেনে নিয়েছিলেন।

কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলো। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সমস্ত হিন্দু ও শিখরা পূর্ব পাঞ্জাবে এবং পাঞ্জাবী মুসলমানদের অধিকাংশ পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেলেন। মুসলিমরা পাকিস্তানে চলে গেলেও পূর্ব পাঞ্জাবের হিন্দু ও সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিমদের সাহিত্যিক আদর্শ ভাষা উর্দুই রয়ে গেলো—যদিও ভারতভুক্ত পাঞ্জাবের পশ্চিমাঞ্চলে মুখ্যত পাঞ্জাবী এবং পূর্বাঞ্চলে হিন্দী ব্যবহৃত হতে লাগলো অন্তত বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে। পরে পূর্ব পাঞ্জাবে হিন্দীকে দ্বিতীয় ভাষারূপে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়ায় অনেক হিন্দুই গররাজী হলেন না, কারণ হিন্দু পাঞ্জাবীরা শিখধর্ম ও গুরুমুখী লিপি-সংশ্লিষ্ট পাঞ্জাবী ভাষাকে বরণ করার চেয়ে হিন্দীকেই বরণ করা শ্রেয় মনে করলেন—যদিও এই শিক্ষিত হিন্দুদের অনেকেই শিখ ও মুসলিমধর্ম সংশ্লিষ্ট পাঞ্জাবী ও উর্দুর সাহায্য ছাড়া বিশুদ্ধ হিন্দী কোনক্রমেই লিখতে পারতেন না। এর উপর আবার আর্য সমাজ ও অকালি দল ক্রমাগতই ধর্মীয় বাড়াবাড়ি শুরু করলেন। ফলে ধর্মীয় বিভেদের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাগত সংঘর্ষ ও রাজনৈতিক বিচ্ছেদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, ভাষাভাষীরা ধর্ম সম্পর্কে ক্রমশই স্পর্শকাতর হয়ে উঠলেন, ধর্মের সঙ্গে ভাষা, এমনকি

লিপিও জড়িয়ে পড়লো। যাই হোক, ইং ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কালে কেবল শিখরা নয়, পাঞ্জাবীভাষী হিন্দুদেরও এক অংশ এই রাজ্যের বিভাগ অনুমোদন করলেন। যদিও অধিকাংশ হিন্দু পাঞ্জাবী সুবা চাইলেন না, কারণ তাঁরা মনে করলেন, এতে শিখধর্মী ও অকালি দলভুক্ত লোকেরা রাজ্যে অতিরিক্ত প্রাধান্য পাবেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও পাঞ্জাব ও হরিয়ানা পৃথকীকরণ (ইং ১৯৬৬) অনিবার্য হয়ে দাঁড়ালো। আর উর্দু এই উভয় রাজ্যেই দ্বিতীয় প্রধান ভাষা হিসেবে হিন্দীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে রইলো।

এইভাবে হিন্দীভাষী ও পাঞ্জাবীভাষীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে যথাক্রমে হরিয়ানা (দক্ষিণ ও পূর্ব পাঞ্জাব) ও পাঞ্জাব রাজ্য ভারতীয় সংবিধানে স্বীকার ক'রে নেওয়া হলো। আর পাঞ্জাবের অন্তর্গত হলো পূর্বতন পাঞ্জাব রাজ্যের এই এগারটি জেলা—গুরুদাসপুর, অমৃতসর, কপুরথালা, ভাতিণ্ডা, জলন্ধর, হোসিয়ারপুর, ফিরোজপুর, লুধিয়ানা, পাতিয়ালা, রূপার ও সাঙ্গ্রুর। আর হরিয়ানার অন্তর্ভুক্ত হলো এই পাঁচটি জেলা : কর্ণাল, রোটক, গুড়গাঁও, হিসার, মহিন্দ্রগড়।

সুতরাং বর্তমানে পাঞ্জাবের ভৌগোলিক সীমানা দাঁড়িয়েছে এই : পশ্চিমে পাকিস্তান, উত্তরে জম্মু ও কাশ্মীর, দক্ষিণে রাজস্থান ও হরিয়ানা এবং পূর্বে যমুনা নদী ও হিমাচল প্রদেশ। এই অনুযায়ী পাঞ্জাবীর ভাষাঞ্চল রাজস্থানী (জয়পুরী), পশ্চিমা হিন্দুস্থানী (হরিয়ানী ইত্যাদি) ও লহ্ন্দা দ্বারা পরিবেষ্টিত।

বর্তমানে পাঞ্জাবী পাঞ্জাব রাজ্যের সরকারী ভাষা এবং তা ভারতীয় সংবিধানের ৮ম অনুসূচী স্বীকৃত। ইং ১৯৬১ সনের জনসমীক্ষা অনুযায়ী সর্বভারতীয় পাঞ্জাবী ভাষীদের সংখ্যা ১ কোটি ৯ লক্ষ ৫০ হাজার ৮২৬। কিন্তু অবিভক্ত পাঞ্জাবের পাঞ্জাবীভাষীদের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৭০ লক্ষ। সুতরাং লহ্ন্দাভাষীরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ। ভারত বিভাগের পর বহু হিন্দু ও শিখ লহ্ন্দাভাষী ভারতে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন কিন্তু তাদের পরিসংখ্যান বর্তমান সমীক্ষায় মেলে না। যাই হোক, ইং ১৯৭১-এর ভারতীয় ভাষা-সমীক্ষায় পাঞ্জাবী ভাষীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৩৯ লক্ষ ২০২। বর্তমানে পাঞ্জাব রাজ্যের সমগ্র জনসংখ্যার ৬১.২১ শতাংশ লোক পাঞ্জাবী ভাষা ব্যবহার করে থাকেন।

পূর্বেই বলেছি, পূর্ব পাঞ্জাবের ভাষাকে সাধারণভাবে পাঞ্জাবী আর পশ্চিমের ভাষাকে লহ্ন্দা বলা হয়। লহ্ন্দা ভাষাকে বর্তমানে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি উপভাষা বা উপভাষাগুচ্ছ বলা যায়, তার সাহিত্যিক রূপও এখনও স্পষ্ট নয়, সাহিত্যিক প্রয়াসও অকিঞ্চিৎকর। লহ্ন্দার উপভাষাগুলি হলো এই : মূলতানী, ডেরাওয়ালী, পোথ্-ওয়ারী, ছিবালী, তিনাওলী, উভেছী, থল্লী, খেত্রাণী ইত্যাদি। মধ্যযুগে অবশ্য লহ্ন্দা

মূলতানী রূপকে আশ্রয় করেই সাহিত্য-প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল, কিন্তু আধুনিক যুগে (অর্থাৎ ১৭শ শতক থেকে) অমৃতসর ও তার আশে-পাশে প্রচলিত উপভাষা 'মাঝি' আদর্শ উপভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্ব পাঞ্জাবীর অন্যান্য উপভাষা হলো—জলন্ধর দোয়াবী (লুধিয়ানী সমেত), পাহাড়ী, রাঠী, পোৱধী, মালবৈ, ভত্তিআণী ইত্যাদি। খ্রীস্টান মিশনারীরা দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের লুধিয়ানা-পাতিয়ালার মালবৈ উপভাষাকে আদর্শ উপভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন, ফলে মালবৈ ভাষার প্রভাব সর্বত্র প্রসারিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আদর্শ সাহিত্যিক ভাষারূপে 'মাঝি'ই অগ্রগণ্য হয়ে আছে। পাঞ্জাবীর আর একটি উপভাষা ডোগরী জম্মু-কাশ্মীরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে এবং কাংড়ার আশে পাশে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এই উপভাষা স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে (দ্র. পৃ. ৫৮)। এর লিপিরীতিও ভিন্ন, লিপির নাম টক্করী বা টাকরী। পাঞ্জাবী ভাষার প্রান্তিক অঞ্চলে হিন্দী, রাজস্থানী, লহ্ন্দা প্রভৃতি ভাষা অবস্থান করায় ভাষা-সংযোগ ঘটেছে বেশি, ফলে নানা ধরণের সংকর ভাষা/উপভাষার উদ্ভব হয়েছে।

প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপির উত্তর-পশ্চিম বিভেদ থেকে লণ্ডা লিপির উদ্ভব। (কাজেই তা নাগরীর সহোদরস্থানীয়)। রাজস্থানীর মহাজনী এবং কাশ্মীরীর শারদা লিপির সঙ্গে এর সাধর্ম্য আছে। এই লণ্ডা লিপি পাঞ্জাবী ও সিন্ধীর নিজস্ব লিপি। সিন্ধীর ক্ষেত্রে এই লিপি এখনও চলে (মুদ্রণে নয়, লেখায়)। পাঞ্জাবে কিন্তু ১৬শ শতক থেকে শিখ ধর্মগুরুদের উদ্যোগে গুরুমুখী লিপি প্রবর্তিত হয়। প্রাচীন লণ্ডা লিপির কিছু অপূর্ণতা ও জটিলতা থাকায় শিখগুরু অঙ্গদ (খ্রী. ১৫৩৮-৫২) এই লিপির সংস্কার সাধন করেন। এই লিপি প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরের শারদা লিপি থেকে উদ্ভূত কিন্তু নাগরী দ্বারা প্রভাবিত। শিখরাই কেবল লেখনে ও মুদ্রণে এই লিপি ব্যবহার করে থাকেন।

৮.২.২ প্রাচীন সাহিত্য

পাঞ্জাবী সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে দুটি কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমত, পাঞ্জাবী সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে পূর্বী পাঞ্জাবীরই প্রযত্নে গড়ে উঠেছে, কারণ, লহ্ন্দার সাহিত্যসম্পদ নগণ্য বললেই চলে। দ্বিতীয়ত, পাঞ্জাবী সাহিত্য তুলনামূলকভাবে অনেক পরবর্তীকালে আবির্ভূত হয় অর্থাৎ আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যপর্ব যখন শুরু, তখন পাঞ্জাবী সাহিত্যের সূত্রপাত। এর কারণ, পাঞ্জাবী সাহিত্যের প্রাচীন লেখকগণ প্রধানত উর্দু বা প্রাচীন হিন্দী ভাষা বা উপভাষাতেই তাঁদের সাহিত্য রচনা করতেন [যেমন প্রাচীন পাঞ্জাবী সূফী কবি বাবা ফরীউদ্দীন গঞ্জ্ শকর্ (খ্রী. ১১৭৩-১২৬৬) পাঞ্জাবীতে লেখেন নি। এঁর কিছু কবিতা (৪টি সূক্ত এবং ১১২টি শ্লোক)

'আদি গ্রন্থ'-এ (গুরু অর্জুন সংকলিত, ১৬০৪ খ্রী.) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই গ্রন্থ মিশ্রিত অপভ্রংশে লেখা]। প্রথম যুগের পাঞ্জাবী সাহিত্য তাই অকিঞ্চিৎকর। প্রথম যুগ বলতে অবশ্য বুঝতে হবে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী সময়। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য রচনা হলো পশ্চিমা হিন্দী বা লহ্ন্দা ভাষায় রচিত গুরু নানকের জীবনী 'জনমসাথী' (১৫৩৫ খ্রী.), রচনাকার গুরু নানকের জীবনসঙ্গী ও শিষ্য বালা। তবে সম্প্রতি আবিষ্কৃত 'একাদশী মহাতম্' নামে একটি গদ্য রচনা (শারদা লিপি ব্যবহৃত) সম্ভবত পাঞ্জাবীর প্রাচীনতম নিদর্শন (১৩/১৪শ শতক)।

পাঞ্জাবী সাহিত্যসৃষ্টির সর্বপ্রথম অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত করেন শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক (খ্রী. ১৪৬৯-১৫৩৮)—যদিও তাঁর নিজের রচনা পাঞ্জাবীতে রচিত নয়। কিছু কিছু পাঞ্জাবী বৈশিষ্ট্য, প্রাচীন উর্দু-হিন্দী (হিন্দী), ব্রজভাষা এবং দিল্লীর উপভাষার সমন্বয়ে গ'ড়ে উঠেছিল তাঁর রচনার গঠনরূপ (Structure)। পঞ্চম শিখগুরু অর্জুন ইং ১৬০৫ সালে গুরু নানক এবং তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের (এমনকি নিজেরও) এবং নানকের পূর্ববর্তী অন্যান্য সর্বভারতীয় ভক্তসাধকদের হিন্দী স্তবগীতি (যেমন, কবীর, রইদাস ইত্যাদি) সংকলন করেন [মোট ৩৩৮৪ সূক্ত (Hymn), ১৫,৫৭৫ স্তবক]। এই গ্রন্থই হলো 'আদিগ্রন্থ' বা গ্রন্থসাহিব। আদিগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিশিষ্ট কবিরা হলেন—বাবা ফরিদ, গুরু নানক, গুরু অঙ্গদ, গুরু অমরদাস, গুরু রামদাস, গুরু অর্জুন, সত্ত বলবন্দ্ এবং সুন্দর। দশম বা শেষ গুরু গোবিন্দ সিং (খ্রী. ১৬৬৬-১৭০৮) এবং সমসাময়িক কবিরাও হিন্দু পুরাণ অবলম্বনে কিছু কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন, কিন্তু এগুলি যথার্থ পাঞ্জাবী নয়, তা আসলে প্রাচীন হিন্দী। ব্যতিক্রম অবশ্য গুরু গোবিন্দ সিংএর 'চণ্ডী-দী-বার' (চণ্ডীস্তব), তা পাঞ্জাবীতেই রচিত। পরবর্তী রচনা সেবা সিং-এর 'দ্বিতীয় জনমসাথী' (খ্রী. ১৫৮৮), এবং মণি সিং-এর 'তৃতীয় জনমসাথী' (কবির মৃত্যুকাল ১৭৩৭ খ্রী.)—উভয় গ্রন্থই গুরু নানকের জীবনী এবং পাঞ্জাবীতেই রচিত।

১৬শ শতকে একজন কবির আকস্মিক আবির্ভাব দেখা যায়। ইনি হলেন আকবরের (খ্রী. ১৫৫৬-১৬০৫) সমকালীন প্রখ্যাত কবি ঝং-এর দামোদর। তিনি হীর এবং রঞ্ঝার লৌকিক প্রেম-কাহিনী অবলম্বন ক'রে ১০০০ স্তবকে একটি কাব্য রচনা করেন। ১৭শ শতকই প্রকৃতপক্ষে পাঞ্জাবীর সুবর্ণ যুগ। এই সময়ে মুসলিম, হিন্দু এবং শিখ ধর্মাবলম্বী লেখকরা পাঞ্জাবী রচনায় ব্রতী হলেন। এঁরা ফরাসী-আরবী, নাগরী বা গুরুমুখী—যে-কোনো লিপি ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন নি।

১৭শ শতকের পাঞ্জাবী সাহিত্য প্রধানত ধর্মমূলক কবিতা এবং লোককাহিনী।

ধর্মীয় সাহিত্যগুলিতে সুফী মতবাদ সুস্পষ্ট এবং লোককাহিনীগুলি প্রধানত লোকগাথামূলক আখ্যানকাব্য, যেমন হীর-রঞ্ঝা, সোহনী-মহিবল, শশী-পন্‌হো প্রভৃতির কাহিনী। বলা বাহুল্য, এ-সমস্তই ছিল হিন্দু-মুসলিম-শিখ নির্বিশেষে জনসাধারণের সাধারণ সম্পদ। আনুমানিক খ্রী. ১৬৫০ সালে লাহোরের কবি চন্দর-ভান বেশ কিছু সুফী-বিষয়ক কবিতা লিখেছিলেন। ১৭শ শতকের অন্যান্য প্রখ্যাত কবি ও রচনা হলো —আবদুল্লাহ্ রচিত (খ্রী. ১৬১৬-১৬৬৬) 'বার অহ্ব' (=১২টি বিষয়), একটি ইসলাম ধর্ম বিষয়ক রচনা; মুকবিলের (খ্রী. ১৬৯৬?) জং-নামা (কারবালা যুদ্ধ-কাহিনী), সুফী কবি বুল্‌হে শাহ্-এর (খ্রী. ১৬৮০-১৭৫৮) কাফি বা ক্ষুদ্র কবিতা, আলি হায়দর (খ্রী. ১৬৮৯-১৭৭৬)-রচিত 'সী-হরফী' (কবিতা) ইত্যাদি। যশোদা নন্দনের (খ্রী. ১৬৫০) রামায়ণ কাহিনী 'লব-কুস্‌দিআ পৌড়িআ' নামক ক্ষুদ্র কাব্যটিও পাঞ্জাবী লোকজীবনের সার্থক প্রতিচ্ছবি। এই প্রসঙ্গে পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ কবি ওয়ারিশ শাহ্-র (খ্রী. ১৭৬৬) হীর-রঞ্ঝার কাব্যগাথা এবং ফজল শাহ'-র শশী-পন্‌হোর গাথাও উল্লেখযোগ্য।

৮.২.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

পাঞ্জাবীর ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণগুলি সংক্ষেপে এই[১]—

১. হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদে স্বরবর্ণগুলি এই: ই, ঈ, উ, ঊ, অ, এ, ও, এ্যা, অ', আ /i, iː, u, uː, ə, eː, oː, ɛː, ɔː, a/। স্বরধ্বনিগুলির সঙ্গে সিন্ধী ও হিন্দীর যথেষ্ট মিল। স্বরের দৈর্ঘ্য অর্থসূচক হলেও সর্ব অবস্থানে তা বৈপরীত্য-মূলক নয়।

২. স্বরবৃত্তি (**Tone**) অর্থসূচক। মোট তিনটি স্বর—অবরোহী (**Falling**) স্বর / ` /, আরোহী (**Rising**) স্বর / ´ / এবং স্বরিত (**Rising-Falling**) /Λ/। স্বরবিযুক্ত অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে না। পূর্ববর্তী ভ, ধ, ঘ ধ্বনিগুলি পরবর্তী স্বরিত স্বরের প্রভাবে তাদের মহাপ্রাণতা এবং ঘোষবত্তা হারায় (অর্থাৎ প', ত', ক')।[২]

১ G. A. Grierson : LSI, Vol. IX, Part I, PP. 607-823, Jain : pp ; D. Chand : Pañjābī bhāṣā dā Vikāś (in Pañjabī), P.U, 1959

২ মজুমদার: বাভাপ (১ম), পৃ. ১৮১

৩. ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলির মধ্যে পাঁচটি বর্গই দেখা যায় কিন্তু ঘোষ মহাপ্রাণধ্বনিগুলি মেলে না অর্থাৎ মোট স্পর্শবর্ণের সংখ্যা ১৫টি (ক, খ, গ, প, ফ, ব ইত্যাদি)। নাসিক্যধ্বনি ম, ন ছাড়াও ণ। এছাড়া ল এবং ল./l̩/ এবং র, ড়। উষ্মধ্বনির বৈচিত্র্য আছে, যথা—/f, s, š, x, h/, তবে /f, x/ কখনো কখনো ফ/ph/, খ/kh/ রূপে উচ্চারিত। অর্ধস্বর দুটি—য়, ৱ /y, w/। ড এবং ড় ধ্বনি বৈপরীত্যমূলক, ফলে উভয়ের পার্থক্য অর্থান্তর ঘটায়—যদিও সীমিতভাবে।

৪. হিন্দীর মতো পাঞ্জাবীতে দুটি লিঙ্গ : পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ (স্মরণীয়, মারাঠী ও গুজরাটীতে তিন লিঙ্গ)। বিশেষণে প্রযুক্ত একবচনের প্রত্যয় -আ : -ঈ (পুং : স্ত্রী) এবং বহুবচনে -এ : -অাঁ (পুং : স্ত্রী)।

৫. বহুবচন পদগঠনে যথেষ্ট সরলতা দেখা যায়। আ-অন্তক নামপদ বহুবচনে হয় -এ অন্তক (মুণ্ডা : মুণ্ডে)। অন্যত্র একবচন ও বহুবচন এক।

৬. অনুসর্গীয় প্রত্যয় : -নূঁ (২য়া), -নৈ (৩য়া), -তে (৫মী), -দা / দে / দো : দিঅাঁ (৬ষ্ঠী ১ব : বহুবচন), এবং অনুসর্গ -বিচ্ (৭মী)।

৭. পুরুষবাচক সর্বনামমূল : উ পু ১ব—হউঁ (মইঁ) : মইঁ (কর্তৃকারক : তির্যক কারক); বহুবচন—অসীঁ : অসা। ম পু ১ব—তূঁ : তই; বহুবচনে তুসীঁ : তুসা, তুহা।

৮. হিন্দী ও গুজরাটীর মতো শত্রর্থ (**Present Participle**) পদজাত অনির্দেশক বর্তমান (জান্দা, হুন্দা ইত্যাদি)। সংস্কৃত কৃদন্ত পদজাত অতীতকাল, যেমন, মারিআ (পুং) : মারী (স্ত্রী)<সং মারিত।

৯. হিন্দীর মতো যৌগিক ভবিষ্যৎ, যেমন পুংলিঙ্গে -গা/গে (১ব/বহুব) এবং স্ত্রীলিঙ্গে -গী (স্ত্রী) বর্তমান মূলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভবিষ্যৎ পদ গঠিত হয়।

৮.৩ সিন্ধী

৮.৩.১ ভাষিক পরিস্থিতি

ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশের একটা প্রধান ভাষা সিন্ধী। বর্তমানে তা পাকিস্তানের অন্তর্গত লাস বেল (বালুচিস্তান) এবং সিন্ধু প্রদেশের ভাষা। আর তার প্রচলন সিন্ধু নদের পূর্ব-পশ্চিম উভয়পার্শ্বস্থ নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে। সিন্ধীর ভাষাঞ্চল সীমানা হলো এইরূপ : পশ্চিমে বালুচিস্তানের ভাষা বালুচি (ইরানীয় ভাষা) এবং ব্রাহুই (দ্রাবিড়), উত্তর ও উত্তর-পূর্বে পশ্চিমা পাঞ্জাবীর (লহ্ন্দা) উপভাষা মূলতানী, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে পশ্‌তো এবং কাশ্মীরী (দর্দিক গোষ্ঠীভুক্ত), পূর্বে রাজস্থানীর মারোয়াড়ী উপভাষা এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে গুজরাটী। দক্ষিণ-পূর্বে সিন্ধী গুজরাটী ভাষাঞ্চলের সঙ্গে মিশে গেছে, মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে রয়েছে সিন্ধীর উপভাষা কচ্ছী। কচ্ছ দেশে (গুজরাট) প্রচলিত কচ্ছী উপভাষার মধ্যে সিন্ধী ও গুজরাটীর সংমিশ্রণ ঘটেছে সবচেয়ে বেশি।

সিন্ধীর উপভাষা ছয়টি : (১) সিরাইকী/সিরো (উত্তর সিন্ধু), (২) লারী (দক্ষিণ সিন্ধু), (৩) থরেলী/থরী (থর মরু অঞ্চল : পূর্বী সিন্ধু এবং রাজস্থানের জয়সলমীর জেলা), (৪) কচ্ছী (সিন্ধুর দক্ষিণ সীমান্তবর্তী গুজরাটের কচ্ছ এবং সৌরাষ্ট্র), (৫) লাসী (সিন্ধুর পশ্চিম প্রান্তিক লাস বেল রাজ্য এবং খিরথর রেঞ্জ্) এবং (৬) বিচোলী (মধ্য সিন্ধু)। সিন্ধু-প্রদেশস্থিত হায়দ্রাবাদ অঞ্চলের উপভাষা বিচোলী হলো আদর্শ উপভাষা (**Standard Dialect**)। বলা বাহুল্য, কচ্ছী এবং থরেলী যথাক্রমে সংলগ্ন গুজরাটী ও রাজস্থানীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গেছে। ইং ১৯৬১ সনের সমীক্ষা অনুযায়ী কচ্ছী ভাষাভাষীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৯২ হাজার ২৪৯, আর ১৯৭১ সনে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার ৯৯১।

অখণ্ড ভারতে সিন্ধী ভাষাভাষীর সংখ্যা ৭০ লক্ষেরও বেশি। এদের মধ্যে অন্তত ৫৬ লক্ষ জন পাকিস্তানের অধিবাসী। ভারত বিভাগের (ইং ১৯৪৭) ফলে ভারতে-আগত শরণার্থী সিন্ধী ভাষাভাষীর সংখ্যা অনেকে বেড়ে গেছে (বিশেষত মহারাষ্ট্র, রাজস্থান এবং দিল্লী)। তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবাদে সিন্ধী ভাষীরা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ইং ১৯৬১ সালের ভারতীয় লোকগণনা অনুযায়ী ভারতে সিন্ধী ভাষীর সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৭১ হাজার ৯৩২। ১৯৭১-এ কিন্তু এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আনুমানিক ১২ লক্ষ ৪ হাজার ৬৭৮। ভারতে সিন্ধী সংবিধানে-স্বীকৃত ভাষা।

ভৌগোলিক তথা ঐতিহাসিক বিচারে সিন্ধী ভারতীয় আর্যভাষার (Indo-Aryan) উত্তর-পশ্চিমা বর্গের অন্তর্ভুক্ত। বৈদিক আমলেই এই অঞ্চলের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হতে দেখা যায়। মহারাজ অশোকের শিলালিপি থেকে এই ভাষাঞ্চলের বিশেষ কয়েকটি প্রাকৃত লক্ষণ পরিস্ফুট হতে থাকে। ভাষাতত্ত্ববিদ বেইলী (Bailey) এই অঞ্চলের প্রাচীন প্রাকৃতের নাম দিয়েছেন 'গান্ধারী প্রাকৃত'। যাই হোক, বিবর্তনের ফলে এই ভাষা ক্রমে প্রাকৃত বৈয়াকরণ উল্লিখিত ব্রাচড ও কেকয় অপভ্রংশে পরিণত হলো। এই ব্রাচড অপভ্রংশই আধুনিক সিন্ধীর প্রকৃত জননী (E. Trumpp এবং Grierson-এর মতে)। অপরদিকে কেকয় অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত হলো লহ্ন্দা বা হিন্দ্‌কী (পশ্চিমা পাঞ্জাবী) এবং পূর্বী পাঞ্জাবী। সুতরাং সিন্ধীর সঙ্গে পূর্বী ও পশ্চিমা পাঞ্জাবীর মেলবন্ধন খুবই স্বাভাবিক। গ্রীয়ার্সন আবার এই সমস্ত ভাষাগুলির অন্তস্তলে দরদীয় ভাষার প্রভাব নিরূপণ করেছেন। অতএব, এই দিক দিয়ে এই ভাষাগুলির সঙ্গে কাশ্মীরীর সম্পর্কও অনিবার্য। বলা বাহুল্য, গ্রীয়ার্সনের পরিকল্পনা অনুযায়ী এই সমস্ত ভাষাগুলিই 'বহিরঙ্গ' আর্যশাখার (Outer Aryan) অন্তর্গত। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বিচার ক'রে পূর্বেই দেখা গেছে, সিন্ধীর সঙ্গে গুজরাটী ও রাজস্থানীর নৈকট্য রয়ে গেছে। সুতরাং, ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে সিন্ধীর স্থান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে সিন্ধীর স্থান যেমন বিচিত্র, ঐতিহাসিক বিচারে তেমন এই ভাষাঞ্চলের সাংস্কৃতিক ইতিহাস অস্পষ্ট, জটিল এবং অসম্পূর্ণ। কারণ, এই অঞ্চলের ইতিহাস গ'ড়ে উঠেছে কয়েকটি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিচ্ছিন্ন উপাদানের টানা-পোড়েনে—যে উপাদানগুলিও আবার যথেষ্ট নয়।

সিন্ধীর নিজস্ব লিপি ভারতীয় প্রাচীন লিপি থেকে উদ্ভূত—কাশ্মীরী ভাষার শারদা লিপি ও পাঞ্জাবীর গুরুমুখী লিপির সঙ্গে এর সম্পর্ক এককালে ছিল নিবিড়। এর বিকৃত রূপ 'লণ্ডা' লিপি এখনও হিন্দু ব্যবসায়ীদের মধ্যে হিসাবনিকাশের কাজে ব্যবহৃত হয়। অতীতে ও বর্তমানে আরবী-ফারসী লিপিই অধিক প্রচলিত—উনিশ শতকের শেষে (খ্রী. ১৮৫২) এই লিপিকে সিন্ধী বর্ণমালার উপযোগী ক'রে গ'ড়ে তোলা হয়েছে (৫২টি বর্ণবিশিষ্ট আরবী সিন্ধী)। ভারত-বিভাগের পর হিন্দু সিন্ধী-ভাষীদের আগ্রহে নাগরী লিপি প্রবর্তনেরও চেষ্টা চলেছে, কিন্তু অদ্যাবধি তা ফলপ্রসূ হয় নি।

৮.৩.২ ঐতিহাসিক পটভূমি

সিন্ধুদেশের ইতিহাস প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই শুরু হয়েছে (মহেন্‌জোদাড়ো, চান্‌হুদাড়ো সভ্যতা স্মরণীয়)। কিন্তু সে-ইতিহাসও অসম্পূর্ণ, কারণ সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর যথেষ্ট আলোকপাত করা হলেও তার ভাষা বা ভাষাগোত্র-পরিচয় এখনও কুয়াশাচ্ছন্ন। এই অঞ্চলের প্রাক্-মুসলিম হিন্দু/বৌদ্ধ সংস্কৃতির মূল্যায়নও সম্ভব হয় নি, কারণ প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের স্বল্পতা। তবে এই ভৌগোলিক অঞ্চলও যে একদা ব্রাহ্মণ্যধর্মশাসিত অঞ্চল ছিল, তা সম্প্রতি জানা গেছে আরবী ভাষায় অনূদিত প্রাচীন সিন্ধী মহাভারতের উপাখ্যান থেকে (সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ৮ম-১০ম শতকে লিখিত)।[১] তাছাড়া সংস্কৃতের প্রাচীন নিদর্শনে, যেমন মহাভারত ও পাণিনির ব্যাকরণে সিন্ধু বা সিন্ধু-সৌবীর উল্লিখিত হয়েছে। মুসলমান আক্রমণ ও শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই সিন্ধুদেশের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। কাজেই সিন্ধুদেশের প্রকৃত ইতিহাসের সূত্রপাত ৮ম শতক থেকে। কিন্তু তথাপি মনে রাখা দরকার, এই অঞ্চল হিন্দু সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রধান স্রোত থেকে প্রায় চির-বিচ্ছিন্ন থেকে গেছে, ভাষাও রয়ে গেছে সংরক্ষণশীল। এবং সম্ভবত তার কারণগুলি এই : (১) ৮ম শতকের পরবর্তী যুগে পশ্চিম দিক থেকে আগত বহিরাগত মুসলমান ও বিভিন্ন উপজাতির সতত আক্রমণ ও ফলস্বরূপ পরাধীনতা (আরব, পারসীক, তুর্কী, আফগান ও মোগল ইত্যাদির আক্রমণ স্মরণীয়)। (২) এই অঞ্চলের একদিকে রাজস্থানের বিশাল মরুভূমি ও অপরদিকে কচ্ছের জনবিরল 'রাণ' (<সং অরণ্য) অঞ্চল অবস্থিত হওয়ায় ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এবং (৩) স্থানীয় ইরানীয় বালুচি ও দ্রাবিড় গোত্রভুক্ত ব্রাহুই ভাষাভাষীদের সঙ্গে সহাবস্থান।

সিন্ধুদেশই মুসলমাদের দ্বারা সর্বপ্রথম অধিকৃত হয় (৮ম শতক)। ফলে ভাষা ও সাহিত্যে যেমন আরবী-ফারসীর প্রভাব দেখা দিয়েছে, হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সার্থক সমন্বয়ও তেমনি ঘটেছে অবাধে। সিন্ধী সাহিত্যের প্রাচীনতম রচনা তাই সূফী মতবাদ ও অধ্যাত্মরসে পুষ্ট হয়েছে। হিন্দু সংস্কৃতির রচনাস্বাক্ষর ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু লিখিত সাহিত্য মেলে অনেক পরবর্তী যুগে, অন্তত পঞ্চদশ শতকের পূর্বে নয়। সিন্ধী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সূফী কবি হলেন 'শাহ্-জো-রিসালো' রচয়িতা শাহ্ আবদুল লতিফ (খ্রী. ১৬৮৯-১৭৫২)। অনুমান করা হয়, 'রিসালো' গ্রন্থের মধ্যে পূর্ববর্তী

---

১ Chatterji : LLMI, pp. 341-48, 353

সূফী কবি শাহ্ আবদুল করিমের (খ্রী. ১৫৩৬-১৬২০) কিছু কিছু কবিতার প্রক্ষেপ আছে। অন্যান্য প্রাচীন সূফী কবিদের মধ্যে প্রধান হলেন—কাজি কাজান (১৫শ শতকের শেষপাদ, মৃত্যু খ্রী. ১৫৫১), সাচল (খ্রী. ১৭৩৯-১৮২৬), সামি (খ্রী. ১৭৪৩-১৮৫০), বেদিল (খ্রী. ১৮১৪-১৮৭৩), রোহল (মৃত্যু : খ্রী. ১৭৮০), দলপৎ (খ্রী. ১৭৬৯-১৮৪১) ইত্যাদি। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার তুলনায় সিন্ধী সাহিত্য কিছুটা পশ্চাদ্‌বর্তী হলেও বর্তমানে সিন্ধী সাহিত্যের চর্চা নতুন ক'রে শুরু হয়েছে।

৮.৩.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

সিন্ধীর ভাষাতাত্ত্বিক বিচার[১] প্রসঙ্গে দু'টি তথ্য স্মরণীয় : প্রথমত, প্রায় হাজার বছর ব্যাপী মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাবে সিন্ধীতে আরবী-ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে খুব বেশী। দ্বিতীয়ত, এই ভাষায় প্রাচীনত্বের ছাপ রয়ে গেছে যথেষ্ট অর্থাৎ এক হিসেবে সিন্ধী ও মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার সম্পর্ক অন্যান্য আধুনিক ভাষার তুলনায় অনেক নিকটাত্ম। উদাহরণস্বরূপ, সিন্ধীতে প্রাকৃতের যুগ্ম ব্যঞ্জন এখনও সরলীকৃত হয় নি (তু. সং হস্ত>প্রা হত্থ>বাঙলা হাত, হিন্দী হাথ্ কিন্তু সিন্ধী হথু; সং চূর্ণ>প্রা চুণ্ণ>বাঙলা চুন, সিন্ধী চুন্নু)। সংস্কৃত নাসিক্য ধ্বনিজাত আধুনিক আনুনাসিকতাও সিন্ধীতে মেলে না, যথা—সং কণ্টক>বাঙলা কাঁটা ইত্যাদি কিন্তু সিন্ধী কণ্ডো ; সং দন্ত>বাঙলা দাঁত, সিন্ধী দন্দু ; সং পঞ্চ>বাঙলা পাঁচ, সিন্ধী পঞ্জ্। সিন্ধীতে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার মতো পদান্ত -ই, -উ ধ্বনিও লুপ্ত হয় নি (তু. হথ, চুন্নু, সুণ্ঠি<সং শুণ্ঠি তু, বাঙলা শুঁট্)।

আধুনিক সিন্ধীর কয়েকটি ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ হলো এই—হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের ধ্বনিমানগত (Phonemic) পার্থক্য ; 'এ' ধ্বনির দুই জাতীয় উচ্চারণ : 'এ/e/ এবং এ্যা /ɛ/ ; 'অ' ধ্বনির হ্রস্ব এবং সংবৃত উচ্চারণ /ɔ, ɔː/। ব্যঞ্জনধ্বনির বৈচিত্র্য আধুনিক ভাষাগুলির তুলনায় অনেক বেশি, যেমন, ক-চ-ট-ত-প বর্গ ছাড়াও অন্য একটি কণ্ঠনালীয় বর্গের অস্তিত্ব। দন্ত্যবর্গ বাদে অন্যান্য ঘোষবৎ স্পর্শবর্ণের কণ্ঠনালীয় রুদ্ধ (Implosive) উচ্চারণ : ব', ড', জ', গ' / b', ḍ', j', g' /। উষ্মবর্ণের প্রাচুর্য / f, s, ś, x, z, γ /। সংস্কৃতসুলভ নাসিক্যবর্ণ পুরোপুরি বজায় আছে

১ G. A. Grierson : LSI, Vol. VIII, part I ; E. Trumpp : Grammar of the Sindhi Language, London & Leipzig, 1872 ; Yegrova : The Sindhi Language, Nauka Publication, Moscow.

অর্থাৎ ম, ন্, ণ, ঞ, ঙ / m, n, ṇ, ñ, ṅ /। 'র' ও 'ড়' ধ্বনির পার্থক্যও বাঙলার মতো রক্ষিত।

রূপতত্ত্ব বিচারে দুইটি লিঙ্গের পার্থক্য আছে (পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ) [তু. ছোকরো : ছোকরী] এবং ক্রিয়া ও সম্বন্ধ-বিশেষণ পুং/স্ত্রী কর্তা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় [উ হলন্দো/হলন্দী) । সিন্ধীতে বচন দুটি : একবচন ও বহুবচন। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ ভেদে একবচনের বিভক্তি যথাক্রমে -ও, -ঈঁ, বহুবচনে হয় -আঁ, -ইয়ুঁ।

সর্বনামমূল : উ পু ১ব—আঁ (উ) : মূঁ, মাঁ, বহুব—অসী : অসাঁ। ম পু ১ব—তূঁ : তো, তুঁহুঁ, বহুব—তব্‌হীঁ ইত্যাদি : তব্‌হা (কর্তৃ : তির্যক কারক)।

বিভিন্ন কারকে অনুসর্গীয় প্রত্যয়ের ব্যবহার : -খে (২য়া), -থাঁ, -খোঁ, খোঁ (৫মী), -জো, জী (৬ষ্ঠী), -মেঁ, মঝিঁ, সন্দো (৭মী)।

অতীতকাল সংস্কৃতের কৃদন্ত পদ জাত, যেমন—উ হলিও "সে গেল" (<চলিতঃ, √চল্)। এবং সংস্কৃত শত্রর্থক পদজাত ভবিষ্যৎ কাল গঠন, যেমন, উ হলন্দো "সে চলিবে" (<সং চলন্ত্, √চল)। সংস্কৃত অস্ ক্রিয়া-উদ্ভূত সহায়ক ক্রিয়ার সাহায্যে যৌগিক কাল গঠন, যথা, উ হলন্দো আহে 'সে যাইতেছে', উ হলিও আহে "সে যাইয়াছে" ইত্যাদি।

॥ ৯ ॥

দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা

৯.১ মারাঠী

৯.১.১ • ভাষিক পরিস্থিতি

আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে মারাঠী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সংখ্যাবলে হিন্দী, তেলুগু ও বাঙলার পরেই মারাঠীর স্থান, সাহিত্যসম্পদও তার প্রচুর। মারাঠী মহারাষ্ট্র প্রদেশের সরকারী ভাষা, দিল্লীর সাহিত্য এ্যাকাডেমী ও ভারতীয় সংবিধানের ৮ম অনুসূচী স্বীকৃত একটি প্রধান ভাষাও বটে। ইং ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতে মারাঠী ভাষাভাষীর সংখ্যা ৩ কোটি ৩২ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭৭১। ইং ১৯৭১ সনে এর আনুমানিক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ১৭ লক্ষ ২৩ হাজার ৮৯৩।

ঐতিহাসিক বিচারে মারাঠী প্রাচীন মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত, যদিও মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ও আধুনিক মারাঠীর ঐতিহাসিক যোগ কতখানি রক্ষিত হয়েছে, তা সংশয়ের বিষয়। নব্য ভারতীয় আর্যভাষার (NIA) ভৌগোলিক বর্গীকরণে মারাঠী দক্ষিণ শাখার অন্তর্গত (সিংহলী ভাষার মতো)। গ্রীয়ার্সন এই ভাষাকে 'বহিরঙ্গ' আর্যভাষাগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১]

বর্তমানে মারাঠীর ভৌগোলিক পরিসর হলো এই: পশ্চিমে আরব সাগর, উত্তর-পশ্চিমে গুজরাট, উত্তরে মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণ-পূর্বে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং দক্ষিণে মহীশূর ও গোয়া। মারাঠী সমগ্র মহারাষ্ট্র জুড়ে বিস্তৃত, তবে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে যথাক্রমে কোল/অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় ভাষাঞ্চলেও তার ক্রমিক প্রসার ঘটছে। কুর্কু (অস্ট্রিক), গোণ্ড্, তেলুগু, কানাড়ী (দ্রাবিড়), ভিলী, খান্দেশী, গুজরাটী, হিন্দী, পূর্বী হিন্দী (ই. ইউ) প্রভৃতি প্রান্তিক ভাষাগুলির সঙ্গে নিয়ত সংযোগের ফলে মারাঠীর বিবর্তন-বৈচিত্র্য ঘটেছে প্রচুর।

---

১ Grierson : LSI, Vol. VII, pp. 1-371

মারাঠীর উপভাষাগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

[১] দেশী ঃ মারাঠীর আদর্শ উপভাষা, ব্যবহৃত হয় সাহিত্য ও সরকারী দলিল-দস্তাবেজের ভাষায়। সাহিত্যিক ও কথ্য আদর্শে অবশ্য বেশ পার্থক্য রয়েছে। মূল ভাষাকেন্দ্র পুনা। তবে এর আঞ্চলিক বিভেদও রয়েছে।

[২] পর্‌ভু ঃ বোম্বাই অধ্যুষিত মারাঠী শিক্ষিত ও অভিজাত শ্রেণীর উপভাষা। ভাষায় অবশ্য গুজরাটী শব্দাবলীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে বেশ কিছু, যদিও ব্যাকরণে সে-প্রভাব স্পষ্ট নয়।

[৩] কোঙ্কণী ঃ পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ও আরব সাগর উপকূলের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ অঞ্চলকে বলা হয় কোঙ্কণ উপকূল। এই অঞ্চল উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৩৫০ মাইল এবং প্রস্থে ৬০ মাইলের অধিক নয়। এই অঞ্চলের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে যথাক্রমে গুজরাট ও গোয়া অবস্থিত। কোঙ্কণের ভাষা কোঙ্কণী। সাধারণত কোঙ্কণীকে মারাঠীর উপভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় (যেমন LSI গ্রন্থে), কিন্তু অনেকেই কোঙ্কণীকে একটি স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের পক্ষপাতী। ইং ১৯৬১ সনের জনসমীক্ষায় সেই স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি (ইং ১৯৭৬) এই ভাষা দিল্লীর সাহিত্য একাডেমী কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। ইং ১৯৬১ সনের হিসেব অনুযায়ী কোঙ্কণী ভাষাভাষীর সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৬৩; এঁদের অনেকেই গোয়া, দমন, দিউ, মহীশূর ও মহারাষ্ট্রের অধিবাসী। ইং ১৯৭১-এর সমীক্ষায় এই সংখ্যা আরও বেড়েছে (১৫,২২,৬৮৪)। আরও দ্র. পৃ. ৪৪।

কোঙ্কণী ভাষার ইতিহাস জটিল এবং অসম্পূর্ণ। কোঙ্কণী ভাষীদের প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়—সারস্বত ব্রাহ্মণ এবং গোয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ কানারা অঞ্চলের খ্রীস্টান অধিবাসী। অভিজাত খ্রীস্টানদের অনেকেরই পূর্বপুরুষ ছিলেন উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ। হিন্দু গোমন্তক ভাষীদের প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী এই প্রাচীন ব্রাহ্মণ বা সারস্বতগণ এই দেশে এসেছিলেন কাশ্মীর থেকে—যদিও এই তথ্যের কোনো ঐতিহাসিক বা ভাষা-তাত্ত্বিক ভিত্তি আবিষ্কার করা যায় নি। যাই হোক, পর্তুগীজ অধিকারের (খ্রী. ১৫৪১) ফলে বহু সারস্বত ব্রাহ্মণ গোয়া থেকে কর্ণাটক, মালাবার, উত্তর ও দক্ষিণ কানাড়া, দক্ষিণ মহারাষ্ট্র ইত্যাদি অঞ্চলে উদ্বাস্তুরূপে ছড়িয়ে পড়েন। ভাষার ক্ষেত্রে এর ফল হলো বিচিত্র। প্রথমত, এর ফলে সম্ভবত প্রাচীন হিন্দু কোঙ্কণী সাহিত্য বিলুপ্ত বা বিনষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতার ফলে কোঙ্কণী ভাষীদের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাকে আশ্রয় করতে হয়েছে; ফল দাঁড়িয়েছে, কোঙ্কণীরা দ্বিভাষী, এমনকি ত্রিভাষী হতে বাধ্য হয়েছেন। ১৬শ শতক থেকেই ক্রমশ তাঁদের কানাড়ী,

মালয়ালম্, মারাঠী বা অন্য কোনো ভাষাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে হয়েছে। তৃতীয়ত, ভাষার মধ্যে বিভিন্ন ভাষার শব্দাবলী অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। পরবর্তী যুগে আবার পর্তুগীজ প্রভাবের ফলে বাক্যরীতিতে পর্তুগীজ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে আবার ইংরেজিয়ানার প্রভাবে কোঙ্কণীতে ভয়াবহ অরাজকতা দেখা দিয়েছে। লেখন-রীতিতেও বিচ্ছিন্নতা দেখা গেছে, যেমন হিন্দু কোঙ্কণীরা নাগরী লিপি ও মারাঠী ভাষা ব্যবহার করে থাকেন, আর খ্রীস্টানরা ব্যবহার করেন রোমান বা কানাড়ী লিপি। গোয়ার উপভাষা অবশ্য স্থানীয় খ্রীস্টানদের (Luso-Indians) সাহিত্যিক আদর্শ ভাষারূপে স্বীকৃত। বস্তুত, কোঙ্কণী সাহিত্য প্রধানত এই খ্রীস্টানদের দ্বারাই অনুশীলিত হয়ে চলেছে, হিন্দু কোঙ্কণী সাহিত্য ব'লে তেমন কিছু নেই। কোঙ্কণীর প্রথম ব্যাকরণও রচনা করেন Father Stephens (খ্রী. ১৫৭৯)। চতুর্থত, কোঙ্কণী উপরোক্ত ঐতিহাসিক কারণে কোনদিনই একটি বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা হয়ে গ'ড়ে উঠতে পারেনি। এই ভাষা প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি উপভাষাগুচ্ছের সমষ্টিমাত্র, কোঙ্কণীর কোনো সাহিত্যিক আদর্শ উপভাষাও (Standard Dialect) নেই। কারণ, এই ভাষার যেমন কোনো সাহিত্যিক আদর্শ ছিল না, তেমনি তা ছিল না দরবারী ভাষা। উপরন্তু তা ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়, গোষ্ঠী ও বৃত্তি (Guild), এমনকি বর্ণ-চেতনার দ্বারা বিচ্ছিন্ন। ধর্মীয়, সামাজিক ও আঞ্চলিক বিভেদ এই ভাষাকে সংহত হতে দেয় নি। যাই হোক, কোঙ্কণী প্রায় ২০টি উপভাষায় বিভক্ত, প্রধান বিভাগ ছয়টি আর এই বিভাগ প্রধানও হিন্দু ও খ্রীস্টান ধর্মের বিভেদকে আশ্রয় ক'রে গড়ে উঠেছে। হিন্দুধর্মীয় চিত্রপুর সারস্বত (উত্তর/দক্ষিণ কানারা অধিবাসী), গৌড় সারস্বত (কানারা, কোচিন) ও গোয়া নিবাসী সারস্বত (গোমন্তকী) সম্প্রদায়-ভুক্ত জনগণ তিনটি বিভিন্ন উপভাষা ব্যবহার করেন। অপরপক্ষে মাঙ্গালোর/দক্ষিণ কানাড়া, উত্তর কানারা ও গোয়ার খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী কোঙ্কণী ভাষীরা অন্য তিনটি উপভাষা ব্যবহার করেন। এছাড়া সামাজিক ও গোষ্ঠীগত উপভাষা-বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়, যেমন—বারদেস্‌করী (বেলগাঁও জেলা), সারস্ত্‌বাদী, কুডালী, দাল্‌দী (মুসলিম ধীবর ব্যবহৃত), চিৎপাবনী (রত্নগিরি, সারন্তবাদী এবং বোম্বাই), গাবডী (যাযাবর সম্প্রদায়ভুক্ত) ইত্যাদি। কোঙ্কণীর ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ পরে আলোচিত হবে।

[৪] বেরারী : বেরারী প্রকৃতপক্ষে বেরার অঞ্চলে ব্যবহৃত উপভাষাগুচ্ছ বিশেষ। এদের মধ্যে পড়ে বরহাডী, নাগপুরী ও হলবী। LSI অনুযায়ী নাগপুর জেলার নাগপুরী, মারাঠীর উপভাষা হলেও বিহারের ছোটনাগপুরে ব্যবহৃত নাগপুরী

থেকে তা ভিন্ন। এইজন্য বর্তমান সমীক্ষায় এই নাগপুরীকে নাগপুরী-মারাঠী বলা হয়েছে।

'হলবী'র প্রচলন মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলায় (পূর্বতন বস্তার রাজ্য)। ইং ১৯৬১-এর সমীক্ষায় হলবী ভাষাভাষীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬৬০, কিন্তু ১৯৭১-এর জনসমীক্ষায় সে-সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ২৫৯। হলবীর বর্গীকরণ সম্পর্কে অবশ্য মতদ্বৈধতা আছে। গ্রীয়ার্সন (: LSI) হলবীকে মারাঠীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ১৯৬১ সমীক্ষাতেও সেই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হয়েছে। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিকদের অনেকেই হলবীকে পূর্বী হিন্দীর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ব'লে মনে করেন। (দ্র. পৃ. ৪৪)। হলবীর সঙ্গে মারাঠীর সাদৃশ্য অবশ্য আছে, যেমন, হলবীর ষষ্ঠীর অনুসর্গ-প্রত্যয় হলো -চো (তু. মারাঠী -চা, -চেঁ, -চী)। যাই হোক, হলবীর মধ্যে মারাঠী, ওড়িয়া অথবা ছত্তিশগঢ়ীর (পূর্বী হিন্দী) সংমিশ্রণের ফলে এই ভাষার যথার্থ মূল্যায়ন এখনও অনির্ণীত রয়ে গেছে। হলবীর ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ পরে আলোচিত হবে। হলবীর সাহিত্যিক ঐতিহ্য এখনও গড়ে ওঠে নি।

মারাঠীর নিজস্ব প্রাচীন লিপি 'মোড়ী'। ছত্রপতি শিবাজীর সচিব বালাজী অবাজী ১৭শ শতকে তদানীন্তন মহারাষ্ট্রে প্রচলিত ভারতীয় লিপিকে আশ্রয় ক'রে এই লিপি উদ্ভাবন করেন। কিন্তু ১৮শ শতক থেকে এর স্থান দখল করেছে নাগরী লিপি (স্থানীয় ভাষায় 'বালবোধ' লিপি)।

৯.১.২ প্রাচীন সাহিত্য

মারাঠীর সাহিত্যিক ঐতিহ্য প্রাচীন। গ্রীষ্টীয় ১১শ-১৩শ শতক সময়সীমার মধ্যে প্রত্নলেখ নিদর্শন মেলে প্রচুর।[১] ১৩শ শতকে অবশ্য সৃজনশীল সাহিত্যের প্রাচুর্য দেখা যায়। প্রাচীন রচনাগুলি প্রধানত ধর্মরসে পুষ্ট। মারাঠী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তিনটি যুগ দেখা যায় :

(১) প্রাচীন যুগ (—১৩৫০ খ্রী. অ.) : এই যুগের রচনা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্ট। প্রধানত 'মহানুভব' সম্প্রদায় ও "বারকরী" পন্থী (ভক্তিমার্গী) সন্তদের রচনা।

(২) মধ্যযুগ (খ্রী. ১৩৫০-১৮০০) : এই যুগকে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়—মুসলিম রাজত্বের সূচনা ও প্রতিষ্ঠা পর্ব (খ্রী. ১৩৫০-১৭০০) অর্থাৎ বিজাপুর, আহমদনগর ও

১ S. G. Tulpule : An Old Marāṭhī Reader, Poona, 1960

বেরার সুলতানদের অভ্যুত্থান পর্ব এবং শিবাজী ও পেশবাদের রাজত্বকাল (খ্রী. ১৭০০-১৮০০)।

(৩) আধুনিক যুগ (১৮০০—)।

হরপালদেব বা চক্রধর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত (খ্রী. ১২৬৭) 'মহানুভব' (পরবর্তী যুগে 'মানভাব') সম্প্রদায় রচিত সাহিত্যই মারাঠীর প্রাচীনতম নিদর্শন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত সন্তেরা ছিলেন নিরাকার একেশ্বরবাদী কিন্তু কৃষ্ণ উপাসক। ১৩শ-১৪শ শতকের মধ্যে মহানুভব সম্প্রদায়ের ভক্তরা রচনা করেছিলেন প্রচুর (মহীন্দ্র ভট: লীলাচরিত, খ্রী. ১২৮৬; কেশবদাস: সিদ্ধান্তসূত্র ইত্যাদি)। কিন্তু পরবর্তী যুগে এই ধর্মের প্রাধান্য ক্ষীণ হওয়ার ফলে সাহিত্যসম্পদও প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে।

অপর সম্প্রদায় বারকরী পন্থীরা ছিলেন বিট্ঠল বা বিষ্ণু উপাসক বৈদান্তিক ভক্তিমার্গী। এঁদের ধর্মে নাথপন্থীদের যোগ, শৈব-বেদান্তীদের জ্ঞান এবং বিষ্ণু ও কৃষ্ণ উপাসকদের ভক্তি ক্রমিক সমন্বয়ে পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। যাই হোক, এঁদের সৃষ্ট রচনাসম্ভার মারাঠীর সম্পদবিশেষ।

মারাঠীর সর্বভারতীয় প্রথম লেখক হলেন জ্ঞানেশ্বর (খ্রী. ১২৭১-৯৩)। এঁর রচিত গীতার ভাষ্য 'ভাবার্থদীপিকা' (খ্রী. ১২৯০) 'জ্ঞানেশ্বরী' নামে পরিচিত।[১] গ্রন্থখানি নয় হাজার 'ওব্রী' স্তবকে বিধৃত। ইংরেজী, হিন্দী ও বাঙলা ভাষায় এই গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। তাঁর অপর গ্রন্থ 'অমৃতানুভব' বেদান্ত-আশ্রিত দর্শনমূলক কাব্যধর্মী রচনা। এছাড়া তিনি অনেক ভক্তিগীতিও রচনা করেছিলেন, যা আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে। জ্ঞানদেবের সমসাময়িক সন্তকবি নামদেব (খ্রী. ১২৭০-১৩৫০) মারাঠীর আর একজন বিখ্যাত কবি। তিনি প্রধানত সরল ভক্তিমূলক গীতি রচনা করেছিলেন, এগুলি 'গাথা' নামক সংকলনে সংগৃহীত হয়েছে। প্রাচীন যুগের মারাঠী রচানাগুলি সাধারণত দুটি বিশেষ ছন্দরীতিতে গ্রথিত হতে দেখা যায়, যথা—'ওব্রী' গদ্যছন্দ—যা সাধারণত আখ্যানমূলক রচনায় ব্যবহৃত এবং ভক্তিমূলক স্তোত্রে গ্রথিত 'অভঙ্গ' ছন্দরূপ, যা প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন 'ওব্রী' ছন্দ থেকেই উদ্ভূত। জ্ঞানেশ্বর, একনাথ এবং রামদাসও 'অভঙ্গ' রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁদের প্রসিদ্ধ রচনাগুলি 'ওব্রী' ছন্দেই লিখিত। নামদেবই প্রথম অভঙ্গকে এক গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদায় এবং রচনাপ্রাচুর্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর দুটি অভঙ্গ শিখদের পবিত্র গ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব'-এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্মান লাভ করেছে।

---

১ M. J. Panse: Linguistic Peculiarities of Jñāneśwarī, Poona, 1953

১৪শ-১৬শ শতকের অন্তর্বর্তী সময়ে মুসলিম শাসনযুগে মারাঠী সাহিত্যপ্রেরণায় ভাঁটা পড়েছিল। তবে এই যুগে মারাঠার তৃতীয় মহাকবি ও সন্ত একনাথ স্বামীর (খ্রী. ১৫৪৮-৯৯) আবির্ভাব স্মরণীয় ঘটনা। তিনি কেবল সন্ত ও সুকবি ছিলেন না, একজন সমাজ-সংস্কারকও ছিলেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থদ্বয় 'একনাথী ভাগবত' (ভাগবতের ১১শ স্কন্ধ) এবং "ভাবার্থ রামায়ণ"—প্রত্যেকটিতেই ২০,০০০ 'ওবী' স্তবকে গ্রথিত হয়েছে। তাঁর অপর রচনা হলো রুক্মিণী স্বয়ংবর, মরুদা ইত্যাদি। এছাড়া তিনি বহুল-প্রচলিত 'জ্ঞানেশ্বরী'র বিভিন্ন পাঠ মিলিয়ে একটি নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক সংস্করণও সম্পাদনা করেছিলেন। ১৬শ শতকের একজন বিদেশীর মারাঠী রচনা এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। জাতিতে ইংরেজ, ধর্মে ক্যাথলিক পাদ্রী Thomas Stephens (খ্রী. ১৫৫৯-১৬১৯), পর্তুগীজ উচ্চারণে পাদ্রে এস্তেভোঁ, মারাঠীতে 'ওবী' ছন্দে লিখলেন 'খ্রীষ্ট পুরাণ' (রোমান হরফে ১৬১৬ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত) যীশু খ্রীস্টের জীবন ও খ্রীস্টধর্ম ব্যাখ্যা ক'রে। পূর্বেই বলা হয়েছে, তিনি প্রথম কোঙ্কণীর ব্যাকরণ লিখেছিলেন।

১৭শ শতকে আবির্ভূত সর্বভারতীয় আর একজন ভক্তিবাদী সন্তকবি হলেন "তুকারাম" (খ্রী. ১৫৮৮-১৬৪৯), জাতিতে শূদ্র। তিনি প্রায় ৫০০০ অভঙ্গ রচনা করেছিলেন, কিংবদন্তী অনুযায়ী অবশ্য সে-সংখ্যা আরও বেশি। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "নবরত্নমালা"য় (ইং ১৯০৭) তুকারামের কিছু কবিতা বাঙলায় অনূদিত হয়েছে। শিবাজীর গুরু সমর্থ রামদাসের (খ্রী. ১৬০৮-৮২) 'দাসবোধ' গ্রন্থটিও একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। গ্রন্থে ভগবদ্‌ভক্তি, ত্যাগ, সমাজ এবং ধর্মরক্ষার সুন্দর নির্দেশ আছে। এছাড়া আরও উল্লেখযোগ্য কবি আছেন, যেমন—মুক্তেশ্বর (খ্রী. ১৬০৮-৬০), বামন পণ্ডিত (১৬১৫-৭৮), শ্রীধর (১৬৭৮-১৭২৮), ময়ূর পণ্ডিত (১৭২৯-৯৪) ইত্যাদি। খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মারাঠী সাহিত্যে দু' ধরণের নতুন ধারা উদিত হতে দেখা যায়, কবির সংখ্যাও প্রচুর। বিভিন্ন নামহীন কবিদের যুদ্ধগাথা 'পোৱাড়া' (<সং প্রবাদ) মারাঠী লোকসাহিত্যের সুন্দর নিদর্শন। দ্বিতীয়ত, 'বখর' বা কাল-বিবরণী (Chronicles), গদ্যে রচিত নানা ধরণের বার্ষিক বিবরণ এবং প্রতিবেদন এইজাতীয় রচনায় গ্রথিত হয়েছে। অবশ্য ১৮শ শতক পর্যন্ত মারাঠীতে পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়ে রচনার ঐতিহ্য বজায় ছিল। ১৮শ শতকে আর একজাতীয় লৌকিক কাব্যধারা প্রবর্তিত হতে দেখা গেল, যা 'লাবণী' নামে অভিহিত। এইজাতীয় কাব্যে প্রধানত জাগতিক প্রেম প্রাধান্য পেয়েছে।

৯.১.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(ক) মারাঠী :

মারাঠীর বিশেষ কয়েকটি ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ[১] হলো : চ-বর্গের দ্বিবিধ উচ্চারণ (দন্ত্যঘৃষ্ট ও তালব্য ঘৃষ্ট)। বাঙলা সুলভ 'ঙ' ও ওড়িয়াসুলভ ণ /ṇ/ ও ল. /ḷ/ ধ্বনির অস্তিত্ব। 'ব' এবং 'ৱ' এবং 'শ' ও 'স' ধ্বনিগুলির উচ্চারণগত পার্থক্য রক্ষিত।

বহুবচন পদগঠনে প্রাচীন প্রাত্যয়িক বিভক্তি রক্ষিত, যেমন সূঁতে (<সং সূত্রাণি)। বহুবচন বিভক্তি : -এ, য়াঁ, ঈঁ, এবং একবচনের বিভক্তি -আ, ঈঁ এঁ [পুং /স্ত্রী/ ক্লী]। গুজরাটীর মতো তিনটি লিঙ্গ : পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। সম্বন্ধ-বিশেষণেও এই লিঙ্গশাসন দ্রষ্টব্য, যেমন—হা মনুষ্য (সেই মানুষ) / হী স্ত্রী / হেঁ পুস্তক ; মাঝা ঘোড়া "আমার ঘোড়া" (পুং) / মাঝী টোপী (স্ত্রী) / মাঝেঁ পুস্তক (ক্লী)।

বিভিন্ন কারকে অনুসর্গীয় প্রত্যয়ের ব্যবহার, যেমন—গৌণকর্মে— -লা, করণে -নেঁ, -এঁ, -শীঁ, সম্বন্ধপদে -চা, -চী, -চেঁ (তুমচা ঘোড়া, তুমচী স্ত্রী, তুমচেঁ ঘর,), অধিকরণে -আঁত্।

সর্বনামমূল : উপু ১ব—মী : মজ, বহুব—আম্হী : আম্হা ; মপু ১ব—তু : তুজ, বহুব—তুম্হী : তুম্হা (কর্তৃ : তির্যককারক)।

কৃদন্ত অতীত (ক্ত-প্রত্যয়) ও কৃদন্ত বর্তমান (শতৃ-) থেকে উদ্ভূত হয়েছে যথাক্রমে অতীত ও বর্তমান কাল, যথা—তো গেলা "সে গেল', (<গত-), তো জাতো "সে যায়" (<যান্ত,√যা)। প্রাচীন বর্তমান কাল উদ্ভূত ভবিষ্যৎ কাল গঠন (ল, ন বিভক্তি যাগে), যথা—তো জাইল্ "সে যাইবে", তূঁ জাশীল "তুমি যাইবে", আম্হী জাউঁ। অস্ ধাতুজাত ক্রিয়ার সাহায্যে যৌগিক কাল গঠন, যথা—মী জাত্ আহে "আমি যাইতেছি", মী জাত্ হোতোঁ "আমি যাইতেছিলাম"। -উন (<বৈ. ত্বান) যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া (ঘেউন, দেউন) ইত্যাদি।

(খ) হলবী :

'হলবী'র ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ : পূর্বেই বলা হয়েছে, হলবীতে মারাঠী, ওড়িয়া ও ছত্তিশগঢ়ী (পূর্বী হিন্দী) ভাষার প্রভাব যথেষ্ট। এছাড়া অন্যান্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

---

১ J. Bloch : LM, 1920 ; কুলকর্ণী : মারাঠী ভাষা উদ্‌গম ব বিকাস (মারাঠীতে লিখিত), ১৯৫৭ (৩য় সংস্করণ), পুনে।

হলো : 'ণ' ও 'ৱ' ধ্বনির যথাক্রমে 'ন' ও 'ব' ধ্বনিরূপে উচ্চারণ। দুই লিঙ্গ : পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ। —মন্ প্রত্যয়যোগে বহুবচন গঠন (তু. ওড়িয়া -মানে)। অনুসর্গীয় বিভক্তি—গৌণকর্মে -কে, অপাদানে -লে, সম্বন্ধে -চো, -কে, অধিকরণে -মেঁ, ·নে ইত্যাদি। অতীতকালে -ল- প্রত্যয় ব্যবহার (মুই গেলোঁ); ভবিষ্যত পদগঠনে -দে (<√দা, তু. পাঞ্জাবী) যোগ, যথা – মইঁ মারেন্দে/দেদে।

(গ) কোঙ্কণী :

কোঙ্কণীর ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ[১]: মারাঠীর মতো দুইজাতীয় চ-বর্গ (তালব্যঘৃষ্ট ও দন্ত্যঘৃষ্ট); ব ও ৱ এবং স ও শ (<স+ই,এ) ধ্বনিদ্বয়ের উচ্চারণ পার্থক্য। ণ ও ল. ধ্বনি আছে কিন্তু ঙ ধ্বনি নেই।

কর্তৃকারকের বিভক্ত -উ (১ব)/-অ (বহুব) [< সং-অঃ, -আঃ]। তির্যক কারকে -আ (১ব)/-আঁ (বহুব) তু. দেৱ, দেৱ (<দেবঃ, দেবাঃ), তির্যক কারকে দেৱা-, দেৱাঁ-। তিন লিঙ্গ (তু.-হো, হী, হেঁ "এই")। মধ্যম ও প্রথম পুরুষে সম্ভ্রমার্থ সর্বনাম নেই। অন্যান্য বিভক্তি—ওয়া -এঁ, -নে, -ন, -ন্; মুখ্য/গৌণ কর্মে -ক, ক্; অপাদানে -থাউন্, থাকুন্, ঠাউন্, সাকুন্ (<স্থা, শক্), সম্বন্ধে -চো,-চী,-চেঁ -লো, -লী, -লে, -গেলে, -গেলী; অধিকরণে -আন্ত্, -আন্ত।

ভবিষ্যৎ কালে মারাঠীসুলভ -ল যোগ, কিন্তু ক্বচিৎ -ত (<অন্ত্, শতৃ) যোগ (তু. হাঁর ৱত্‌লোঁ "আমি যাইব")। অতীত কালে -ল প্রত্যয় যোগ (নিদ্‌লো "ঘুমাইলো") কিন্তু কৃদন্ত -ত্ যোগে ঘটমান অতীত (নিদ্‌তালো, নিদ্দতালো "ঘুমাইতেছিল")। নাস্ত্যর্থ ক্রিয়ায় (Negative Verb) অস্/ভূ ধাতুজ ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয় না (তু মারাঠী নাহী, নৱ্‌হে, কোঙ্কণী না, নাউ, নান্ত, নাত্‌লো)। -তা (<শতৃ -অন্ত্) যোগে শত্রর্থ বিশেষণ (নিদ্‌তা, নিদ্দতালো "ঘুমন্ত"); -ল যোগে কৃদন্ত বিশেষণ (গেল্লো, গেলো, মেল্লো<গত, মৃত)। -উন্,-উন্ যোগে (<বৈ -ত্বান) অসমাপিকা (নিদুন্, নিদুন্)। ণিজন্ত ক্রিয়ামূলে প্রাচীনত্ব রক্ষিত (তু. সুকৃতা : শুক্কয়তা=হি. সুখ্‌না : সুখানা)।

কোঙ্কণীর শব্দভাণ্ডারে বৈচিত্র্য আছে। বহু প্রাচীন গুজরাটীর শব্দের সঙ্গে কোঙ্কণীর সাদৃশ্য দেখা যায়। এইজাতীয় শব্দগুলি এমনকি মারাঠীতেও মেলে না।

---

১ S. M. Katre : The Formation of Koṅkoṇi, Bombay, 1942

॥ ১০ ॥

উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রধান ভাষা

১০.১ কাশ্মীরী

১০.১.১ ভাষিক পরিস্থিতি

ভারতভুক্ত জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের কাশ্মীর প্রদেশে কাশ্মীরী প্রচলিত। স্থানীয় লোকেরা অবশ্য তাঁদের মাতৃভাষাকে বলেন 'ক-শূর'। এই ভাষা ভারতীয় সংবিধান-সম্মত পনেরটি ভাষার অন্যতম। সংবিধানে এই ভাষা কাশ্মীরী নামেই অভিহিত।

অবিভক্ত জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ১৪টি জেলায় বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে নয়টি জেলা ভারতীয় কাশ্মীরের অধীনে, বাকী ৫টি জেলা 'আজাদ কাশ্মীর' নামে পাকিস্তানের কবলিত। যাই হোক, কাশ্মীরীর ভাষাঞ্চল প্রায় ১০ হাজার বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত, তবে সমগ্র জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে কাশ্মীরী ভাষীরা প্রধানত অনন্তনাগ, শ্রীনগর, বরমুলা ও ডোডা জেলায় কেন্দ্রীভূত। বাকি পাঁচটি জেলার মধ্যে উধামপুর ও পুঞ্ছ-এও কাশ্মীরী ভাষীরা সংখ্যাবলে একেবারে নগণ্য নয়। কিন্তু ইং ১৯৬১-এর সমীক্ষা অনুযায়ী জম্মু, কাথুআ এবং লদাখ জেলায় তাদের সংখ্যা নগণ্য বললেই চলে।

কাশ্মীরের অধিবাসীদের মধ্যে ধর্ম, জাতি-উপজাতি এবং ভাষাগত ভেদ যথেষ্ট। যেমন, কাশ্মীরীরা ধর্মে প্রধানত হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম এবং শিখ—যদিও এদের মধ্যে মুসলিমরাই সংখ্যায় অধিক। জাতিভেদও যথেষ্ট। যেমন, কাশ্মীর উপত্যকা এবং কিস্‌ত্‌ওয়ারে প্রধানত কাশ্মীরীরা, কাশ্মীরের পশ্চিম জেলাগুলিতে এবং জম্মুতে পাঞ্জাবীরা বাস করেন। এছাড়া জম্মুতে বসবাস করেন বহু রাজপুত ডোগ্‌রা এবং মুসলমান-সম্প্রদায়ভুক্ত অর্ধ-যাযাবর গুজর সম্প্রদায় (গুজররা রাজস্থানী শব্দ-মিশ্রিত পাঞ্জাবী উপভাষাবিশেষ ব্যবহার করে থাকেন)। আর লদাখে বাস করেন প্রধানত বৌদ্ধ লদাখীরা। এছাড়া কাশ্মীরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে হিন্দু 'গদ্দী' এবং অন্যত্র মুসলিম 'ওয়াটাল' ইত্যাদি অর্ধ-যাযাবর জাতিও দেখা যায়।

ইং ১৯৬১ সনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী জম্মু ও কাশ্মীরের মোট জনসংখ্যা ৩৫ লক্ষ ৬০ হাজার ৯৭৬ (১৯৭১-এ ৪৬,১৬,৬৩২)। সংখ্যাবলে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের

কাশ্মীরী ভাষীরা জনসংখ্যার ৫৪.৪২ শতাংশ (১৯৭১-এ ৫৩.১৪%)। অন্যান্য ভাষাভাষীদের আনুপাতিক হার এইরূপ—ডোগরী (২৪.৪১%), অনির্ণীত পাহাড়ী (৬.৮৪%), গোজ্‌রী বা গুজরী (৫.৮৮%), পাঞ্জাবী (৩.০৬%) এবং লদাখী (১.৪৮%)। উর্দুকে মাতৃভাষারূপে চিহ্নিত করেছেন, এমন লোকের সংখ্যা ১২ হাজার ৪৪৫ (১৯৭১-এ ১২,৭৪০)। এই সমীক্ষা অনুযায়ী কাশ্মীরী ভাষীর সর্বভারতীয় জনসংখ্যা ১৯ লক্ষ ১৪ হাজার ৪৪৬ (জম্মু ও কাশ্মীরে ১৮,৯৬,১৪৯; পাঞ্জাবে ৮,১২৪, হিমাচল প্রদেশে ৩,৫০১)। ১৯৭১-এ এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪ লক্ষ ২১ হাজার ৭৬০।

কাশ্মীরীর ঔপভাষিক পরিস্থিতি খুব স্পষ্ট নয়। তবু স্বীকার করা চলে, শ্রীনগর উপত্যকার ভাষাই আদর্শ উপভাষা। তা সমগ্র রাজ্যে স্বীকৃত আদর্শরূপে পরিগণিত, সকলের বোধগম্যও বটে। মোটামুটিভাবে কাশ্মীরী উপভাষাগুলিকে এইভাবে ভাগ করা যায়—

(১) দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের উপভাষা।
(২) উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের উপভাষা এবং
(৩) শ্রীনগর এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলের আদর্শ ভাষা।

ঐতিহাসিক কারণে কাশ্মীরীর ওপর সংস্কৃত ও ফারসীর প্রভাব পড়েছে যথেষ্ট। তাই ভাষিক প্রয়োগে রীতিগত (Stylistic) ভেদ সহজেই নজরে পড়ে, ভাষাভাষী এবং পরিমণ্ডলের অবস্থা অনুযায়ী এই রীতিগত বিভেদ স্বাভাবিক।

কাশ্মীরের বহুল-প্রচলিত ভাষা কাশ্মীরী এবং ডোগরী; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সরকারী কাজকর্মে ও বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে উর্দুরই প্রচলন বেশি। কাশ্মীরী, ডোগরী বা লদাখী—কোনো ভাষাই ৬০ শতাংশের অধিক লোক ব্যবহার করেন না। তাছাড়া এই ভাষাগুলি তেমন উন্নতও নয়। এই কারণে বর্তমানে উর্দুই সরকারী ভাষারূপে গৃহীত হয়েছে (যদিও উর্দু ভাষীরা মোট জনসমষ্টির ০.২৮%); আর সংবিধানের ৬ষ্ঠ অনুসূচী অনুযায়ী কাশ্মীরী, ডোগরী, বাল্‌টী, দর্দি, পাঞ্জাবী, পাহাড়ী এবং লদাখী আঞ্চলিক ভাষারূপে (Regional Languages) গণ্য হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, ইং ১৮১৯ সালের পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ শিখ রাজত্বকালে (খ্রী. ১৮১৯-১৮৪৮) কাশ্মীরের সরকারী ভাষা ছিল ফারসী।

কাশ্মীরী ভাষার নিজস্ব লিপি ছিল প্রাচীন শারদা লিপি। সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ১০ম শতকে এই লিপি প্রচলিত ছিল। বলা বাহুল্য, এই লিপি প্রাচীন ব্রাহ্মী থেকেই উদ্ভূত, কাজেই তা দেবনাগরী বা নাগরী লিপির সহোদরস্থানীয়া। ঐতিহাসিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে এই লিপি অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। বর্তমানে এই লিপি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে

কেবল ব্যবহৃত হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, এমনকি শিখ রাজত্বেও কাশ্মীরের সরকারী ভাষা ছিল ফারসী। শিখ রাজত্বের পর উর্দু এখানকার ভাষারূপে গণ্য হয়েছে। এই কারণে আরবী-ফারসী লিপির প্রচলন বর্তমান কাশ্মীরে খুবই ব্যাপক। বর্তমানে এখানে নাগরী লিপি প্রবর্তনের চেষ্টা চলেছে।

কাশ্মীরের ভৌগোলিক অবস্থান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সে সঙ্গে তার রাজনৈতিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং ভাষাতাত্ত্বিক পরিস্থিতি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে, কাশ্মীর হিন্দু, মুসলমান, শিখ এমনকি বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্কৃতির এক সার্থক মিলনস্থল। সাংস্কৃতিক গৌরবে এই রাজ্য প্রধানত হিন্দু ও মুসলিম সম্মিলিত ও যুক্ত ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। আর ভাষাতাত্ত্বিক বংশকৌলীন্যে তা ভারতীয় আর্য হলেও ইন্দো-ইরানীয় প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য বহন করে।

ভৌগোলিক অবস্থান বিচারে কাশ্মীরের সীমানা এই—উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান ও রুশ সীমান্ত, উত্তরে চীনের সিন্-কিয়াঙ্ প্রদেশ, পূর্বে তিব্বত ও পশ্চিমে পাকিস্তান এবং দক্ষিণে হিমাচল প্রদেশ ও পাঞ্জাব। কাশ্মীরী ভাষা বিচার করলে কিন্তু দেখা যাবে, তা ভারতীয় আর্য এবং ইরানীয় শাখার সঙ্গে সুদূর অতীত থেকেই যুক্ত, চীনা-তিব্বতীয় বা ইন্দো-ইউরোপীয় বাল্‌টো-স্লাবিক শাখার সঙ্গে নয়।

তবে ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য ভাষা বর্গীকরণেও কাশ্মীরীর স্থান নির্ণয় একটি জটিল সমস্যা। এ-প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে (দ্র. পৃ. ২১-২২, ৪০-৪১)। অনেকেই মনে করেন কাশ্মীরী মূলে ভারতীয় আর্য এবং ইরানীয় শাখার সহোদরস্থানীয়া এবং এদের জননী ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য। তবে বর্তমানে অধিকাংশ ভাষাতাত্ত্বিক মনে করেন, কাশ্মীরী ভারতীয় আর্যের সন্ততি অর্থাৎ তা ভারতীয় আর্যের দরদীয় শাখাভুক্ত। এই মতানুসারে ভারতীয় আর্যের দরদীয় শাখা দুইটি: (১) খোয়ার বর্গ (চিত্রালি বা ছত্ররি বা অর্নিয় সমেত) এবং (২) দর্দ বর্গ, যথা, শিণা, কাশ্মীরী এবং কোহিস্তানী। কাফির বর্গীয় অপর দরদীয় ভাষাগুলি কিন্তু ভারতীয় দরদীয় ভাষাগুলি থেকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে।[১]

১০.১.২ কাশ্মীর ও কাশ্মীরী সাহিত্য

কাশ্মীরের ইতিহাসও রাজনৈতিক আবর্তনের এক স্মরণীয় ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। পৌরাণিক উল্লেখের কথা বাদ দিলেও দেখা যাবে, কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস বৌদ্ধ

১ দরদীয় ভাষা সম্পর্কে আরও দ্র. মজুমদার: সপ্রাক্র. পৃ: ৪৮-৪৯।

ও হিন্দু রাজত্বকাল দিয়ে শুরু, ক্রমে মুসলমান আক্রমণ ও অধিকার এবং পুনরায় হিন্দু ও শিখ রাজত্বের পুনরুদ্ধার এবং পরে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রিক বিভাগ দিয়ে তার পরিণতি। বৌদ্ধ-হিন্দু যুগের ইতিহাস প্রায় দেড় হাজার বছরের ঘটনা। মহারাজ অশোকের সময় (খ্রী পূ. ২৬৮-৩১) কাশ্মীর মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, সম্ভবত অশোকই শ্রীনগর শহরের পত্তন করেন। বৌদ্ধ চতুর্থ সংঘ সম্মেলনে (খ্রী ২য় শতক) এইখানে হীনযান-মহাযান বিভেদের সূত্রপাত হয়। কণিষ্কের আমলে খ্রীষ্টীয় ১ম-২য় শতকে শক আধিপত্য ও কুষাণ অধিকার স্বীকৃত হয়। পরে হুন আক্রমণ ও হুনরাজা মিহিরকুলের যুগ (খ্রী. ৫২০-৫৪২)। সপ্তম শতকে হর্ষবর্ধনের রাজত্বে (খ্রী. ৬০৬) কাশ্মীর আবার বৃহত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবর্তে জড়িয়ে পড়ে। ৭ম শতকের পর থেকেই প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরের প্রাধান্য স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত হতে থাকে। প্রবরসেনা (খ্রী. ৬ষ্ঠ শতক), দুর্লভবর্ধন (৭ম শতক), ললিতাদিত্য (৮ম শতক) প্রমুখ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কাশ্মীরের নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই পর্বের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস প্রখ্যাত কবি কল্‌হণের 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে (খ্রীষ্টীয় ১২শ শতক) লিপিবদ্ধ আছে।

কাশ্মীরে মুসলিম পর্বের সূত্রপাত করেন সুলতান শামসুদ্দীন (খ্রী. ১৩৩৯-৪৯)। প্রায় ১৫৮৬ সাল পর্যন্ত এই তুর্ক-আফগান শাসন-পর্বের পর কাশ্মীর দিল্লীর মোগল সম্রাটদের দ্বারা অধিকৃত হয়। মোগল রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত কাশ্মীর মোটামুটি তার স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রেখেছিল। কাশ্মীরে মোগল রাজত্বের কাল ১৫৮৬-১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ। ইং ১৭৪৮ সালে আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালীর আক্রমণে কাশ্মীর আফগানদের শাসনে আসে। তৃতীয় পর্বে মুসলমান শক্তি অস্তমিত হলে ১৮১৯ সালে পুনরায় রাজনৈতিক অভ্যুত্থান দেখা গেল—পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিং কাশ্মীর অধিকার করেন। পরে ১৮৪৮ সালে জম্মুর হিন্দুরাজা ডোগরাদের রাজত্বকাল শুরু হয়। ভারতের স্বাধীনতালাভের পূর্ব পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীর এই রাজপুত ডোগরাদের অধিকারে ছিল। ভারতের স্বাধীনতা -উত্তর যুগে কাশ্মীর বিভক্ত হয় এবং 'আজাদ কাশ্মীর' নামক কাশ্মীরের পশ্চিমাঞ্চল পাকিস্তানের কবলিত হয়।

কাশ্মীরের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ধর্ম, জাতি, উপজাতি ও ভাষা সমন্বয়ে যেমন সহিষ্ণু, ধর্মনিরপেক্ষ নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যসৃষ্টিতে তেমন সৃজনশীল। হিন্দুযুগে বহু মনীষী কাশ্মীরে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের সাহিত্যসম্ভার নিয়ে। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস তাই দামোদর, অভিনবগুপ্ত (খ্রী. ৯৫০-১০২৫), কল্‌হণ, বিল্‌হণ প্রভৃতি সর্বভারতীয় লেখকদের অবদানে সমৃদ্ধ হতে পেরেছে। শৈবতান্ত্রিক দর্শনের 'ত্রিক' প্রস্থানও

কাশ্মীরে বিকশিত হতে পেরেছিল। জয়াপীড়ের (খ্রী. ৯ম শতক) রাজদরবারে স্থান পেয়েছিলেন ক্ষীরস্বামী, উদ্‌ভট, দামোদর গুপ্ত, বামন ইত্যাদি। কাশ্মীরের 'আকবর' জইনুল-আবিদিন-এর রাজত্বকালে (খ্রী. ১৪২০-৭০) তাই যেমন মহাভারত ও রাজ-তরঙ্গিণী ফারসীতে অনূদিত হয়েছিল, তেমনি বহু আরবী, ফারসী গ্রন্থও প্রাচীন হিন্দুস্থানীতে অনূদিত হয়েছিল।

যাই হোক, কাশ্মীরে সংস্কৃত রচনা নিদর্শন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেলেও প্রাকৃত স্তরের ভাষানিদর্শন তেমন মেলে না। আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলির উদ্ভব কাল আনুমানিক দশম শতক। কাজেই এই সময়সীমার পূর্বে অন্তত কাশ্মীরীর পূর্বতন রূপ কাশ্মীরী প্রাকৃত বা কাশ্মীরী অপভ্রংশের নিদর্শন পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা যথেষ্ট মেলেনি। রাজতরঙ্গিণীতে অবশ্য একটি ক্ষুদ্র পংক্তি পাওয়া যাচ্ছে: রঙ্গস্স হেলু দিণ্ণ [রঙ্গকে হেলু (গ্রাম) প্রদত্ত হলো], কিন্তু এটিকে যথার্থ কাশ্মীরী অপভ্রংশ বলা চলে না।[১] অভিনবগুপ্তের (১০ম শতক) 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে আরও দুটি অপভ্রংশজাতীয় কবিতা মেলে। এইরূপ গোরক্ষনাথের (নামান্তরে মহেশ্বরানন্দ) 'মহার্থমঞ্জরী' (খ্রী. ১২০০) নামক গ্রন্থে কিছু প্রাকৃত শ্লোক মেলে, কিন্তু তা মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত।

ঐতিহাসিক বিবর্তন বিচারে কাশ্মীরী সাহিত্যকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়:

(১) প্রাচীন যুগ (কালসীমা খ্রী. ১২০০-১৫০০)।

(২) মধ্য যুগ (খ্রী. ১৫০০-১৮০০) এবং

(৩) আধুনিক যুগ (খ্রী. ১৮০০ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত)।

কাশ্মীরী ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন শিতিকণ্ঠ আচার্যের সংস্কৃত গ্রন্থ 'মহানয়-প্রকাশে' উদ্ধৃত চার পংক্তির ৯৪টি স্তবক। গ্রীয়ার্সনের মতে, গ্রন্থটির রচনাকাল আনুমানিক ১৫শ শতকের শেষ পাদ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটি আরও প্রাচীন, অন্তত ১৩শ শতকের রচনা। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু, তৎকালীন কাশ্মীরে প্রচলিত শৈবতান্ত্রিক দর্শন। ভাষাদর্শও প্রায় চর্যাপদের মতো পুরোনো ধরণের এবং দুর্বোধ্য। অধ্যাপক পৃথ্বীনাথ পুষ্প্ 'ছুম্ম সম্প্রদায়' নামক আর একটি গ্রন্থ আবিষ্কার করেছেন, গ্রন্থটি ৭৪টি শ্লোকসমন্বিত আর ভাবে ও ভাষায় তা মহানয়প্রকাশের সমসাময়িক। চতুর্দশ শতকের নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ কবি শৈব-সন্ন্যাসিনী লল্লা দিদি বা লাল্ দেদ্ (খ্রী. ১৩৩৫-৮৩/৮৬)। লল্লার ১১০টি কবিতা গ্রীয়ার্সন ইংরেজীতে অনুবাদ ও সম্পাদনা ক'রে প্রকাশ করেন (রয়েল এশিয়াটিক

১ Chatterji: LLMI, p. 257

সোসাইটি লণ্ডন, ইং ১৯২৩)। তাঁর রচিত গানগুলি এখনও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কাশ্মীরীদের মুখে মুখে ফেরে। কথিত আছে, তিনি কাশ্মীরের স্থফী সাধক ও ইসলাম-ধর্মের প্রচারক শাহ্ হম্‌দানী-র দ্বারা প্রভাবিত হন এবং ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। যাই হোক, এর ফলেই হয়তো তাঁর রচনা রহস্যবাদে স্থফী মতবাদের সমধর্মী। হিন্দু ও মুসলিমদের কাছে তাই তিনি লল্লা যোগীশ্বরী অথবা লাল আরীফা নামে পরিচিত। হিন্দু ও মুসলমানদের কাছে সমান জনপ্রিয় আর একজন স্থফী সাধক-কবি হলেন শাহ্ নূরউদ্দীন (খ্রী. ১৩৭৭-১৪৪০)। হিন্দুদের কাছে তিনি নন্দ র্যোশ্ বা 'নন্দ ঋষি' নামে পরিচিত। তাঁর রচিত কবিতাবলী বা 'শ্রুক্', 'ঋষিনামা' বা 'নূর-নামা' নামে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে, যদিও পদাবলীর বেশ কিছু অংশ প্রক্ষিপ্ত। এই কাব্যগ্রন্থে কবির গভীর ভগবৎপ্রেম এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গী চমৎকার ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

পঞ্চদশ শতকে বোধ হয় কাশ্মীরী সংস্কৃতির একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে। এই পর্বে স্থফী ধর্ম-বিভাবনার সুষ্ঠু পরিবেশ, ধর্ম ও জাতিগত সমন্বয় এবং রাজদরবারের আনুকূল্যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গ'ড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রচনার বিষয়বস্তুও বিস্তৃততর হলো, ভাষাদর্শও সর্বতোমুখী হলো। এই পর্বের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন বস্তুত কাশ্মীরের 'আকবর' গুণগ্রাহী রাজা 'জইনুল আবিদিন (রাজত্বকাল খ্রী. ১৪২০-৭০)। সংস্কৃত ও ফারসী—দুয়েরই অনুরাগী, হিন্দু ও মুসলমান—দুই ধর্মেরই পৃষ্ঠপোষক এই রাজার রাজসভা বহু কবি ও মনীষী অলংকৃত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উথসোম, যোধভট্ট, ভট্ট অবতার প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের অনেকেই তাঁদের পৃষ্ঠপোষক আবিদিনের জীবনী ('জৈন') তাঁদের রচনার বিষয়বস্তু করেছিলেন। এই জীবনীগুলি অবশ্য অধুনালুপ্ত। অজ্ঞাত কবির লেখা 'বাণাসুরবধ' সম্ভবত কাশ্মীরী ভাষায় রচিত প্রথম কাহিনীকাব্য। এতদ্ব্যতীত দুইজন সংস্কৃতজ্ঞ জইনুলের আনুকূল্যে কল্‌হণের প্রসিদ্ধ কাশ্মীর-ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী'র (১১৫০ খ্রী. পর্যন্ত) পরবর্তী অংশ রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। 'রাজতরঙ্গিণী'র ফারসী অনুবাদক মুল্লা আহ্‌মদ মহাভারতও ফারসীতে অনুবাদ করেন। এছাড়া ফারসী কবি 'জামি'-র লেখা য়ুসুফ জুলেখা সংস্কৃতে অনূদিত হয়েছে, অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীবর।

মধ্যযুগের (১৫০০-১৮০০ খ্রী.) কাশ্মীরী সাহিত্যে ক্রমশই ফারসীর প্রভাব বাড়তে থাকে এবং তদনুপাতে সংস্কৃতের প্রভাব কমে। ধর্মেও ইসলামের প্রাধান্য সুস্থির হয়, কিন্তু স্থফী আবহাওয়া টিঁকে থাকে। তাই এই পর্বে বহু আরবী-ফারসী ধ্রুপদী সাহিত্য কাশ্মীরী লেখকগণ আত্মস্থ করেন, ফলে আরবী-ফারসী সাহিত্যে প্রচলিত য়ুসুফ-জুলেখা, খুসরৌ-শীরীন, লয়লা-মজনূন প্রভৃতি অনেক প্রেম-কাহিনী কাশ্মীরী

সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। পাঞ্জাব থেকেও আহৃত কিছু রোমান্টিক গল্প কাশ্মীরী ভাষায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

এই পর্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাময়ী নারী-কবি হব্ব খোতুন (১৫৫১-১৬০৬ খ্রী.)। কাশ্মীরী সাহিত্যে তাঁর দান 'লোল' (আকৃতি) নামে কয়েকটি গীতিকবিতা—যা অতুলনীয় প্রেম এবং জীবনের জয়গান। এই যুগের অন্যান্য কবির নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যথা—খ্বাজা হবীবুল্লা নওশহ্‌রী (?—১৬১৭), হিন্দু কবি সাহিব কৌল, মহিলা কবি রূপ ভবানী (খ্রী. ১৬২৪-১৭২০), মুল্লা ফাথির ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে সাহিব কৌল হিন্দু পুরাণের বিষয় নিয়ে 'কৃষ্ণ অবতার' ও 'জনম-চরিত' রচনা করেছিলেন। এর পরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাশ্মীরের তৃতীয় মহিলা কবি অরণী মাল্ (হলুদ ফুলের মালা), ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। লাল দেদ্ এবং হব্ব খোতুন-এর মতো তাঁরও বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না। স্বামী পরিত্যক্তা অরণীমাল্-এর মধুর খণ্ডকবিতায় বিরহবেদনা ও প্রকৃতিপ্রেম তীব্র হয়ে ওঠেছে। ১৮শ শতকের আর একজন বিখ্যাত হিন্দু কবি প্রকাশ রাম (দিবাকর প্রকাশভট্ট নামেও পরিচিত) কাশ্মীরী ভাষায় 'রামাবতার চরিত' এবং পরবর্তী খণ্ড 'লবকুশ যুদ্ধ চরিত' লিখে বিখ্যাত হন (গ্রীয়ার্সন কর্তৃক ইং ১৯৩০ সালে প্রকাশিত)। মীর আবদুল্লা বৈহকী (?-১৮০৭) রচিত গীতিকবিতা-সংকলন 'কোশীর-অকৈদ' এবং ধর্মীয় কাব্য 'মুখ্‌তসর ওয়্‌কায়', গঙ্গাপ্রসাদ রচিত 'সংসার-মায়া-মোহজাল সুখ দুঃখ চরিত' প্রভৃতি গ্রন্থের নামও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

আফগানী শাসনের অবসান ও রণজিৎ সিং কর্তৃক কাশ্মীর বিজয় (ইং ১৮১৯) থেকে আধুনিক কাশ্মীরী যুগের সূচনা। এই যুগে লাহোরের সঙ্গে কাশ্মীর যুক্ত হলো এবং সেই সঙ্গে উর্দু ও ইংরেজীর সঙ্গে কাশ্মীরীর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলো।

১০.১.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

কাশ্মীরী ভাষার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি[১] সংক্ষেপে এই—স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির অপিনিহিতি। সর্বনামশ্লিষ্ট (Pronominalised) বিভিন্ন প্রত্যয়ের প্রয়োগ-বাহুল্য। সংস্কৃতের তুলনায় কাশ্মীরী স্বরধ্বনির বৈচিত্র্য। অপর বৈশিষ্ট্য 'মাত্রা' স্বরধ্বনি—যেগুলি প্রায় অশ্রুত হয়ে পূর্ববর্তী অক্ষরকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। সংস্কৃত বর্ণমালার মহাপ্রাণিত ঘোষবর্ণগুলি অর্থাৎ ঘ, ঝ, ভ, ধ ইত্যাদি কাশ্মীরীতে সম্পূর্ণ লুপ্ত। মূর্ধন্য ধ্বনি (অর্থাৎ ট, ঠ, ড, ঢ) দন্ত্য ধ্বনিতে পরিণত (অসমীয়ার মতো)। ষ-এর ব্যবহারও সীমিত। তালব্য চ, ছ, জ প্রভৃতি ধ্বনিগুলিও আংশিক বিকৃত। পদান্ত অল্পপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি মহাপ্রাণিত।

লিঙ্গ দুটি—পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ, তবে সর্বনামের ক্ষেত্রে লিঙ্গ তিনটি (পুং, স্ত্রী ও ক্লীব)। বিশেষ্যের দুই বচন (একবচন ও বহুবচন)। কারক চারটি (কর্তৃ, কর্ম, অপাদান ও করণ)। এছাড়া অনুসর্গের প্রয়োগও দ্রষ্টব্য। বিশেষণ বিশেষ্যের লিঙ্গ, বচন ও কারক গ্রহণ করে থাকে।

ধাতুরূপ প্রধানত কৃদন্তমূলক। কাল তিনটি—বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও অনুজ্ঞা। অন্ত্যর্থ ক্রিয়ার কাল দুটি—বর্তমান ও অতীত। কাশ্মীরী ভাষার শব্দভাণ্ডারে আরবী-ফারসীর প্রভাব যথেষ্ট। এমনকি ছন্দপ্রকরণেও ফারসীর প্রভাব সহজ দ্রষ্টব্য।

---

১ Grierson : LSI, Vol. VIII, part ii, pp. 233-41 ; Grierson : Essays on Kacmiri Grammar, Calcutta 1899 ; Grierson : Manual of Kashmiri Language, London, 1911 ; T. Baily Graham : The pronunciation of Kashmiri, London, 1937 ; Chatterji : LLMI, p. 81 ; সুভদ্রকুমার সেন ঃ কাশ্মীরী ভাষা (ঃ ভারতকোষ, ২য় খন্ড, পৃ: ৩১১-১২)।

॥ ১১ ॥

দক্ষিণ ভারতের প্রধান ভাষা

১১.১ তামিল

১১.১.১ ভাষিক পরিস্থিতি

তামিল তামিলনাড়ুর (পূর্বতন মাদ্রাজ) সরকারী ভাষা। এই ভাষা ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম অনুসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বর্তমানে তামিলনাড়ু একটি সংহত ভাষাতাত্ত্বিক অবয়বে স্বীকৃত হয়েছে। দক্ষিণ কানাড়ার এবং কিছুটা মালাবার জেলা যেমন মহীশূর ও কেরালার অন্তর্গত হয়েছে, তেমন কেরালারও কিছু অংশ ও কন্যাকুমারিকা তামিলনাড়ুর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১৯৫৬ সালের রাজ্যপুনর্গঠন বিধি অনুযায়ী। তামিলনাড়ুর সাম্প্রতিক ভৌগোলিক সীমানা দাঁড়িয়েছে এই: উত্তরে মহীশূর ও অন্ধ্র, পূর্বে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এবং কেরল, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণ-পূর্বে মান্নার উপসাগর ও পক্ প্রণালী। সর্ব দক্ষিণ প্রান্ত অবশ্য কন্যাকুমারী অন্তরীপ। বলা বাহুল্য, মাদ্রাজ ভারতের সর্বদক্ষিণ রাজ্য (এবং ১২টি জেলায় বিভক্ত)।

ইং ১৯৬১ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতে তামিল ভাষীর সংখ্যা ৩ কোটি ৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৭০৬ (তামিলনাড়ুতে ২,৮০,১১,০৯৯, মহীশূরে ৮,৫৪,২২৭ এবং কেরালায় ৫,২৭,৬১৩)। কিন্তু ১৯৭১-এর সমীক্ষায় তামিলভাষীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ ৯২ হাজার ৭৯৪। ভারতের বাইরে—সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয় এবং অন্যান্য ইন্দোনেশীয় দেশে, এমনকি দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকাতেও তামিল ভাষীরা ছড়িয়ে পড়েছেন সুদূর অতীতকাল থেকেই।

বর্তমান তামিল প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত: (ক) সাহিত্যিক তামিল এবং (খ) কথ্য তামিল। কথ্য তামিলের আবার যথেষ্ট উপভাষা-বৈচিত্র্য দেখা যায়। এগুলি সংখ্যায় সাতটির কম নয়, যথা—

১. কন্যাকুমারীর উপভাষা।

২. তিরুনেলভেলি এবং রামনাদ জেলার দক্ষিণী উপভাষা।

৩. মধ্যদেশীয় উপভাষা—যার প্রচলন মুখ্যত মাদুরাই এবং ত্রিচি জেলায়।

৪. পশ্চিমী উপভাষা (কোইম্বাটোর জেলা)।
৫. পূর্বী উপভাষা (তাঞ্জোর এবং দক্ষিণ আরকোট জেলা)।
৬. মাদ্রাজী উপভাষা (মাদ্রাজ শহর এবং চেঙ্গলপেট) এবং
৭. উত্তরদেশীয় উপভাষা (উত্তর আরকোট জেলা)।

আরও উপভাষা-বৈচিত্র্য দেখা যায় প্রান্তিক ভাষাঞ্চল গুলিতে, কারণ, এই অঞ্চলগুলিতে তেলুগু, কন্নড়/কানাড়ী এবং মালয়ালম্ ভাষার অবাধ মিশ্রণ ঘটে থাকে। তামিল ভাষার ক্ষেত্রে সামাজিক উপভাষার বিভেদও ভাষাতাত্ত্বিকের কৌতূহল উদ্রেক করে। ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, এমনকি ভাষাতাত্ত্বিক অবয়ব-গঠনেও ব্রাহ্মণ এবং তথাকথিত নিম্ন বর্ণের ভাষার আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখা যায়।[১]

যাই হোক, তামিলনাড়ুর জাতীয় আদর্শ ভাষা হলো এই কথ্য ভাষা উদ্ভূত। এই সর্বজনস্বীকৃত আদর্শ কথ্য ভাষা আসলে কিন্তু প্রধানত পূর্বী উপভাষাশ্রিত—যদিও তাতে সংলগ্ন উত্তরাঞ্চলীয় উপভাষার মিশ্রণ আছে। এই আদর্শ ভাষা প্রায় সমস্ত উপভাষাঞ্চলেই বোধগম্য আর তাতে স্থানিক প্রভাব কিছু-না-কিছু রয়ে গেছে। কিন্তু লক্ষণীয়, এই ভাষার কোনো স্বীকৃত লিপিবিধি নেই অথবা নেই কোনো লিখিত ব্যাকরণ, অথচ মৌখিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এর একছত্র আধিপত্য। বর্তমানে এর ক্ষেত্র আরও প্রসারণশীল—সিনেমা, রেডিও, থিয়েটার, এমনকি গল্প-উপন্যাসেও এর প্রয়োগ ক্রমবর্ধমান।

অপরদিকে সাধু ভাষার সঙ্গে কথ্য ভাষার ব্যবধান যথেষ্ট—ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব এমনকি শব্দভাণ্ডারের ক্ষেত্রেও। আসলে সাধু ভাষা গ'ড়ে উঠেছে পূর্বী জেলাগুলির প্রাচীন ভাষান্তরকে আশ্রয় ক'রে—যা প্রধানত প্রাক্স্তরীয় চেন্-তামিল ভাষায় (খ্রী. ৫০০) উদাহৃত হয়েছে। এই সাধু ভাষা মুখের ভাষা নয়, বিশেষ শিক্ষণ ছাড়া একে আয়ত্ত করা কঠিন। তাই এই ভাষা শিক্ষিত জনের কেতাবী ভাষা হয়ে আছে। বস্তুত, বর্তমান বাঙলা ভাষায় যে সাহিত্যিক ও কথিত রূপের ভেদ দেখা যায়, তামিলের ক্ষেত্রে সে-পার্থক্য বহুগুণে বেশি। এই সাধু ভাষাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ বর্তমান সাধু ভাষা সাধারণত পত্র-পত্রিকায়, চিঠিপত্রে অথবা গ্রন্থে ব্যবহৃত ; অপর পক্ষে ধ্রুপদী সাহিত্য ভাষা প্রধানত কাব্যের ভাষা—যা প্রাচীন সাহিত্যেই মুখ্যত ব্যবহৃত হতো আর যা প্রায় দেড় হাজার বছর ধ'রে বিভিন্ন স্তর

১ W. Bright and A. K. Ramanujam : Socio-linguistic Variation and Language Change (: SL pp. 157-166).

অতিক্রম ক'রে একটি স্থিরীকৃত আদর্শে গ'ড়ে উঠেছে। বর্তমানে আবার ব্রাহ্মণরা তামিলে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের বাহুল্য ঘটাচ্ছেন, কিন্তু অন্যদের ঝোঁক হচ্ছে সংস্কৃত-বহিষ্কার। এখনকার সাধারণ শিক্ষিত তামিলরাও তাই অষ্টাদশ শতকের তামিল সাহিত্য বুঝতে পারেন না। অন্যদিকে কথিত তামিলের বিভিন্ন রূপ সাহিত্যের প্রয়োগে নিষিদ্ধ হয়ে আছে।

তামিলের নিজস্ব লিপি আছে। এই লিপি প্রাচীন ব্রাহ্মীর দক্ষিণদেশীয় বিভেদ অর্থাৎ গ্রন্থলিপি থেকে বিবর্তিত। প্রাচীনতম তামিললেখ বট্টেঝু.ত্তু লিপিতে লিখিত। আধুনিক তামিল লিপিতে বট্টেঝু.ত্তু থেকে বেশ কিছু হরফ ধার করা হয়েছে। তামিল মুসলিমরা অবশ্য ফারসী-আরবী লিপি ব্যবহার করে থাকেন।

ভারতীয় লিপিগুলির মধ্যে বোধ হয় তামিলই সর্বাপেক্ষা অসম্পূর্ণ লিপি। এই লিপি প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টীয় ৫ম শতকে ব্যবহৃত প্রাচীন তামিলের প্রতিচ্ছবি। তাই উচ্চারণে ঘোষ/অঘোষ বিভেদ থাকলেও বর্ণ (Grapheme) একটি অর্থাৎ অঘোষ অল্পপ্রাণ বর্ণ (যেমন ক্, গ্ স্থলে কেবল ক্)। এইরূপ তামিলে ৩০টি বর্ণ আছে— স্বরবর্ণ হ্রস্ব/দীর্ঘ ভেদে ১২টি (a, ā, i, ī, u, ū, e, ē, o, ō. ai, au) এবং ব্যঞ্জন বর্ণ ১৮টি, যথা—কণ্ঠ্য k, ṅ ; তালব্য c, ñ, মূর্ধন্য ṭ, ṇ, দন্ত্য t, n, ওষ্ঠ্য p, m, দন্তমূলীয় ṯ, ṉ, অর্ধস্বর y, w, তরল r, l, ḷ, উষ্ম ঘোষ মূর্ধন্য z´ (অথবা ḻ)।

এছাড়া সংস্কৃত শব্দের উপযোগী করার জন্য গ্রন্থলিপি থেকে পাঁচটি বর্ণ ধার করা হয়েছে, যথা—জ, ষ, স, হ, ক্ষ—যদিও গোঁড়া তামিলভাষীরা পারতপক্ষে এই বর্ণগুলি ব্যবহার করেন না। সংস্কৃতের তুলনায় তামিলে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি অপেক্ষাকৃত কম। তামিল লিখন পদ্ধতিতে যুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার একেবারেই নেই। লক্ষণীয়, তামিল বর্ণমালায় শ, ষ, স এবং হ নেই।

১১.১.২ ভাষা ও সাহিত্য

তামিল ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায়[১]—

১ ॥ আদি তামিল (Ancient Tamil) : ?—খ্রীষ্টীয় ৫০০।

২ ॥ প্রাচীন তামিল (Old/Classical Tamil) : খ্রী. ৫০০-১৩৫০। পল্লব, চালুক্য ও চোড় সাম্রাজ্যকালীন ভাষা। তামিলে এই প্রাচীন তামিলকে বলা হয় পঝ.ন-তমিঝ. (Paz´an-Tamiz´) এবং চেন-তমিঝ. (Cen-Tamiz´, উচ্চারণে কতকটা 'শেন্দমিড়')।

---

১ Chatterji : LLMI pp. 306-331 ; Nigam : LH pp. 318-22 ;

৩ ॥ মধ্যযুগীয় তামিল বা ইটেইৎ-তমিঝ. (Itai-t-Tamiź): খ্রীষ্টীয় ১৩৫০-১৮০০। উত্তর-চোড়, বিজয়নগর যুগ এবং মাদুরার নায়কদের সমকালীন ভাষা।

৪ ॥ আধুনিক তামিল বা পুতুৎ-তমিঝ. (Putu-t-Tamiź/Pu-t-Tamiź) অথবা গ্রাম্য তামিল (Vulgar Tamil) বা কোড়ুন তমিঝ. (Koḍun-Tamiź): ইং ১৮০০ সনের পরবর্তী যুগ অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনের যুগ।

তামিল ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রায় দু' হাজার বছরের পুরোনো, ভাষাও তাই যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছে। আর এই পরিবর্তন এমনই সুদূরপ্রসারী যে প্রাচীন তামিল এখন বর্তমান তামিল ভাষীদের কাছেও বিশেষ শিক্ষণ ব্যতীত বোধগম্য হয় না।

তামিলের বিবর্তন ধারাকে একটি বিশেষ ধ্বনিসূত্রের (Phonetic Law) মানদণ্ডে বিচার করা যেতে পারে। আদি তামিলে (ধরা যাক্ খ্রীষ্টীয় শতকের সূচনায়) সংস্কৃত 'ভগবান্' শব্দটি উচ্চারিত হতো 'বগৱন্' রূপে। প্রাচীন তামিলে (আ. খ্রী. ৫০০) তার পরিণতি 'পকৱন্' (পল্লব লিপিতে লিখিত)। মধ্য তামিল পর্যন্ত (১৩৫০ খ্রী.) এইরূপ ঘোষ ধ্বনির অঘোষ উচ্চারণ বজায় ছিল। খ্রী. ১৩৫০-এর পর মধ্য তামিলে (ইটেইৎ তমিয়্র.) তা উচ্চারিত হতো 'পগৱন্' রূপে। অর্থাৎ এইখানে স্বরমধ্যগত (অথবা নাসিক্য ব্যঞ্জনের অন্তস্থিত) অঘোষ ব্যঞ্জন ঘোষবৎ হলো। আধুনিক তামিলে প্রাচীন লিখন ধারা অনুযায়ী 'পকৱন্' লিখিত হলেও উচ্চারণে তা 'পগৱন্' রয়ে গেল—যদিও স্বরমধ্যগত এই ঘোষধ্বনি কতকটা উষ্মীভূত (ক্>গ>গ. [γ]; এইরূপ ত্>দ্>দ. [δ], ট>ড্>ড় ইত্যাদি)।

মধ্যযুগীয় তামিলের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো: দন্তমূলীয় ত্' এবং ত্ত্, ন্ত> প্রবল-কম্পিত ৱ্ এবং ত্র্, ন্দ; চ>শ, স। আর এই বৈশিষ্ট্যগুলি আধুনিক তামিলেও কতকটা রক্ষিত আছে।

দ্রাবিড় ঐতিহ্য[১] অনুযায়ী আদি তামিল সাহিত্যকে 'সংগম' সাহিত্যও বলা হয়। আনুমানিক খ্রীষ্ট পূর্ব ৫ম/৪র্থ শতক থেকে খ্রীষ্টীয় ৫০০ অব্দ পর্যন্ত প্রসারিত এই 'চঙ্কম' বা 'সংগম' যুগ। তামিল কিংবদন্তী অনুযায়ী খ্রীষ্টপূর্বীয় বহু শতক পূর্বে দক্ষিণের বহু কবি অথবা চারণকবি তিনটি সম্মিলিত সাহিত্য সভায় উপস্থিত

---

১ Chatterji: Dravidian, Annamalai University, 1965; A. M. Dyakov: The National Problem in India today, pp. 112-16, Moscow, 1966

হয়েছিলেন আর তাদের সার্বিক সাহিত্যকর্ম সংকলিত হয়ে আছে সংগম সাহিত্যে। প্রথম সম্মেলনে নাকি দেবতারা সম্মিলিত হয়েছিলেন—কিন্তু এই পর্বের সংকলিত সাহিত্য লুপ্ত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় সম্মেলনে প্রাচীন তামিল ব্যাকরণ 'তোল্‌কাপ্পিয়ম্' রচিত হয়েছিল—যদিও প্রকৃতপক্ষে তা অনেক পরবর্তী যুগের রচনা (আ. খ্রী. ৫০০)। তামিল কিংবদন্তী অনুযায়ী তৃতীয় সম্মেলনের যুগ আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ শতকে। এই পর্বে দু' হাজার কবিতার আটটি সংকলন সংগৃহীত হয়েছিল এবং এগুলি রক্ষা পেয়ে গেছে (কিন্তু ভাষা বিচারে এগুলিও অর্বাচীন)। মোট কথা, সংগম যুগের সাহিত্যকর্মকে যতটা প্রাচীন বলা হয়ে থাকে, ভাষা বিচারে তা ততটা প্রাচীন নয়। কারণ আদি পর্বের তামিল ব'লে যাকে উপস্থাপন করা হয়, তা আসলে ভাষাবিচারে 'চেন-তমিঝ়' বা প্রাচীন তামিলের অন্তর্গত, স্বভাবতই তার বয়স খ্রীষ্টীয় ৫০০ অব্দের বেশি নয়।

বলা বাহুল্য, এইজাতীয় সংকলন-সাহিত্য বৈদিক সংকলনের কথা মনে করিয়ে দেয়, হয়তো বা তা বৈদিক ধারণার দ্বারা প্রভাবিত। সাহিত্যিক সম্মেলনের ধারণাও যেন খ্রীষ্টপূর্ব যুগের তিন বৌদ্ধ সংগীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় (রাজগৃহ, বৈশালী, পাটলিপুত্র)। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে আধুনিক তামিল সাহিত্যের সঙ্গে সংগম যুগের সাহিত্য-কর্মের এক নিবিড় বন্ধন রয়ে গেছে আর দ্বিতীয়ত, তামিল সাহিত্যের আদি প্রেরণা উত্তরাপথের সাহিত্যের মতো ধর্মীয় অনুভবে উৎসারিত হয় নি—সে-সাহিত্যের মধ্যে মানবীয় শৌর্য-বীর্য গাথা, প্রেম-প্রকৃতি ইত্যাদির কবিতা প্রচুর। তৃতীয়ত, আদি তামিল যুগে রচনার অপ্রতুলতা থাকলেও (অন্তত ঐতিহাসিক বিচারে) সেই যুগ এবং সাহিত্যিক ঐতিহ্য স্বীকার করে নিতেই হয় আর তার সবচেয়ে বড়ো কারণ হলো এই যে এই অনুমিত যুগে এককালে নিশ্চয়ই ধ্বনিগুলির (বিশেষত ব্যঞ্জনধ্বনি) পূর্ণাঙ্গ উচ্চারণ-রীতি বজায় ছিল এবং তখন লিপিরীতি ও উচ্চারণরীতির পার্থক্য ছিল না।

পুরোনো তামিলের সর্বপ্রথম নিদর্শন বোধহয় 'তোল্‌কাপ্পিয়ম্'। রচনাটি একটি ব্যাকরণসন্দর্ভ, লিখিত হয়েছে সূত্রাকারে। গ্রন্থটিতে ১৬০০ সংখ্যার অধিক সূত্র আছে, রচয়িতা 'তোল্‌কাপ্পিয়র' (কিংবদন্তী অনুযায়ী তিনি অগস্ত্যমুনির (তামিলে অকত্তিয়র) শিষ্য বা প্রশিষ্য। রচনাটি লিখিত হয়েছিল সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ৫০০ অব্দে, কারণ এই শতকে প্রচলিত ভাষার ব্যাকরণ রচনাই ছিল এই গ্রন্থের উপজীব্য। এই যুগের ভাষা চেন-তমিঝে.র বর্ণ, ধ্বনি, পদ, বিভক্তি ইত্যাদির বিবরণই কেবল এখানে আলোচিত হয়নি, সেই সঙ্গে কাব্যের বিষয়বস্তু, যেমন, প্রেম, যুদ্ধ, প্রকৃতি ইত্যাদি বহু বিষয় এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

প্রাচীন তামিল সাহিত্যের (খ্রী. ৫০০-১৩৫০) নিদর্শন বেশির ভাগই সংকলন-গ্রন্থাকারে পাওয়া গিয়েছে, কিছু কিছু দীর্ঘ কবিতাও মেলে। এদের মধ্যে প্রধান হলো—

১. পত্তু-প্-পাট্টু (গীতিকাব্য-দশক): এই কবিতাগুলি আট জন কবির দ্বারা রচিত এবং প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বিভিন্ন রাজগণকে উৎসর্গীকৃত। কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নক্কীরার (৬ষ্ঠ ও ১০ম মণ্ডলের রচয়িতা) এবং ইরুত্তিরণ্ কণ্ণনার্ (=রুদ্রকৃষ্ণ, ৪র্থ এবং ২য় মণ্ডলের রচয়িতা)। উপরোক্ত সংকলনে তদানীন্তন তামিল সংস্কৃতির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়; প্রাচীন তামিলদের ধর্মীয় ধারণা, দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, যুদ্ধ-শান্তি, নগর ও গ্রাম্য জীবন, রাজবন্দনা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইত্যাদি বহু বিষয় সহজ সরল সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে বিশ্বসাহিত্যে স্থান ক'রে নিয়েছে।

২. এট্টুত্তোকই (অষ্ট-সংগ্রহ): এই অষ্টকের মধ্যে প্রধান রচনা হলো 'পতিরুপ্পাত্তু'—গ্রন্থটিতে দশজন কবির দশটি ক'রে কবিতা সংকলিত হয়েছে। এইরূপ আর একটি কাব্য-সংগ্রহ হলো 'পরিপাটল'—গ্রন্থটিতে তামিল, দেবদেবী যেমন, বিষ্ণু (তিরুমাল্) এবং মুরুকন্, বইকই নদী, মদুরাই শহর এবং সমুদ্রের স্তুতিবন্দনা করা হয়েছে।

এই যুগে উপরোক্ত কাব্যগ্রন্থ দুটি ছাড়াও আরও পাঁচটি দীর্ঘ আখ্যান-মূলক কাব্য রচিত হয়েছিল—এগুলি একত্রে 'পঞ্চকাব্যম্' রূপে অভিহিত হয়। এগুলিকে মহাকাব্যও বলা চলে। রচয়িতাগণ সকলেই সংগম যুগের কবি ব'লে চিহ্নিত। কাব্যগুলি এই—

৩. চিলপ্পতিকারম্ (নূপুর গাথা): কাব্যটি ইলম্কো-ব্-অটিকল. নামক একজন জৈন ধর্মাবলম্বী চের রাজপুত্রের রচনা। এটি একটি বিয়োগান্তক রোমান্টিক গাথা।

৪. মণি-মেকলৈ: রচনাকার ছিতলৈ-চ্-ছত্তনর্ ছিলেন বৌদ্ধ। কাব্যের নায়িকা মণিমেকলৈ প্রেমিক রাজপুত্রের বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর জীবন বরণ করেছিলেন। গ্রন্থটিতে সে-যুগের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি, বৌদ্ধ ও জৈন এবং অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের আচার-আচরণ ও মতবাদ প্রতিফলিত হয়েছে।

বলা বাহুল্য, পঞ্চকাব্যগুলির মধ্যে 'চিলপ্পতিকারম্' এবং 'মণিমেকলৈ' কাব্য দুটিকে আদি তামিলের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা যায়। অপর তিনটি কাব্য (৫) জৈনকবি তিরুৎতক্ক-তেবর রচিত 'চীবক-চিন্তামণি', (৬) বৌদ্ধ ধর্মমূলক 'কুণ্টল-কেচি' এবং (৭) বলৈ.য়াপতি মূলত উত্তর ভারতীয় প্রভাবে প্রভাবিত এবং অনেকাংশে কৃত্রিম।

এই যুগে রচিত অপর কাব্য হলো (৮) পেরুম্কতৈ : জৈন কবি কঙ্কু-বেলির এর রচয়িতা। গ্রন্থটি কৌসাম্বীর রাজা উদয়ন এবং উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোতের কন্যা বাসবদত্তার প্রেমকাহিনী নিয়ে রচিত। কাব্যটি পৈশাচী প্রাকৃতে লিখিত লুপ্ত গ্রন্থ 'বৃহৎকথা'র জনপ্রিয় কাহিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রাচীন সাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো, ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের উত্তর-যুগে রচিত ১৮টি নীতিগর্ভ কবিতার সংকলন: পতিনেন-কীড়্-ক্-কণক্কু। এই ১৮টি সংকলনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো তিরু-ব্লু.বর রচিত 'কুরল'। কবি নীচকুলোদ্ভব কিন্তু তিনি কোন্ ধর্মাবলম্বী তা জানা যায় না—হিন্দু এবং জৈন উভয় সম্প্রদায়েরই তিনি স্বীকৃত কবি। সে যাই হোক, ঈশ্বরের সঙ্গে মানবীয় সম্পর্ক স্থাপন, কাব্যধর্মিতা এবং তত্ত্বজ্ঞান ইত্যাদির সমন্বয়ে কাব্যটি সমুচ্চ মহিমায় উত্তরিত হয়েছে। এই কাব্যটি ইংরেজী, ল্যাটিন ছাড়াও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় এবং বাঙলা ও হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে।

প্রাচীন তামিল সাহিত্যে শৈব ও বৈষ্ণব কবিদের রচনা অপ্রতুল ছিল না, কিন্তু গুপ্ত যুগ ও পল্লব রাজত্বের প্রথম দিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে তামিল সাহিত্যও উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল। ফলে খ্রীষ্টীয় ৬০০ শতকের পর থেকে শৈব ও বৈষ্ণব সন্তদের প্রভাবে সারা উত্তর ও দক্ষিণ ভারত ভক্তিবাদের জোয়ারে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

প্রাচীন সন্তদের দ্বারা রচিত শৈব স্তোত্র ও কবিতাগুলি ১১শ শতকে নম্পি-য়্-আণ্টার নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন (খ্রী. ৯৭৫-১০৩৫)। সংকলনগুলিকে বলা হয় "তিরুমুরৈ"। প্রথম সাতটি 'তিরুমুরৈ'-সংকলনকে বলা হয় 'তেবরম্'। এগুলি ছম্পন্তর (=সম্বন্ধ), অপ্পর এবং চুন্তরর্ (=সুন্দর) দ্বারা রচিত। ৮ম তিরুমুরৈ-র স্তোত্রগুলির রচয়িতা হলেন মাণিক্ক-বাচকর (৭ম-৮ম শতক)—যিনি তামিল শৈব সন্তদের মধ্যে চতুর্থ স্থানের অধিকারী এবং এই যুগের শৈব সন্তদের মধ্যে সর্বপ্রধান। এঁর কবিতা ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে। তামিলনাড়ের শৈব সন্ত ও মরমিয়া সাধকরা (সংখ্যায় ৬৩) 'নায়ম্-নার্' ব'লে অভিহিত হন, পরে অবশ্য এঁরা 'ছিত্তর' (=সিদ্ধ) নামে পরিচিত। এই সন্তদের সম্বন্ধে তামিল

দেশে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তা তামিল শৈব ধর্মসাহিত্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। এগুলি 'পেরিয়-পুরাণম্' (ঃ ছেক্কিলর, ১২শ শতক) নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে।

তামিলনাড়ের ১৮ জন বৈষ্ণব সন্ত আড়বার (āźvār বা আঝ.বার = ভগবৎ প্রেমে নিমজ্জিত ব্যক্তি) নামে পরিচিত। আড়বারগণের দিব্য উক্তিসমূহ প্রবন্ধাকারে সুরক্ষিত হয়েছে 'নাল্-আয়ির-প্-পিরপন্তম্' (=প্রবন্ধম্) নামক সংকলন-গ্রন্থে, সংকলয়িতা শ্রীনাথ মুনি (১১শ শতক)। গ্রন্থটিতে ৪০০০ শ্লোক রয়েছে। এই দিব্য প্রবন্ধাবলী 'দ্রাবিড় বেদান্ত' নামে প্রসিদ্ধ। আড়বার পদাবলীর সঙ্গে বাঙলীর কীর্তন পদাবলীর ভাব, সুর ও তালের সাদৃশ্য অনেক স্থলে দেখা যায়। এই দ্রাবিড় বেদান্ত থেকে আড়বারদের বৈরাগ্য, তত্ত্বজ্ঞান, ভগবদনুভব, প্রেমভক্তি ও ভজন ধারার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে পঞ্চভাবের সাধনা দেখা গেলেও দাস্য ও নায়িকা ভাবের প্রাধান্যই বেশি। আড়বারদের মধ্যে একজন মহিলা কবিও আছেন, নাম আণ্টাল বা আণ্ডাল, তিনি ছিলেন প্রধানত গোপীভাবের সাধিকা।

১০ম থেকে ১৩শ শতকের মধ্যে অর্থাৎ চোড় (চোল.) রাজাদের গৌরবময় যুগে আরও কয়েকজন বিখ্যাত কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। কম্পন বা কম্বন প্রাচীন সংগম যুগের শেষ কবি। তামিল ভাষায় রামায়ণের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক তিনি। অনুবাদের মধ্যে মৌলিকত্বের ছাপ আছে। আর এক কবি ওট্টক্কূত্তন রামায়ণের শেষ সর্গ (উত্তর কাণ্ড) অনুবাদ করেছিলেন। অপর কবি পুক্ঝে.ন্তি-ও সহজ ও সুন্দর ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করেন। এঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'নল-বেণ্পা' নল-দময়ন্তী কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

চোল. সম্রাটদের সময় শৈবদের এক নতুন সম্প্রদায় শৈব সিদ্ধান্ত দর্শন প্রবর্তন করেন; এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন মেয়্কান্ত-তেৱর (১৩শ শতক), ইনি 'চিব কিনান-পোতম্' (=শিবজ্ঞানবোধ) নামক একটি মৌলিক গ্রন্থের রচয়িতা। এঁর শিষ্য অরুল.-নন্তি শিবাচার্য রচিত 'চিব-কিনান-চিত্তিয়র্' (শিবজ্ঞান সিদ্ধি) তামিল শৈব দর্শনের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

১৪শ শতক থেকে তামিল সাহিত্যের মধ্য যুগের শুরু (খ্রী ১৩৫০-১৮০০)। চোল., বিজয়নগর ও মদুরাই নায়কদের কাল জুড়ে এই মধ্যযুগ। এই যুগের সাহিত্য কতকটা প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক (Institutional)। এই সময়ে রচিত কোনো মৌলিক রচনা মেলে না। পৌরাণিক, ভক্তি ও রোমান্টিক কাব্যের পূর্বধারার অনুবৃত্তিই এই যুগে অনুসৃত হয়েছে। এই যুগের কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন 'কালমেঘম্' রচয়িতা 'কুন্ত-

কোণম্', মহাভারতের অনুবাদক 'বিল্লিপুত্তরর্', 'চেদারণ্যপুরাণম্' নামক শৈব পুরাণ গ্রন্থ রচয়িতা পরন্‌জ্যোতি এবং শ্রেষ্ঠ শৈব কবি 'তায়ুমন্‌ৱর্ (খ্রী. ১৭৪২)। ১৮শ শতকে কয়েকজন মুসলমান কবিরও নাম পাওয়া যায়।

১৬শ শতকের শেষ ভাগে ক্যাথলিক খ্রীষ্টান মিশনারীরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য তামিল ভাষাচর্চার সূত্রপাত করেন। এঁদের প্রচেষ্টায় প্রথম তামিল ভাষায় লিখিত পুস্তক ইং ১৫৭৯ সালে কোচিন থেকে প্রকাশিত হয়। এই সময় থেকেই খ্রীষ্টানদের রচিত তামিল গদ্য, অভিধান ও গল্প প্রভৃতি রচিত হতে থাকে। বলা বাহুল্য, ইং ১৮৫৭ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে তামিল ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিকীকরণ ত্বরান্বিত হলো।

১১.১.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য[১]

তামিল বর্ণমালার আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে (দ্র. ১১.১.১)। উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বর্ণগুলির স্বরূপ এই :

স্বরধ্বনি : হ্রস্ব স্বর—অ /ʌ/, ই /i/, উ /u/, এ /e/, ও /o/। দীর্ঘ স্বর—আ /a/, ঈ /iː/, ঊ /uː/, এঃ /eː/, ওঃ /oː/ এবং লিখিত যৌগিক স্বর ঐ>ei, ঔ>avu (তু. তলৈ>তলেই, সৌখ্যম্>সৱুক্কিয়ম্)। আদি 'অ' ধ্বনি উচ্চারণে ক্বচিৎ কতকটা 'এ' (তু. সং বলন্>বেলন্, জপ>চেৱম্)। লক্ষণীয়, দীর্ঘ এ এবং ও ধ্বনির জন্য তামিলে নির্দিষ্ট বর্ণ আছে, যা সংস্কৃতে নেই। আবার সংস্কৃত শ, ষ, স, হ বর্ণ তামিল বর্ণমালায় নেই।

তামিল বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে বর্ণ (Grapheme) হিসেবে ক, চ, ট, ত, প এবং দন্তমূলীয় ত' /ṯ/ স্বীকৃত হলেও (তামিল বৈয়াকরণদের পরিভাষায় বল্লিনম্ বা কঠিন) এদের উচ্চারণে বৈচিত্র্য আছে। এদের উচ্চারণ সাধারণত এই সূত্র অবলম্বনে স্থিরীকৃত : (১) আদি, যুগ্ম এবং ট্/ত'-এর পরে উপরোক্ত ধ্বনিগুলির অঘোষ উচ্চারণ। (২) নাসিক্য ধ্বনির পরে ঘোষবৎ উচ্চারণ এবং (৩) স্বরমধ্যগত অথবা য়, র, ল ধ্বনির পরে উষ্ম উচ্চারণ। এই সূত্রানুযায়ী উপরোক্ত ধ্বনিগুলির উচ্চারণ দাঁড়ায়—

---

১ R. Caldwell : CGDL ; J. Bloch ; GSDL ; M. S. Andronov : The Tamil Language, Moscow, 1965 ; T. P. Meenakshi Sundaram : A History of Tamil Language ; K. Zvelebil, Yu. Glasov & M. Andronov : Introduction to the Historical Grammar of the Tamil Language, Moscow, 1967

লিখিত ক > উচ্চারণে (১) ক, (২) গ, (৩) খ. /x/।

লিখিত চ > (১) চ (ঘৃষ্ট), (২) জ (ঘৃষ্ট), (৩) স্।

লিখিত ট > (১) ট, (২) ড, (৩) তাড়িত ড় /ṛ/।

লিখিত ত > (১) ত, (২) দ, (৩) দ. /δ/।

লিখিত প > (১) প, (২) ব, (৩) ব়. /β/ (সোষ্ম ওষ্ঠ্য)।

লিখিত র,রর (r,rr) > (১) অঘোষ দন্তমূলীয় ত্' (কতকটা ত্র স্থলভ),
(২) ঘোষ দন্তমূলীয় দ' (কতকটা দ্র স্থলভ), (৩) র্।

উপরোক্ত সূত্র অনুযায়ী সংস্কৃত দন্ত > তামিল উচ্চারণে তন্দম্, মণ্ডপ > মণ্ডবম্, ভাগ্যম্ > পাক্কিয়ম্ ইত্যাদি।

এছাড়া নাসিক্য ধ্বনির (তামিল বৈয়াকরণের পরিভাষায় 'মেল্লিনম্' অর্থাৎ মৃদু) যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে—ঙ /ṅ/, ঞ /ñ/, ণ /ṇ/, ন /n/, ম /m/ এবং দন্তমূলীয় ন্'/n̲/। তামিল বৈয়াকরণদের পরিভাষায় ইডাই-ইনাম্ বা মধ্যম ধ্বনি হলো : অন্তঃস্থ ধ্বনি য়, র্, ল, ব় এবং পার্শ্বিক মূর্ধন্য ধ্বনি ল. /ḷ/ এবং উষ্ম ঘোষ মূর্ধন্যধ্বনি ঝ./ḻ/ বা /ź/ (উচ্চারণ কতকটা 'ষ্ ঝ.' ধ্বনিস্থলভ/Cerebral Palatalised Sonant Spirant)।

তামিল উচ্চারণের অপর বৈশিষ্ট্য হলো, র, ল, ড়, ল., র প্রভৃতি ধ্বনি শব্দের আদিতে থাকলে তার পূর্বে ই বা উ আগম হয়, যেমন, রাজা > ইরাশন্ /ইরায়ন্, রেবতি > ইরাবদি, রক্তম্ > ইরত্তম্, লোক > উলোগম্ ইত্যাদি। তামিল এবং অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষায় স্বর-সংযোগজনিত য়/ব় -শ্রুতি আগম একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, যেমন, তেঃ "চা" + ইলৈ 'পাতা' > তেঃয়িলৈ ; নটু 'মধ্য' + ইল্ > নটুবিল্ "মাঝে" ইত্যাদি।

তামিল শব্দভাণ্ডারে তেলুগু ভাষার তুলনায় সংস্কৃত কৃতঋণ শব্দ (Loan-word) যথেষ্ট কম।

লিঙ্গ : লিঙ্গধারণা স্বাভাবিক (Natural) নয়, তা শব্দগত বা ব্যাকরণগত। শব্দে লিঙ্গভেদ তিনজাতীয় (পুং, স্ত্রী ও ক্লীব) হলেও পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ ভেদ আছে কেবল বিচারশীল (Rational) বা উচ্চ জাতির ক্ষেত্রে (বৈয়াকরণের ভাষায় 'মহৎ')। অপরদিকে প্রাণী, অচেতন বস্তু বা ভাববাচক শব্দ (অর্থাৎ 'অমহৎ') সর্বদাই ক্লীবলিঙ্গ বাচক।

বচন : দুটি বচন—একবচন ও বহুবচন। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে বহুবচন-প্রত্যয় অভিন্ন। -অন্ বাচক পুংলিঙ্গ শব্দ বহুবচনে -অর্ রূপে পরিণত হয় (মনি'তন্ "মানুষ" >

মনি'তর)। অন্যান্য শব্দের ক্ষেত্রে -কল্./ক্কল. প্রত্যয় যুক্ত হয় (পেণ "স্ত্রীলোক" > পেণ্-কল., রাজা>রাজাক্কল.)।

শব্দরূপ: তামিলে কারক সম্বোধন সমেত আটটি। তামিল কারক-বিভক্তিগুলি মরম "গাছ" (ক্লীব) শব্দরূপে দেখানো যায় এইভাবে—মরম্ (বহুব: মরঙ্-কল্.) (কর্তৃ), মর-ত্তেই (কর্ম), মর-ত্তাল্ "by a tree" (করণ), মরম্-ওডু, মর-ত্তাডু (সহায়ক কারক/Comitative) "with a tree", মর-ত্তিরূকু (গৌণ কর্ম), মর-ত্তিন্ (অপাদান), মরত্তিনদু, মরত্তিন' (সম্বন্ধ), মরত্তিন্‌কণ, মরত্তিল্ (অধিকরণ), মরমেঃ (সম্বোধন)। বহুবচনের ক্ষেত্রে বহুবচন-প্রত্যয় যোগের পর বিভক্তি অন্বিত হয় (যেমন ২য়া: মরঙ্গলে.ই ইত্যাদি)। তামিলে ক্রিয়াবাচক ও নামবাচক অনুসর্গের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। এছাড়া লক্ষণীয়, অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষায় এবং তামিলে বিশেষণ কোনো বিশিষ্ট পর্যায় (Category) নয়।

সর্বনাম: উত্তম পুরুষ—নান্: নাঙ্-কল্.; মধ্যম পুরুষ—নী: নীঙ্-কল্.; প্রথম পুরুষে তিন লিঙ্গ—অবন্ (পুং) /অবল. (স্ত্রী): অতু (ক্লী)। বহুবচন অবর্ (কল্.): অবৈকল. (ক্লী)।

ক্রিয়াপদ: কাল, ভাব, বচন ও পুরুষ অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হয়। ক্রিয়া-বিভক্তিগুলি সাধারণত সর্বনামশ্লিষ্ট (Pronominalised) অর্থাৎ ক্রিয়াপদের শেষে পুরুষবাচক সর্বনামের খণ্ডিত বা ভগ্ন রূপ বিভক্তি হিসেবে যুক্ত হয়। তামিল ক্রিয়ার 'কাল' বোঝাতে কালবাচক বিকরণ বা প্রত্যয় (Temporal Suffix) ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান কালের প্রত্যয় -কিত্/ক্কিত্ (চেয়্-কিত্-এঃন্ "আমি করি" <চেয়্ "করা"); অতীতকালের প্রত্যয় -ত্, -ন্ত্, -ইন্', -ত্ত্ (চেয়্‌তেঃন্' "আমি করেছিলাম"; অতি'-ন্তেন্' <অতি' "জানা"); এবং ভবিষ্যৎ কালের প্রত্যয় -ব্, প্, -প্প (চেয়্-বেন্', পারপ্পেন্'<পার্ "দেখা")। বর্তমান কালের রূপ ভবিষ্যৎ অর্থেও তামিলে ব্যবহৃত হয়।

তামিল ক্রিয়ার 'ভাব' (Mood) তিনটি—নির্দেশক, অনুজ্ঞা এবং সম্ভাবক (Optative)। অনুজ্ঞার রূপ কেবল মধ্যম পুরুষে। একবচনে ধাতু অবিকৃত (চেয়্ কর!) কিন্তু বহুবচনে -উম্ যুক্ত হয় (চেয়্যুম্ / চেয়্যুঙ্ কল.)। সম্ভাবকের প্রত্যয় -ক অথবা তুমর্থক রূপের সঙ্গে -ট্টুম্ যুক্ত হয় (বাঝ্.ক<বাঝ্. "বেঁচে থাকা; চেয়্যট্টুম্)।

তামিল ও অন্যান্য দ্রাবিড় ক্রিয়া-পর্যায়ে নাস্ত্যর্থক ক্রিয়ার (Negative Verb) যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। নাস্ত্যর্থক ক্রিয়ার রূপ অস্ত্যর্থক ক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র, যদিও

এগুলি 'কাল' নিরপেক্ষ অর্থাৎ তা বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ বাচক হতে পারে। নাস্ত্যর্থক ক্রিয়াগুলি কৃদন্ত বিশেষণ, অসমাপিকা বা ভাববাচক বিশেষ্য পদও গঠন করতে পারে।

কৃদন্ত অসমাপিকা (Verbal Participle) তিনটি—ভূতার্থক (কাল-বিকরণ+ প্রত্যয় -অ : চেয়্-ত, পটিত্ত<√পটি "পাঠ করা"), শত্রর্থক (কাল-বিকরণ+প্রত্যয় -অ : চেকিত', পটিকিত্ত) এবং কৃত্যার্থক (ভবিষ্যৎ কালের উত্তম পুরুষ ক্লীবলিঙ্গের রূপ : চেয়্যুম্, পটিক্কুম্)।

ক্রিয়াবাচক অসমাপিকা (Absolutive) গঠিত হয় অতীত কালবাচক বিকরণ ও শ্রুতি 'উ' ধ্বনির সাহায্যে (চেয়্তু "করা, doing)। তুমর্থক অসমাপিকার (Infinitive) প্রত্যয় হলো -অ, -ক/ক্ক (চেয়্য় "to do", ইরুক্ক<ইরু "হওয়া)। সাপেক্ষ অসমাপিকা (Conditional) গঠনে অতীতবাচক বিকরণের সঙ্গে -আল্ প্রত্যয় যুক্ত হয় (চেয়্তাল্ "যদি করে/করিলে")।

তামিল ও অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষায় অনুকারবাচক (Imitative Words) এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দের (Echo words) প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বাক্যরীতির ক্ষেত্রে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো—বিশেষণ বিশেষ্যের পূর্বে বসে। স্বাভাবিক পদক্রম : কর্তা+গৌণ কর্ম+মুখ্য কর্ম+ক্রিয়া। সংস্কৃত সুলভ কৃদন্ত প্রয়োগ, যেমন—পাটম্ পটিত্ত পাইয়ন্' "The boy who has read the lesson" ; পাইয়ন্' পটিত্ত পাটম্ "The lesson read by the boy"। এছাড়া আরও দুটি-একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো :

(ক) সম্বন্ধ-নির্দেশক সর্বনামের (Relative Pronoun) স্থলে সর্বনামশ্লিষ্ট কৃদন্ত নামের (Participial Noun) প্রয়োগ, যেমন—পটিত্ত-ৱন্' "He who (had) read" ; পটিত্তৱল্. "She who (had) read" ; পটিক্কিত্'ৱন্' "A reading man" ; পটিপ্পৱন্' "He who will read" ; পটিপ্পৱল্. "She who will read" ইত্যাদি।

(খ) সম্বন্ধ-নির্দেশক যৌগিক বিশেষণের (Relative Participle) প্রয়োগ (প্রত্যয় : অ), যেমন—নিলন্-এন্দিয় বিসুম্ব "পৃথিবী-আবরিত আকাশ" (The sky which covers the earth") ; কয়্ ইরু পিণি-কোণ্ড মণি "রজ্জু-নিবদ্ধ ঘণ্টা" (bell attached to a cord) ।[১] আরও দ্র. ৫.৩।

[১] J. Bloch : GSDL, pp. 84-85

১১.২ মালয়ালম্

১১.২:১ ভাষিক পরিস্থিতি

মালয়ালম্ ভাষা দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাগুলির অন্যতম। এই ভাষা কেরল রাজ্যের (রাজধানী ত্রিবান্দ্রম্) সরকারী ভাষা। ভারতীয় সংবিধানে (৮ম অনুসূচী) একে স্বতন্ত্র প্রধান ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ইং ১৯৬১ সনের লোকগণনা অনুযায়ী সর্বভারতীয় মালয়ালম্ ভাষাভাষীর সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ ১৫ হাজার ৭৮২। ইং ১৯৭১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আনুমানিক ২ কোটি ১৯ লক্ষ ১৭ হাজার ৪৩০ অর্থাৎ সারা ভারতে অধ্যুষিত দ্রাবিড়ভাষী জনসংখ্যার প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ।

পশ্চিমে আরব সাগর এবং পূর্বে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অন্তরালে ভারতের এই ক্ষুদ্রতম রাজ্যটি অবস্থিত। এই রাজ্য উত্তর ও দক্ষিণে—কাসারগোড থেকে ত্রিবান্দ্রম পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর-দক্ষিণে এই রাজ্যের প্রসার প্রায় ৪০০ মাইল। পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তার কিন্তু ৮০ মাইলের অধিক নয়। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে (ইং ১৯৫৬) কেরলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পূর্বতন ত্রিবাঙ্কুর ও কোচীন রাজ্য, মাদ্রাজের মালাবার জেলা এবং দক্ষিণ কানাড়া জেলার কাসারগোড তালুক। অপরদিকে এই রাজ্যের পূর্ব দিকের কয়েকটি তামিল অঞ্চল তামিলনাড়ুর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে মালয়ালমের ভাষাঞ্চল সীমানা দাঁড়িয়েছে এই—উত্তরে ও উত্তর-পূর্বে কন্নড় অঞ্চল (মহীশূর বা কর্ণাটক) এবং দক্ষিণে ও পূর্বে তামিল ভাষাঞ্চল (তামিলনাড়ু)।

প্রাচীন কালে তামিল ভাষাঞ্চল তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল, যথা—চোড় (চোল.), পাণ্ডি (পাণ্ড্য) এবং চের (কেরল)। চের বা কেরল অপর দুইটি বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার দ্বারা বিচ্ছিন্ন। প্রধানত পার্বত্য উচ্চভূমির ভাষা ব'লে চের প্রদেশের ভাষাকে বলা হতো 'মলয়ালম্ (মল/মলৈ "পর্বত", আলম্ "উপত্যকা")। সম্ভবত এই ভাষা যে নিম্নভূমির অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষাঞ্চল থেকে কতকটা বিচ্ছিন্ন, তা বোঝানোর জন্যই উপরোক্ত নামকরণ গ্রহণ করা হয়েছে। বস্তুত, দক্ষিণ প্রত্যন্ত অঞ্চল ব্যতীত এই প্রদেশ চিরকালই দুরধিগম্য হয়ে আছে।

প্রাচীন তামিল 'সংগম' সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুসারে চের প্রদেশ প্রাচীন তামিল ভাষাঞ্চল 'তমিঝ.কম্'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল (খ্রীষ্টীয় ১ম শতকে তামিল পরিচিত ছিল *Damiźakam /*দমিঝ.কম্-রূপে—গ্রীক অনুবাদে যা হয়েছে Damirikē)। সংগম যুগে চের রাজাদের অধীনে কেরল শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং বহির্বাণিজ্য ব্যাপারে যথেষ্ট

সম্বৃদ্ধিলাভ করে। সংগম যুগের পরে কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রবল হয়ে ওঠে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত কেরলের স্বর্ণযুগ। এই সময়ে দ্বিতীয় চের সাম্রাজ্যের আধিপত্যের যুগ। বিশেষত দ্বিতীয় চের সম্রাটদের রাজত্বকালে বেদান্ত ও ভক্তিবাদের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের অভ্যুদয় ঘটে। শ্রীশংকরাচার্য (খ্রী. ৭৮৮-৮২০) ছাড়াও অন্যান্য ধর্মগুরু যেমন, কুলশেখর আড়বার, চেরমান পেরুমাল নায়নার ও ভিরনমিণ্ড নায়নার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আড়্বার ভক্তিবাদের এক নতুন স্রোতও জনজীবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এই সময়ে কেরল বহির্বাণিজ্যেও অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করে। খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে দ্বিতীয় চের সাম্রাজ্যের পতনের পর কেরলে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য গ'ড়ে ওঠে। ত্রিবান্দ্রম্, কোচীন প্রভৃতি রাজ্য এই যুগেই স্বাতন্ত্র্যলাভ করে।

কেরলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় ঐতিহ্যও যথেষ্ট প্রাচীন। ইং ১৯৬১ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী কেরলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের বর্তমান সংখ্যা এইরূপ—হিন্দু ১,০২,৮২,৫৬৮; খ্রীষ্টান ৩৫,৮৭,৩৬৫; মুসলমান ৩০,২৭,৬৩৯; জৈন ২,৯৬৭; শিখ ৮২২; বৌদ্ধ ২২৮; ইহুদী ও অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায় ২,১২৬।

পরিসংখ্যান বিচারে দেখা যাচ্ছে এখানে হিন্দুদের স্থান সর্বোচ্চ। তবে হিন্দুদের মধ্যে প্রভাবশালী হলেন নাম্ব্দিরি ব্রাহ্মণ এবং অতীতের যুদ্ধব্যবসায়ী ও ভূস্বামী নায়ার সম্প্রদায়ভুক্ত বর্তমান মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণগণ। খ্রীষ্টানদের সংখ্যা হিন্দুর পরে। খ্রীষ্টানদের মধ্যে সর্বপ্রথম সিরীয় খ্রীষ্টানগণ এবং ইহুদীরা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকেই কেরলে বসবাস করে আসছেন। অনেকের মতে সেন্ট্ টমাস খ্রীষ্টীয় ৫২ সালে মালাবার উপকূলে অবতরণ ক'রে সেখানকার বহু ব্রাহ্মণকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। তবে ইহুদী এবং প্রাচীনপন্থী সিরীয় খ্রীষ্টান মিশনারীরা ধর্মপ্রচারে কখনই আগ্রাসী হয়ে ওঠেন নি। ফলে কেরলের হিন্দুদের সঙ্গে তাদের যথেষ্ট সদ্ভাব বরাবরই বজায় ছিল। ইং ১৪৯৭ সালে পর্তুগীজ পর্যটক ভাস্কো-দা-গামা-র কালিকটে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে কেরলে খ্রীষ্টান ধর্ম ও ইউরোপীয় প্রভাব-প্রতিপত্তির যথার্থ সূত্রপাত হলো। ইং ১৫১০ সালে পর্তুগীজরা গোয়া দখল করলে খ্রীষ্টান, বিশেষত রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মীয় প্রচার এবং ধর্মান্তরীকরণ প্রচেষ্টা তুঙ্গে উঠলো। সেন্ট্ জেভিয়ার প্রমুখ রোমান ক্যাথলিক এবং পরে প্রোটেস্টাণ্টদের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে নিম্নবর্ণের লোকেরা (যেমন ধীবর সম্প্রদায়) খ্রীষ্টান ধর্ম অবলম্বন করতে লাগলো—যদিও ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানদের জীবনযাত্রা-পদ্ধতি এবং আচার-আচরণ হিন্দুধর্মের বাতাবরণেই পুষ্ট হতে লাগলো

আর তাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষাও হয়ে রইলো মালয়ালম্। বর্তমানে কেরল জন-সংখ্যার ৩৭% হলো খ্রীষ্টান।

কেরলের তৃতীয় প্রধান সম্প্রদায় হলো মুসলমান জনগণ। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতকে কেরলে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হয়। মালয়ালম্ ভাষী মুসলমানদের বলা হয় মাপ্পল. বা মোপলা। কেরলে এরা সংখ্যালঘু হলেও কোজি.কোড জেলাতেই এদের সংখ্যাধিক্য, মোট জনগণের ৪৫%। তবে মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব উচ্চতর সমাজজীবনে ততটা ব্যাপক নয়।

১১.২.২ ভাষা ও সাহিত্য

মালয়ালম্ ভাষা সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকে প্রাচীন তামিল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে—আর ৯ম শতকে উৎকীর্ণ ভাস্কর রবিবর্মণের কোচিন তাম্রপট্টলেখ থেকে তা জানা যায়। অবশ্য এই লেখ-ভাষ্যের মালয়ালম্ বৈশিষ্ট্য তেমন স্পষ্ট নয়। তাই ১৪শ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত অন্তত তামিল ও মালয়ালম্-এর সাহিত্যিক ঐতিহ্য অভিন্ন। ১৪শ শতকের পূর্বে সাহিত্যিক নিদর্শনও বিশেষ কিছু মেলে না। সুতরাং প্রাচীন মালয়ালম্ হয় ছিল প্রাচীন তামিল, নয়তো প্রাচীন তামিলেরই অনুরূপ কোনো একটি ভাষা। এই হিসাবে মালয়ালম্ সাহিত্যের ঐতিহাসিক যুগবিভাগ দাঁড়ায় এই রকম[১]—

১॥ প্রথম যুগ বা মধ্য মালয়ালম্ : খ্রী. ১৩৫০-১৮০০ পর্যন্ত (অর্থাৎ মধ্য তামিলের সমকালীন যুগ)।

২॥ আধুনিক যুগ : খ্রী. ১৮০০—।

মালয়ালমের নিজস্ব লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষিত আছে 'পাট্টু' সংগীতে। এই-জাতীয় সংগীত অবশ্য দ্রাবিড় 'সংগম' সাহিত্যেরই অন্তর্গত (প্রাচীন তামিল 'পাট্টু', তেলুগু 'পাটু') আর এদের গায়করা 'ছাকায়ার' নামে অভিহিত হতেন। পাট্টু সংগীতের বিষয়বস্তু যথেষ্ট পুরোনো সন্দেহ নেই কিন্তু ভাষার প্রাচীনত্ব বিতর্কের বিষয়। বিষয়-বস্তু প্রধানত কেরল জীবনকেন্দ্রিক, যেমন, ঘুমপাড়ানী গান, প্রেমগীতি, উৎসব-পার্বণ, হিন্দুদেবতা ও নায়কদের বীরত্বগাথা সম্পর্কিত।

মালয়ালম্ ভাষার ঐতিহাসিক পর্বে বিবর্তনের তিনটি সুস্পষ্ট রীতি সহজেই চোখে পড়ে। একটি রীতি হলো সংস্কৃতানুগ—যার অপর নাম 'মণিপ্রবালম্' রীতি।

১ Chatterji : LLMI, pp. 332-40 ; Nigam : LH, pp. 291-94

নাম্বুদ্রি (ব্রাহ্মণ) ও ক্ষত্রিয় (নায়ার) সমাজে সংস্কৃত ছিল সমাদৃত ভাষা। শ্রীশঙ্করাচার্যের (৭৮৮-৮২০ খ্রী. অ.) জন্মভূমিও ছিল কেরল। ফলে সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ মালয়ালমে ঘটেছে সর্বাধিক আর এইখানেই তামিলের সঙ্গে তার ব্যবধান; কারণ, তামিলে এই সংস্কৃত প্রভাব তেমন ব্যাপক নয়। মালয়ালমে সংস্কৃতাদর্শ অনুকরণে গদ্য-পদ্য মিশ্রিত 'চম্পূ' সাহিত্যও গ'ড়ে উঠেছিল। এই ঐতিহ্য সম্ভবত ১৪শ শতকের। 'মণিপ্রবালম্' রীতি ছাড়াও তামিল-প্রভাবপুষ্ট অপর একটি ভাষারীতিও মালয়ালমে গ'ড়ে উঠেছিল। বিশুদ্ধ মালয়ালম শব্দের তামিল রূপান্তর এবং তামিল ব্যাকরণের অনুসৃতি হলো এই রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণ কেরলে, বিশেষত যেখানে তামিল ও মালয়ালম্ ভাষাঞ্চলের প্রান্তিক সীমানা, এই রীতি বিশেষ ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছিল। মালয়ালমের তৃতীয় রীতি 'পচ্চ মলয়ালম্' বা বিশুদ্ধ মালয়ালম্ নামে অভিহিত। এই রীতি তামিল অথবা সংস্কৃতের নিরঙ্কুশ প্রভাব থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছে। বলা বাহুল্য, দ্রাবিড় 'সংগম' যুগের চের ভাষার সার্থক উত্তরসূরী হলো এই রীতি। এই রীতির উপজীব্যও হলো লোকনির্ভর সাহিত্য আর এই সাহিত্যসৃজনে হিন্দু, খ্রীষ্টান ও মুসলমানরা সমভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

চতুর্দশ শতকের উল্লেখযোগ্য প্রাচীনতম গ্রন্থ হলো কোনো এক ত্রিবাঙ্কুর নৃপতি রচিত 'রামচরিত' (খ্রী. ১৩০০)। গ্রন্থটি পুরোপুরি তামিল রীতি আশ্রিত। কালিদাসের 'মেঘদূত'-জাতীয় একখানি সন্দেশ-কাব্য 'উণ্ণুনীলি সন্দেশম্'-এর লেখক ও কাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে গ্রন্থখানি সংস্কৃত-রীতি আশ্রিত। এই শতকেই 'মণিপ্রবালম্' রীতিতে রচিত অপর তিনখানি গ্রন্থের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: উণ্ণিচেরুতেরী-চরিতম্ (খ্রী. ১৩০০), উণ্ণিয়াটি-চরিতম্ এবং উণ্ণিয়চ্চি-চরিতম্ (পরবর্তী যুগে)—তিনখানি গ্রন্থই চম্পূকাব্য, বিষয়বস্তু দেবরাজ ইন্দ্র অথবা গন্ধর্ব (যক্ষ) এবং মানবীর প্রেমলীলা।

পঞ্চদশ শতকে রচিত 'লীলাতিলকম্' ব্যাকরণ ও অলংকারশাস্ত্র-বিষয়ক রচনা। গ্রন্থ থেকে মণিপ্রবালম্ রীতির প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা যায়। ১৫শ শতকের গোড়ার দিকের লেখক ছেরুশ্শেরি নম্পূতিরি 'কৃষ্ণপ্পাট্টু' বা কৃষ্ণগাথা সুললিত বিশুদ্ধ মালয়ালম্ বা পচ্চ মলয়ালম্ রীতিতে রচনা করেছিলেন।

ষোড়শ শতকের কবি পুনম্ রচিত 'রামায়ণ-চম্পূ' (খ্রী. ১৫৫০) মিশ্র গদ্য-পদ্য চম্পূ-রীতি অবলম্বনে লিখিত একখানি কাব্য। গ্রন্থে সংস্কৃত শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। এই শতকীয় একজন অজ্ঞাত কবির 'চন্দ্রোৎসবম্' কাব্যে গ্রাম্য উৎসব ও জীবনের চমৎকার ছবি চিত্রিত হয়েছে, যদিও স্থানে স্থানে চম্পূরীতি ব্যাহত হয়েছে।

মালয়ালম্ সাহিত্যের প্রথম বড়ো কবি হলেন সপ্তদশ শতকের নায়র তুঞ্চত্তু রামানুজ এঝু.ত্তচ্ছন। তিনি অবশ্য পৌরাণিক ঐতিহ্যে আস্থাবান, তাই অধ্যাত্ম-রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত পুরাণের অনুবাদ-কর্মে তিনি নিজেকে সার্থকভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে তাঁর প্রবর্তিত কাব্য-গঠনরীতি 'কিলি.প্পাট্টু' বা Parrot song পরবর্তী যুগে অনেকেই অনুসরণ করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতকে এক নতুন ধরণের সাহিত্যরীতি—পুরাণাশ্রিত নৃত্যনাট্য বা তুল্.ল.ল গড়ে উঠলো। এইজাতীয় নাটক আসলে 'ছাক্যার' অভিহিত ব্রাহ্মণদের পৌরাণিক কথকতার সূত্র ধরেই বিবর্তিত হয়েছিল ১৫শ শতক থেকেই। ১৮শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকত্তু কুঞ্চন নম্পিয়ার এইজাতীয় Ballad গীতিকে সাহিত্যিক মর্যাদায় উন্নীত করেন। তিনি নিজেই প্রায় ৭০টি তুল্.ল.ল রচনা করেছিলেন—যার মোট পংক্তি সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার। মালয়ালম্ সাহিত্যের তিনি একজন বরেণ্য কবি।

মালয়ালমের সমৃদ্ধ সাহিত্যশাখাগুলির মধ্যে 'আট্টকথ' সাহিত্য অন্যতম। এই সাহিত্যশাখা 'কথাকলি' নৃত্যনাট্য অবলম্বনে রচিত। কথাকলি প্রকৃতপক্ষে বহুকাল -প্রচলিত লোকনৃত্য ও লোকনাট্য "কুট্টিয়াটম" (আক্ষরিক অর্থ : যৌথ অভিনয়) এবং সংস্কৃত নাট্যাভিনয়, বিশেষত ভরতের নাট্যশাস্ত্র-নির্দেশিত নাট্যরীতির সমন্বয়ে গঠিত। প্রাচীনকালে এইজাতীয় নাটকনৃত্য ও মুখোশযুদ্ধ সংবলিত নাট্যাভিনয় প্রচলিত থাকলেও ১৭শ শতকে তা মালাবার অঞ্চলে 'কথাকলি' নৃত্যনাট্যরূপে বিকশিত হয় এবং পরে ১৮শ শতকে তা পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

মালয়ালম্ সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হলো প্রকৃতপক্ষে ১৮শ শতকে, প্রথম মুদ্রিত পুস্তকের (ইং ১৭১৩) আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন খ্রীষ্টান মিশনারীরা।

মালয়ালম্ লিপি ব্রাহ্মী লিপি থেকেই উদ্ভূত, তবে দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মী লিপি স্বতন্ত্র ধারায় বিবর্তিত হয়েছে। ব্রাহ্মী লিপি উদ্ভূত বট্টেঝু.ত্তু এবং পল্লব লিপির (৭ম শতক) পরবর্তী স্তরে আধুনিক দ্রাবিড় লিপিগুলি বিকশিত হয়। কিন্তু স্থানীয় লিপি ধ্বনির ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় ১৭শ শতকে মালয়ালমে সংস্কৃত বর্ণমালা বা গ্রন্থলিপি লিপিমাধ্যম হিসেবে গৃহীত হয়।

১১.২.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য[১]

মালয়ালম্ বর্ণমালা ও উচ্চারণ-পদ্ধতি তামিলের অনুরূপ। তবে উভয়ের ক্ষেত্রে ধ্বনি-সংস্থানের পার্থক্য আছে। যেমন, শব্দের আদিতে তামিল ন>মালয়ালম্ ঞ (তামিল নান্>ঞান্ "আমি"); তামিল ত>ল (তামিল আত্তুমা "আত্মা"> আল্‌তুমাব়') ইত্যাদি। মালয়ালমে সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ তামিলের চেয়ে অনেক বেশি।

লিঙ্গ: লিঙ্গধারণা তামিলের অনুরূপ হলেও মালয়ালমে সম্ভবত প্রাচীনত্ব রক্ষিত। তাই অনেকক্ষেত্রে শব্দে লিঙ্গবাচক প্রত্যয় যুক্ত হয় না, সেগুলি যেন লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। এরূপ ক্ষেত্রে পুং বা স্ত্রীত্ব বাচক শব্দ যোগ ক'রে লিঙ্গান্তর ঘটানো হয়, যেমন, তামিল পেইঅন্ (-অন্ পুংলিঙ্গবাচক)=মালয়ালম পেইদল্ (লিঙ্গ নিরপেক্ষ) >আন্ পেইদল্ "বালক": পেণ্ পেইদল্ "বালিকা"।

বচন: দুইটি বচন কিন্তু বহুবচন-প্রত্যয়ের প্রয়োগ-পার্থক্য তামিলের মতো। লিঙ্গ-নিরপেক্ষ বহুবচন প্রত্যয় (Epicene Plural), ব়র্, মার্ (পুং/স্ত্রী নির্বিশেষে) এবং ক্লীবলিঙ্গে কল্./ক্কল্./গল্. (কল্.ল.ন্-মার্ "চোরেরা", ব়িণ্ণব়র্ "স্বর্গীয় পুরুষরা"<ব়িণ্ "স্বর্গ"+ব়র্<অব়র্ "তারা" (?); নিঞ্ঞল্. "তোমরা"<নিম্+কল্.; ক্লীবলিঙ্গের মরঙ্ঙল. "বৃক্ষগুলি"<মরম্+কল.)।

শব্দরূপ: কারকের সংখ্যা তামিলের অনুরূপ। নিচে মালয়ালম্ 'মরম্' "বৃক্ষ" (ক্লী) শব্দের শব্দরূপ প্রদর্শিত হলো—মরম্ [বহুব: মরঙ্ঙল্.] (কর্তৃ-), মর-ত্তিনে, মর-ত্তে (কর্ম), মর-ত্তাল্ "by a tree" (করণ), মর-ত্তোডু "with a tree" (সহায়ক তয়া / Comitative), মরত্তিন্নু (গৌণ কর্ম), মরত্তিল্‌নিন্নু (অপাদান), মরত্তিন্রে, মরত্তিনুডে (সম্বন্ধ), মরত্তিল্ (অধিকরণ), মরমেঃ (সম্বোধন)।

লক্ষণীয়, তামিলের মতো মালয়ালমে অনুসর্গের প্রয়োগ ব্যাপক। বিশেষণেরও বিশেষ রূপ-পর্যায় (Grammatical Category) নেই।

সর্বনাম: উত্তম পুরুষ—ঞান্: নাম্/নোম্/নম্মল্./ঞাঙ্-গল্.; মধ্যমপুরুষ—নী: নিঞ্ঞল্.; প্রথম পুরুষ—এঃব়ন্ (পুং, he) / এঃব়ল্. (স্ত্রী, She) / এঃদু (ক্লী, it)।

ক্রিয়াপদ: ক্রিয়াপর্যায় তামিলের অনুরূপ। কালবাচক প্রত্যয়ের অবশ্য পার্থক্য আছে, যেমন, বর্তমানে -উন্নু, -ক্কুন্নু- (চেয়্যুন্নেন্ 'আমি করি'); অতীতকালের

---

১ R. Caldwell : CGDL ; J. Bloch : GSDL

বিকরণ তামিলসুলভ অথবা -ই যুক্ত (চেয়্‌দেন্ / চেয়্‌দনেন্ "আমি করেছিলাম"; পাডি "সে গান গেয়েছিল")। ভবিষ্যৎকালে বর্তমান রূপই সাধারণত ব্যবহৃত, তবে তামিলসুলভ ভবিষ্যৎ বিকরণও ব্যবহৃত হয় (চেয়্‌ব্বেঃন্ "আমি করবো)।

ক্রিয়াপর্যায়ের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য তামিলের অনুরূপ (আরও দ্র. ৫.৩)।

১১.৩ কানাড়ী / কন্নড়

১১.৩.১ ভাষিক পরিস্থিতি

কন্নড় বা কানাড়ী কর্ণাটক বা মহীশূর রাজ্যের (রাজধানী বাঙ্গালোর) সরকারী এবং সাহিত্যিক ভাষা। এই ভাষা সংবিধানের ৮ম অনুসূচী স্বীকৃত। ইং ১৯৬১ সনের জনসমীক্ষা অনুযায়ী কন্নড় ভাষাভাষীর সংখ্যা ১ কোটি ১৪ লক্ষ ১৫ হাজার ৮২৭। ইং ১৯৭১-এর গণনায় এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ১৫ লক্ষ ৭৫ হাজার ১৯। কন্নড় ভাষীরা প্রধানত মহীশূর রাজ্যেই বসবাস করেন—সমগ্র রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে ৬৫.১৭% জন এই ভাষা ব্যবহার করেন। কন্নড় ভাষীদের অনেকেই প্রতিবেশী রাজ্য মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং কেরলে বাস করেন।

কন্নড় ভাষাঞ্চলের সীমানা এই: উত্তরে মারাঠী, পূর্বে তেলুগু, দক্ষিণে মালয়ালম্ এবং তামিল ভাষাঞ্চল। পশ্চিমে অবশ্য আরব সাগর। প্রাচীনকালে কানাড়ী ভাষাঞ্চল আরও উত্তর দিকে বিস্তৃত ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তা আর্য মারাঠীর অগ্রগতিতে সংকুচিত হয়েছে।

লক্ষণীয়, সংস্কৃত কর্ণাটক শব্দ থেকে 'কন্নড়'—এই দেশবাচক শব্দটি সৃষ্ট হয় নি। আসলে কালো মাটির দেশ ব'লে 'কর্' (=কালো) এবং নাড়ু (=দেশ) শব্দযোগে কন্নড় শব্দটি সৃষ্ট হয়েছে।

পূর্বতন মহীশূর রাজ্য, কুর্গ, বোম্বাই প্রদেশের বেলগাঁও জেলা, হায়দ্রাবাদ এবং কোইম্বাটুর—এই পাঁচটি রাজ্যের কানাড়ী ভাষাভাষীদের সংহত ক'রে তদনুযায়ী কর্ণাটক রাজ্য বর্তমানে গঠিত হয়েছে। ইং ১৯৫৬ সালের রাজ্য পুনর্গঠন এ্যাক্ট অনুযায়ী বর্তমান কানাড়ী ভাষাঞ্চল মহীশূরের অন্তর্গত হয়—পরে তা কর্ণাটক নামে পরিচিত হয়। এর পূর্বে এই অঞ্চলের ভাষাতাত্ত্বিক সংহতি নানা কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। প্রথমত, ব্রিটিশ রাজত্বে দীর্ঘদিন ধ'রে কানাড়ী ভাষীরা অন্যান্য রাজ্যে বাস করতেন, ফলে সেখানে সেই রাজ্যের ভাষাই ছিল প্রধান, যেমন মাদ্রাজে তামিল, বোম্বাই-এ মারাঠী এবং হায়দ্রাবাদে তেলুগু এবং উর্দু। কেবল মহীশূর রাজ্যেই

কানাড়ী ভাষীদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা ছিল। দ্বিতীয়ত, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার জন্যও কানাড়ী ভাষীরা সংহত হতে পারেন নি। তুঙ্গভদ্রা নদী সমগ্র মহীশূর রাজ্যকে দুইটি বিশাল ভৌগোলিক অঞ্চলে—উত্তর ও দক্ষিণ কর্ণাটকে বিভক্ত করেছে। আবার পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অবস্থানজনিত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবেও কানাড়ী ভাষীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তৃতীয়ত, বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক শক্তির টানাপোড়েন এবং বৈষম্যের ফলেও এই ভাষা-ঐক্য পদে পদে ব্যাহত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্রিটিশ আমলে কানাড়ী ভাষীরা স্বাধীন মহীশূর রাজ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের ফলস্বরূপ ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনে তারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে নি। শুধু তাই নয়, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও তারা অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। এমনকি স্বাধীনতা-উত্তর যুগেও কর্ণাটক রাজ্য গঠনের ব্যাপারে কানাড়ী ভাষীরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। যেমন, বোম্বাইয়ের লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের উচ্চ ও অভিজাত কোটির কানাড়ীরা পৃথক কানাড়ী ভাষাঞ্চল দাবী করলেও মহীশূর রাজ্যের মধ্যবিত্ত সমাজ কিন্তু মহীশূরের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, মহীশূরের বক্কলিগ সম্প্রদায়ভুক্ত কানাড়ীরা লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের সম্ভাব্য প্রাধান্য স্বীকার ক'রে নিতে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। ফলস্বরূপ, পৃথক কর্ণাটক রাজ্য প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হয়েছিল। চতুর্থত, মহীশূর রাজ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষীদের সমস্যাও নগণ্য ছিল না এবং বলা বাহুল্য, এখনও সে-সমস্যা রয়েছে। মহীশূর রাজ্যে দুইটি প্রধান সংখ্যালঘু ভাষাভাষী রয়েছে—(ক) মারাঠী : এরা প্রধানত মহারাষ্ট্রের প্রান্তিক অঞ্চলে বাস করেন। (খ) তুলু (ইং ১৯৭১ অনুযায়ী জনসংখ্যা ১১,৫৬,৯৫০) : এঁরা মুখ্যত বাস করেন আরব উপসাগরের উপকূলে। তুলু ভাষাঞ্চলকে বলা হয় "তুলওয়ারা"। দ্রাবিড় ভাষী হিসেবে তুলুদের প্রাচীন সংস্কৃতি নগণ্য নয়। এরা প্রায়-হুবহু কানাড়ী লিপি ব্যবহার করেন। আর যদিও বর্তমানে তুলুকে কানাড়ী উপভাষার অন্তর্ভুক্ত ব'লে ধরা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগ থেকেই তুলু সাহিত্য ও স্বতন্ত্র লিপির প্রচলন ছিল। বর্তমানে যদিও তুলুওয়ারায় কানাড়ীই চলে কিন্তু দৈনন্দিন গার্হস্থ্য জীবনে তুলুরই প্রাধান্য বেশি। বর্তমানে তুলুভাষীরা তাদের ভাষার সরকারী স্বীকৃতি চায়। অপর পক্ষে, সম্প্রতি কুর্গ রাজ্য মহীশূর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এখানকার অপর দ্রাবিড়ভাষী অর্থাৎ কোডগু ভাষীরাও কানাড়ী ভাষাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন—যদিও এঁদের ভাষা এবং রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার যথেষ্ট পৃথক।

কন্নড় ভাষার উপভাষা-ভেদ নিম্নলিখিত অঞ্চল কেন্দ্রিক, যথা—(১) মহীশূর,

(২) চিত্রদুর্গা, (৩) ধার্ওয়ার, (৪) উত্তর কানাড়া, (৫) দক্ষিণ কানাড়া, (৬) হাসান, (৭) বেল্লারী এবং (৮) গুলবর্গা। উপভাষাগুলির মধ্যে লিখিত ও কথ্য আদর্শ ভাষার পার্থক্য যথেষ্ট। এছাড়া বর্ণবিভেদের ফলে সামাজিক উপভাষারও বৈচিত্র্য সৃষ্ট হয়েছে। আদর্শ উপভাষার ক্ষেত্রে মহীশূর উপভাষা এবং ধারওয়ার উপভাষা পৃথকরূপে স্বীকৃত। এদের মধ্যে লিখিত ও কথ্য রীতিরও ভেদ রয়েছে। অবশ্য মহীশূর উপভাষায় এই লিখিত ও কথ্য রীতির পার্থক্য ধারওয়ার উপভাষার চেয়ে অনেক বেশি। মহীশূর উপভাষার প্রভাবও ব্যাপক অঞ্চলে প্রসারিত।

কন্নড় লিপি প্রতিবেশী তেলুগুর অনুরূপ—তামিলের নয়, যদিও ভাষার যোগ তামিলের সঙ্গেই অধিক।

১১.৩.২ ভাষা ও সাহিত্য

প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে লিখিত কন্নড় সাহিত্য একমাত্র তামিলের সঙ্গেই তুলনীয়, তার নিদর্শন প্রায় দেড় হাজার বৎসর প্রাচীন। ঐতিহাসিক ক্রম অনুযায়ী কানাড়ী সাহিত্যকে চারটি পর্বে ভাগ করা যায় :

১. আদি কন্নড় (পূর্বদ-পজ. গন্নড়)—প্রাক্-সাহিত্য যুগ থেকে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

২. প্রাচীন কন্নড় (হল. গন্নড়)—৮০০—১১৫০ খ্রীষ্টাব্দ।

৩. মধ্য কন্নড় (নড়ু-গন্নড়)—১১৫০—১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ।

৪. আধুনিক কন্নড় (পোস বা হোস-গন্নড়) – ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী।

আদি যুগে কন্নড় সাহিত্যের নিদর্শন যৎসামান্য। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ৫ম শতাব্দীর মধ্য ভাগে উৎকীর্ণ কয়েকটি শিলালিপি। এতে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের প্রভাব লক্ষণীয়। অপর আর একটি পুরালিপির পরিচয় পাওয়া যায়—যা আনুমানিক ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে একটি তাম্রপট্টে কাব্যাকারে খচিত। তবে ৯ম শতকের পূর্বেও যে আরও কিছু লেখক আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা বোঝা যায়, ৯ম শতকের প্রথমার্ধে রচিত 'কবিরাজমার্গ' নামক গ্রন্থের উল্লেখ দেখে।

প্রাচীন কন্নড় পর্বের প্রধান লেখক হলেন জৈনকবি শ্রীবিজয়, উপরোক্ত 'কবিরাজমার্গ' (৮৪০ খ্রী.) নামক গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থটি অলংকার ও কাব্যরীতি বিষয়ক। শ্রীবিজয় রাষ্ট্রকূট বংশীয় রাজা নৃপতুঙ্গের (খ্রী. ৮১৪-৭৭) সভাকবি ছিলেন।

৯ম শতকের পর থেকে কন্নড় সাহিত্যের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বের সাহিত্যও মোটামুটি সংস্কৃত কাব্য-ঐতিহ্যের ছায়াশ্রয়ী, রচনারীতিও বহুলাংশে সংস্কৃত গদ্য-পদ্য মিশ্রিত চম্পূ কাব্যের। আর গ্রন্থ ভাবনার প্রধান উৎস রামায়ণ-মহাভারত তো বটেই, বিশেষভাবে জৈনধর্ম এবং পুরাণ ও তীর্থংকরদের কথা ও কাহিনী। প্রকৃতপক্ষে জৈনধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে কানাড়ী সাহিত্যের যথার্থ সূত্রপাত হলো।

৯ম শতকের আর একজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন গুণবর্মন (১ম)। ইনি জৈন তীর্থংকরদের কাহিনী অবলম্বনে 'হরিবংশ' বা 'নেমিনাথ পুরাণ' রচনা করেন।

১০ম শতকের 'ত্রিরত্ন' নামে খ্যাত শ্রেষ্ঠ কবিত্রয় হলেন পম্প, পোন্ন এবং রন্ন। জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ পম্পের (জন্ম খ্রী. ৯০২) দুখানি গ্রন্থের প্রথমটি 'আদিপুরাণ' (খ্রী. ৯৪১) প্রথম জৈন তীর্থংকরের জীবনী; অপর গ্রন্থ 'বিক্রমার্জুন-বিজয়' (যা' পম্প-ভারত নামেই সমধিক পরিচিত) মহাভারত-কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। এঁরই সমসাময়িক জৈন কবি পোন্ন-রচিত 'শান্তি পুরাণ'-এর উপজীব্য হলো ষোড়শ জৈন তীর্থংকরের উপাখ্যান। তৃতীয় কবি রন্ন দ্বিতীয় তীর্থংকরের কাহিনী অবলম্বনে লিখেছিলেন 'অজিতপুরাণ' (খ্রী. ৯৯৩)। ইনিও মহাভারত অবলম্বনে কিছু কবিতাও রচনা করেছিলেন। ১০ম শতকের একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ নাগবর্মন্ (১ম)-এর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এঁর রচিত 'ছন্দোহম্বুধি' (খ্রী. ৯৮৪) গ্রন্থটি ছন্দোবিষয়ক রচনা। ইনি অবশ্য বাণভট্টের কাদম্বরী অনুসরণ ক'রে একখানি চম্পূকাব্য রচনা করেছিলেন। অনুরূপভাবে দুর্গসিংহ (খ্রী. ১০২৫) পঞ্চতন্ত্রের রূপান্তর করেছিলেন চম্পূরীতিতে। ১১শ শতকের শেষে জৈন পণ্ডিত নাগবর্মাচার্য একখানি বৈরাগ্য শতক লিখেছিলেন—গ্রন্থটির নাম 'চন্দ্রচূড়ামণি-শতক' বা 'জ্ঞানসার'।

১১শ শতকে কন্নড় সাহিত্যচর্চার ধারা কিছুটা স্তিমিত—তার কারণ সম্ভবত তামিলদেশ থেকে ক্রমাগত চোল.দের আক্রমণ। তবে ১২শ শতকের প্রথম পাদে একজন বিখ্যাত কবি আবির্ভূত হন। এঁর প্রকৃত নাম নাগচন্দ্র কিন্তু তিনি 'অভিনব পম্প' নামে আখ্যাত হতেন। ১৯তম তীর্থংকর কাহিনী-আশ্রিত 'মল্লিনাথ পুরাণ' ছাড়াও 'রামচন্দ্র চরিত্র পুরাণ' (পম্প-রামায়ণ নামে অধিক পরিচিত) নামক তাঁর রচনা কানাড়া ভাষায় একটি উৎকৃষ্ট কাব্যকীর্তি এবং রামায়ণের জৈন সংস্করণ।

মধ্য কন্নড় যুগের সূত্রপাত ১২শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। এই পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে এই :

১. ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে পদাদি ও স্বরমধ্যগত 'প্' ধ্বনির 'হ্' ধ্বনিতে পরিবর্তন।

২. ১২শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রায় দুই শতক ব্যাপী বীর-শৈব বা লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায় ও ধর্মের পুনরুত্থান (খ্রী. ১১৫০-১৩৩৬) এবং সেই সঙ্গে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের চাপে জৈনধর্মের সংকোচন। বীর-শৈবরা ছিলেন একেশ্বরবাদী—শিবলিঙ্গ উপাসনার প্রবর্তক। এই নূতন ধর্মবিশ্বাসের প্রবর্তক হলেন 'বসব'।

৩. ধর্মগুরু বসব প্রবর্তিত 'বচন' নামে খ্যাত সহজ গদ্যরীতির আবির্ভাব (১২শ শতক)।

৪. অবহেলিত লোকসাহিত্য থেকে আহৃত নতুন লোকাশ্রিত ছন্দোরীতির প্রয়োগ, যেমন ষট্‌পদী এবং সম্ভবত প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত রগলে. ছন্দ।

৫. বৈষ্ণব ও বীর-শৈব সন্ত ও মরমিয়া কবিদের নিরন্তর কাব্যধারায় ভক্তিরসের প্রাবল্য (খ্রী. ১৩৩৬-১৫৭৫)।

৬. বিজয়নগর রাজ্যের পতনের পরবর্তী যুগ (খ্রী. ১৫৭৫-১৭০০): নতুন সামাজিক পরিস্থিতি এবং প্রাচীন সাহিত্য ধারার অনুবর্তন। এবং গোয়াতে খ্রীষ্টান মিশনারীদের চেষ্টায় মুদ্রণযন্ত্রের প্রবর্তন (খ্রী. ১৫৬৬) এবং তার প্রভাব।

৭. ১৮শ শতকে চম্পূকাব্যের পুনর্জাগরণ এবং ইতিহাসাশ্রিত গদ্যরচনা বা ইতিহাস-সাহিত্য রচনার প্রয়াস—অসমীয়া প্রভৃতি দু/একটি ভাষায় ছাড়া যার দর্শন ভারতে বিশেষ মেলে না। ১৭শ শতকের শেষার্ধ থেকেই মৈশুরে ওদেয়ার রাজাদের সময় থেকে সাহিত্যের এই নতুন শাখা বিকশিত এবং বিবর্ধিত হয়।

৮. খ্রী. ১৮২০: এই সময় থেকেই আধুনিক কন্নড়ের সূত্রপাত।

১২শ শতকের প্রখ্যাত কয়েকজন কবি (বসব'কে বাদ দিয়ে) হলেন: হরীশ্বর/হরিহর—তাঁর রচিত 'শিবগণ-দ-রগলে. আসলে ৬৬ জন প্রখ্যাত শৈব সন্তদের জীবন অবলম্বনে লিখিত একখানি কাব্যগ্রন্থ। চম্পূ রীতিতে রচিত তাঁর অপর গ্রন্থ 'গিরিজা-কল্যাণ' শিব-উমার বিবাহ-আখ্যান আশ্রিত রচনা। এই শতকের অপরাপর কবি হলেন—রাঘবাঙ্ক: ষট্‌পদী ছন্দে রচিত 'হরিশ্চন্দ্র কাব্য' ও 'সোমনাথ চরিত্রে'; কেরেয় পদ্মরস: রগলে. ছন্দে রচিত দর্শনশাস্ত্র 'দীক্ষাবোধে';

কুমার পদ্মরস : স্কন্দপুরাণ অবলম্বনে রচিত 'সানন্দচরিত্রে'; পালকুরিকে সোম : সোমেশ্বর শতক (খ্রী. ১১৯৫) ইত্যাদি।

১৩শ শতকের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন—দেবকবি : চম্পূ রীতিতে রচিত 'কুসুমাবলী' (খ্রী. ১২০০); সোমরাজ : চম্পূরীতি-আশ্রিত 'শৃঙ্গাররস' (খ্রী. ১২২২) ইত্যাদি। ১৩শ শতকের কবি 'আণ্ডয্য' (১২৩৫ খ্রী.) সংস্কৃত শব্দ যথাসম্ভব বর্জন ক'রে কালিদাসের কুমারসম্ভবের একটি তর্জমা করেন। অন্যান্য কবিদের মধ্যে প্রধান হলেন : মল্লিকার্জুন [স্থক্তিসুধার্ণব—কাব্য-সংকলন (খ্রী. ১২৪৫)] ও তাঁর পুত্র কেশিরাজ [ব্যাকরণগ্রন্থ 'শব্দমণিদর্পণ' (খ্রী. ১২৬০)], কুমুদেন্দু [ষট্পদী ছন্দে রচিত রামায়ণ (খ্রী. ১২৭৫)] ইত্যাদি।

খ্রী. ১১৭০—১২৫৪ শতকের মধ্যে কিছু কিছু জৈন কবিও আবির্ভূত হয়েছিলেন, যেমন, নয় জন জৈন কবিদের মধ্যে প্রধান হলেন—নেমিচন্দ্র (লীলাবতী) এবং জন্ন (যশোধর চরিত্রে, ১২০৯)—উভয় গ্রন্থই রোমাণ্টিক আখ্যান। এই যুগে বৈষ্ণব কবিরাও অপরিচিত নন, যেমন, রুদ্রভট্ট (খ্রী. ১১৭২-১২১৯) কবির 'জগন্নাথ বিজয়' গ্রন্থখানি বিষ্ণুপুরাণ অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত।

১৪শ শতকের রচনায় অবশ্য কিছু বৈচিত্র্য আছে। যেমন 'রট্ট কবি'র 'রট্টসূত্র' (খ্রী. ১৩০০) নৈসর্গিক বিজ্ঞানবিষয়ক ব্যাখ্যান; নাগরাজ-এর 'পুণ্যাশ্রব' (খ্রী. ১৩৩০) গার্হস্থ্যধর্ম সম্পর্কে ৫২ টি উপদেশমূলক আখ্যান। ব্রাহ্মণ কবি ছাবুণ্ডরাজ আবার দণ্ডিনের দশকুমার চরিতের কন্নড় অনুবাদ (খ্রী. ১৩০০) চম্পূরীতি অবলম্বনে রচনা করেন।

খ্রী. ১৩৩৬ সালে বিজয়নগর রাজ্য স্থাপিত হওয়ার ফলে কন্নড় ও তেলুগু ভাষাঞ্চল প্রায় ২২৫ বৎসর ধ'রে মুসলমান আক্রমণ ও বাহ্‌মনী আধিপত্যের (খ্রী. ১৩৪৭) হাত থেকে সুরক্ষিত হলো এবং সেই সঙ্গে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটলো; কারণ, বিজয়নগরের সম্রাটগণ ছিলেন সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মে বিশ্বাসী। এঁরা কানাড়ী ভাষার পৃষ্টপোষকতা করলেও কানাড়া ভাষার স্থলে কিন্তু সংস্কৃত ও তেলুগুর প্রাধান্য বাড়লো, কারণ, বিজয়নগর নৃপতিরা নিজেরাই সংস্কৃত ও তেলুগুর চর্চা করতেন। ফলে কন্নড় সাহিত্যচর্চা ততটা ফলপ্রসূ না হলেও কিছু কিছু সাহিত্য-নিদর্শন এই পর্বেও মেলে। এই যুগের প্রখ্যাত কবি 'ভীম কবি'র 'বসবপুরাণ' (খ্রী. ১৩৬৯) বীর-শৈবধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বসবের অলৌকিক জীবনকাহিনী। লিঙ্গায়েৎ লেখকদের মধ্যে প্রধান হলেন পদ্মণাঙ্ক (খ্রী. ১৩৮৫), মল্লণার্য (১৩৭০), ছামরস (১৪৬০) ইত্যাদি। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী অন্যান্য লেখকরাও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কিছু কিছু লিখেছিলেন, যেমন—

মঙ্গরাজ (চিকিৎসাশাস্ত্র), অভিনবচন্দ্র (অশ্ববৈদ্য—পশুচিকিৎসাবিষয়ক), মধুর (জৈন পুরাণ), নারণপ্প (মহাভারত) ইত্যাদি।

১৫শ শতকের কবি শিশুমায়ণ কানাড়ী সাহিত্যে এক নতুন রীতির গীতিকবিতার প্রবর্তন করেন। 'সাংগত্য' নামে এই কবিতা মন্ত্রের মতো সুর অথবা বাদ্য সহযোগে গাওয়া হতো।

১৬শ শতক থেকে আর এক নতুন প্রবণতা দেখা গেল। দক্ষিণ দেশের রামানুজ এবং উত্তর ভারতের রামানন্দের প্রভাব কেবল ভক্তিরসের প্রাবল্য ঘটালো না, বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নরপতি কৃষ্ণদেব রায়ের (ইং ১৫০৯-৩০) উৎসাহে তা বর্ধিত হতে লাগলো। এর ফলে নতুন ক'রে মহাভারত ও রামায়ণের নব নব সংস্করণ ও অনুবাদ প্রকাশিত হতে লাগলো (যেমন, নারণপ্প ও তম্মণ্ণ-র ষট্‌পদী মহাভারত ও রামায়ণ, ছাটু বিট্‌ঠলনাথ নিত্যাত্মসুখ রচিত ষট্‌পদী ভাগবত পুরাণ)। অপরদিকে বৈষ্ণবীয় ধর্মমতের পুনর্জাগরণের ফলে 'দাস' নামক ভ্রাম্যমাণ সাধকসম্প্রদায়ের পদাবলীসাহিত্য গড়ে উঠলো, যেমন, পদকর্তা পুরন্দরদাস (খ্রী. ১৪৮৪-১৫৬৪), কনকদাস, বরাহ-তিম্মপ্পদাস ইত্যাদি। এঁদের রচিত ৪০২টি পদের একখানি সংকলন ইং ১৮৫৩ সালে জার্মান মিশনারী ম্যোগ্‌লিঙ্‌ প্রকাশ করেন। এই যুগের সাহিত্যপরিক্রমায় বীর-শৈবরাও উপেক্ষণীয় নন, যেমন—বিরূপাক্ষ (চেন্ন-বসব-পুরাণ, ১৮৫৫), আদর্শ (প্রৌঢ়রায় চরিত্রে, ১৫৯৫), সিদ্ধলিঙ্গযোগী (রাজেন্দ্র বিজয়-পুরাণ—বীরশৈব নৃপতির কাহিনী) ইত্যাদি।

১৭শ শতকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন (খ্রী. ১৫৬৫)। এর ফলে কর্ণাটকের কিছু অংশ বিজাপুর সুলতান এবং কিছু অংশ স্থানীয় ওদেয়ার শাসকদের (খ্রী. ১৬১০) অধীনে এলো। এই যুগে একজন জৈন পণ্ডিত ভট্টাকলঙ্কদেব একটি পূর্ণাঙ্গ কানাড়ী ব্যাকরণ ('কর্ণাটক শব্দানুশাসন', ১৬০৪) সংস্কৃত টীকা সমেত প্রকাশ করেন। ১৭শ শতকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন একজন লিঙ্গায়েৎ সন্ন্যাসী, ষড়ক্ষরদেব। তাঁর রচনা 'রাজশেখর বিলাস' (খ্রী. ১৬৫৭) [চম্পূ রীতিতে লিখিত রোমান্টিক উপাখ্যান], বৃষভেন্দ্র বিজয় এবং শবরশংকর বিলাস। এই সময়েরই আর একখানি রচনা 'জৈমিনি ভারত'-এর লেখক লক্ষ্মীশ।

১৭-১৮শ শতকে ওদেয়ার নরপতিদের আগ্রহে ও আনুকূল্যে কানাড়ী সাহিত্যে একটি নতুন শাখার প্রবর্তন হলো (খ্রী. ১৬৫০-১৭১৩)। এই সাহিত্যকর্মগুলি হলো ইতিহাসাশ্রিত রচনা। ওদেয়ার ছিক্কদেবরায় (ইং ১৬৭২-১৭০৪) নানা ঐতিহাসিক উপাদান তাঁর গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করেছিলেন ; টিপু সুলতানের আক্রমণে এই গ্রন্থাগার

ধ্বংস হলেও এই নতুন ধারা বিনষ্ট হয় নি। ছিক্কদেবরায়, তাঁর মন্ত্রী ও সভাকবিগণ অবশ্য চম্পূ ও সাংগত্য রীতি অবলম্বনে নানা বিষয়ে কাব্য রচনা করেন, এমনকি পুরাণকাহিনী অবলম্বনে গদ্যও রচনা করেন—তবে এগুলিতে নীতিকথা ও ভগবদ্‌ভক্তিরই প্রাধান্য। এঁদের মধ্যে জৈন কবি বিশালাক্ষ পণ্ডিত, কানাড়ী ও সংস্কৃতজ্ঞ বৈষ্ণব পণ্ডিত তিরুমলার্য, চিক্কুপাধ্যায় অলসিংগার্য ও বিখ্যাত নাট্যকার সিংগরার্যই প্রধান। ছিক্কদেবরায়ের রাজসভায় সন্‌ছিয় হোন্নম্ম নামে একজন মহিলা কবিও (: হদিবদেয় ধর্ম—পতিব্রতা নারীর কর্তব্যসম্বন্ধীয় রচনা) ছিলেন। ছিক্কদেবরায় লিঙ্গায়েৎ-বিরোধী হওয়ায় এই পর্বে বীর-শৈব সাহিত্যকৃতি কিছুটা ম্লান হলেও রচনা একেবারে বিরল নয় (যেমন, নিজগুণযোগী বিরচিত 'বিবেকচিন্তামণি')। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কানাড়ী সাহিত্যে 'যক্ষগান' নামে গীতিনাট্যধর্মী একজাতীয় রচনা লক্ষ্য করা যায়—এগুলি অবশ্য পুরাণকাহিনী অবলম্বনে রচিত।

১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে গোয়াতে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কানাড়ী সাহিত্যে দিক পরিবর্তন ঘটলো। ইং ১৬৭৪ সাল পর্যন্ত আনুমানিক ৫০ খানি কানাড়ী পুস্তক মুদ্রিত হলো। ইতালীয় ধর্মপ্রচারক লেওনার্দো চিন্নোমা-লিখিত কানাড়ী ব্যাকরণ ও শব্দকোষ এই ছাপাখানা থেকে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১১.৩৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য[১]

কন্নড় বর্ণমালা সংস্কৃতের মতো পূর্ণাঙ্গ। প্রতিটি ধ্বনির জন্যই এই বর্ণমালায় স্বতন্ত্র বর্ণ আছে। স্বরবর্ণে হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ আছে। কন্নড় হ্রস্ব স্বর হলো —অ/ʌ/, ই, উ, এ, ও ; দীর্ঘ স্বর—আ/a/, ঈ, ঊ, এঃ/e/, ওঃ/oː/, ঐ/ai/,ঔ/au/। আদি 'অ' ধ্বনি কখনও কখনও 'এ' রূপে উচ্চারিত বা লিখিত হয় (চন্নু/চেন্নু "সৌন্দর্য")। ঔ বর্ণ সংস্কৃত কৃতঋণ শব্দে থাকলেও (যেমন, ঔষধ) প্রকৃত দ্রাবিড় শব্দে তা 'অবু' (avu) রূপে উচ্চারিত হয়।

ব্যঞ্জন ধ্বনির ক্ষেত্রে স্পর্শ ব্যঞ্জন বাঙলা বা সংস্কৃতের মতো পুরোপুরি বজায় আছে (ক, খ, গ, ঘ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ,ধ, প, ফ, ব, ভ)। চ, ছ, জ, ঝ ইংরেজী বা বাঙলার মতো ঘৃষ্ট (Affricate) অর্থাৎ চ, জ/ts, dz/ ইত্যাদি। নাসিক্য ধ্বনি— ম, ণ, ন, ঞ, ঙ। এছাড়া উষ্ম ধ্বনি—দন্তমূলীয় ত' /ṯ/ (উচ্চারণে কতকটা ত্র/tr-এর

১ R. Caldwell : CGDL ; J. Bloch : GSDL ; M. S. Andronov : The Kannaḍa Language, Moscow, 1969

মতো), শ, স, ষ্ এবং হ। অপর উষ্ম ঘোষ মূর্ধন্য ধ্বনি ল./ḷ/ এবং ল'/ḻ/ (বর্তমানে ল.) এবং অন্তঃস্থ বর্ণ য়, র, ল, ব/v/।

অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষার মতো শ্রুতি আগম কন্নড়েও স্বাভাবিক (গুরু+উ>গুরুবু, স্ত্রী+ – অন্ন্ >স্ত্রীয়ন্ন্ ইত্যাদি)।

কানাড়ীতে সংস্কৃত কৃতঋণ শব্দের (**Loan Word**) সংখ্যা যথেষ্ট।

লিঙ্গ : লিঙ্গধারণা তামিলের অনুরূপ। তবে মালয়ালমের মতো এখানে লিঙ্গ-ধারণার প্রাচীনত্ব রক্ষিত (দ্র. পৃ. ২২৭)।

বচন : বচন দুটি—একবচন ও বহুবচন। লিঙ্গনিরপেক্ষ বহুবচন-প্রত্যয় (**Epicene Plural**) হলো—অরু/কলু. (পুং/স্ত্রী) এবং ক্লীবলিঙ্গের প্রত্যয়—গলু., যেমন—হুড়্গন্নু 'বালক' (হুড়্গ-) : হুড়্গরু "বালকরা"; হুড়্গিয় 'বালিকা' (হুড়্গি-) : হুড়্গিয়রু ; কিন্তু মনে "বাড়ী" : মনেগলু. "বাড়িগুলি" ইত্যাদি।

শব্দরূপ : কন্নড় কারক সংখ্যায় ৭টি। অপাদান কারক তেলুগুর মতো অনুসর্গের দ্বারা প্রকাশিত হয়। নিচে "মরম্" "বৃক্ষ" (ক্লী) শব্দের রূপ থেকে বিভক্তিগুলি স্পষ্ট হবে। কর্তৃ—মর-ৰ্ (বহুব : মরগলু.), কর্ম—মর-ৱন্নু (: মরগল.ন্নু), করণ—মর-দিন্দ, গৌণ কর্ম/সম্প্রদান—মরক্কে, সম্বন্ধ—মর-দ, অধিকরণ—মরদল্লি, সম্বোধন—মরমে। এছাড়া কারকবাচক অনুসর্গের প্রয়োগ অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষার মতো সুলভ।

সর্বনাম : উত্তম পুরুষ—না, নান্নু : নাৱু (১ব : বহুবচন) ; মধ্যম পুরুষ—নী, নীন্নু : নীৱু ; প্রথম পুরুষ—অর, অৱন্নু : অৱরু (পুং), অবলু., ইৱলু. : অৱরু, ইৱরু (স্ত্রী), অদু, ইদু : অৱু (গলু.), ইৱুগলু. (ক্লী)।

ক্রিয়াপদ : কন্নড় ক্রিয়াপদ কাল, ভাব, বচন ও পুরুষ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। ক্রিয়া-বিভক্তিগুলি তামিলের মতই সর্বনামশ্লিষ্ট (**Pronominalised**)। ক্রিয়া গঠনে কালবাচক বিকরণ (**Temporal Suffix**) যুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান কালে -(উ)ত্ প্রত্যয় (√মাড়ু "করা" : মাড়ুত্তেঃনে 'আমি করি'/মাড়ুত্তেঃৱে 'আমরা করি') ; ভবিষ্যৎ কালে -(উ) ৱ্ প্রত্যয় (মাড়ুৱে(নু)/মাড়ুৱেৱু) এবং অতীত কালে -(ই)দ্-প্রত্যয় (মাডিদে(নু)/মাডিদেৱু)। বর্তমানের রূপ অবশ্য ভবিষ্যৎ ও বর্ণনাত্মক অতীতেও (**Narrative Past**) ব্যবহৃত হয়।

কন্নড় ক্রিয়ার ভাব তিনটি—নির্দেশক, অনুজ্ঞা এবং অভিপ্রায় (**Subjunctive/ Suppositional**)। অনুজ্ঞার রূপ তিন পুরুষ ও দুই বচনে মেলে (মাড়ু 'কর ! (১ব) : মাডি (রি) (বহুব)। অভিপ্রায় রূপ গঠনে অতীতমূলের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয় (১ব : মাডী(য়ে) "**You may do**")।

কন্নড় ক্রিয়াপর্যায়ে তামিলের মতই নাস্ত্যর্থ ক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। নাস্ত্যর্থ ক্রিয়ার সমাপিকা/অসমাপিকা ভেদ আছে।

কৃদন্ত অসমাপিকা (Verbal Participle) দুইটি—ভূতার্থক (কাল-বিকরণ + অ : মাডি-দ 'Who/which did') এবং বর্তমান-ভবিষ্যৎ বাচক কৃত্যার্থক (কাল-বিকরণ + অ : মাড্‌-ব্র "Who/which will do,—will be doing")।

ক্রিয়াবাচক অসমাপিকা (Absolutive) গঠিত হয় বর্তমানে -ত্ত(া)-প্রত্যয় যোগে (মাড্‌-ত্ত(া) "doing"); অতীত কালে -ই, -দু প্রত্যয় যোগে (মাডি "having done", করে-দু 'having called'। সাপেক্ষ অসমাপিকা (Conditional) গঠিত হয় কৃদন্ত মূলের সঙ্গে -অরে- যুক্ত ক'রে (√মাড্‌>মাডি-দ (অতীতমূল)> মাডিদরে "if one does/did")। তুমর্থক অসমাপিকা (Infinitive) গঠনের ক্ষেত্রে ধাতুর সঙ্গে -অ, -অলু যুক্ত হয় (মাড, মাডলু<√মাড্‌ "to do")।

অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষার মতো কন্নড় ভাষায় অনুকারবাচক (Imitative words) এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দের (Echo words) প্রয়োগ যথেষ্ট।

বাক্যরীতি তামিলের অনুরূপ (দ্র: পৃ. ২২১)। উল্লেখযোগ্য অপর দুটি বৈশিষ্ট্য হলো—

(ক) সম্বন্ধ-নির্দেশক সর্বনামের স্থলে সর্বনামশ্লিষ্ট কৃদন্ত নামের (Participial Noun) প্রয়োগ, যেমন—মাড্‌ববনু "He who does, he who will do"; মাড্‌ববলু. 'She who does,—will do'; মাডিদবনু "He who did"; মাডিদবলু. 'She who did' ইত্যাদি।

(খ) সম্বন্ধ-নির্দেশক যৌগিক বিশেষণের (Relative Participle) (প্রত্যয়-অ-যোগে) প্রয়োগ, যেমন—পডেব ভেঃরি "The drum which one strikes"; কল্‌ত পাঠম্‌ "lesson learnt"।[১] আরও দ্র. ৫.৩।

---

১ J. Bloch : GSDL, pp. 84-85

১১.৪ তেলুগু

১১.৪.১ ভাষিক পরিস্থিতি

দ্রাবিড় পরিবারের একটি প্রধান ভাষা তেলুগু। এই ভাষা ভারতীয় সংবিধানের ৮ম অনুসূচী স্বীকৃত। অন্ধ্র প্রদেশের (রাজধানী হায়দ্রাবাদ) সরকারী আন্তঃরাজ্য ভাষা হিসেবে তেলুগুর স্থান দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে তামিলের পরেই। তেলুগু ভাষা-ভাষীরা প্রধানত অন্ধ্রপ্রদেশে এবং তৎসংলগ্ন মহীশূর ও তামিলনাড়ুতে বাস করে। তেলুগু ভাষা 'আন্ধ্র' ভাষা নামেও পরিচিত। ঐতরেয় আরণ্যকের (খ্রী.পূ. ৭০০) সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, 'আন্ধ্র' নামটি ছিল জাতিবাচক, প্রাচীনকালে তা ভাষা অর্থেও ব্যবহৃত। পরে আন্ধ্র অঞ্চল ও তার ভাষার নাম হয়ে দাঁড়ালো 'তেলেঙ্গ'। এই 'তেলেঙ্গ' শব্দ থেকেই 'তেলুগু' শব্দটি উদ্ভূত।

ইং ১৯৬১ সনের জনসমীক্ষা অনুযায়ী সর্বভারতীয় তেলুগু ভাষাভাষীর সংখ্যা ৩ কোটি ৭৬ লক্ষ ৬৮ হাজার ১৩২। সম্প্রতি ১৯৭১ সনে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ৭ হাজার ৬৯৭। বলা বাহুল্য, সর্বভারতীয় নিরিখে সংখ্যাবলে হিন্দীর পরেই তেলুগুর স্থান। অন্ধ্র প্রদেশে অবশ্য উর্দু ভাষাভাষীর সংখ্যাও যথেষ্ট—বেশির ভাগ উর্দুভাষীই হায়দ্রাবাদ শহরের আশেপাশে বাস করে। হায়দ্রাবাদ শহরও উর্দু সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল।

দাক্ষিণাত্যের প্রায় এক-চতুর্থাংশ জুড়ে অন্ধ্র প্রদেশ অবস্থিত। গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী নিম্ন অববাহিকা জুড়ে এর প্রসার। তবে অন্ধ্র প্রদেশের ভৌগোলিক সীমা ইং ১৯৫৬ সালে পুনর্গঠিত হয় ভাষাঞ্চলকে সংহত ক'রে। এই ভাষাঞ্চল ওড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও তামিলনাড়ুর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই রাজ্যের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল পার্বত্যময় এবং পূর্বঘাট পর্বতমালা উত্তর থেকে দক্ষিণে সমুদ্রের উপকূল বরাবর বিস্তৃত। পূর্বে বঙ্গোপসাগরের উপকূল দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০০ মাইল।

তেলুগু ভাষাঞ্চল চারটি উপভাষায় গ্রথিত, যথা—

১. উত্তরদেশীয়: শ্রীকাকুলম্ এবং বিশাখপত্তনম্ জেলা।
২. মধ্যদেশীয়: কৃষ্ণা, গুন্টুর এবং পূর্ব ও পশ্চিম গোদাবরী জেলা।
৩. পশ্চিমা উপভাষা তেলেঙ্গানা জেলাগুলিতে অর্থাৎ আদিলাবাদ, করিমনগর, ওয়ারাঙ্গল, খম্মামেত্তু, নলগোণ্ডা, হায়দ্রাবাদ এবং মেডক জেলায় প্রচলিত।
৪. দক্ষিণদেশীয়: রয়লসীমার চারটি জেলা অর্থাৎ কোরনু, চুড্ডপ, চিত্তোর, অনন্তপুরম্ এবং নেল্লোর জেলা।

এই চারটি উপভাষার অবশ্য বিভাষা (Sub-dialect)-বিভেদও রয়েছে। মধ্য-দেশীয় উপভাষাই হলো শিক্ষিত জনের আদর্শ স্বীকৃত ভাষা। এছাড়া সামাজিক উপভাষা বিভেদও যথেষ্ট। এই বিভেদ প্রধানত শিক্ষা, বৃত্তি, বর্ণ এবং সম্প্রদায় আশ্রিত। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে মধ্য দ্রাবিড় এবং দক্ষিণ দ্রাবিড় বর্গের ভাষাগুলির অন্তর্বর্তী স্থান দখল করেছে তেলুগু, তাই এদের সঙ্গে এর সাদৃশ্যও যথেষ্ট। তেলুগু ভাষায় সংস্কৃত ও ফারসী শব্দাবলীর অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করার বিষয়।

তেলুগু লিপি কন্নড় লিপির সঙ্গে অভিন্ন। এই লিপি ৭ম শতাব্দীর পল্লব লিপি থেকে বিবর্তিত হয়ে খ্রীষ্টীয় ১০০০ অব্দে বিশিষ্টতা অর্জন করে। পল্লব লিপি হলো ব্রাহ্মী লিপির সন্ততি।

তামিল, তেলুগু, মালয়ালম্ ও কানাড়ী—এই চারটি সাহিত্যিক ভাষার মধ্যে মূল দ্রাবিড় থেকে সর্বপ্রথম বিচ্ছিন্ন হয়েছে তেলুগু (আনু. খ্রী. পূ. ১০০০)।[১] এই কারণে তামিল ও মালয়ালম্ ভাষা থেকে তেলুগু অনেক পৃথক হয়ে গেছে। অপর দিকে কন্নড়/কানাড়ী ভাষীরা তেলুগু লিপি গ্রহণ করলেও ভাষা হিসেবে তেলুগু কন্নড় থেকে বহুলাংশে পৃথক্।

১১.৪.২ ভাষা ও সাহিত্য

তেলুগু ভাষার ইতিহাস বেশ প্রাচীনধর্মী হলেও তার সাহিত্যকর্ম শুরু হয়েছে অনেক পরে। তেলুগু সাহিত্যের ইতিহাসকে দুটি যুগে বিভক্ত করা যায়—

(১) প্রাচীন তেলুগু (খ্রী. ৭০০ [?]—১০০০) এবং

(২) মধ্য তেলুগু (খ্রী. ১০০০-১৮০০)।

প্রাচীন পর্বের তেলুগুর সাহিত্যিক নিদর্শন বিরল। খ্রীষ্টীয় ৭ম থেকে ১০ম শতকে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি প্রধানত পুরালিপি—সংখ্যায় সেগুলি ২/৪ টির অধিক নয়। ১০ম শতকের কিছু পুরালিপি আবার কাব্যাকারে লিখিত।

মধ্য পর্বের তেলুগু সাহিত্য সংস্কৃত কাব্যধারার গতানুগতিকতায় সীমাবদ্ধ, কিছু-বা নিছক অনুবাদ। প্রকৃত তেলুগু সাহিত্যের সূচনা একাদশ শতকে। এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি নন্নয় ভট্ট। ইনি নারায়ণ ভট্টের সহায়তায় মহাভারতের তিনটি পর্ব (আদি, সভা এবং অংশত বন পর্ব) অনুবাদ করেছিলেন (খ্রী. ১০২০)। বৈদিক ও পৌরাণিক

১ M. S. Andronov : The Brahui Language, p. 18 (map), Moscow, 1980

আর্য ভাবধারাশ্রিত সংস্কৃত সাহিত্যই ছিল তাঁর প্রধান উৎস—তাঁর ভাষাও তাই ছিল সংস্কৃত শব্দসম্পদে পুষ্ট, কিন্তু স্বচ্ছন্দ এবং সুললিত। তাঁর রচনা সাধারণত চম্পূরীতিতে গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে গ্রথিত। নন্নয় ভট্ট ছিলেন চালুক্য নরপতি রাজরাজ নরেন্দ্রের (খ্রী. ১০২২-১০৬৩) কুলগুরু। এই শতকের আর এক লেখক পব্লুরি মল্লন্ন (খ্রী. ১০৬০-১০৭০) সংস্কৃতে রচিত মহাবীরাচার্যের গণিতশাস্ত্র তেলুগু কবিতায় অনুবাদ করেছিলেন।

দ্বাদশ শতক থেকেই দক্ষিণ ভারতে রামানুজপন্থী বৈষ্ণবদের এবং লিঙ্গায়েৎ বীর-শৈব সম্প্রদায়ের প্রভাব দেখা যায়। সেই প্রেরণায় সাহিত্যও রচিত হয়েছে অনেক—যেমন, কাকতিয় যুবরাজ প্রতাপরুদ্রের (১ম) [খ্রী. ১১৪০-১১৯৬] 'নীতিসার' অথবা পালকুরিকি সোমনাথের 'বাসবপুরাণ'। পালকুরিকি সর্বপ্রথম চম্পূর পরিবর্তে জনপ্রিয় দ্বিপদী ছন্দ প্রবর্তন করলেন।

নন্নয়ের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করেন ১৩শ শতকের কবি "কবিব্রহ্মা" তিক্কন্ন যজ্বী (খ্রী. ১২২০-১৩০০)—ইনি চম্পূরীতিতেই মহাভারতের বিরাট পর্ব থেকে স্বর্গারোহণ পর্ব পর্যন্ত অনুবাদ-কর্ম সম্পন্ন করেন। বিরাট পর্ব অনুবাদ তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। নন্নয় এবং তিক্কন্নের পর 'শম্ভু দাস প্রবন্ধ-পরমেশ্বর' নামে পরিচিত কবি এর্রপ্রগড (খ্রী. ১২৮০-১৩৫০) মধ্যবর্তী অসমাপ্ত অরণ্য পর্বও সম্পূর্ণ করলেন। এই শৈব-কবি হরিবংশ এবং সম্ভবত রামায়ণ, লক্ষ্মী নৃসিংহ পুরাণ এবং অহোবল-মাহাত্ম্য রচনা করেছিলেন। তেলুগু সাহিত্যে 'কবিত্রয়' বলতে এই তিন কবিকেই বোঝানো হয়।

১৩শ শতকে আরও বহু কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন: রামায়ণ রচয়িতা রঙ্গনাথ (খ্রী. ১২৩০-৪০), তেলুগু ব্যাকরণ 'ত্রিলিঙ্গ শব্দানুশাসন' এবং ছন্দঃশাস্ত্র 'আথর্বণ-ছন্দস্' রচয়িতা জৈন কবি আথর্বণ 'দ্বিতীয়াচার্য', দশকুমারচরিতের অনুবাদক মূলঘটিক কেতন (খ্রী. ১২৫০) ইত্যাদি। শেষোক্ত কবি একখানি তেলুগু ব্যাকরণ (আন্ধ্রভাষা-ভূষণমু) এবং যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির মিতাক্ষরা টীকার অনুবাদ-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

সংস্কৃত শতকের মতো শতক রচনাও এই পর্বে রচিত হলো। নীতিশতক-জাতীয় রচনার সূত্রপাত অবশ্য করেছিলেন প্রতাপরুদ্র (১ম) তাঁর 'নীতিসার' গ্রন্থে অথবা পলকুরিকি সোমনাথ (খ্রী. ১১৮০)। এই পর্বে বেদ্দন-এর 'সুমতি শতক' (খ্রী. ১২৬০) এইজাতীয় আর একটি রচনা।

১৪শ শতকের প্রধান কবিরা হলেন: বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বুক্ক রায়ের সভাকবি নচন্ন সোম (খ্রী. ১৩৫৫-৭৭)—যিনি 'হরিবংশ' গ্রন্থের রচয়িতা।

অপর জন বিজয়নগর রাজসভার সম্মানিত কবিসার্বভৌম শ্রীনাথ (খ্রী. ১৩৫৬-১৪৪০)। ইনি মহাভারতের নল-দময়ন্তী-উপাখ্যান অবলম্বনে "শৃঙ্গার নৈষধ" রচনা করেছিলেন। এঁর অপর দুইখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : পল্‌নাটি-বীর-চরিত এবং বীথি-নাটক। এই দুই-খানি গ্রন্থের প্রথমটি স্থানীয় বীর যোদ্ধাদের যুদ্ধ ও প্রেমঘটিত রোমান্সগাথা। দ্বিতীয় গ্রন্থটি নাট্যসম্পর্কীয় হলেও তদানীন্তন নাগরিক জীবনের সুন্দর প্রতিচ্ছবি। এছাড়া তাঁর কিছু রচনা সংস্কৃত পুরাণ অবলম্বনে রচিত অনুবাদকর্ম, কিন্তু সাহিত্যধর্মে তাৎপর্যহীন।

১৫শ শতকের অধিকাংশ কবিই সংস্কৃত-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক—বিজয়নগর সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগে রচিত বলেই এই যুগের রচনাবলী প্রধানত হিন্দু-সংস্কৃতির জয়গান। ফলে বম্মের পোতন (খ্রী. ১৪০০-১৪৫০), রেমুলবাড ভীম কবি (খ্রী. ১৩৫০-১৫০০ শতকের মধ্যে আবির্ভূত) প্রভৃতি কবিদের অধিকাংশ রচনাই পৌরাণিক কাহিনী আশ্রিত এবং সংস্কৃত-ঘেঁষা। তবে ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যও একেবারে বিরল নয়, যেমন, জক্কন্ন (ইং ১৪১০), বিন্নুকোণ্ড বল্লভ (১৪২০) প্রভৃতি কবিদের রচনা। এই যুগের একজন বিশিষ্ট মহিলা-কবি হলেন তলপাক হিম্মক্ক (ইং ১৪৫০)। দ্বিপদী ছন্দে রচিত তাঁর 'সুভদ্রা কল্যাণ' একটি সুন্দর দীর্ঘ কবিতা, কাহিনী অবশ্য মহাভারতের।

১৬শ শতকের প্রধান কেন্দ্র চরিত্র হলেন বিজয়নগরের সম্রাট কৃষ্ণদেব রায় (খ্রী. ১৫০৯-৩০)। তিনি কেবল ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি নন, তিনি নিজেও সাহিত্যরসিক, পণ্ডিত ও কবি। তার রচিত একটি শ্রেষ্ঠ কাব্য "আমুক্তমাল্যদ"। "অষ্টদিগ্‌গজ" নামে অভিহিত আরও আটজন কবি বিজয়নগর রাজসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন অল্লসানি পেদ্দন (খ্রী. ১৫১০-৭৫)। তাঁর রচিত "স্বরোচিষ মনুচরিত" রচনা থেকেই প্রবন্ধ-কাব্যের সূত্রপাত। এইজাতীয় রচনা আসলে হলো প্রাচীন যুগের দেবতা বা রাজার কাহিনী অবলম্বনে পদ্য ও গদ্যে রচিত বড়ো গল্প। নন্দী তিম্মনের "পারিজাতাপহরণ" এই যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-কাব্য। ইনিও 'অষ্টদিগ্‌গজে'র একজন। পিঙ্গলি সুরন্ন (১৭শ শতকের প্রথম দিকের লেখক) অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যেমন—রাঘবপাণ্ডবীয়মু, কলাপূর্ণোদয়, প্রভাবতী-প্রদ্যুম্ন। তবে লেখাগুলি কিছুটা পণ্ডিতী ধরণের, ভাষাও কৃত্রিম।

এই প্রসঙ্গে বাহ্‌মনি রাজ্যের মুসলমান রাজাদের অবদানও উল্লেখযোগ্য। একদিকে এঁরা যেমন ফারসী ও "দক্‌নী হিন্দবী"র চর্চা করতেন, অপরদিকে তেমন গোলকোণ্ডার কুতবশাহী রাজাদের মতো (খ্রী. ১৫১৮-১৬৮৯) তেলুগু ও সংস্কৃত চর্চায়ও উৎসাহ দিতেন।

১৭শ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি বোধ হয় বেমন। অনেকে অবশ্য তাঁকে ১৫শ শতকের কবিও বলে থাকেন। তাঁর রচিত "বেমন শতক''-এ আছে প্রায় হাজার কবিতা। এইগুলি প্রকৃতপক্ষে নীতিকবিতা—কিন্তু সহজ সরল অথচ সবল ভাষায় উপস্থাপিত। এঁকে তামিলের প্রাচীন কবি তিরুবুল্.ল়্.বরের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

মধ্য যুগের শেষ পর্বের শ্রেষ্ঠ কবি সপ্তদশ শতকের গুরু সন্ত ত্যাগরাজ (মৃত্যু ইং ১৮৪৮)। তাঁর জন্ম অবশ্য তামিলনাড়ুর তাঞ্জোরে। ত্যাগরাজ কর্ণাটক সংগীতের তানসেন। তেলুগুতেই তাঁর গীতগুলি রচিত আর এই গানগুলি স্বতঃস্ফূর্ত রামভক্তিতে উচ্ছল।

প্রথম মুদ্রিত তেলুগু গ্রন্থ ১৭৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, মুদ্রাযন্ত্রের যুগ থেকেই আধুনিক তেলুগু সাহিত্যের শুরু।

১১.৪.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য১

তেলুগুতে সংস্কৃত বর্ণমালা (**Alphabet**) পুরোপুরি গ্রহণ করা হয়েছে, এমনকি ঋ, ৠ, ঌ এবং দীর্ঘ ঌ বর্ণও গৃহীত হয়েছে। তামিল/মালয়ালমে শ, ষ, স, হ বর্ণ নেই কিন্তু এখানে তা আছে (কানাড়ীতে তাই)। নতুন বর্ণের মধ্যে দীর্ঘ এঃ/eː/, ওঃ/oː/ এবং র'/r'/—যা সংস্কৃতে নেই।

তেলুগু স্বরধ্বনি হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদে এই : অ /ʌ/, ই, উ, এ, ও (হ্রস্ব) এবং আ, ঈ, ঊ, এঃ, ওঃ (দীর্ঘ) এবং ঐ /ʌi/ ও ঔ /ʌu/। ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে বর্গীয় ব্যঞ্জনগুলি পুরোপুরি বজায় আছে, তবে তালব্য স্পর্শব্যঞ্জনের দ্বিবিধ উচ্চারণ—ই/ঈ, এ/এঃ, য় ধ্বনির পূর্ববর্তী চ, ছ ধ্বনি মারাঠীসুলভ তালব্যঘৃষ্ট কিন্তু অন্যত্র দন্ত্যঘৃষ্ট / ts, dz /। নাসিক্য ধ্বনি এবং অন্তঃস্থ ধ্বনি য়, র, ল, ৱ / y, r, l, w / অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষার মতই লভ্য, তবে তামিলসুলভ ড় তেলুগুতে 'ড' ধ্বনিতে পরিণত (=কানাড়ী ল.) আর তামিল-মালয়ালম্ র্' তেলুগু-কানাড়ীতে কাব্যিক এবং সাধু গদ্যে ব্যবহৃত, কথ্য ভাষায় তা ট্/ট (=কানাড়ী ত্/ত) ধ্বনিতে পরিণত (যেমন তামিল মার্'র্'ু [উচ্চারণে মাত্রু]

১ R. Caldwell : CGDL ; J. Bloch : GSDL ; Z. N. Petrunicheva : The Telugu Language, Moscow, 1960 ; B. S. Rao : Telugu Made Easy, 3rd edition (1963).

"শব্দ">তেলুগু মাট, কানাড়ী মাতু ; তামিল পর্'র'্ [=পত্ত্]>তেলুগু পট্টু, কানাড়ী পট্টু, পত্তু)। ল. ধ্বনি অবশ্য তেলুগুতে যথারীতি। লক্ষণীয়, তেলুগু-কানাড়ীতে ণ্ট, স্ত, স্প ধ্বনি তামিলের মতো ণ্ড, ন্দ, ম্ব ক্রমে পরিবর্তিত হয় না। তেলুগুতে তামিলের চেয়ে সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ অধিক।

লিঙ্গ : লিঙ্গ-ধারণা অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষার অনুরূপ। নতুনত্বের মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক শব্দ ক্লীবলিঙ্গের অর্থাৎ অমহৎ (Inferior) বর্গের অন্তর্গত। উদাহরণস্বরূপ—তামিল প্রথম পুরুষ সর্বনাম অৱন্ (পুং), অৱল. (স্ত্রী) এবং অদু (ক্লী) = তেলুগু ৱাড্ু (পুং), আ-মে/-আ-দি (স্ত্রী/ক্লী "she/that")। লক্ষণীয়, তেলুগুতে বিশেষণ লিঙ্গনিরপেক্ষ, যেমন—মন্চিৱাড়ু "ভাল লোক" : মন্চিডি 'ভাল নারী/জিনিস')।

বচন : লিঙ্গনিরপেক্ষ বহুবচন প্রত্যয় (Epicene Plural) হলো -রু (রায়রু "রাজারা") এবং ক্লীবলিঙ্গ বা অমহৎ বহুবচন প্রত্যয় -লু (কলম-লু "কলমগুলি")।

শব্দরূপ : কারকের সংখ্যা তামিলের অনুরূপ। তেলুগু গুর্রমু "ঘোড়া" (ক্লী) শব্দের কারক-বিভক্তি নিচে প্রদর্শিত হলো : কর্তৃ—গুর্রমু (বহুব : গুর্রমলু) ; কর্ম—গুর্রমুন্নু ; করণ—গুর্রমুন "by a horse" ; সহায়ক ক্রিয়া—গুর্রমুতোঃ "with a tree" ; গৌণকর্ম/সম্প্রদান—গুর্রমুনকু ; অপাদান—গুর্রমুন্নুণ্ডি ; সম্বন্ধ—গুর্রমু/গুর্রমুয়োক্ক ; অধিকরণ—গুর্রমন্দু/গুর্রমুনন্দু ; সম্বোধন—গুর্রমা। এছাড়া গৌণ কারকে অনুসর্গের প্রয়োগ ব্যাপক।

সর্বনাম—উত্তম পুরুষ—নেঃনু : মেঃমু (১ব : বহুব), মধ্যম পুরুষ—নীৱ্ু/নী : মীরু ; প্রথম পুরুষ—ৱাড়ু : ৱারু (পুং) ; আদি : আৱি (ক্লী/স্ত্রী)।

ক্রিয়াপদ : কাল, ভাব, বচন ও পুরুষভেদে ক্রিয়াপদ সাধিত হয়। ক্রিয়াবিভক্তি সর্বনামশ্লিষ্ট। কালবাচক বিকরণ (Temporal Suffix) এইগুলি—বর্তমানকালে চু (=ৎসু)/ তু (চেঃয়ুচুন্নানু "আমি করি"<√ চেঃয়্ "করা") ; অতীতকালে -ই- (চেঃসিতিনি "আমি করেছিলাম", আডিতিনি<আড্ "খেলা) এবং ভবিষ্যৎ কালে -এঃ এবং -দু- (চেঃসেনু, চেঃয়ুদুনু "আমি করবো")। বর্তমানের রূপ ভবিষ্যতেও ব্যবহৃত হয়। এছাড়া নাস্ত্যর্থক ক্রিয়ার (Negative Verb) স্বতন্ত্র পর্যায় আছে।

ক্রিয়াবাচক অসমাপিকা (Absolutive) গঠিত হয় বর্তমান কালে -তু/ই প্রত্যয় যোগে (চেঃস্তু, চেঃসি "doing"), অতীতকালে -উত্তি "having been" যোগে (চেঃস্তুত্তি "having done") এবং সাপেক্ষ অসমাপিকায় (Conditional) -ইন্/-এঃ যোগে [চেঃসিন "If I do", চেঃসিতে/চেঃস্তে "If I did (do)"]। তুমর্থক অসমাপিকার (Infinitive) প্রত্যয় -অ/অন্ (চেঃয়, চেঃয়ন্ 'to do')।[১]

বাক্যরীতি অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষাসুলভ। লক্ষণীয় হলো, অন্যান্য দ্রাবিড় ভাষার মতো 'অ' প্রত্যয় যোগে সম্বন্ধ-নির্দেশক যৌগিক বিশেষণের (Relative Participle) প্রয়োগ, যেমন—মী-কুমারুডু-ব্রাসিন উত্তরমু চদিবিনানু "তোমার-পুত্র-লিখিত পত্র আমি পড়েছি"।[২] আরও দ্র. ৫.৩।

১ J. Bloch : GSDL p. 88
২ *ibid*, pp. 84-85

॥ ১২ ॥

বহির্ভারতীয় আর্য ভাষা

১২.১ নেপালী

১২.১.১ ভাষিক পরিস্থিতি

নেপাল ভারত-বহির্ভূত স্বাধীন রাষ্ট্র হলেও ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক বহু প্রাচীন। কেবল ভাষার দিক দিয়ে নয় (কারণ নেপালী ভারতীয় আর্য ভাষা), ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির নিবিড় বন্ধনে তার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য, অটুট—যদিও প্রবংশ বিচারে নেপালের অধিবাসীরা তিব্বত ও চীনের মঙ্গোলয়েড বংশধারার বর্তমান সন্ততি। অবশ্য আরও কয়েকটি ব্যাপারে নেপাল আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করেছে: প্রথমত, সারা পৃথিবীর আসরে ভারতকে বাদ দিলে নেপালই একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৈলশিখরগুলি নেপালেই অবস্থিত। এবং তৃতীয়ত, নেপালের গোর্খা সৈনিকরা বীরত্বের আভিজাত্যে সমগ্র পৃথিবীতে তুলনাহীন।

নেপালের ভাষাঞ্চল সীমানা নির্ধারণের পূর্বে তার ভৌগোলিক সীমানা চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। সমুচ্চ পর্বতমালার শৈল অধিত্যকায় অবস্থিত নেপালের উত্তরে তিব্বত, পূর্বে সিকিম, দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গ এবং পশ্চিমে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ। তিব্বত ও ভারতের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৫০০ মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণে অর্থাৎ প্রস্থে প্রায় ১৫০ মাইল (আয়তন প্রায় ৫৪,৩৬২ বর্গ মাইল) জুড়ে নেপালের অবস্থান। এই সমগ্র অঞ্চলের দক্ষিণের তরাই অঞ্চলই কেবল বাসযোগ্য সমতলভুমি, অপর দিকে উত্তরে তিব্বত পর্যন্ত বিস্তৃত সমুচ্চ বিশাল হিমালয়ের পার্বত্যাঞ্চল। বলা বাহুল্য, অতীতে নেপাল রাজ্য পশ্চিমে পাঞ্জাব ও পূর্বে সিকিম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তির ফলে পশ্চিমের নৈনীতাল, আলমোড়া, গাঢ়ওয়াল, দেরাদুন ও সিমলা ইংরেজ সরকারের অধীনে আসে। এছাড়া পূর্বদিকের কিছু অংশ সিকিমের সঙ্গে যুক্ত হয়।

'নেপাল' এই অভিধা ভারতে বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। ঐতিহাসিক উল্লেখের মধ্যে গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য হলো সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদের স্তম্ভলিপি (খ্রী. ৪র্থ শতক)। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও (খ্রী. ৩০০) 'নেপাল' কথার উল্লেখ আছে।

এছাড়া অশোকের শিলালেখ (সংখ্যা ১৩) থেকেও প্রতিভাত হয় যে 'নেপাল' মহারাজ অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্-এর (৬২০-৬৪৫ খ্রী. অ.) বিবরণ থেকে জানা যায়, নেপালের রাজারা ছিলেন ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব লিচ্ছবি-বংশীয় এবং এখানকার নৃপতিরা ছিলেন সুপণ্ডিত। আরও উল্লেখ পাওয়া যায় যোগিনীতন্ত্র গ্রন্থে, বারাহপুরাণে। যাই হোক, এই সমস্ত ঐতিহাতিক সাক্ষ্য দেখে বোঝা যায়, নেপাল প্রকৃতপক্ষে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল—সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয়—যে কোনো দিক দিয়েই তা ভারতের কাছে মোটেই বিদেশ ব'লে গণ্য হতো না।

'নেপাল' নামকরণ সম্পর্কে লোকশ্রুতি হলো যে 'নে' মুনির নাম থেকে নেপালের নামকরণ। তবে খুব সম্ভব নেপালের প্রাচীন মঙ্গোলয়েড অধিবাসী নেওয়ারদের বাসস্থান হিসেবে "নেওয়ার" (যার অর্থ "পবিত্র স্থানের অধিবাসী") 'নেপাল' শব্দে পরিণত হয়।

নেপালী নেপাল রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা। ইং ১৯৬১ সনের জনসমীক্ষা অনুযায়ী নেপালী ভাষীর সংখ্যা ৯৪ লক্ষ ১২ হাজার ৯৯৬। কিন্তু ভারতে নেপালী ভাষীর সংখ্যা ১০ লক্ষ ৪ হাজার ২৬ জন। ইং ১৯৭১-এর সমীক্ষায় ভারতে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২ লক্ষ ৮৬ হাজার ৮২৪। নেপালী ভাষীদের ৫০% শতাংশের অধিক লোক নেপালের দক্ষিণে তরাই অঞ্চলে বসবাস করে। নেপালের বাইরে প্রধানত পশ্চিম-বঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাতেই অধিকাংশ নেপালী বাস করেন। কিছু কিছু নেপালী আসাম (২,১৫,২১৩), উত্তরপ্রদেশ (৬৯,১১৮) এবং বিহারেও (২৯,২৮২) বসবাস করেন। অধুনা ভারত-ভুক্ত সিকিমেরও অধিকাংশ লোক এই ভাষাভাষী।

নেপালীর ভাষাঞ্চল সীমানা হলো উত্তরে তিব্বতী (ভোট-বর্মী), পূর্বে ভোটানী (ভোট-বর্মী), দক্ষিণে বাঙলা, মৈথিলী, ভোজপুরী ও অবধী (ইন্দো-ইউরোপীয়) এবং পশ্চিমে কুমায়ুনী (ইন্দো-ইউরোপীয়)। নেপালে ভারতীয় আর্যভুক্ত নেপালী ছাড়াও বহু ভোট-বর্মী ভাষা রয়েছে (গুরুঙ্, মগর, নেওয়ারী, সুনওয়ারী, মুর্মী ইত্যাদি)। কিছু কিছু ভোট-বর্মী ভাষায় অবশ্য অস্ট্রিক বা মুণ্ডা প্রভাবও দেখা যায় (সর্বনামশ্লিষ্ট ভোট-হিমালয়ী)।

'নেপালী' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নিয়ে মতবিভেদ আছে। গ্রীয়ার্সনের মতে, তা সংস্কৃত 'নৈপালী' থেকে উদ্ভূত। অনেকের মতে আবার নেপালের অন্যতম প্রাচীন ভাষা 'নেওয়ারী' নাম থেকে নেপালী শব্দের উদ্ভব হয়েছে। নেপালী বিভিন্ন নামে পরিচিত,

যথা—(১) গোর্খালী—নেপালে গোর্খা শাসকদের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত ব'লে তা গোর্খালী। বলা বাহুল্য, ইং ১৭৬৯ সালের পর থেকেই নেপালে গোর্খা শাসনের সূত্রপাত। (২) খস-কুরা বা খস্‌দের ভাষা। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অধ্যুষিত খস উপজাতিরাই সম্ভবত সর্বপ্রথম এই ভাষা গ্রহণ করেছিল। (৩) 'পর্বতীয়া' বা পার্বত্যাঞ্চলের ভাষা হিসেবে তা উপত্যকার নেওয়ারী বা ভারতের সমতলভূমির আর্যভাষা থেকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হয়েছিল। (৪) পূর্বী পাহাড়ী। পাহাড়ী নামটি সর্বপ্রথম প্রচলন করেন **Baines** এবং গ্রীয়ার্সন। এই হিসাবে নেপালী পূর্বী পাহাড়ীর অন্তর্গত।

বর্গীকরণের ক্ষেত্রে নেপালী ভারতীয়-আর্য ভাষায় অন্তর্গত। **Baines** এবং গ্রীয়ার্সন এই ভাষাকে পাহাড়ী শাখার পূর্বী উপশাখা রূপে চিহ্নিত করেছেন—একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই পাহাড়ী শাখা কল্পিত হয়েছে পশ্চিমা, মধ্যা ও পূর্বী পাহাড়ী ভাষাগুলির সাধর্ম্যের ওপর ভিত্তি ক'রে। মধ্য পাহাড়ীর অন্তর্গত প্রধান ভাষা হলো গাঢ়োয়ালী (পৌরী-গাড়োয়াল, মুঁসৌরি) ও কুমায়ুনী (আলমোড়া এবং নৈনিতাল) এবং পশ্চিমা পাহাড়ীব অন্তর্ভুক্ত হলো চমেলী, মণ্ডেআলী, কুল্লু, কিউঁঠালী, জৌনসারী, শিরমৌরী ইত্যাদি ভাষা (দ্র. পৃ. ৬১-৬৩)। পূর্বী পাহাড়ীভুক্ত নেপালীর উপভাষা হলো এইগুলি—(১) পূর্বী নেপালী (ধনকুটা, ইলাম অঞ্চলে প্রচলিত); (২) মধ্য বা আদর্শ নেপালী; (৩) 'মাদী' উপভাষা এবং (৪) পশ্চিমা উপভাষা (দোটিয়ালী, কর্ণালী ইত্যাদি)।

গ্রীয়ার্সনের মতে, নেপালী ভাষার বিবর্তন নেপালে গোর্খা অভিযানের সঙ্গে সম্পর্কিত। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষায় জানা যায়, উদয়পুরের (রাজপুতানা) কোনো রাজপুত গোষ্ঠী মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ভারতের উত্তরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং ১৬শ শতকের গোড়ার দিকে হিমালয়ের নিম্নাঞ্চলে, যথা, গাঢ়োয়াল, কুমায়ুন অঞ্চলে এবং পশ্চিম নেপালে স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে তোলে। ইং ১৫৫৯ সালে এই রাজপুতদের কোনো গোষ্ঠী কাঠমুণ্ড (<কাষ্ঠমণ্ডপ ? ঃ চট্টোপাধ্যায়) শহরের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত 'গোর্খা' নামক শহরটি দখল করে এবং নিজেরাও গোর্খা জাতিরূপে পরিচিত হয়। ইং ১৭৬৮ সালে গোর্খাদের রাজা পৃথ্বীনারায়ণ শাহ্ সমগ্র নেপাল অধিকার ক'রে নেপালে গোর্খা রাজবংশের পত্তন করেন। সুতরাং দেখা গেল, নেপাল শাসকেরা প্রকৃতপক্ষে রাজপুতবংশীয় এবং তাদের ভাষা নেপালী বা গোর্খালী পূর্বোক্ত উদয়পুর অঞ্চলে প্রচলিত ভাষা রাজস্থানীর মেওয়াটী-মারোয়াড়ী উপভাষার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত।

সুতরাং এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে, গ্রীয়ার্সনের পক্ষে নেপালী ও রাজস্থানীর ভাষাতাত্ত্বিক সাধর্ম্য খুঁজে পাওয়াই স্বাভাবিক এবং বলা বাহুল্য, এই হিসেবে এই ভাষা মধ্যদেশীয় শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলেই মনে হয়। বর্তমানে টার্নার (**R. L. Turner**) কিন্তু মনে করেন : এই ভাষা প্রকৃতপক্ষে মধ্য ভারতীয় আর্যের (MIA) উত্তর-পশ্চিম উপশাখার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই প্রসঙ্গে তিনি যে ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ উদ্ধার করেছেন, তার একটি উদাহরণ নিয়ে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যাক : সংস্কৃত নাসিক্যধ্বনি+অঘোষ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন (যেমন, ঙ্ক, ঞ্চ, ন্ত, ম্প)—এই যুক্তব্যঞ্জনের অঘোষ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনটি অধিকাংশ ভাষায় রক্ষিত, যেমন—সং দন্ত>প্রা দন্ত>বাঙলা-হিন্দী-গুজরাটী দাঁত, ওড়িয়া দান্ত, মারাঠী দাত, সিংহলী দত, কিন্তু উত্তর-পশ্চিমা ভাষায় উপরোক্ত অঘোষ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন ঘোষীভূত, যেমন, সং দন্ত>কাশ্মীরী, পাঞ্জাবী দন্দ্, সিন্ধী ডন্দু ইত্যাদি। লক্ষণীয়, পাহাড়ী ভাষাগুলি এই দিক দিয়ে উত্তর-পশ্চিমার সমগোত্রীয়, তুলনীয় সং দন্ত>নেপালী দাদে, পশ্চিমা পাহাড়ী দন্দ। এই পাহাড়ী ভাষীরা যে পশ্চিম দিক থেকেই এসেছে তার আরও প্রমাণ জিপসী বা রোমনী ভাষার সঙ্গে এদের সাধর্ম্য, যেমন, রোমনী (সর্বত্র) দন্দ্, দোন্দ ইত্যাদি। কাজেই স্বীকার করতে হয়, পাহাড়ীদের তথা পূর্বতন নেপালীভাষীদের আদি অধিষ্ঠান ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতেই, আর সম্ভবত এই অঞ্চলে অধ্যুষিত 'খশ' উপজাতিদের দ্বারাই তা আরও পূর্ব অঞ্চলে নীত হয়।[১]

অবশ্য অপর কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, নেপালীর সঙ্গে গুজরাটী, সিন্ধী, লহ্ন্দা, পাঞ্জাবী এবং হিন্দীর প্রাক্-স্তরীয় ভাষার কিছু সাধর্ম্য রয়েছে, যেমন, ই-প্রত্যয় যুক্ত কর্মবাচ্যের গঠনে ('ই'<প্রা ঈঅ<সং -য়, তু. সং গম্যতে> প্রা গমীঅই, গমিজ্জই) নেপালীর সঙ্গে সিন্ধী, লহন্দা, গুজরাটী ও হিন্দীর মিল রয়েছে (অন্যত্র ইজ-যুক্ত কর্মবাচ্য)। মোট কথা, এই দিক দিয়ে নেপালী ভাষা উত্তর-পশ্চিমা এবং পশ্চিমার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। এমনকি নেপালীর সঙ্গে পূর্বী ভাষাগুলির সাধর্ম্যও নজরে পড়ে। আসলে এই ভাষা যখন ক্রমশই পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয় আর্যভাষার পশ্চিমা বা পূর্বী প্রভাব প্রতিফলিত হতে পারে। এইজন্যই উত্তর-পশ্চিমা ও পশ্চিমাসুলভ 'ণ' ধ্বনি নেপালীতে মধ্যা ও পূর্বী ভাষার মতো 'ন' ধ্বনিতে পরিণত। এইরূপ প্রাকৃত ড, ড্ড ধ্বনি এখানে পূর্বীসুলভ র/ড় ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

১ LSI Vol. IX, pt. iv p. 8 ; Turner : ND Introduction, xiii

প্রকৃতপক্ষে দেখা যাচ্ছে, সমতলভূমির ভাষাভাষীদের সঙ্গে সতত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রক্ষা ক'রে চলতে হয়েছে বলেই এই ভাষা সর্বদাই নতুন নতুন প্রভাব অঙ্গীকার করে নিয়েছে, তারই ফলস্বরূপ হিন্দুস্থানী (যেমন ৬ষ্ঠীর 'কো' বিভক্তি, এমনকি নাগরী লিপির প্রবর্তনা), ভোজপুরী এবং মৈথিলীর প্রভাবও নেপালীতে কিছু-না-কিছু রয়েই গেছে। এছাড়া নেপালী ভাষার অন্তস্তলে ভোট-বর্মী প্রভাব তো আছেই, কারণ জাতি হিসেবে এরা নর্ডিক আর্য এবং মঙ্গোলয়েড প্রবংশের মিশ্রণ হলেও প্রাচীনতর যুগে এখানকার অধিবাসীরা ভোট-বর্মী ভাষাগোষ্ঠীরই অন্তর্গত ছিল।

নেপালীর প্রাচীন সাহিত্যিক উপাদানগুলির (১৩০০-১৬৭০ খ্রী. অ.) মধ্যে প্রধান হলো: রাজা পুণ্যমল্লের তাম্রপত্র (১৩৫৯ শকাব্দ), মান রাজা শাহ্-এর আদেশ পত্র (১৪১৪ খ্রী.), রাজা নরেশ্বরের আদেশপত্র (১৪৫০ খ্রী.), প্রতাপমল্লের কনকপত্র (১৫৫৬ খ্রী.), রাণী পোখরী লেখ (১৬৭০ খ্রী.) ইত্যাদি। নেপালী সাহিত্য অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলির তুলনায় যথেষ্ট অর্বাচীন। নেপালী সাহিত্যের প্রথম কবি উদয়ানন্দ অর্জ্যাল ১৮শ শতকের মধ্যভাগের লেখক। নেপালীর বিখ্যাত কবি ভানুভক্ত অধ্যাত্মরামায়ণের ভিত্তিতে ইং ১৮৭০ সালে নেপালী ভাষায় তাঁর রামায়ণ রচনা করেন। নেপালীর প্রথম ব্যাকরণ ইং ১৮২১ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়, লেখক আলেকজাণ্ডার আয়টন।

১২.১.২ নেপাল ও নেওয়ারী

নেপালে ভারতীয় আর্যভুক্ত 'নেপালী' ছাড়াও ভোট-বর্মী পরিবারভুক্ত বহু ভাষার প্রচলন আছে—এগুলি সবই ভোট-হিমালয়ী মণ্ডলের বিভিন্ন উপশাখা (দ্র. পৃ. ৬৬), যথা—(ক) নেপাল ও সিকিমে প্রচলিত নেওয়ারী, মগর, গুরুঙ্, মুর্মি, সুন্ওয়ারি, কিরান্তী, লেপ্চা/রোঙ্ এবং টোটো (আনুমানিক ভাষাভাষী সংখ্যা ১ লক্ষ ২ হাজার)। এই ভাষাগুলি শুদ্ধ বা অ-সর্বনামশ্লিষ্ট ভাষা। (খ) পশ্চিমা ভাষা, যথা, সিমলা অঞ্চলে প্রচলিত কন্ওয়ারী এবং পূর্ব পাঞ্জাবের হিমালয় পার্বত্যাঞ্চলে প্রচলিত লাহুলী ইত্যাদি নয়টি উপভাষা এবং পূর্বী ভাষা, যথা, নেপাল অঞ্চলে প্রচলিত ধিমাল, থামি, লিম্বু, যথ, খম্বু, রৈ, বয়ু ইত্যাদি (ভাষাভাষী সংখ্যা আনুমানিক ১ লক্ষ ১৪ হাজার)। এই ভাষাগুলি সর্বনামশ্লিষ্ট (Pronominalised), তাই এগুলির উপর প্রাক্-মঙ্গোলয়েড যুগে একদা-প্রচলিত অস্ট্রিক ভাষার প্রভাব রয়ে গেছে।

সুতরাং কালানুক্রমের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, অষ্ট্রিক-প্রভাবিত ভোট-হিমালয়ী ভাষীরা এখানকার প্রাচীনতম অধিবাসী আর আর্যগোষ্ঠীভুক্ত নেপালী ভাষীরা এখানে নবাগত আগন্তুকমাত্র।

প্রবংশ বিচারে নেপালের অধিবাসীরা মঙ্গোলয়েড অথবা ইন্দো-মঙ্গোলয়েড গোত্রভুক্ত। উত্তরের পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসকারী ভোটিয়া বা তিব্বতীরা পুরোপুরি ভোট-মঙ্গোলীয়। কিন্তু পশ্চিমে বাস করে গুরুঙ্ এবং মগর, মধ্যাঞ্চলে মুর্মি, গোর্খালি/নেপালী এবং নেওয়ারী, পূর্বে কিরান্তী, লিম্বু ও লেপ্চা। এদের মধ্যে মধ্যাঞ্চলে অধ্যুষিত গোর্খালিরা ভারতীয় আর্যভাষাভাষী 'ককেশীয়' বা নর্ডিক এবং ভোট-বর্মী ভাষী মঙ্গোলয়েড জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত। জাতিতে এরা প্রধানত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। আর ধর্মের দিক দিয়ে এরা মগর ও গুরুঙ্দের মতো হিন্দু। অপর পক্ষে নেওয়ার, লিম্বু, কিরান্তী এবং লেপ্চারা হলো প্রধানত বৌদ্ধ—যদিও এই বৌদ্ধ ধর্মাচার হিন্দুধর্মের সঙ্গে সমীভূত হয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য, ভোট-বর্মীভাষী মঙ্গোলয়েড প্রবংশের প্রধান অধিষ্ঠান ছিল তিব্বতের পূর্ব এবং আসামের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে। আনুমানিক খ্রীষ্ট পূর্ব ১০০০ অব্দেই এরা পশ্চিমে এবং দক্ষিণে প্রসারিত হতে থাকে এবং ক্রমে ভুটান ও সিকিম থেকে পশ্চিমে লাদাখ এবং বাল্টীস্তান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ভোট-হিমালয়ী ভাষীরা সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ সালেই নেপালে অধিষ্ঠিত হতে থাকে—যদিও কোন্ পথ ধ'রে তারা এখানে এসেছিল সে-সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় নি। হয়তো এরা এসেছিল প্রথমে তিব্বতে এবং পরে হিমালয় পেরিয়ে ক্রমশ দক্ষিণে এবং একই সঙ্গে হয়তো পূর্ব আসাম পথে বিভিন্ন নদীর গতিপথ ধ'রে। এর পরের ইতিহাস কতকটা আসামের অনুরূপ।

আসামে যেমন মঙ্গোলয়েড বোড়ো-ভাষীরা ধীরে ধীরে ভারতীয় আর্যভাষার কাছে নতি স্বীকার করলো, পাহাড়ী ভাষাঞ্চলেও তেমনি। মঙ্গোলয়েড প্রবংশের বিভিন্ন ভোট-হিমালয়ী ভাষীদের ভাষা ক্রমে আর্য পাহাড়ীর (নেপালীর) দ্বারা স্থানচ্যুত হলো। উভয়ক্ষেত্রেই কালক্রমে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সমন্বয় ঘটেছে। বংশাবলী জাতীয় (Chronicle) রচনার ক্ষেত্রেও এরা ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে পথিকৃৎ (নেওয়ারী "বংশাবলী" এবং অহোম 'বুরুঞ্জী' স্মরণীয়)। উভয় ভাষাঞ্চলেই একদা-প্রচলিত অষ্ট্রিক ভাষার স্বাক্ষর রয়ে গেছে (পাহাড়ী অঞ্চলে সর্বনামশ্লিষ্ট ভাষা এবং আসামে খাসি ভাষা স্মরণীয়)। উভয় স্থানেই পূর্বাপর-প্রচলিত ভোট-বর্মীগোষ্ঠীভুক্ত ভাষাগুলি বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নিয়ে কোনো মতে টিঁকে আছে, বৃহৎ আসামরাজ্যে যেমন মণিপুরী, নেপালে তেমন নেওয়ারী। বাস্তবিক পক্ষে, ভারতীয় সংস্কৃতির

ইতিহাসে ভোট-বর্মীর স্মরণীয় অবদান হলো নেওয়ারী, মণিপুরী এবং অহোম সংস্কৃতি।

নেপালে গোর্খা শাসন এবং সেই সঙ্গে নেপালী ভাষার প্রবর্তনা প্রকৃতপক্ষে ১৮শ শতক থেকে শুরু। এর পূর্বের ইতিহাস অবশ্য মঙ্গোলয়েড নেওয়ার রাজাদের একটানা প্রায় তিনশ' বছরের আধিপত্য। নেপালে নেওয়ার রাজাদের আগমন ঘটে আনুমানিক খ্রীষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে। এর পূর্বের ইতিহাস অস্পষ্ট। পূর্বেই বলেছি, 'নেওয়ার' শব্দটি থেকেই 'নেপাল' শব্দের উদ্ভব; নেওয়াররা শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে মঙ্গোলয়েড, ধর্মে প্রধানত বৌদ্ধ এবং ভাষাবিচারে নেওয়ারী ভোট-চীনা ভাষা-গোষ্ঠীর ভোট-বর্মী শাখার ভোট-হিমালয়ী উপশাখার অন্তর্গত। ইং ১৭৬৮ সালে হিন্দু ধর্মাবলম্বী নেপালীভাষী গোর্খাদের বিজয়ের পূর্বে নেপালের রাজভাষা ও সরকারী ভাষা ছিল এই নেওয়ারী। কিন্তু বর্তমানে তা গোর্খা রাজাদের বিরূপতায় ও সরকারী নিষেধাজ্ঞার প্রবল চাপে নিষ্পেষিত, নেপালীর পাশে নেওয়ারী দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষামাত্র। অকৃত্রিম নেওয়ার জাতি বর্তমানে দুর্লভ, কাঠমণ্ডুর আশেপাশে এরা এখন বসবাস করে। ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক ২/৩ লক্ষ। নেপাল ছাড়া ভারত ও সিকিমেও কিছু কিছু নেওয়ারী ভাষীর বসতি আছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে নেওয়ারীদের অবদান অতুলনীয়। বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃতে রচিত মহাযানী বৌদ্ধ সাহিত্যের বহু গ্রন্থ এদের দ্বারা রক্ষিত হয়েছে। এগুলি সবই কুটিল লিপিতে লিখিত। চর্যাপদ, দোহাকোষ প্রভৃতি বাঙলা ও অপভ্রংশে রচিত গ্রন্থগুলিও এঁরা সংরক্ষণ করেছেন। বাঙলা ভাষায় লেখা প্রাচীন নাটকও সেখানে অভিনীত হতো, এবং সেগুলি উদ্ধারও করা গেছে। এছাড়া স্থাপত্যে, ধাতুশিল্পে, সূক্ষ্ম অলংকরণে, গৃহসজ্জা এবং দারুশিল্পে নেওয়ারীদের নৈপুণ্য বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

নেওয়ারী ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হলো ইং ১২০৭ সালে রচিত কাঠমণ্ডুর গনবহল-এ পাওয়া একটি দানপত্র। সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ হলো ১৪শ শতকে রচিত "গোপাল-রাজবংশাবলী"। এতে খ্রীষ্টীয় ১০৫৬-১৩৮৮ কালসীমায় নেপালের বিচিত্র ঘটনাবলী, ইতিহাস ও রাজবংশের ক্রমপঞ্জী উল্লিখিত হয়েছে। নেওয়ারী লিপি প্রাচীন ব্রাহ্মী-উদ্ভূত পূর্বী রীতির কুটিল লিপি থেকে বিকশিত। বর্তমানে তার স্থান দখল করেছে নাগরী।

নেওয়ারী একটি অ-সার্বনামিক ভাষা (**Non-Pronominalised**)। এই ভাষার অপর বৈশিষ্ট্য, মুণ্ডা ভাষার মতো এই ভাষায় চেতন (Animate) ও অচেতন

(Inanimate) ভেদে লিঙ্গশাসন দেখা যায়। নেওয়ারীতে সংস্কৃত শব্দও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে অনেক। নেপালী ব্যতীত নেপালের অধিকাংশ ভাষাই নেওয়ারীর সঙ্গে সম্পর্কিত।[১]

ভাষা প্রসঙ্গে নেপালের ঐতিহাসিক পটভূমিকা উপস্থাপিত হওয়া দরকার। নেওয়ারী 'বংশাবলী' অনুযায়ী নেপাল খ্রীষ্টীয় শতক সূচনার পূর্বেই 'গোপাল' এবং 'আহীর' বংশীয় রাজাদের দ্বারা শাসিত হতো। বংশাবলীতে বিশুদ্ধ মঙ্গোলয়েড প্রবংশের রাজারা কিরাত নামে অভিহিত হয়েছে আর এই কিরাত রাজারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক অথবা পৌরাণিক আর্য সংস্কৃতি সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে (যেমন, পাণ্ডব, বুদ্ধ বা অশোক সম্পর্কিত)। নেপালে ঐতিহাসিক রাজবংশের সূত্রপাত করলেন বিহার-আগত সৌরবংশীয় লিচ্ছবী রাজারা (জন্মসূত্রে তাঁরাও সম্ভবত ইন্দো-মঙ্গোলয়েড), সময়সীমা খ্রীষ্টীয় ৩৫০ থেকে ৯ম শতকের শেষ পাদ। এই সময়েই বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের (বৈষ্ণব ও শৈব) যথার্থ সমন্বয় ঘটতে দেখা গেল (স্মরণীয় পশুপতিনাথের মন্দির ৭ম শতকে নির্মিত হয়েছিল)। ৭ম শতকে যখন উত্তর ভারতে কনৌজের সম্রাট হর্ষবর্ধন এবং দাক্ষিণাত্যে চালুক্যবংশীয় পুলকেশিন্ রাজত্ব করছিলেন, সেই সময় নেপালে ঠাকুর বংশীয় রাজা মহাসামন্ত অংশুবর্মনের (ইনিও সম্ভবত জন্মসূত্রে ইন্দো-মঙ্গোলয়েড) যথেষ্ট প্রতিপত্তি। এঁর কন্যার সঙ্গে তিব্বতী রাজার বিবাহ ঘটলে নেপাল এবং তিব্বতের সংযোগসাধন ঘটে এবং তিব্বতে মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে। অপরদিকে আবার তিব্বতী রাজা চীনদেশের তাঙ্ বংশের রাজকুমারীর সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হলে তিব্বত ও চীনার রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপিত হয়। অংশুবর্মনের পর নেপালে আবার লিচ্ছবী বংশীয় রাজাদের প্রাধান্য দেখা গেল।

নেপালে ঠাকুরী বংশের যথার্থ স্থিতিকাল ৯ম-১২শ শতক পর্যন্ত। এই পর্বে নেপালের সঙ্গে যেমন ভারতের (বাঙলা ও বিহার) সংযোগসূত্র স্থাপিত হয়, চীন ও তিব্বতের সঙ্গেও তেমনি। এই সময় নেপালে সংস্কৃত চর্চা যথেষ্ট বর্ধিত হয়, বৌদ্ধ মঠে বৌদ্ধ শাস্ত্র রক্ষিত হতে থাকে। ইং ৮৭৯ সালে সম্ভবত 'নেপাল' নামটিরও প্রচলন হয়। এর পর ১২শ শতকের মধ্যভাগ থেকে ১৪শ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত দক্ষিণ নেপালে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক রাজবংশের সূত্রপাত (বাঙলায় যেমন সেনবংশ) এবং এই সময় থেকে হিন্দুধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

---

১ LSI Vol. III pt. I.

এর পর ১৩শ শতক থেকে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মল্ল রাজাদের রাজত্বকাল। এঁরা সম্ভবত আর্য ও মঙ্গোলীয় মিশ্রণে গঠিত কোনো গোষ্ঠী, যাদের ভাষা ছিল ভোট-বর্মীভুক্ত নেওয়ারী। এই সময় নেওয়ারী ভাষার যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটে। নেওয়ারী ভাষাতেও সংস্কৃতের প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। অবশ্য সংস্কৃত, মৈথিলী, বাঙলা বা পূর্বী হিন্দী অথবা অপভ্রংশের প্রচলন ও চর্চাও ছিল স্বাভাবিক। বস্তুত, পূর্ব নেপালে নেওয়ার মল্লদের রাজত্বকাল (বিশেষত ১৭শ শতক) হলো নেপালের স্বর্ণযুগ। এঁরা ধর্মে ছিলেন বৌদ্ধ অথবা হিন্দু। ফলে, সাংস্কৃতিক সমন্বয়—ভাষায় এবং ধর্মে—ছিল অনিবার্য। ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই নেওয়ার মল্লরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং নেপাল রাজ্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়ে (কাঠমণ্ডু, ললিতপুর/পাটন, বানেপা, ভাতগাঁও)। এই দুর্বলতার সুযোগে নেপালে খ্রী. ১৭৬৮ সাল থেকে গোর্খা রাজত্বের সূত্রপাত হয়—সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আর সেই সঙ্গে নেওয়ারীর স্থান দখল করে নেপালী।

১২.১.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

নেপালী ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে হলো এই—

১. স্বরবর্ণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো লিখিত 'এ' ধ্বনির দুজাতীয় উচ্চারণ [e/ɛ], অ ধ্বনির দুই উচ্চারণ [ʌ/a]। লিপিরীতিতে হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ থাকলেও সম্ভবত তা অর্থান্তর ঘটায় না। ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শ্‌ ষ্‌ স-এর দন্ত্য উচ্চারণ /s/ ; নাসিক্য ধ্বনি ঙ্‌, ন্‌, ম্‌ মহাপ্রাণিত নয়, তবে ল এবং ড় ধ্বনি মহাপ্রাণিত হতে পারে [l/lh, ṛ/ṛh]। 'ষ' কখনো কখনো 'খ' রূপে উচ্চারিত। স্পর্শ ধ্বনিগুলি সংস্কৃতের মতো পুরোপুরি রক্ষিত।

২. বচন দুটি—একবচন ও বহুবচন (ঘোড়ো : ঘোড়া)। হরু/হেরু যোগেও বহুবচন গঠিত হয় (ঘোড়াহরু, মানিসহরু)।

৩. লিঙ্গ দুটি—পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ। লিঙ্গ-ধারণা স্বাভাবিক (পুং : ভাই, কিতাপ ; স্ত্রী : ছোরী "বালিকা", গাই)। বিশেষণ, সম্বন্ধ-বিশেষণ বা ক্রিয়া লিঙ্গশাসনে নিয়ন্ত্রিত (ঠুলো গোরু "বড় গরু" : ঠুলি গাই ; রাজাকো ছোরো : রাজাকী ছোরী)। স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয় সাধারণত (-ই)নি, -ই (সাধুনি, মিতিনি, মাই, রাতি, গাই)।

৪. কারক দুটি—কর্তৃ ও তির্যক কারক। কেবল ও-কারান্ত শব্দে তির্যকমূলের পার্থক্য রক্ষিত, অন্যত্র নয় (ছোরো : ছোরা- কিন্তু মানিস : মানিস-)।

৫. কারকবাচক অনুসর্গ—মুখ্য / গৌণ কর্মে -লাই [তু. মধ্য / পশ্চিমা পাহাড়ী : সনি, কণি]; করণবাচক -লে [তু. কুমাউনী লে, গঢ়বালী -নে]; ৪র্থীতে -কন (<কর্ণ), ৫মীতে -লে, দেখি, বাট, সিত (<সহিত) [তু. গঢ়বালী -তৈ, থৈ]; ৬ষ্ঠীতে কো, কা, কী (স্ত্রী); ৭মীতে -মা, মাহ, মাথ/মাথি [তু. গঢ়বালী -মেঁ]।

৬. সর্বনামমূল—১ব : বহুব—কর্তৃকারকে উ পু হামি : হামিহরু, তির্যককারকে ম/মই : হামি ; ৬ষ্ঠীতে মেরো : হামরো [অন্য পাহাড়ী ভাষায় মেঁ, মৈঁ, মেরী (১ব); হম, হমন, হমারী (বহুব)]; ম পু ত/তই : তিমি, তির্যককারকে ত/তই : তিমি ; ৬ষ্ঠীতে তেরো : তিমিরো।

৭. অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল কৃদন্তমূলক : ম গএঁ (<গতম্), ম হোউঁ-লা "আমি হইব"।

৮. শত্রর্থক প্রত্যয় -দো (<সং শত্রর্থ প্রত্যয় -অন্ত্), যেমন—হুঁদো "হওয়া", গরদো "করা" ইত্যাদি। শত্রর্থ এবং যৌগিক কালে -দো ব্যবহৃত হয় (ম জাঁদা হোউলা, ম জাঁদো থিয়েঁ)।

৯. অস্ত্যর্থক ধাতু -ছ, হো এবং অতীতে থিয়ো, ভ ব্যবহৃত হয়, যেমন—ম ছুঁ, ম হুঁ, ম থিয়েঁ/থেঁ, ম ভএঁ। যৌগিক কালে এই অস্ত্যর্থক ক্রিয়াগুলি যুক্ত হয়, যেমন—ম জানছু, ম গয়ে(ক)ছু, ম জানথে, ম জাঁদো থিয়েঁ/থেঁ ইত্যাদি।[১]

১২.২ সিংহলী[২]

সিংহলী ভাষা সিলোনীজ (Ceylonese), সিজ্ঘলী (Singhalese) অথবা সিমেলু (Simelu) নামেও পরিচিত। সিংহলী সিংহলের ভাষা। বর্তমানে সিংহলের নতুন নামকরণ হয়েছে শ্রীলঙ্কা রূপে (রাজধানী কলম্বো)। ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত থেকে এই দ্বীপটির নিকটতম সীমানা মাত্র ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত। মধ্যে ৩২ কিলোমিটার

১ Turner : ND
Sri Vastav : The Origin and Development of Nepali language,
S. K. Chatterji : Kirāta-jana-krti,
Grierson : LSI, IV, pt iv,
ভারতকোষ : নেওয়ারী, নেপালী
গোপাল হালদার : ভারতের ভাষা (নেওয়ারী)

২ Geiger : Litteratur Und Sprache der Sinhalese ; Chatterji : ODBL, i, pp. 15-16, ff 18 ; Ghatage : HL p. 132 ; ভারতকোষ(৫ম), পৃ: ৫৬৫ ; Taraporewala : ESL, pp. 249, 252, 258

বিস্তৃত পক্ প্রণালী। মোট অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ। অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, তবে ১৬ লক্ষেরও অধিক লোকসংখ্যা ধর্মে হিন্দু এবং অধিকাংশই তামিল ভাষী। এই দ্বীপটি ইংরেজের অধিকারে আসে ইং ১৭৯৬ সনে, আর স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৮-এ।

সিংহলের উত্তরার্ধ প্রধানত তামিল ভাষাঞ্চল, কিন্তু দক্ষিণের প্রচলিত ভাষা হলো সিংহলী। শ্রীলঙ্কায় ইংরেজীরও চলন যথেষ্ট। ইং ১৯৭১-জন সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতে সিংহলী ভাষীর সংখ্যা ৮৪৭।

সিংহলীর উপভাষা 'মাহী' মালদ্বীপে প্রচলিত। আনুমানিক ৯ম-১০ম খ্রীষ্টীয় শতকে তা প্রাচীন সিংহলী থেকে উদ্ভূত হয়।

সিংহলী ভাষার নিজস্ব লিপি আছে—তা মহারাজ অশোকের সময়কালীন (খ্রী. পূ. ৩য় শতক) ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভূত।

সিংহলী ভারতীয় আর্য ভাষার সন্ততি—যা তার সহোদরস্থানীয় ভারতীয় ভাষা থেকে আনুমানিক খ্রী. পূ ৫ম শতকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী (যেমন দীপবংশ, মহাবংশের ঐতিহ্য) যুবরাজ বিজয়সিংহ এই সময়ে ভারত থেকে গিয়ে সিংহলে বসতি স্থাপন করেন। বিজয়ের আদি বাসস্থান ছিল লাল. (Lāḷa)। অনেকের মতে লাল. হলো পশ্চিম বঙ্গের রাঢ়। বিজয়সিংহ তাঁর ভ্রাম্য জীবনে সুপ্পারক এবং ভরুকচ্ছ (বর্তমানে বোম্বাই উপকূলের সোপরা এবং ভরোছ বা ব্রোচ্) পরিদর্শন করেছিলেন। অপর মতে লাল. হলো গুজরাট (এবং সিন্ধু) প্রদেশের লাট অঞ্চল। সুনীতিবাবুর মতে, পরের মতটি যথার্থ। সুনীতিবাবু ও Geiger-এর মতে, এই ভাষা ভারতের পশ্চিম উপকূল থেকে সিংহলে নীত হয়। পরে খ্রী. পূ. ৩য় শতকে সিংহল বাঙলা দেশের মাধ্যমে মগধের সম্পর্কে আসে। মধ্য বাঙলা সাহিত্যে এই যোগাযোগের ঐতিহ্য বজায় আছে।

সে যাই হোক, এ-কথা সত্য যে ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে এই ভাষা সিংহলে আনীত হয়। কাজেই হয়তো তা পালি থেকে উদ্ভূত। মহারাজ অশোকের পুত্র মহিন্দ উজ্জয়িনী থেকে এই ভাষা সিংহলে প্রচার করেন। কাজেই তা পালির সঙ্গে সম্পর্কিত হতেও পারে—যদিও ভারতের কোন্ অঞ্চলে পালি ভাষার প্রচলন ছিল, তা নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক রয়ে গিয়েছে। বর্তমানে অবশ্য ভাষাতাত্ত্বিকদের অনেকেই মনে করেন যে সিংহলীর সঙ্গে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত (এবং সেই সঙ্গে আবন্তী উপভাষা) এবং আধুনিক মারাঠীর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

সিংহলী ভাষার প্রাচীনতম পর্বের নাম দেওয়া হয় সিংহলী প্রাকৃত, কালসীমা খ্রী. পূ. ২য়—খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতক। এই পর্বের প্রধান লক্ষণ হলো: ব্যঞ্জনধ্বনির মহাপ্রাণহীনতা (যথা, স্থবির>প্রা থের>সিংহলী প্রাকৃত তের), স্>হ্ (পোসথ> পোহত) এবং প্>ব (বাপি>বাবি)। প্রত্ন-সিংহলীকে বলা যায় ক্রান্তি পর্ব, কালসীমা ৪র্থ-৮ম খ্রীষ্টাব্দ। এই পর্বে স্বরমধ্যগত দন্ত্য এবং কণ্ঠ্য স্পর্শ ব্যঞ্জনের লোপ (নিগম>নিয়ম, পব্বত>বরয়), মূল দীর্ঘ স্বরের হ্রস্ব স্বরে পরিণতি, সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীকরণ এবং বিশেষ ধরণের স্বরপরিবর্তন (যেমন, ফাণিত>পেণি, দধি>দী, মধু>মূ)। পরবর্তী স্তরকে বলা হয় মধ্য সিংহলী (খ্রী. ৮ম-১৩শ শতক)। এই পর্ব এলু. নামেও অভিহিত হয়। এলু. শব্দটি এসেছে 'সিংহল' থেকে (এলু.< হেলু. <হিঅলু. <সীহলু. <সিংহল)। ভারতীয় আর্য ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে বলা যায়, এলু. হলো সিংহলী প্রাকৃতের অপভ্রংশ পর্ব। এই যুগের প্রাচীনতম নিদর্শন হলো রাজা প্রথম সেনা (৮৩১-৮৫১ খ্রী,) উদ্দেশ্যে রচিত একটি আলঙ্কারিক রচনা 'সিয়বসলকর' (Siyabasa-lakara)। এছাড়া 'ধম্মপদট্‌ঠকথা' নামক গ্রন্থের একটি টীকা "দহমপিয়া-অটুৱা-গঁটপদয়" ১০ম শতকে মেলে, রচয়িতা, রাজা অভা-সলমেৱন কস্সুব্"। ভারতের বিহার রাজ্যেও সিগিরি (সিংহগিরি) পর্বতগুহাগাত্রে 'এলু.' কবিতার নিদর্শন পাওয়া গেছে।

আধুনিক সিংহলীর সূত্রপাত খ্রী. ১৩শ শতক থেকে। আধুনিক সিংহলীর প্রাচীনতম কবি হলেন 'তোটগমুৱে'। ত্রয়োদশ শতকের একখানি প্রাচীন ব্যাকরণ 'সিদত্-সঙ্গরাৱ' এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সিংহলীর সাহিত্যরচনা যথেষ্ট কৃত্রিম এবং পণ্ডিতী ধরণের। পালি এবং সংস্কৃত থেকে বহু শব্দ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। ব্যাকরণও প্রাচীনধর্মী। আধুনিক সিংহলী ভাষার কয়েকটি লক্ষণ এই—

১. চ্>স্ (চত্তরো>সতর)। জ্>দ্ (জাত>দা)। ট>ল. (পটি> পিলি.)।

২. অর্ধ-আনুনাসিকতা সমন্বিত দুইটি স্বর (ä, ä:)।

৩. সিংহলীতে এ-কারের হ্রস্ব ও দীর্ঘ ভেদ। এছাড়া এ-কারের বাঙলাসুলভ এ্যা [æ] উচ্চারণ।

৪. পরবর্তী স্তরে স্>হ এবং মূল হ্-এর লোপ, যথা—সন্দ>হন্দ।

৫. সিংহলীতে দুইটি লিঙ্গ—সপ্রাণ এবং অপ্রাণ (Animate and Inanimate)।

৬. সিংহলীতে পালি ও তামিল ভাষার যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

১২.৩ জিপসী বা রোমনী

যাযাবর জিপসীদের ভাষা জিপসী বা রোমনী নামে অভিহিত। এই ভাষা মূলত ভারতীয় আর্য ভাষার সন্ততি—যা একদা মূল ভূখণ্ড থেকে সুদূর ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল।

টার্নারের মতে জিপসী ভারতের মধ্যাঞ্চলের ভাষা, পরে জিপসী ভাষীরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। সম্ভবত খ্রীষ্টীয় নবম শতকের পূর্বেই এরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে এবং ভারত থেকে নির্গত হয়ে প্রথমে ইরানে এবং পরে এশিয়া মাইনর হয়ে ইউরোপে প্রবেশ করে। ইউরোপের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এবং ইউরোপ-সংলগ্ন পশ্চিম এশিয়ায় (আর্মেনিয়া, সিরিয়া ও তুর্কী দেশে), এমনকি সুদূর আমেরিকাতেও এই ভাষা আজও প্রচলিত আছে। অবশ্য স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে আসায় এই ভাষার বৈচিত্র্য যথেষ্ট ; তাদের স্থানিক বিভাগগুলিকে এশীয়, আর্মেনীয় এবং ইউরোপীয়—এই ভাগে বিভক্ত করা যায়। তবে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানের ভাষার প্রভাবে অল্প-বিস্তর প্রভাবিত হলেও হলেও এদের মূল ভারতীয় আর্যভাষার লক্ষণ চিনতে অসুবিধে হয় না।

অপর মতে জিপসীদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন পাঞ্জাবের অধিবাসী। তারা ভারত ত্যাগ করে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে। প্রথমে দর্দিস্তানের মধ্য দিয়ে ইরানে ও পরে আর্মেনিয়ায় একাধিক দলে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছিল এরা। এদের অপর একটি শাখার গতিপথ ছিল ইউরোপ—হাঙ্গেরী, রাশিয়া, পোলাণ্ড্, জার্মানী, এমনকি ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড্।

সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে জিপসীদের মূল বাসস্থান ছিল ভারতের পূর্বাঞ্চলে। তাঁর বক্তব্য এই—"কিন্তু অনেক বিষয়ে, বিশেষ করিয়া শব্দগঠন প্রণালীতে এবং মৌলিক শব্দভাণ্ডারে যাযাবরীর আরও বেশি মিল পাওয়া যায় বাংলার মত মাগধীয় ভাষায়। ইউরোপ-এশিয়ার সব যাযাবরীই নিজেদের পরিচয় দেয় 'রোম' (পুরুষ) ও 'রোম্‌নি' (নারী) বলিয়া। এই শব্দ দুইটির মূল হইল 'ডোম' ও ডোমনী'। ডোম জাতির পুরাতন ঐতিহ্য বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে রক্ষিত আছে এবং সে-ঐতিহ্যের সমর্থন যাযাবরী ভাষায় কিছু কিছু পাওয়া যায়। এইসব বিবেচনা করিয়া মনে হয় যাযাবরীদের পূর্বপুরুষ পূর্ব ভারতের অধিবাসী ছিল"।[১]

---

১ ভারতকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫২১।

যাই হোক, মূল বাসস্থান নিয়ে যে বিতর্কই থাকুক না কেন, অধিকাংশ উপভাষাতেই যে গান্ধারী প্রাকৃত বা দর্দিক ভাষার প্রভাব বা লক্ষণ দেখা যায়—তা অবিসংবাদী সত্য। তাই প্রমাণিত হয় যে এরা বেশ কিছুদিন দর্দিস্তানে বাস করেছিল। উত্তর-পশ্চিমা গান্ধারী প্রাকৃতেরও যে প্রভাব ছিল, তার প্রমাণ জিপসী শব্দের আদিতে র-ফলা সংরক্ষণ।

জিপসী ভাষার বিবর্তন ভারতীয় আর্য-সুলভ। এই ভাষার কয়েকটি লক্ষণ হলো—

১. সং ঐ, ঔ>জিপসী এ, ও, যথা—তেল (<তৈল), মোল (<মৌল্যম্)।

২. স্বরমধ্যগত একক ব্যঞ্জনের ক্ষীণতা প্রাপ্তি, যথা—মুই (মুখ), নই (নখ), বই (বাহু), শিল (<সিঅল<শীতল), বাসরু (=বাছুর<বৎসরূপ)।

৩. যুক্ত ব্যঞ্জন সমীভূত, যথা—পুৎসাব (<পুচ্ছ<প্রচ্ছ্), দিক্ (<*দৃক্ষ-), রত্ (রক্ত)।

৪. ঘোষ মহাপ্রাণ-ধ্বনি>ঘোষ অল্পপ্রাণ/অঘোষ মহাপ্রাণ (উপভাষা ভেদে)। যথা—বোখেলো (<ভুখিল "ক্ষুধার্ত), ফেন (<ভগিনী), বোক (<ভুখ)।

৫. খ [kh] >খ়. [x] উষ্মীভূত।

৬. দন্ত্যবর্ণ>র, ল, যথা—রন (<দণ্ড), রোই (<সং দর্ব্বি)।

৭. ড/ড়>র, যথা—খুরো (=ঘোড়া<ঘোটক), রন (ডণ্ড<দণ্ড), রোম (=ডোম)।

৮. গান্ধারী প্রাকৃতসুলভ আদিতে র্-ফলা যুক্ত সংযুক্ত ব্যঞ্জন রক্ষিত। যথা—ত্রিন "তিন", দ্রখ্ (<দ্রাক্ষা)।

৯. নাসিক্যধ্বনি যুক্ত ব্যঞ্জন রক্ষিত, যথা—পঞ্জ (<পঞ্চ)।

ইংরেজী জিপ্‌সী ভাষার কিছু নিদর্শন নিচে প্রদর্শিত হলো—

1. *The* tatcho[১] drom[২] *to be a* jinni-mengro[৩] *is to* shūn[৪], dik[৫] *and* rig[৬] *in* zi[৭].

   [=The true way to be a wise man is to hear, see and bear in mind].

2. Dui Romany chals[৮] *were* bitcheni
   Pawdle *the* bori pāni ;
   Plato *for* kōr*ing*, Lāsho *for* chor*ing*[৯]
   The putsi[১০] *of a* bori[১১] rānī[১২].

[Two Gypsy lads were sent away
Across the great waters ;
Plato for rioting, Lasho for stealing
The purse of a great lady].

[বাঁকা অক্ষরে লিখিত শব্দ বা শব্দাংশগুলি ইংরেজী]।

১ তু. বাংলা সাচ্চা, হিন্দী সচ্চা<সং সত্য।

২ তু. গ্রীক dromos

৩ jinney <√জ্ঞা "জানা"+mengro (পুরুষবাচক প্রত্যয়) ="knowing person, wise"

৪ শোনা <√শ্রু

৫ দেখা <*দৃক্ষ <√দৃশ্

৬ রাখা <√রক্ষ্

৭ তু. সং ধী

৮ তু. বাঙলা ছেলে

৯ বাঙলা চোর

১০ তু. সং পুটম্ 'purse'

১১ তু. বড়

১২ <রাজ্ঞী, বাঙলা রানী, এখানে "মহিলা".

R. L. Turner : Collected Papers : The Position of Romani in Indo-Aryan (London, 1975) ; For vocables see also Turner : ND pp 730-34 ; John Sampson : The Dialect of the Gypsies of Wales, (Oxford, 1926) ; Taraporewala ; Elements of the Science of Language, pp. 239-41 ; Ghatage : HL p. 132 ; Chatterji : ODBL i p. 16 ff 19 ;

॥ ১৩ ॥

নব্য ভারতীয় আর্য ঃ ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ

১৩.১ বিবর্তনের পদচিহ্ন

ঐতিহাসিক বিচারে দেখা যাবে, প্রাকৃত ভাষাস্তর থেকেই সংস্কৃত বা সংস্কৃতসুলভ ভাষার প্রাচীন ছাঁদটি ক্রমশই অবক্ষয়ের পথে পা বাড়িয়েছে। অর্বাচীন অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ স্তরেও ব্যাকরণগত কাঠামোর এই ভাঙন রোধ করা যায় নি। বস্তুত, আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের অব্যবহিত পূর্ববর্তী এই স্তর প্রাকৃত ভাষার ধ্বংসাবশেষ মাত্র। কৃত্রিম, সাহিত্যিক ছাঁচে-বদ্ধ এই ভাষার ক্ষয়িষ্ণু প্রবণতার পাশাপাশি কিন্তু উদীয়মান আধুনিক কথ্য ভাষাগুলি নতুন রূপবন্ধে সংগঠিত হচ্ছিল, আবিষ্কার ক'রে চলছিল নতুন নতুন ব্যাকরণিক পদ্ধতি। উপমা দিয়ে বলা চলে, ভারতীয় আর্যভাষার প্রাকৃত পর্ব যেন পূর্ণিমার পরবর্তী পদক্ষেপ, ভাষাপ্রবাহের কৃষ্ণপক্ষ; অপর দিকে নব্য আর্য ভাষাস্তর যেন শুক্লপক্ষের নবীন যাত্রাপথ। সে যাই হোক, আধুনিক আর্য ভাষাগুলির সাধর্ম্যের ওপর ভিত্তি ক'রে এদের প্রত্ন-স্তরীয় ভিত্তিমূল নির্ণয় করা হয়ে থাকে আর এই পুনর্গঠিত অনুমিত ভাষাটিই চিহ্নিত হয় প্রত্ন-'নবীন ভারতীয় আর্য' (Proto-New Indo-Aryan) এই অভিধায়। ভারতীয় ভাষার এই নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে বিভিন্ন ভাঙা-গড়া প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর তার মূল ভিত্তি হলো এইখানে ঃ

প্রথমত, প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় আর্য ছিল মূলত সংশ্লেষাত্মক (Synthetic) ভাষা কিন্তু ক্রমিক অবক্ষয়ের ফলে নবীন স্তরে দেখা গেল বিশ্লেষাত্মক (Analytic) প্রক্রিয়া। উদাহরণস্বরূপ, সংস্কৃত "নরেষু"—এই নামপদে একই সঙ্গে লিঙ্গ, বচন ও কারক বোঝানো যেতো বিভক্তির মাধ্যমে। বর্তমানে বিশ্লেষণ পদ্ধতির ফলে তার রূপান্তর ঘটলো—"মানুষগুলির মধ্যে"—এই রূপে। তাই বহুবচন-চিহ্ন, কারক-চিহ্ন এখানে পৃথকভাবে চিহ্নিত হলো। অনুরূপ ভাবে, সংস্কৃত "পিপাসতি" ক্রিয়াপদে পুরুষ, বচন, কাল, ভাব (Mood) অথবা কার্যরীতি (Aspect) প্রভৃতি বিভক্তি, বিকরণ (Stem Affix) বা বিভিন্ন ব্যাকরণগত প্রক্রিয়ার সাহায্যে চিহ্নিত হয়েছে। বর্তমানে তার স্থানে দেখা দিয়েছে প্রতিটি ব্যাকরণিক স্বভাবের স্বতন্ত্র লক্ষণ

("সে পান করিতে ইচ্ছা করে")। বলা বাহুল্য, এইজাতীয় পরিবর্তন স্বরূপত বিবর্তনগত।

দ্বিতীয়ত, নব্য ভারতীয় আর্য-ভাষার উষালগ্নে বিচিত্র ঔপভাষিক বিভেদ সত্ত্বেও এদের মধ্যে একটি ব্যাকরণগত ঐক্য মোটামুটি বজায় ছিল। কিন্তু শব্দভাণ্ডারের বৈষম্য, শব্দার্থ পরিবর্তন এবং নবাগত শব্দের ক্রমিক অনুপ্রবেশ এই আধুনিক ভাষাগুলিকে অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, ভাষাগুলির মধ্যে ঔপভাষিক ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। লক্ষণীয়, অবহট্‌ঠ মূলত কৃত্রিম ও সাহিত্যিক ভাষা (**Lingua Litteraria**) ছিল ব'লে তার মধ্যে স্থানীয় বাগ্‌বিধির বিশিষ্টতার অর্থাৎ উপভাষার লক্ষণ খুবই কম দেখা যায়। সে যাই হোক, আধুনিক আর্যভাষায় শব্দ-সংক্রান্ত বিচিত্রমুখিতার বিন্যাস আমরা এইভাবে করতে পারি :

(ক) শব্দনির্বাচন : আধুনিক আর্যভাষায় সংস্কৃত অথবা সংস্কৃতজ সমার্থক শব্দগুলির মধ্যে বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়, যেমন—বাঙলা জল=হিন্দী পানি, ওড়িয়া পাণি (<সং পানীয়); বাঙলা শকুন=ওড়িয়া শাগুণা= হিন্দী-বিহারী গীধ (<সং গৃধ্র); বাঙলা আগুন=হিন্দী আগ=ওড়িয়া নিআঁ= পাঞ্জাবী নিঘ=অসমীয়া জুই (<সং অগ্নি/নিদাঘ/জ্যোতি); হিন্দী লড়কা, বেটা= বিহারী লরিয়া=অসমীয়া ল'রা=বাঙলা ছেলে ইত্যাদি।

(খ) অর্ধতৎসম শব্দের বিভিন্নতা : সমার্থক শব্দ হলেও ধ্বনিতাত্ত্বিক বিবর্তনের বিভিন্নতার জন্য আধুনিক ভাষায় শব্দসম্পদের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে, যেমন—বাঙলা কেষ্ট=হিন্দী কিশন (<সং কৃষ্ণ), বাঙলা লক্‌খী=হিন্দী লছ্‌মী (<সং লক্ষ্মী)।

(গ) শব্দার্থ পরিবর্তন : তৎসম, তদ্ভব ও আগন্তুক—যে-কোনো শাব্দিক স্তরেই সমান্তরাল প্রয়োগ দেখা গেলেও শব্দের অর্থান্তর ঘটেছে নানা ভাষায় নানা ভাবে, যেমন—তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে হিন্দী গম্ভীর "গভীর" বা পতঙ্গ "ঘুড়ি" বাঙলায় ভিন্নার্থে প্রযুক্ত। তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রে হিন্দী বসেরা এবং বাঙলা বাসর (<বাসগৃহ) অথবা হিন্দী গবঁার ও বাঙলা গোঁয়ার (<*গ্রাম-দার) শব্দগুলি একই অর্থে প্রযুক্ত নয়। অনুরূপ, প্রাচীন বিদেশী শব্দজাত হিন্দী 'সর্দী' ও বাঙলা 'সর্দি' (<প্রাচীন পারসীক **θard**) শব্দের উৎস অভিন্ন হলেও বর্তমান অর্থ ভিন্ন।

(ঘ) নবাগত বা আগন্তুক শব্দ : ঐতিহাসিক কারণে দেশী অথবা বিদেশী শব্দসম্পদের অনুপ্রবেশ আধুনিক ভাষার বৈচিত্র্য বাড়িয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বাঙলা "কুড়ি" (<অষ্ট্রিক) সংখ্যাবাচক শব্দের সমার্থক 'বীস' (<সং বিংশতি) শব্দের

বহুল ব্যবহার অন্যান্য ভাষায় মেলে। ঐতিহাসিক কারণেই ভারতীয় আর্যভাষাভুক্ত পূর্বী ভাষাগুলির মধ্যে, বিশেষত ওড়িয়ায় সংস্কৃত শব্দসম্পদের যতটা প্রাচুর্য্য দেখা যায়, পশ্চিমা ভাষাগুলিতে ততটা নয়। সেখানে আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্যই নজরে পড়ে। এবং তার ইতিহাসও বাঙলার তুলনায় প্রাচীন।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন আধুনিক ভাষাগুলিতে পরিবর্তনের সমানুপাতিক হার সর্বত্র সমান নয়। প্রাচীন আর্যাবর্ত ছিল বহুদিন যাবৎ ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। এখানকার সমাজব্যবস্থা ছিল যেমন আর্য বর্ণাশ্রমের নিগড়ে শৃঙ্খলিত, ভাষাদর্শও তেমন ছিল অভিজাত মননশীলতায় সমৃদ্ধ অথবা মান্য ভাষা (**Prestige Language**)-রূপে স্বীকৃত। কাজেই সন্নিহিত অঞ্চলের ভাষা/উপভাষাগুলি এককালে এদের প্রভাবে ভাষিক সংহতি বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। এখানকার আধুনিক ভাষাগুলিও (যেমন, গুজরাটী, হিন্দী ইত্যাদি) তাই প্রত্ন-স্তরেই সাহিত্যিক শিষ্ট আদর্শ ভাষারূপে জনসাধারণ্যে অভিজাত মহিমা অর্জন করেছে, সাহিত্যানুশীলনের ধারাবাহিকতাও অক্ষুণ্ণ রেখেছে (যেমন, শৌরসেনী প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্‌ঠ, প্রাচীন রাজস্থানী বা ডিঙ্গল)। ফলে এখানকার ভাষা হয়ে উঠেছিল সংরক্ষণশীল, এখনও তাই। কিন্তু এই ভাষাকেন্দ্র থেকে যতই দূরে যাওয়া যায়, ততই সংরক্ষণশীলতার নির্মোক ভেঙে পড়ে, ব্যাকরণগত কাঠামোর পক্ষচ্ছেদ ঘটে (যেমন, পূর্বী ভাষাগুলিতে মহাপ্রাণিত ব্যঞ্জনের অভাব, লিঙ্গশাসনের বিপর্যয়, অনুক্ত কর্তৃকারকের বিলোপ ইত্যাদি)। এই কারণে পূর্ব ভারতীয় আর্যভাষাগুলির ভাষিক প্রগতিশীলতা পশ্চিমা ভাষার চেয়েও অধিক।

চতুর্থত, ভারতীয় ভাষার ভাষিক পরিস্থিতি বুঝতে হলে, ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা নৃতাত্ত্বিক পরিকাঠামোর (**Infra-structure**) সার্বিক পরিচয় জেনে নেওয়া দরকার। আধুনিক ভারতের ভাষা প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই দেখেছি, ভারতীয় জনজীবনের অন্তস্তলে (**Substratum**) দ্রাবিড়, অস্ট্রিক বা ভোট-বর্মী ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব কতো সুদূরপ্রসারী। এই প্রভাব ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন পর্বে যেমন সক্রিয়, প্রত্ন-নবীন ভারতীয় আর্যস্তরেও তেমনি। ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, এই প্রভাব ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যরীতি বা শব্দভাণ্ডার—যে-কোনো ভাষিক স্তরেই কোনো-না-কোনো ভাবে ক্রিয়াশীল। উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করা যাক।

ধ্বনিতত্ত্বের ক্ষেত্রে একটি স্থির সিদ্ধান্ত : আর্যদের ভারত-আগমনের পরেই ভারতীয় আর্যে মূর্ধন্যধ্বনির আবির্ভাব ঘটেছে, কারণ ইন্দো-ইউরোপীয় কোনো প্রাচীন ভাষাতেই এই ধ্বনিগুচ্ছ ছিল না, অথচ দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষাভাষীদের মধ্যে এই ধ্বনিগুলি

ব্যাপক এবং বিচিত্রও বটে। কিন্তু এই মূর্ধন্যধ্বনির সর্বভারতীয় ব্যাপকতা সত্ত্বেও অসমীয়ায় এগুলি দন্ত্যমূলীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। পণ্ডিতদের মতে, এর কারণ ভারতের প্রত্যন্ত পূর্বাঞ্চলে ভোট-বর্মী প্রভাব। অনুরূপ, সর্বভারতীয় ঘৃষ্ট ধ্বনিগুলির উষ্ম ধ্বনিতে পরিণতি (অর্থাৎ চ, ছ>স /s/, জ, ঝ>জ. / z /) ঘটেছে অসমীয়া, পাহাড়ী বা পূর্ব বাঙলার ভাষায়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এখানেও ভোট-বর্মী প্রভাব সক্রিয়।

রূপতত্ত্বের ক্ষেত্রেও দেখি, আধুনিক আর্যভাষাগুলি দ্রাবিড়-অষ্ট্রিক ভাষার ভাষিক ছাঁদটি অনেকাংশে অঙ্গীকার করে নিয়েছে।[১] উদাহরণস্বরূপ, একই বিভক্তির সাহায্যে একবচন ও বহুবচনের পদগঠন (তুলনীয়, বাঙলা ছেলে-র : ছেলে-দিগে-র), মনুষ্যবাচক ও অমনুষ্যবাচক শব্দের বহুবচনে স্বতন্ত্র প্রত্যয় যোগ (তু. ছেলেরা ঃ গাছগুলি, গরুগুলি), যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার ইত্যাদি লক্ষণ দ্রাবিড় প্রভাবের ফলশ্রুতি। অনুরূপ ভাবে, দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক প্রভাব দেখা গেছে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন, বিভক্তির স্থলে অনুসর্গীয় প্রত্যয় এবং অনুসর্গযোগে বিভিন্ন কারক গঠন (তু. বাঙলা ঘরেতে, ঘরের মধ্যে), অনুকার শব্দ (Echo word) বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের (Onomatopoetic word) ব্যাপক ব্যবহার, উপসর্গের ক্রমিক বিলোপ ইত্যাদি। বহু স্থাননাম ও "কুড়ি" সংখ্যাবাচক শব্দের প্রয়োগও অষ্ট্রিক প্রভাবজাত।

বাক্যরীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো এই যে আধুনিক আর্যভাষাগুলি প্রত্যয়ান্বয়ের (Infleetion) স্থলে ক্রমশই দ্রাবিড়-অস্ট্রিক রীতিসুলভ মুক্তান্বয়ের (Agglutination) দিকে ঝুঁকেছে। দ্বিতীয়ত, বেদোত্তর যুগ থেকেই তিঙন্তবাচক বা ক্রিয়ামূলক (Verbal) রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে নামমূলক (Nominal)। নামমূলক এই ক্রিয়াগঠন রীতিকে অনেকে দ্রাবিড় প্রভাবজাত ব'লে মনে করেন। বলা বাহুল্য, এই রীতি আধুনিক আর্যভাষাতেও ঐতিহাসিক সূত্রে বজায় আছে (যেমন, বাঙলা চলিল, চলিব, চলিত<সং চলিত, চলিতব্য, চলন্ত্)।

১ S. K. Chatterji : Integration in Linguistic Pattern in India : Bulletin of the Philological Society of Calcutta, Vol I, No. i ; ODBL i pp. 170-178 ; J. Bloch : L' Indo-Aryan du Veda aux temps modernes, Paris, 1934, pp. 321-331 ; M. B. Emeneau : India as a linguistic area, Language, Vol. 32, No. 1, 1956, pp. 3-16 ; M. Andronov : Two Lectures on the Historicity of Language Families, 1968, pp. 3-6.

১৩.২ সাধারণ ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ

১৩.২.১ ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

১ ॥ ধ্বনিবিজ্ঞান : ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, সংস্কৃত ধ্বনিমালার উচ্চারণ-মান আধুনিক আর্য ভাষায় মোটামুটি বজায় আছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় নতুনত্ব দেখা গেছে।[১] উদাহরণস্বরূপ, চ-বর্গের উচ্চারণ সংস্কৃতে ছিল প্রকৃত স্পর্শধ্বনি। কিন্তু প্রায় সমস্ত আধুনিক ভাষায় তা পরিণত হয়েছে ঘৃষ্টধ্বনি (Affricate)-রূপে। অনুরূপ, সংস্কৃত ড, ঢ ধ্বনি বেশির ভাগ ভাষায় তাড়িত (Flapped) ড়, ঢ় ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে, অবশ্য বিশেষ ধ্বনিতাত্ত্বিক সংস্থানে। বর্তমানে এই ধ্বনিগুলি ধ্বনিমানকও (Phonemic) বটে। এছাড়া অন্তঃস্থ ব / w / ধ্বনির স্থলে সোষ্ম ওষ্ঠ্য / β / অথবা / b / ধ্বনির আবির্ভাব, অধিকাংশ ভাষায় ষ-ধ্বনির স/শ-ধ্বনিতে পরিণতি (ক্বচিৎ ষ>খ), ঙ-ধ্বনির ধ্বনিমান রূপে আবির্ভাব (যেমন, অসমীয়া, বিহারী, বাঙলা, সিন্ধী এবং ক্বচিৎ ওড়িয়া), সংস্কৃত ং-ধ্বনির ম্/ন্/ঙ-রূপে উচ্চারণ-রীতি ইত্যাদি আধুনিক লক্ষণ নবীন ভারতীয় আর্যভাষার সুচিহ্নিত বৈশিষ্ট্য।

আধুনিক ভারতীয় ভাষায় নতুন ধ্বনিরূপে আবির্ভূত হয়েছে এই ব্যঞ্জনগুলি :

ম্‌হ, ন্‌হ / mh, nh / : মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরী, অবধী, হিন্দী, ওড়িয়া।

র্‌হ, ল্‌হ / rh, lh / : ভোজপুরী, মগহী, মৈথিলী, অবধী, অসমীয়া।

ঙ্‌হ / ṅh / : মৈথিলী, ভোজপুরী।

খ. / x / : সিন্ধী, পাঞ্জাবী, অসমীয়া।

গ. / γ / : সিন্ধী।

ফ. / f / : সিন্ধী, পাঞ্জাবী।

জ. / z / : অসমীয়া, সিন্ধী, হিন্দী।

ণ. / ṇ / : ওড়িয়া, মধ্য ও পশ্চিমা পাহাড়ী, পূর্বী ও পশ্চিমা পাঞ্জাবী, সিন্ধী, রাজস্থানী, গুজরাটী ও মারাঠী।

ল / ḷ / : মধ্য ও পশ্চিমা পাহাড়ী, পূর্বী ও পশ্চিমা পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, গুজরাটী, মারাঠী ও ওড়িয়া।

অবরুদ্ধ ব্যঞ্জন / ʔ / : সিন্ধী, ক্বচিৎ গুজরাটী, রাজস্থানী, পাহাড়ী, পূর্বী বাঙলা।

---

১ বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. মজুমদার : বাভাপ (১ম), ১ম সংস্করণ, ff ৮.২

স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে আধুনিক বৈশিষ্ট্য হলো এইগুলি—সংস্কৃত অ / a / ধ্বনির সংবৃত / ɔ, ʌ, a / রূপে উচ্চারণ-পরিণতি, ঋ ধ্বনির রি/রু রূপে উচ্চারণ-বিকৃতি এবং স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ মাত্রার পার্থক্য লোপ। ফলে আধুনিক ভাষায় সাধারণত এই মাত্রাভেদ ধ্বনি-মানক (**Phonemic**) নয়।[১] যেমন বাঙলা, অসমীয়া, গুজরাটী বা মারাঠীতে, সীমিত ক্ষেত্রে ভোজপুরী, ওড়িয়া এবং সিন্ধীতে।

২ ॥ যুক্ত ব্যঞ্জন : মধ্য ভারতীয় আর্যে উদ্ভূত যুগ্ম ব্যঞ্জন আধুনিক আর্যভাষায় প্রায়শই একটি ব্যঞ্জনে সরলীকৃত হয়েছে ; ফলস্বরূপ, অব্যবহিত পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর পূরক দীর্ঘত্ব (Compensatory Lengthening) লাভ ক'রে অক্ষরে (Syllable) মাত্রার সমতা বজায় রেখেছে। অবশ্য কোনো কোনো সংরক্ষণশীল ভাষায় যুগ্ম ব্যঞ্জন রয়ে গেছে, যেমন লহ্ন্দা, পাঞ্জাবী বা পশ্চিমা পাহাড়ীতে। কোনো ভাষায় আবার যুগ্ম ব্যঞ্জনের সরলীকরণ হলেও পূর্ব স্বরের পূরক দীর্ঘত্ব ঘটে নি, যেমন, সিন্ধী বা সিংহলীতে। উদাহরণস্বরূপ—

সং হস্ত>প্রা হত্থ>বাঙলা-অসমীয়া-নেপালী হাত্, ওড়িয়া-বিহারী হাথ, কুমাওনী হাথ ; হিন্দী-মারোয়াড়ী-গুজরাটী হাথ্, মারাঠী হাত্, অবধী হাঁথ্ ; কিন্তু সিন্ধী হথু, সিংহলী অত্, হত্ ; লহন্দা-পাঞ্জাবী হত্থ্, পশ্চিমা পাহাড়ী হথ্ (উপভাষায় হত্ত্)।

সং অদ্য>প্রা অজ্জ>বাঙলা-ওড়িয়া আজ্/আজি, মৈথিলী-ভোজপুরী-অবধী-হিন্দী আজ্, গুজরাটী আজ্, মারাঠী আজ্ (āj́), কুমাওনী আজ, নেপালী আজ্/আজু, অসমীয়া আজি / **azi** / ; কিন্তু লহন্দা-পাঞ্জাবী অজ্জ্, পশ্চিমা পাহাড়ী অজ্জ্ (**ajj'**), সিংহলী অদ, সিন্ধী অজু' (**aj'u**)।

সং কর্ম- >প্রা কম্ম>বাঙলা-অসমীয়া-নেপালী-কুমাওনী কাম্, হিন্দী-মারোয়াড়ী-গুজরাটী-মারাঠী কাম্, অবধী কামু (**kāmᵘ**), বিহারী কাম্, ওড়িয়া কাম ; কিন্তু পশ্চিমা পাহাড়ী-লহ্ন্দা-পাঞ্জাবী কম্ম্ ; সিন্ধী কমু, সিংহলী কম।

সং অষ্ট>প্রা অট্ঠ>অসমীয়া-বিহারী-হিন্দী-অবধী আঠ্, বাঙলা আট্, ওড়িয়া আঠ ; কিন্তু পাঞ্জাবী-পশ্চিমা পাহাড়ী-লহন্দা অট্ঠ্, সিন্ধী অঠ, সিংহলী অট।

---

১ বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. মজুমদার : বাভাপ(১ম), ১ম সংস্করণ, ff ৮.৩

লক্ষণীয়, হ্রস্ব স্বরধ্বনির পূরক দীর্ঘত্ব 'অ' ধ্বনির ক্ষেত্রে যতটা স্পষ্ট (অর্থাৎ অ>আ), ই/উ ধ্বনির ক্ষেত্রে ততটা নয়, যেমন—সং উষ্ট্র>প্রা উট্‌ঠ>প্রত্ন-নবীন ভারতীয় আর্য *উঠ : অসমীয়া-বাঙলা উট্‌, ওড়িয়া উট, নেপালী উঁট ইত্যাদি। এর কারণ, আধুনিক আর্যভাষায় স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘভেদ সাধারণত ধ্বনিমানক (Phonemic) নয় (উপরে দ্রষ্টব্য), তাই প্রায়শই ই/ঈ, উ/ঊ ধ্বনির বিপর্যয় ঘটেছে। কিন্তু 'অ' এবং 'আ' ধ্বনির ক্ষেত্রে উভয়ের গুণগত (Qualitative) পার্থক্য পরে আবির্ভূত হয়েছে ব'লে বানানে তার বিপর্যয় ঘটে নি (অর্থাৎ অ / ɔ, ʌ, ∀ / এবং আ / a / ।[১]

৩ ॥ যুক্ত ব্যঞ্জন ও আনুনাসিকতা : ভারতীয় আর্যভাষার অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ স্তরেই একক ব্যঞ্জন-উদ্ভূত আনুনাসিকতা ধর্ম দেখা দিয়েছিল, যেমন—সং কমল>অপ. কবঁল ; সং তেষাম্‌>অপ. তেহং/তেহঁ। আধুনিক ভাষায় এই প্রবণতার আরও প্রসার ঘটলো। নাসিক্যব্যঞ্জন-যুক্ত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে সরলীকরণের সঙ্গে সঙ্গে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ক্রমশই ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়ে পরিশেষে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে সানুনাসিক ক'রে লুপ্ত হলো। অবশ্য কোনো কোনো ভাষায় এর ব্যতিক্রম আছে (যেমন, সিন্ধী, লহ্‌ন্দা, ওড়িয়া)। উদাহরণস্বরূপ—

সং দন্ত>প্রা দন্ত>বাঙলা, অসমীয়া, বিহারী, নেপালী, কুমাওনী, অবধী, হিন্দী, মারোয়াড়ী, গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় "দাঁত" কিন্তু পাঞ্জাবী দন্দ্‌, কাশ্মীরী দন্দ্‌, সিন্ধী ড'ন্দু (d̤'andu), লহ্‌ন্দা দন্দ্‌ / ডণ্ড্‌।

সং দণ্ড>প্রা দণ্ড>বিহারী-নেপালী ডাঁড়, হিন্দী ডাঁড়্‌, গুজরাটী দাঁড্‌ / ডাঁড্‌, মারাঠী দাঁড্‌, বাঙলা দাঁড়, অসমীয়া ডাঁর্‌ / ডঁর্‌ ; কিন্তু ওড়িয়া দাণ্ড, লহ্‌ন্দা দন্ন্‌/ডন্ন্‌, সিন্দী ড'ণ্ডু।

৪ ॥ স্বর-সংযোগ : মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় স্বর-সংযোগ ব্যাপক ; কারণ, প্রাকৃতে স্বরমধ্যগত একক স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনি লোপের ফলে স্বরসংযোগ না হয়ে উপায় ছিল না (তুলনীয় : সং গত, গজ, গদ>প্রা গঅ)। প্রাকৃতে এই সংযুক্ত স্বরকে বলা হয় "উদ্‌বৃত্ত স্বর"। আধুনিক ভারতীয় আর্য স্তরে এইজাতীয় উদ্‌বৃত্ত স্বরের পরিণতি ঘটেছে এইভাবে—

ক ॥ য়/ব-শ্রুতির (Glide) দ্বারা দুটি স্বরের বিযুক্তি।

খ ॥ উদ্‌বৃত্ত স্বরদুটির যৌগিক স্বরে (Diphthong) পরিণতি।

গ ॥ স্বরসংকোচন বা সন্ধি (Contraction)।

---

১ মজুমদার : বাভাপ (১ম) ff ৮. ২. ৩

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত ধ্বনি-পরিবর্তনের বিভাজন আনুক্রমিক। অর্থাৎ যে-কোনো ভাষায় সাধারণত উপরোক্ত প্রক্রিয়া পরপর ঘটে থাকে। উদাহরণস্বরূপ—সং শৃগাল >প্রা সিআল>বাঙলা শিয়াল (য়-শ্রুতি) [śi-y-āl] >শিআল = শ্যাল [śiāl = śyāl] > শে'ল [śæl]; সং শূকর>প্রা সুঅর>বাঙলা শূঅর, শূয়র>শুওর> শোর ইত্যাদি। আধুনিক আর্য ভাষায় অনুরূপ তিনধরণের প্রক্রিয়া দেখা যাবে, এমন একটি উদাহরণ—সং শৃগাল>প্রা সিআল>বাঙলা শিয়াল, শেয়াল, অসমীয়া সিআল [xiyāl], গুজরাটী সিয়াল., সিংহলী সিৱলা, কিন্তু বিহারী-অৱধী সিআর, পশ্চিমা পাহাড়ী শ্যাও, শিআল., ওড়িয়া সিআল., হিন্দী সিয়াল, সিআর, সাল, স্যালা, কুমাওনী স্যাল্‌, কাশ্মীরী শাল্‌। পদান্তে স্বরসংকোচ সর্বত্র ঘটেছে, এমন একটি উদাহরণ—সং মৃত্তিকা>প্রা মট্টিআ, মত্তিয়া, মিত্তিআ>অসমীয়া বাঙলা-ওড়িয়া মাটি, বিহারী মাটী, মাঁটী, অৱধী মাটী, হিন্দী মাটী, মাঁটী, মট্টী, মিট্টী, গুজরাটী মাটী, মাঁটী, মারাঠী মাতী, সিন্ধী মিটী, লহন্দা-পাঞ্জাবী মিট্টী, পশ্চিমা পাহাড়ী মিত্তী, নেপালী-কুমাওনী মাটো, সিংহলী ম্যাট্ট [mäṭṭa]।

৫ ॥ স্বরাঘাত প্রক্রিয়া : ভাষায় সাধারণত দু'ধরণের স্বরাঘাত পদ্ধতি (Accent system) দেখা যায়—শ্বাসাঘাত বা বলমূলক (Stress Accent) এবং স্বরসঞ্চারী বা স্বরমূলক (Musical Accent)। স্বরসঞ্চারের সঙ্গে শ্বাসাঘাতের পার্থক্য হলো এই যে স্বরসঞ্চারের ক্ষেত্রে সুরের ওঠা-নামা বা তীক্ষ্মতা (Pitch) নির্ভর করে শব্দতরঙ্গের কম্পাঙ্কের (Frequency of vibrations) ওপর। কিন্তু শ্বাসাঘাতের বৈশিষ্ট্য হলো ধ্বনির বা অক্ষরের তীব্রতা (Loudness)—যা নির্ভর করে বাগ্‌যন্ত্রের পেশী-সঞ্চালিত শক্তি এবং শ্বাসক্ষেপণের বেগ বা চাপের ওপর।

আধুনিক আর্য ভাষাগুলিতে সাধারণত শ্বাসাঘাত প্রক্রিয়া দেখা যায়। কেবল পাঞ্জাবী এবং সম্ভবত পূর্বী বাঙলা স্বরসঞ্চার-পদ্ধতি আশ্রয় করেছে।[১] পণ্ডিতদের অনুমান, আধুনিক ভাষাগুলির প্রত্ন-স্তরে (Proto-NIA) সাধারণত প্রথম দীর্ঘ উপান্ত (Pen-ultimate) অক্ষরের ওপর শ্বাসাঘাত পড়তো, ফলে অনাহত (Unstressed) অক্ষরের পরিবর্তন ছিল স্বাভাবিক—যদিও আদ্য অক্ষরস্থিত স্বরের মাত্রা এবং গুণ (Quantity and Quality) বজায় থাকে। অপরদিকে শ্বাসাঘাতের অভাবে পদান্ত স্বরের ক্রমিক লোপ অথবা অতিহ্রস্ব স্বরে পরিণতি (যেমন ওড়িয়া,

১ মজুমদার : বাভাপ (১ম), পৃ ১৮০-১৮১

সিন্ধী, মৈথিলী, ক্বচিৎ ভোজপুরী) প্রায়শই এই ভাষাগুলিতে সহজ দ্রষ্টব্য। বলা বাহুল্য, শ্বাসাহত স্বরধ্বনি সর্বত্রই বজায় থাকতে দেখা যায়।[১] উদাহরণস্বরূপ—

সং কুম্ভকার>প্রা কুম্ভার>অসমীয়া-বাঙলা কুমার, ওড়িয়া কুম্ভার, হিন্দী কুম্হার, মৈথিলী কুম্হার, ভোজপুরী কোঁহার, গুজরাটী-মারাঠী কুঁভার।

সং অন্ধকার>প্রা অন্ধার> বাঙলা আঁধার, ওড়িয়া অঁধার, অন্ধার, মৈথিলী-ভোজপুরী অন্হার, গুজরাটী অঁধারু, মারাঠী অধাঁর, লহন্দা অন্ধার্‌, অন্হারা, হনারা, পাঞ্জাবী অন্হারা, অসমীয়া আন্ধার, এন্ধার।

১৩.২.২ রূপতত্ত্ব (Morphology)

১॥ লিঙ্গবিধি[২] :

সংস্কৃত ও প্রাকৃতে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ—এই তিন বিভেদ থাকলেও অর্বাচীন অপভ্রংশে এই পার্থক্য বিপর্যস্ত হয়েছে। এর কারণ, পদান্ত স্বরধ্বনির লোপ, দীর্ঘ স্বরের হ্রস্ব হয়ে যাওয়ার প্রবণতা এবং অ-কারান্ত শব্দের প্রভাব। নবীন ভারতীর আর্য ভাষার সংরক্ষণশীল ভাষাগুলিতে সংস্কৃতানুগ লিঙ্গবিধি কোনো কোনো ক্ষেত্রে রইলো বটে [তু.হিন্দী বাত্‌ (স্ত্রী) <সং বার্তা (স্ত্রী)], কিন্তু লিঙ্গানুশাসনের বিভেদ আরম্ভ হলো নতুন ক'রে—যা মুখ্যত ব্যাকরণসিদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ—

সং অক্ষি (ক্লী) >গুজরাটী-হিন্দী আঁখ্‌ (স্ত্রী), পাঞ্জাবী অক্‌খ্‌ (স্ত্রী), সিন্ধী অখি (স্ত্রী)।

সং দধি (ক্লী) >হিন্দী দহী (পুং), পাঞ্জাবী দহীঁ (পুং), মারাঠী-গুজরাটী দহীঁ (ক্লী), সিন্ধী ডহী (স্ত্রী)।

সং ইক্ষু, *উক্ষু (পুং)>হিন্দী ইখ, উখ (স্ত্রী), গুজরাটী উস (স্ত্রী), পাঞ্জাবী ইক্‌খ্‌ (পুং), মারাঠী উস (পুং)।

আধুনিক ভাষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্লীবলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ একাকার হয়ে গেছে, ক্লীবলিঙ্গ রক্ষিত আছে কেবল মারাঠী, গুজরাটী ও সিংহলী ভাষায়। সিংহলীতে আবার নতুন ক'রে সচেতন/অচেতন ভেদে দুই লিঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। মাগধী প্রাকৃত-উদ্ভূত পূর্বী ভাষাগুলিতে কিন্তু লিঙ্গভেদ আর রইলো না।

---

১ বিস্তৃত আলোচনার জন্য তদেব, পৃ. ১৫৫-১৮৮, ff ৮.৪

২ বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র মজুমদার ; বাভাপ (২য়) ff ১১,১

২ ॥ বচন[১] ঃ

সংস্কৃতে ছিল তিনটি বচন—একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তরেই দ্বিবচন লুপ্ত হয়েছে, কিন্তু একবচন ও বহুবচনের পার্থক্য অর্বাচীন অপভ্রংশ পর্যন্ত বজায় ছিল। তবে কর্তৃকারকের বহুবচনের পদান্ত বিভক্তি লুপ্ত হতে থাকায় একবচন ও বহুবচনের বিভক্তিগত পার্থক্য আর রইলো না। তাই নবীন ভারতীয় আর্য ভাষায় বহুত্ববাচক বিভক্তির জন্য ৩য়া ও ৬ষ্ঠীর বহুবচনের বিভক্তিকে আশ্রয় করতে হলো। নবীন আর্যভাষাগুলির মধ্যে পশ্চিমা ভাষাগুলিতে অর্থাৎ মারাঠী, গুজরাটী, রাজস্থানী, হিন্দী, সিন্ধী, লহ্ন্দা ও পাঞ্জাবীতে এইজাতীয় বহুবচনের বিভক্তির অবশেষ কম-বেশি রশে গেছে। পূর্বী ভাষাগুলিতেও এর স্বাক্ষর অসুলভ নয়। নবীন ভারতীয় আর্যভাষায় বিভক্তিমূলকতার অবক্ষয়ের ফলে অপর একটি পদ্ধতি আবির্ভূত হতে দেখা যায়। বিভক্তির পরিবর্তে সমষ্টিবাচক শব্দ (Noun of Multitude) অথবা তাদের বিবর্তিত রূপকে বহুবচনের পদগঠনে কাজে লাগানো হয়েছে। সুতরাং উৎপত্তি বিচারে নবীন ভাষাগুলির বহুবচন-পদ গঠিত হচ্ছে দু'ভাবে—

(ক) বিবর্তিত বহুবচনের বিভক্তি দিয়ে—তা যে-কোনো কারক থেকেই আহৃত হোক না কেন (যেমন, ১মা, ৩য়া, ৬ষ্ঠী)।

(খ) বহুবচনদ্যোতক শব্দ বা শব্দাংশের সাহায্যে (তদ্ভব/তৎসম)।

আধুনিক ভাষায় সংরক্ষিত প্রাচীন বহুবচনের বিভক্তি ও তাদের বিবর্তিত অবশেষ দেখা যাবে এই এই ক্ষেত্রে—

১. ১মার বহুবচন ঃ মারাঠী স্থত্ (<স্থত্রম্) কিন্তু স্থতেঁ (<স্থত্রাণি); সিন্ধী ডেহু (<দেশঃ) কিন্তু ডেহ (<দেশাঃ), পিউ (<পিতৃ) কিন্তু পিউর (<পিতরঃ) ; পশ্চিমা হিন্দী বাত্ (<বার্তা) কিন্তু বাতেঁ, বাতইঁ (<*বার্তানি =বার্তাঃ) ; অবধী সাঁপু (<সর্পঃ) কিন্তু সাঁপ (<সর্পাঃ) ইত্যাদি।

২. ৩য়ার বহুবচন ঃ পূর্বী হিন্দী ঘোড়ন্বে, পশ্চিমা হিন্দী ঘোড়ে<ঘোড়েহি <*ঘোটেভিঃ=বৈদিক ঘোটকেভিঃ, সং ঘোটকৈঃ) ; পাঞ্জাবী মুণ্ডে "বালকরা" (ঃ মুণ্ডা), বণিএঁ (ঃ বণিআঁ "বণিক"), মারাঠী সাসরা (ঃ সাসরা "শ্বশুর"), ওড়িয়া পুরুষে (ঃ পুরুষ), বাঙলা লোকে (বলে), চল সবে ইত্যাদি।

---

১ বিস্তৃত আলোচনা ঃ মজুমদার ঃ বাভাপ (২য়) ff ১১.২

৩. ৬ষ্ঠীর বহুবচন : পূর্বী হিন্দী ঘোড়ৱন্ (<ঘোটকানাম্), মৈথিলী লোকনি (<লোকানাম্), মগহী ঘোড়ন্, ঘোড়ৱন্, ঘরন্ (<গৃহাণাম্), ভোজপুরী ঘরন্(হ্), গাইন্(হ্), গাইন্হি, গাইনি ইত্যাদি ; ওড়িয়া তাহাঙ্কর, তাঙ্কর (: তাহর) <*তানাম্ = সং তেষাম্ ; বাঙলা ওঁর, ওনার (< -নাম্) ইত্যাদি। পশ্চিমাভাষাগুলিতে এই -নাম্>-ন্ এবং তজ্জাত আনুনাসিকতা বহুবচনের তির্যকমূলে নিয়মিতভাবে রক্ষিত আছে। যেমন—হিন্দী ঘোড়ো্ঁ- (তু. ঘোড়োঁকো), পাঞ্জাবী মুণ্ডিআঁ- (তু. মুণ্ডিআঁ-নু), সিন্ধী পিউনি-, পিউরনি-, মারাঠী ঘরাঁ-, সাসরাঁ-, অৱধী সাঁপন- ইত্যাদি।

সমষ্টিবাচক তৎসম শব্দযোগে বহুবচন পদগঠন নবীন ভারতীয় আর্যভাষার সুলভ বৈশিষ্ট্য (যেমন, সকল, সমূহ, লোক ইত্যাদি)। তবে নবাবির্ভূত বৈশিষ্ট্য হলো তদ্ভব/অর্ধতৎসম শব্দযোগ ক'রে বহুবচন গঠন। এগুলির সর্বভারতীয় সাধর্ম্যও লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ—হিন্দী-বিহারী -লোগ (<লোক), -সভ (<সৰ্ব) [যেমন, হমলোগ, হম্সভ্ ইত্যাদি], নেপালী -হেরু (<সৰ্বঃ)।

সমষ্টিবাচক শব্দের ইতিহাস কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, বিশেষত অসমীয়া -বোর, বিলাক, -হঁত ; ওড়িয়া -মান ; বাঙলা -(এ)রা, -গুলি, -দিগের ইত্যাদি শব্দ/শব্দাংশের ক্ষেত্রে।[১]

৩॥ কারক ও বিভক্তি :

গঠন-প্রকৃতির দিক দিয়ে বিচার করলে নব্য ভারতীয় আর্য-ভাষার নামপদের কারক দু'টি—(ক) কর্তৃমূল মুখ্য কারক (**Direct Case**), (খ) গৌণমূল বা তির্যক কারক (**Oblique Case**)। উৎপত্তি বিচারে প্রথমা বিভক্তি এবং কর্মকারকের বিভক্তি মিলে মুখ্য কারক গঠিত হয়েছে। আর ৭মী ও সমীকৃত ৩য়া মিলে হয়েছে গৌণ বা তির্যক কারক। কর্তৃকারক এবং তির্যক কারকের প্রয়োগগত পার্থক্য হলো এই : (১) মুখ্য কারকের মূল সম্পর্ক ক্রিয়ার সঙ্গে, ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে কর্তা। কিন্তু অনুক্ত বা তির্যক কারকের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়, গৌণ (**Indirect**)। তির্যক কারক সেখানে আশ্রিত বা আধার। (২) কর্তৃকারক প্রধানত মুখ্য কারক হলেও গৌণ রূপেও তা ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে কর্তা হলো অনুক্ত

---

১ সমষ্টিবাচক শব্দের প্রয়োগ ও উৎস সম্পর্কে দ্র. মজুমদার : বাভাপ (২য়), ff ১১.২.২

কর্তা (তুলনীয় ঃ হিন্দী মৈঁ নে পোথী পঢ়ী <সং ময়া পুস্তিকা পঠিতা)। (৩) গৌণ-মূলেই কেবল অনুসর্গ বা অনুসর্গীয় বিভক্তি যুক্ত হয়।

ঐতিহাসিক বিচারে আধুনিক আর্য ভাষার বিভক্তিগুলি চার ধরণের, যথা—(ক) অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ বিভক্তির অবশেষ, (খ) তদ্ভব বা বিবর্তিত বিভক্তি, (গ) শূন্য বিভক্তি এবং (ঘ) অনুসর্গীয় বিভক্তি। বলা বাহুল্য, এইজাতীয় বিভক্তি-গুলির বিকাশ ঘটেছে পূর্বোক্ত বিভাগের ক্রম-অনুসরণ ক'রে। সর্বভারতীয় অথবা আঞ্চলিক অপভ্রংশের স্বাক্ষর হিসেবে যে-বিভক্তিগুলি টিঁকে আছে, সেগুলি আধুনিক ভাষার প্রাচীন নিদর্শনে যথেষ্ট মেলে, যেমন, চর্যাপদে—১মায় -ও বিভক্তি (বোড়ো, জো, সো ইত্যাদি), ৩য়ায় -ই(অ) (সমাহিঅ, ভন্তি), ৫মীতে -হু/হুঁ (গগণহু, খেপহু, খণহুঁ), ৬ষ্ঠীতে -হ, (গঅণহ, খণহ), ৭মীতে -হি/হিঁ (দিবসহি) ইত্যাদি। আধুনিক স্তরেও এইজাতীয় বিভক্তি অসুলভ নয়, যেমন ১মার ১বচনে— -উ বিভক্তি (<-ও) [সিন্ধী ডেহু (<দেশঃ), মারাঠী-অবধী সাঁপু (<সর্পঃ)], ৩য়ার বহুবচনে -ঈঁ [দেবী (<অপ -হিঁ)], ৭মীর ১বচনে মারাঠী -ইঁ (<অপ -হিঁ) ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক বিবর্তনের সাক্ষ্য হিসেবে আগাগোড়া রক্ষিত হয়েছে এমন কতকগুলি নবীন বিভক্তি হলো ঃ ই, এঁ, এ (১মা), -এঁ/এ (৩য়া), -(আ)হ (৬ষ্ঠী), -এ, ই (৭মী) ইত্যাদি।

কখনও কখনও সম্বন্ধের একবচনের ও বহুবচনের বিভক্তিও রয়ে গেছে। যেমন—সং চৌরস্য>চুরস্ (কাশ্মীরী), চোরেস্ (জিপসী) ; ক্ষণস্য>খনহ (প্রাচীন বাঙলা) ; *দেবাস, দেবস্য>দেবা (মারাঠী) ; চৌরাণাম্>চুরন্ (কাশ্মীরী) ; দেশানাম্>ডেহনে (সিন্ধী) ; গৃহাণাম্>ঘরাঁ (পাঞ্জাবী-গুজরাটী-রাজস্থানী), ঘরন্, ঘরউ, ঘরোঁ (পশ্চিমা হিন্দী)।

তদ্ভব বিভক্তির অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভক্তিহীনতা যখন সমস্ত কারকের সাধারণ ধর্ম হলে উঠলো, তখন অনুসর্গীয় বিভক্তি (Postpositional Affix) কারকের চিহ্ন হিসেবে প্রযুক্ত হতে লাগলো আধুনিক প্রায় সব ভাষাতেই। এই অনুসর্গীয় বিভক্তিগুলি মূলত ছিল অনুসর্গ শব্দ, যা শব্দের পরে যুক্ত হতো (যেমন, -ত<সং অন্তঃ)। পরে এইগুলিই পরিণত হয়েছে বিভক্তিতে। নবীন আর্য ভাষায় এই অনুসর্গীয় প্রত্যয় গুলির উৎস হলো এই[১]—

১ Beames : CGMAL, Vol. II p. 296.

করণে -কর্ণ (অথবা -পর্ণ)>-নেঁ (হিন্দী), -নোঁ, নী, নূঁ (গুজরাটী)।

অধিকরণে *মধ (=মধ্য) >-মেঁ (হিন্দী), -মে (সিন্ধী), -মাঁ (গুজরাটী), -মে, মৈঁ (ব্রজ)।

অধিকরণে -অন্ত> -ত/তে (বাঙলা-অসমীয়া), -আঁত (মারাঠী), -তে (পাঞ্জাবী)।

করণ-অপাদান-অধিকরণে -সম> -সোঁ, -সে (হিন্দী-অবধী), -সোঁ (মৈথিলী), -সূঁ (মারোয়াড়ী), সোঁ/সূঁ (ব্রজ)।

সম্বন্ধে *দিত, *দাত (=দত্ত)> -দা, দী (পাঞ্জাবী)।

সম্বন্ধে -কৃত্য> -চা, চী, চেঁ (তিনলিঙ্গ) [মারাঠী]।

কার্য> -জো, -জী (সিন্ধী)।

-কর> -(অ)র (বাঙলা-অসমীয়া-ওড়িয়া), -কর (পূর্বী হিন্দী)।

*কের> এর (বাঙলা), -কের (রাজস্থানী-পূর্বী হিন্দী)।

*সৎক (=সন্ত্+ক)>সাক (অসমীয়া), সন্দো (সিন্ধী), হন্দো (রাজস্থানী)।

গৌণকর্ম ও সম্বন্ধে-কৃত> -ক, -কে (বাঙলা-ওড়িয়া-মৈথিলী), -কো,-কা, -কী (হিন্দী), -কৌ (ব্রজভাষা)।

গৌণকর্মে লগ্>লই (পাঞ্জাবী), লাই (সিন্ধী), লায় (নেপালী), লা (মারাঠী), লাঙ্গ (হিন্দী)।

৪ ॥ সর্বনাম ঃ

নামপদের সঙ্গে সর্বনামের যে-পার্থক্য নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় পরিস্ফুট হয়েছে; তার প্রথম লক্ষণ, নামপদের তুলনায় এতে প্রাচীন বিভক্তির (প্রাকৃত-অপভ্রংশ) সংরক্ষণ ঘটেছে তুলনামূলকভাবে বেশী। দ্বিতীয়ত, গঠন-প্রকৃতির দিক দিয়ে পুরুষ-বাচক সর্বনাম-মূল নামপদের মতো সংখ্যায় দুটি নয়, মোট তিনটি, যথা—(ক) কর্তৃমূল, (খ) তির্যক বা গৌণমূল এবং (গ) সম্বন্ধমূল। অবশ্য পূর্বী ভাষাগুলির ক্ষেত্রে এই সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে (যেমন বাঙলা আমি ঃ আমা-, ওড়িয়া মুঁ ঃ মো-/আম-, অসমীয়া মই ঃ মো/আম-)।[১] অর্থাৎ কেবল কর্তৃমূল এবং তির্যকমূল।

নবীন ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির কর্তৃমূল উদ্ভূত হয়েছে বিভিন্ন উৎস থেকে, যেমন কর্তৃকারক, করণকারক ও সম্বন্ধ থেকে ; যথা—

---

১ উদাহরণ-বাহুল্য কমাবার জন্য কেবল উত্তম পুরুষ সর্বনাম উদাহৃত হবে।

১॥ কর্তৃকারকের ১মা বিভক্তি (১ব): সংস্কৃত 'অহম্' উদ্ভূত—পাঞ্জাবী হউঁ, সিন্ধী আঁউঁ/আঁ, গুজরাটী হুঁ।

২॥ করণকারকের ৩য়া বিভক্তি (১ব/বহুব.): সং 'ময়া' (১ব)-উদ্ভূত—হিন্দী মৈঁ, ওড়িয়া মুঁ, বাঙলা মুই (উপভাষায়), মারাঠী মী। সং অস্মাভিঃ (বহুব.)-জাত[১]—বাঙলা আমি (১ব), ওড়িয়া আম্ভে/আমে (বহুব.), অসমীয়া আমি (বহুব), হিন্দী হম্, পাঞ্জাবী অসীঁ, গুজরাটী অমে, মারাঠী আম্হীঁ (সর্বত্র বহুব.), সিন্ধী অসীঁ "আমরা", নেপালী হামী।

৩॥ সম্বন্ধের ৬ষ্ঠী বিভক্তি (১ব/বহুব.): সং 'মম' (১ব)-উদ্ভূত—বাঙলা মো-রা (কাব্যিক), প্রাচীন হিন্দী মো, নেপালী ম (১ব)। সং অস্মাকম্ (বহুব.) -জাত—বাঙলা আমরা (<মধ্য বাঙলা আহ্মারা)।

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার তির্যকমূলের উৎসও বিচিত্রমুখী, যেমন—

১॥ গৌণকর্মের ৪র্থী বিভক্তি (১ব): সং মহ্যম্ (১ব)-জাত—হিন্দী মুঝ- (মুঝকো, মুঝসে ইত্যাদি), গুজরাটী মজ (মজ থী, মজ নে), মারাঠী মজ (মজলা, মজসীঁ)।

২॥ সম্বন্ধের ৬ষ্ঠী বিভক্তি (১ব./বহুব.): সং মম (১ব)-উদ্ভূত—মধ্য বাঙলা মো- (মোর, মোকে, মোতে ইত্যাদি), ওড়িয়া মো- (মোর, মোতে), নেপালী ম-, সিন্ধী মূঁ-/মাঁ-, প্রাচীন হিন্দী মো- (মোহি "মোর জন্য")। সং অস্মাকম্ (বহুব.)-জাত—তির্যক একবচন/বহুবচনে—বাঙলা আমা-(আমাকে, আমাদের), ওড়িয়া আম্ভ-/আম- (আমর); বহুবচনে—অসমীয়া আমা- (আমাত্, আমালৈ), ; গুজরাটী অমো-, অমো ; মারাঠী আম্হা (<অপ. অম্হাণং) ; পাঞ্জাবী (অ)সা ; সিন্ধী অসাঁ।

সম্বন্ধপদ ও সম্বন্ধমূলের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো, পুরুষবাচক ও অপুরুষবাচক সর্বনামের পার্থক্য। প্রথমত, অ-পুরুষবাচকের সর্বনাম-মূল দুটি—কর্তৃমূল ও সম্বন্ধমূল। সম্বন্ধমূল সর্বদা তির্যকমূল হিসেবে ব্যবহৃত হয় (যেমন, হিন্দী জো : জিস্‌কা)। দ্বিতীয়ত, পুরুষবাচক সর্বনামের ক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্র -র প্রত্যয়ের ব্যবহার (ব্যতিক্রম মারাঠী ও

---

১ এক্ষেত্রে বৈদিক 'অস্মে' (৪র্থী/৬ষ্ঠী বহুব.) পদেরও প্রভাব আছে

সিন্ধী)[১] এবং ভাষাবিশেষে -র যুক্ত সর্বনাম পদটির লিঙ্গশাসিত আচরণ (যেমন, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী ইত্যাদি)—যদিও পূর্বী ভাষাগুলিতে এই লিঙ্গানুশাসন নেই। উদাহরণস্বরূপ—১ব/বহুব : হিন্দী মেরা/হমারা, পাঞ্জাবী মেরা/অসাডা, গুজরাটী মারো/অমারো, নেপালী মরো/হাম্‌রো, মারোয়াড়ী মারো/ম্‌হারো, ভোজপুরী হমর্‌/হমার, ওড়িয়া মোর/আস্তর, বাঙলা মোর, আমার/আমাদের ইত্যাদি। তৃতীয়ত, অপুরুষবাচক সর্বনামের ক্ষেত্রে সম্বন্ধপদের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার এবং নামপদসুলভ অনুসর্গ-প্রত্যয়ের সংযোগ এবং লিঙ্গান্তর বিধি (আধুনিক বিহারী ও পূর্বী ভাষাগুলি অবশ্য এর ব্যতিক্রম), যেমন—হিন্দী উন্‌কা বেটা/উন্‌কী বেটী ইত্যাদি। চতুর্থত, অপুরুষবাচক সর্বনামের ক্ষেত্রে ৬ষ্ঠীর বহুবচন-জাত পদগুলির সম্ভ্রমার্থক প্রয়োগ, যেমন—হিন্দী জিস্‌কা/জিন্‌কা, পঞ্জাবী জিস্‌, জিহ/জিনা, জিন্‌হাঁ, ওড়িয়া যাহার/যাহাঙ্কর, বাঙলা যাহার/যাঁহার, যেনার<সং যস্য/যাসাম্‌, যেষাম্‌, *যেনাম্‌)। অপরদিকে মধ্যম পুরুষবাচক সর্বনামের ক্ষেত্রে নতুন ক'রে আবির্ভূত হয়েছে সং আত্মন্‌ শব্দজাত সর্বনাম-মূল—যা আত্মবাচক সর্বনাম (অর্থাৎ 'নিজ' অর্থে) হিসেবে ব্যবহৃত হলেও সম্ভ্রমার্থক প্রয়োগরূপে চিহ্নিত হয়েছে, যেমন—হিন্দী-পাঞ্জাবী আপ, সিন্ধী পাণ, মারাঠী আপণ, ওড়িয়া আপে, আপণ, বাঙলা আপনি ইত্যাদি।[২]

৫॥ ক্রিয়ার কাল ও ভাব :

উৎপত্তিবিচারে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় কাল দুইটি—মৌলিক বা সরল কাল (Simple Tense) এবং যৌগিক কাল (Compound Tense)। মৌলিক কালের ক্রিয়া-পর্যায়কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

ক ॥ প্রাত্যয়িক বা তিঙন্ত কাল (Radical Tense) : এইজাতীয় ক্রিয়াপদ এসেছে সংস্কৃত তিঙন্ত বিভক্তি (Inflections) -যুক্ত ক্রিয়াপদের বিবর্তনের ফলে (অর্থাৎ -তি, -অন্তি ইত্যাদি বিভক্তিজাত)।

খ ॥ কৃদন্ত কাল (Participial Tense) : এইজাতীয় ক্রিয়াপদ এসেছে সংস্কৃত কৃদন্ত প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াপদ থেকে (অর্থাৎ নিষ্ঠা, শত্রর্থ, কৃত্য প্রত্যয়)।

তিঙন্ত ক্রিয়াপদগুলি আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার নিম্নলিখিত ক্রিয়াপর্যায়ে রক্ষিত হয়েছে, যথা—

---

১ Beames : CGMAL, Vol. II, p. 277

২ Beames : CGMAL, Vol. II, p. 328 ; Kellogg : GHL ff 303, 381

১. বর্তমান নির্দেশক (Indicative), যেমন—সং *করন্তি (=কুর্বন্তি, লট্)> বাঙলা করেন, ওড়িয়া করন্তি, হিন্দী করেঁ, পাঞ্জাবী করণ্, সিন্ধী করনি, ব্রজভাষা করৈঁ, মারাঠী করত (<প্রাচীন মারাঠী করতী), গুজরাটী করে, হিন্দী করেঁ, ভোজপুরী করীঁ।

২. বর্তমান অনুজ্ঞা (Imperative), যেমন—সং *করত (=কুরুত, লোট্) >বাঙলা কর্, ওড়িয়া-অসমীয়া কর্, হিন্দী-পাঞ্জাবী-গুজরাটী-মারাঠী কর্, সিন্ধী করু।

৩. ভবিষ্যৎ নির্দেশক, যেমন—সং চলিষ্যতি (লৃট্)>প্রা চলিস্সই>প্রত্ন-নবীন ভারতীয় আর্য *চলীস, *চলীহ>প্রাচীন বাঙলা *চলিহ (তু, কহিহ), অন্ত্য মধ্য বাঙলা চলিহ, আধুনিক বাঙলা চ'লো (ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা)। সং করিষ্যতি>প্রা করিস্সই>প্রত্ন-নবীন ভারতীয় আর্য *করীস, *করীহ> গুজরাটী করশে<প্রাচীন গুজরাটী করীস ; লহ্ন্দা করসী, প্রাচীন হিন্দী করিহৈ, হিন্দী করে ("he may do"), রাজস্থানী করৈ, ভোজপুরী করিহেঁ, মগহী করিহে/করিহেঁ ইত্যাদি।

কৃদন্ত ক্রিয়াপদগুলি আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদে রক্ষিত হয়েছে, যথা—

১. শতৃ-প্রত্যয়জাত (সং -অন্ত্> -ন্ত ঃ নব্য ভারতীয় আর্যে ভাষাভেদে নিত্যবৃত্ত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদ গঠনে এবং শত্রর্থক কৃদন্ত প্রত্যয় হিসেবে ব্যবহৃত, যথা—প্রথম পুরুষ একবচনে—বাঙলা থাকিত, (নিত্যবৃত্ত), ওড়িয়া থান্তা (সম্ভাব্য অতীত), অসমীয়া মরিল হেঁতেন (-হেঁতেন< সং সন্ত্, সম্ভাব্য অতীত), সিন্ধী হুন্দো হলন্দো "সে যাবে" (ভবিষ্যৎ), মারাঠী করিতো "সে করে" (বর্তমান), করিতা "যদি সে করে" (সম্ভাব্য বর্তমান), করিত্ আহে "করিতেছে" ; প্রাচীন হিন্দী দেখ্তা=হিন্দী দেখ্তা হৈ "সে দেখিতেছে" ; পাঞ্জাবী মৈঁ জান্দা "আমি যাই" (বর্তমান) ; গুজরাটী হুঁ ছোড়তো (নিত্যবৃত্ত)।

২. নিষ্ঠা প্রত্যয়জাত (সং ক্ত=ত>-অ) ঃ নব্য ভারতীয় আযে নিত্য অতীত ও নিষ্ঠার্থক কৃদন্ত প্রত্যয় হিসেবে ব্যবহৃত, যথা—প্রথম পুরুষ একবচনে—বাঙলা চলিল, অসমীয়া চলিলে, ওড়িয়া চালিলা, ভোজপুরী দেখলে, মৈথিলী চললাহ (পূর্বী ভাষায় ল-প্রত্যয়যুক্ত) ; মারাঠী চললা (পুং), পাঞ্জাবী মারিআ (পুং), সিন্ধী হল্যো, হলিও (পুং) "he went", গুজরাটী

ছোড্যো, ছোড়েলো (পুং), পাঞ্জাবী মারিআ (পুং), দিঠা ; হিন্দী গয়া (পুং), প্রাচীন হিন্দী গয়ৌ।

৩. কৃত্য প্রত্যয় (সং তব্য > -ব): নব্য ভারতীয় আর্যে ভবিষ্যৎকাল ও ভাববাচক বিশেষ্য পদ গঠনে ব্যবহৃত। যথা—প্রথম পুরুষ একবচনে—বাঙলা চলিবে, ওড়িয়া চালিব, অসমীয়া চলিব ; মৈথিলী-ভোজপুরী তুঁ দেখব (প্রথম পুরুষে হ-যুক্ত-ভবিষ্যৎ), সিন্ধী ছডি'বো (পুং), গুজরাটী করবো, মারাঠী সোডাবা।

অবশ্য হিন্দীতে যৌগিক পদ্ধতির সাহায্যে ভবিষ্যৎ গঠন করা হয়, যথা—হিন্দী সুনেগা "সে শুনবে" (-গা<গম্)। মারাঠী, রাজস্থানী এবং পাহাড়ী ভাষাতে আবার -ল প্রত্যয় যোগে (<লগ্?) ভবিষ্যৎ পদ গঠিত হয়। যেমন—মারাঠী সুটেল, সোডীল, নেপালী হোলা, কুমাওনী মার্‌লো, মারোয়াড়ী পডেলো ইত্যাদি।[১]

৬॥ যৌগিক কাল :

আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার মধ্য স্তরে যৌগিক কালের (সম্পন্ন/অসম্পন্ন) আবির্ভাব এক নতুন বৈশিষ্ট্য। নিষ্ঠা বা শতৃ-প্রত্যয়জাত (-ত, -অন্ত) মূল ধাতুর সঙ্গে, অস্, ভূ বা স্থা ধাতুজাত সহায়ক ক্রিয়ার সংযোগে যৌগিক কাল গঠিত হয়, যেমন—

√ভূ : হিন্দী বহ্ দেখতা হৈ, দেখা হৈ ; মারোয়াড়ী বো লিখৈ হৈ "সে লেখে" ; পাঞ্জাবী উহ্ জান্দা হৈ।

√*অচ্ছ্ : বাঙলা গিয়াছে, গিয়াছিল ; অসমীয়া তেওঁ গৈছে, গৈছিল ; ওড়িয়া সে করুছি, করিছি ; মৈথিলী হম সুতইত ছী ; গুজরাটী করে ছে "সে করে", আপ্যো ছে "সে দিয়েছে" ; রাজস্থানী মারূঁ ছূঁ "মারছি" ; পাহাড়ী মারে ছ "মেরেছে"।

√অস্ : সিন্ধী হূ হলন্দো আহে "সে যাচ্ছে/যায়", হলিও আহে "সে গেছে" ; পাঞ্জাবী গিআ সন্ "তারা গিয়েছিল", জান্দা সী (<আসীৎ) ; মারাঠী লিহীত/লিহিতো আহে "সে লিখছে", লিহিলা আহে "সে লিখেছে" ; মৈথিলী (কেবল প্রথম পুরুষে) কে জাইত অহি "কে যাচ্ছে ?"

√স্থা : হিন্দী বোল্‌তা থা, বোলা থা ; ওড়িয়া করু থাএ, করু থিলা, করু থিব, করু থান্তা (সম্ভাব্য অতীত)।

---

১ Beames : CGMAL, Vol. III, ff 54,55

৭॥ ভাব/কর্মবাচ্য :

নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় ভাব/কর্মবাচ্য দুই ভাবে গঠিত হয়, যথা—(ক) প্রাত্যয়িক কর্মবাচ্য (Inflected Passive) এবং (খ) যৌগিক কর্মবাচ্য (Periphrastic Passive)।

প্রাত্যয়িক কর্মবাচ্য উদ্ভূত হয়েছে সংস্কৃত কর্মবাচ্য-রীতির সূত্র ধ'রে। মধ্য ভারতীয় আর্যে কর্মবাচ্যের বিকরণ সমীভূত অথবা সম্প্রসারিত হওয়ায় দু'ধরণের পদগঠন দেখা যায়। যেমন—সং গম্যতে>শৌরসেনী প্রাকৃত গমীঅদি, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত গমিজ্জই। এই সমীভূত -ইজ্জ> -ঈজ প্রত্যয়ান্বিত কর্মবাচ্যের উদাহরণ পশ্চিমা ভাষাগুলির মধ্যে সিন্ধী, রাজস্থানী, লহ্ন্দা প্রভৃতি ভাষায়, এমনকি দক্ষিণদেশীয় মারাঠীতে এখনও মেলে; যেমন—সিন্ধী করীজে "করা হয়" (<প্রাকৃত করিজ্জই<ক্রিয়তে); মারোয়াড়ী করীজণো (=হিন্দী কিয়া জানা), রামস্থঁ পোথিয়াঁ লিখীজৈ হৈ (=লিখ্যতে); হিন্দী [বিনীত প্রয়োগে] কীজিয়ে (=ক্রিয়তাম্), লিজিয়ে (=লভ্যতাম্); মারাঠী করিজে, দীজে (<দীয়তে)।

সম্প্রসারিত প্রাচীন ইঅ- প্রত্যয়যুক্ত কর্মবাচ্যের প্রয়োগ মেলে মধ্য ও দক্ষিণদেশীয়, বিশেষ ক'রে পূর্বাঞ্চলের ভাষাগুলিতে, যথা—ব্রজভাষা মারিয়ে "মারা হয়" (ঃ মারৈ "সে মারে"); হিন্দী আনা চাহিয়ে; পাঞ্জাবী পঢ়িএ (<পঠ্যতে), সুনীএ (শ্রূয়তে); মারাঠী গমে (<গম্যতে), দীসে (<দৃশ্যতে); প্রাচীন বাঙলা করিঅই, পাবিঅই (<প্রাপ্যতে), দুহিএ (দুহ্যতে) ইত্যাদি।

নবীন ভারতীয় আর্যে-উদ্ভূত নতুন রীতি হলো, সহায়ক ক্রিয়ার সাহায্যে যৌগিক কর্মবাচ্য গঠন, যেমন—বাঙলা বাড়িটি দেখা যায়, বলা যায়; হিন্দী ব্রহ্ দেখা জাতা হৈ, দেখা জাএগা, বহ্ পত্র লিখা গয়া; পাঞ্জাবী দিঠা জাবে, দিঠা জাবেগা; মৈথিলী ঈ কাজ কএল অছি "এই কাজ করা হয়েছে", ঈ বাত জানল ছল; পাঞ্জাবী পঢ়িআ জান্দা হৈ (=পঠ্যতে)।

৮॥ যৌগিক ক্রিয়া :

অসমাপিকা ক্রিয়া বা নামপদের সঙ্গে আর একটি ক্রিয়া জুড়ে যদি একটিমাত্র ক্রিয়াপদের অর্থ দ্যোতিত হয়, তবে সেই সম্মিলিত ক্রিয়াপদকে বলে যৌগিক ক্রিয়াপদ। অবহট্‌ঠ স্তরেই অবশ্য এই বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল। যেমন—ভত্তি করু (=প্রমাদ্যতাম্), বিসাম করু (=বিশ্রাম্যতাম্)। তবে আধুনিক ভাষায় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহারে ক্রিয়ার কার্যরীতি বা কার্যভঙ্গী (Aspect) প্রকাশ একটি নতুন

বৈশিষ্ট্য। যেমন—বাঙলা খুলে দে/নে/ফেল/বল্, ছুঁড়ে দে; হিন্দী নিকাল দেনা, মার দেনা; মারাঠী লিহূণ দেণেঁ "লিখে দেওয়া", খণুণ দেণেঁ "খুঁড়ে দেওয়া"; ওড়িয়া পোড়ি যিবা "পুড়ে যাওয়া", বিকি দেবা "বিক্রয় করা"; গুজরাটী শীখী লেবুঁ "শিখে নেওয়া"; সিন্ধী ছডে' ডী'অণু "ছেড়ে দেওয়া" (: ছড'ণু), হলী বঞণু "চলে যাওয়া"; মৈথিলী স্নান করব, দর্শন করব ইত্যাদি।

১৩.২.৩ বাক্যরীতি (Syntax)

বাক্যরীতির বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে নবীন ভারতীয় আর্যের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করছি। এই বৈশিষ্ট্য দু'টি সংরক্ষণশীল ভাষাগুলিতে এখনও বজায় আছে। পূর্বী ভাষাগুলিতে কিন্তু এ-বৈশিষ্ট্য লুপ্ত—যদিও প্রাচীন স্তরে তার ব্যবহার ছিল।

১ ॥ লিঙ্গ-সৌষম্য :

(ক) সম্বন্ধ-বিশেষণ ও নামপদ : হিন্দী উন্‌কা বেটা (পুং)/উন্‌কী বেটী (স্ত্রী), মেরা হাথ্/মেরী বাত্; মারাঠী মাঝা ঘোড়া (পুং)/মাঝী টোপী (স্ত্রী)/মাঝেঁ ঘর (ক্লী); গুজরাটী মারো ঘোড়ো/মারী ঘোড়ী/মারুঁ ঘোড়ুঁ; প্রাচীন বাঙলা রুখের তেন্তলী (চর্যা ২) কিন্তু হাড়েরি মালী (চ. ১০)।

(খ) বিশেষণ ও নামপদ : হিন্দী অচ্ছা লড়্‌কা/অচ্ছী লড়্‌কী; মারাঠী চাঙ্গলা মনুষ্য "ভাল মানুষ" / চাঙ্গলী ছত্রী "ভাল ছাতা" (স্ত্রী) / নদীচে পানী চাঙ্গলেঁ আহে (ক্লী); গুজরাটি সারো ছোকরো "ভাল ছেলে/সারী ছোকরী/সারুঁ ছোকরুঁ "বালকজাতি" (ক্লী); পাঞ্জাবী ঠণ্ডা পাণী/ঠণ্ডী রোটী; চঙো ছোকরো 'ভাল ছেলে'/চঙী ছোকরী/চঙা ছোকরা "ভাল ছেলেরা"; প্রাচীন বাঙলা একেলী শবরী (চ. ২৮), দিঢ়ি টাঙ্গী (চ. ৫)।

(গ) কর্তা ও ক্রিয়াপদ : হিন্দী বহ্ গয়া (পুং)/বহ্ গয়ী (স্ত্রী); মারাঠী তো ম্হটলা "সে বলেছিল" (পুং)/তী ম্হটলী (স্ত্রী)/তেঁ ম্হটলেঁ (ক্লী), তো হোতা/তী হোতী ইত্যাদি; গুজরাটী ছোকরো দোড্যা/ছোকরীও হসী "মেয়েরা হেসেছিল"; সিন্ধী কিণ ডী'হনে বাদ খবরে মিলী "কিছু দিন বাদে খবর মিললো"; প্রাচীন বাঙলা চলিল কাহ্ন (চ. ১৩) কিন্তু ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী (চ. ৪৯)।

২ ॥ অনুক্তে কর্তরি প্রয়োগ :

অকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কৃদন্ত অতীত কাল হলো কর্তার বিশেষণ এবং কর্তৃবাচ্যক ; কিন্তু সকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অতীতকাল কর্মের বিশেষণ এবং কর্মবাচ্যক। অনুক্ত কর্তা সাধারণত করণ কারকে, ক্বচিৎ গৌণকর্মে প্রযুক্ত হয়। যেমন—

প্রাচীন বাঙলা : রাতি পোহাইলী (স্ত্রী) কিন্তু মোএ ঘেণিলি হাড়েরি মালী।[১]

হিন্দী : রাম চলা কিন্তু রাম নেঁ পোথী পঢ়ী।

গুজরাটী : তেও ধীমা চাল্যা "তারা ধীরে চলছিল" কিন্তু তেণে কেরী খাধী "সে আমটি খেয়েছিল।"

মারাঠী : মী তুলা এক রুপয়া দিল্লা, মী ত্যালা দোন্ রুপয়ে দেলে, ত্যানেঁ পোথী বাচিলী (স্ত্রী) "সে বইটি পড়েছিল।"

পাঞ্জাবী : উস্ নৈ আউণাঁ সা "by or to him to come it was = he was to have come", খত্ লিখিআ জান্দা হৈ কিন্তু চিট্‌ঠী পঢী জান্দী হৈ।

নেপালী : মৈ লে খায়া "আমি খেয়েছিলাম।"

রাজস্থানী : মারোয়াড়ী—ঘোড়ে লাত্ (স্ত্রী) মারী কিন্তু ঘোড়ো লাত্ মারৈ হৈ।

লক্ষণীয়, কৃদন্ত ভবিষ্যতের কর্মণি প্রয়োগ কেবল গুজরাটীতে মেলে, যথা—তোরে/তেঁ বীশবাস করবো (=ত্বয়া বিশ্বাসঃ কর্তব্যঃ) "by thee trust is to be made= you ought to have confidence"।[২]

---

১ মজুমদার : বাভাপ (২য়), পৃ. ৩৯২

২ Beames : CGMAL Vol III, pp. 155-156

॥ ১৪ ॥

ভারতীয় লিপি

১৪.১ ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী

ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রধানত তিন জাতীয় লিপি ব্যবহৃত হয়ঃ (১) প্রাচীন ব্রাহ্মী-উদ্ভূত লিপি, যেমন, বাঙলা, দেবনাগরী, গুরুমুখী ইত্যাদি। (২) সেমেটিক বা সেমীয়-উদ্ভূত আরবী-ফারসী লিপি—যা একদা মুসলমানদের দ্বারা ভারতে আনীত হয়েছিল। উর্দু, সিন্ধী, আধুনিক কাশ্মীরী বা কতকাংশে পাঞ্জাবী ভাষাভাষীরা বর্তমানে এই লিপির ব্যবহার করে থাকেন। (৩) রোমান লিপি, যেমন ইংরেজী। উৎপত্তি বিচারে এই লিপি ফিনিশীয়। এই ফিনিশীয় লিপি থেকেই গ্রীক বর্ণমালার উদ্ভব (আ. খ্রী পূ. ৮০০)। পরে দক্ষিণ ইটালিতে উপনিবিষ্ট গ্রীকদের কাছ থেকে রোমের অধিবাসীরা দু/এক শত বছরের মধ্যে এই লিপিবিদ্যা শিক্ষা করে। রোমানদের মাধ্যমে এই লিপি ইংল্যাণ্ডে আনীত হয়। ভারতবর্ষে অবশ্য পর্তুগীসদের আগমনের সময় থেকে রোমান অক্ষরের প্রবর্তন ঘটেছে।

উপরোক্ত তিনটি লিপি ছাড়াও আর একটি কৃত্রিম লিপি বর্তমানে ব্যবহৃত হয়, যার নাম দেওয়া হয়েছে ভারতীয় রোমান লিপি। মূল রোমক বর্ণমালাকে ভারতীয় ভাষার উপযোগী ক'রে ভারতীয় রোমান লিপি গৃহীত হয়েছে। যে-ভাষার বর্ণমালা এখনও গ'ড়ে ওঠে নি, এমন ক্ষেত্রে এই লিপি বর্তমানে ব্যবহৃত হয়, যেমন, বিভিন্ন উপজাতিক (Tribal) ভাষাগুলির ক্ষেত্রে। সংস্কৃত বা পালি-প্রাকৃত ভাষার ক্ষেত্রেও এই লিপি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, কারণ এই ভাষাগুলির নিজস্ব কোনো লিপি নেই। সর্বভারতীয় বোধগম্যতা এবং ধ্বনিমাত্রিক সুবিধার সর্তেই এই লিপি ভাষাতাত্ত্বিকেরা গ্রহণ করেছেন।

ভারতীয় লিপির বিবর্তন প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে রাখা দরকারঃ মহেঞ্জো-দড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত প্রত্ন-ভারতীয় লিপিই অখণ্ড ভারতের প্রাচীনতন নিদর্শন। কিন্তু প্রায় চার হাজার বছরের প্রাচীন এই লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব না হওয়ায় পরবর্তী ভারতীয় লিপির সঙ্গে তার যোগসূত্র নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। প্রত্ন-ভারতীয় লিপির পর খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মহারাজ অশোকের উৎকীর্ণ গিরি-অনুশাসনে প্রাচীন ভারতীয়

লিপির দুটি পদ্ধতি পাওয়া যাচ্ছে—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ব্যবহৃত খরোষ্ঠী লিপি (শাহ্‌বাজগঢ়ী ও মান্‌সেহ্‌রা অনুশাসন) এবং অন্যান্য অঞ্চলে ব্যবহৃত ব্রাহ্মী লিপি।

খরোষ্ঠী, নামান্তর খরোষ্ট্রী, সেমীয় (আরামীয়/Aramaic) লিপি থেকে উদ্ভূত। কীলকাকৃতি অক্ষরে লিখিত ব'লে এই লিপি বাণমুখ (Cuneiform) লিপি নামে পরিচিত। এই লিপি লেখা হয় দক্ষিণ থেকে বামে। লিপি-পদ্ধতিতে দীর্ঘ স্বর বা মাত্রা-চিহ্ন ব্যবহৃত হতো না। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকেই এই লিপি ভারতের বাইরে—চীনা তুর্কীস্তান পর্যন্ত প্রসারিত হয়। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতকের পর থেকে এই লিপির ব্যবহার আর দেখা যায় না। দেড় হাজার বছর পূর্বেই খরোষ্ঠী ভারত থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে, সম্ভবত ভারতীয় ভাষার পক্ষে অনুপযুক্ত বলেই; আর তার স্থান দখল করেছে ব্রাহ্মী এবং হয়ে উঠেছে সর্বভারতীয় লিপি।

বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মী লিপিই ভারতের সর্বপ্রাচীন পাঠযোগ্য লিপি (পাঠোদ্ধার করেন খ্যাত জেমস্ প্রিন্সেপ্)—যা ভারতীয় আর্য ভাষার সঙ্গে সর্বতোভাবে সংশ্লিষ্ট। ভারতীয় পুরাণে খ্রীষ্টপূর্ব বহু সহস্র বৎসরের কথা বলা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে খ্রীষ্টপূর্ব তিনশো বছর আগেকার আর্য ভাষায় রচিত কোনও লেখা এখনও পর্যন্ত মেলে নি বা তার পাঠোদ্ধার করা যায় নি। তাই মৌর্য যুগের ব্রাহ্মীকেই উপস্থিত ক্ষেত্রে আধুনিক লিপিসমূহের জননী বা আদি উৎস বলতে হয়। ব্রাহ্মী লিপি দেবতা ব্রহ্মার সৃষ্টি—ভারতীয় পুরাণ এই ব্যাখ্যাই দেয়। এই ব্যাখ্যার দ্বারা ব্রাহ্মী লিপির ওপর অবিসংবাদী অধিকতর প্রাচীনত্ব আরোপ করা হয় মাত্র, কিন্তু এই লিপি ভারতের সর্বপ্রাচীন তো নয়ই, এমনকি একমাত্র লিপিও নয়।

ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তি বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এতাবৎ প্রায় সকলেই মনে করতেন, ব্রাহ্মী ফিনিশীয় অক্ষর (Script) থেকে উৎপন্ন। খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের পূর্বেই সিরিয়া দেশের ফিনিশিয়া (Phoenicia) প্রদেশে সেমীয় গোষ্ঠীর ফিনিশীয় ভাষাকে আশ্রয় ক'রে ফিনিশীয় লিপি এককালে গ'ড়ে উঠেছিল। সম্ভবত দক্ষিণ আরব নতুবা পারস্য উপসাগর হয়ে দ্রাবিড় জাতীয় বণিকদের মারফৎ এই লিপি আনুমানিক খ্রী. পূ ৯০০-৮০০ কালসীমায় ভারতে আনীত হয় এবং পরে ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে এই ব্রাহ্মী অক্ষরমালার সম্পূর্ণতা ঘটে। বলা বাহুল্য, প্রখ্যাত লিপিতত্ত্ববিদ ব্যুলার-এর (G. Bühler) মতেও ব্রাহ্মী সেমীয় লিপি। অনেকে আবার ফিনিশীয় অক্ষর থেকে ব্রাহ্মীর উদ্ভব স্বীকার করেন না। তাঁদের অনুমান, ভারতের আর্যভাষী জনগণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে, কোনও এক ধরণের মৌলিক চিত্রলিপি

(Pictogram) থেকে ব্রাহ্মীর বিকাশ ও উৎকর্ষ ঘটিয়েছেন। আবার মহেঞ্জো-দড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত শত শত মুদ্রালিপির বিকাশের ফল ব্রাহ্মী লিপি—এই নতুন মতবাদ সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে যাই হোক, মোট কথা, খ্রী. পূ. ১০০০ সালের কাছাকাছি সময় ব্রাহ্মী লিপির প্রতিষ্ঠার কাল ব'লে মনে করা অসংগত নয়।

ব্রাহ্মী লিপির বৈশিষ্ট্য মোটামুটি এই—

১. ব্রাহ্মী লিপির অক্ষরগুলি সরল, এগুলিতে মাত্রা বা অন্য প্রকার কোনো অনাবশ্যক বাহুল্য ছিল না। অক্ষরগুলির ছাঁদ গ্রীক বা রোমান ক্যাপিটাল বা বড়ো হাতের অক্ষরের মতো, যেমন, ক (+), গ (Λ), ত (λ), ন (⊥) ঠ (O), ধ (D) ইত্যাদি।

২. এই লিপি **Syllabic** বা অক্ষরমাত্রিক, তাই ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে 'অ' ধ্বনি যুক্তই থাকতো। শব্দের আদিতে অ, ই, উ, ও স্বরবর্ণগুলি এককভাবে লেখা হতো আর স্বরবর্ণের সাহায্যে ৩২ টি অক্ষর তৈরী করা যেতো।

৩. অন্যান্য মাত্রিক স্বরবর্ণ, যেমন আ-কার, ই-কার, উ-কার প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ চিহ্ন ব্যঞ্জন বর্ণের গায়ে মাথায় বা পায়ে লাগানো হতো।

৪. সংখ্যা বোঝানো হতো দশক বা শতকের সাহায্যে।

৫. এই লিপি লেখা হতো বাম দিক থেকে ডান দিকে।

১৪.২ আধুনিক ভারতীয় লিপি

ব্রাহ্মী লিপির ক্রমিক বিবর্তনের ফলশ্রুতি আধুনিক ভারতীয় লিপিমালা এবং ভোট, বর্মী, যবদ্বীপীয়, সিয়ামী, কোরীয় প্রভৃতি বহির্ভারতীয় লিপি। খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতক থেকে ব্রাহ্মী লিপি ভারতবর্ষের বাইরে প্রসারিত হয়ে স্থান ও কালভেদে নানা রূপ পরিগ্রহ করেছে। ব্রহ্মদেশীয় মোন্ এবং তজ্জাত ম্রন্মা বা বর্মী লিপি, কম্বোজের কম্বোজী এবং তার থেকে উদ্ভূত দৈ বা থাই বা সিয়ামী লিপি, ইন্দোনেশিয়ার যবদ্বীপীয় বা অন্যান্য লিপি, প্রাচীন চম্পার লিপি, ভোট বা তিব্বতী লিপি, মধ্য এশিয়ার খোটানী লিপি, কুচার কুচীয় বা তোখারীয় লিপি, কোরিয়ার লিপি ইত্যাদি ব্রাহ্মী লিপি থেকেই বিবর্তিত হয়েছে। ভারতীয় ধর্মপ্রচারক ও বণিকদের মাধ্যমে ব্রাহ্মী লিপি এই ভাবে বহির্ভারতে সম্প্রসারিত হয়েছিল।

উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মী লিপির বিবর্তন ঘটেছে স্বতন্ত্র ধারায়। উত্তর ভারতে মৌর্য যুগের ব্রাহ্মী হলো প্রাচীন স্তরের লিপি। পরে ১ম ও ২য় শতকে কুষাণ রাজত্বকালে এই লিপি কুষাণ ব্রাহ্মী লিপিতে পরিবর্তিত হয়। আনুমানিক ৪র্থ-৫ম শতকে গুপ্ত যুগে ব্রাহ্মী লিপি পরিণত হলো গুপ্ত লিপিতে। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের সূচনায় কোণাকৃতি সিদ্ধমাতৃকা বা কুটিল লিপির আবির্ভাব ঘটলো। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মী ক্রমশ উত্তর ও পূর্ব ভারতে অঞ্চলভেদে তিনটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করে: (১) শারদা (উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর-পাঞ্জাব অঞ্চলে, আনুমানিক ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ); (২) নাগর (দক্ষিণ-পশ্চিমে গুজরাট-রাজপুতানা-মালবে ও মধ্যপ্রদেশে, আ. ৮ম-১০ম খ্রীষ্টাব্দে) এবং (৩) প্রত্ন-বাঙলা বা গৌড়ী (পূর্বভারতে, আ. ১১শ শতক)। গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণ ও রাজপুত রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় নাগরীর প্রসার ঘটে সমগ্র উত্তর ভারতে। নাগর থেকেই পরবর্তীকালে দেবনাগরী, গুজরাটী ও কইথী/কায়থী লিপির উৎপত্তি। শারদা থেকে কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের গুরুমুখী এবং প্রত্ন-বাঙলা বা গৌড়ী (অভিধাটি ডঃ দীনেশ সরকারের) লিপি থেকে হলো বাঙলা, মৈথিল বা তিরুটিয়া (তিরহুতিয়া), অসমীয়া, ওড়িয়া ও নেপালী লিপির উদ্ভব। সুতরাং দেখা গেল, দেবনাগরী ও বাঙলা সহোদরস্থানীয় লিপি। উভয়েরই উদ্ভব মোটামুটি একই সময়সীমায়, এখন থেকে মাত্র এক হাজার বছর পূর্বে।

অপর দিকে দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মী লিপি স্বতন্ত্র ধারায় বিবর্তিত হয়ে প্রাচীন বট্টেলু.ত্তু ও পল্লব লিপির মধ্য দিয়ে আধুনিক তামিল, তেলুগু, কানাড়ী, মালয়ালম, গ্রন্থ, সিংহলী প্রভৃতি লিপিতে পরিণত হয়েছে। ব্রাহ্মী লিপির বিবর্তন ও বিকাশ পরের পৃষ্ঠায় রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

দ্র. G. Bühler : Indian Palaeography, reprint, Calcutta, 1961 ; K. B. Tripathi : EOLS (introduction)। বাঙলায় আলোচনার জন্য দ্র. চট্টোপাধ্যায়, ভা ভা স, পৃ. ১৪০-৪৪ ; হালদার: ভা ভা, পৃ. ১৩০-৩৩ ; ভারতকোষ (খরোষ্ঠী, ব্রাহ্মী, লিপিতত্ত্ব)।

ব্রাহ্মী (খ্রী. পূ. ৩য় শতক)

- কুষাণ লিপি (খ্রী. ১ম-২য় শতক)
  - গুপ্তলিপি (খ্রী. ৪র্থ-৫ম শ.)
    - সিদ্ধমাতৃকা / কুটিল (৬ষ্ঠ-১০ম শতক)
      - উত্তর-পশ্চিম ভারত [শারদা, আ. খ্রী. ৮০০]
        - (পূর্বী প্রভাব)
          - তিব্বতী
        - কাশ্মীরী গুরুমুখী
      - মধ্যদেশ ও রাজস্থান-গূর্জর [নাগর, ৮ম-১০ম শ]
        - কায়থী
        - গুজরাটী
        - দেবনাগরী
      - পূর্বভারত [প্রত্ন-বাঙলা/গৌড়ী, [১১শ শতক]
        - বাঙলা-অসমীয়া
        - মৈথিলী
        - ওড়িয়া
        - নেপালী
      - মধ্য এশিয়া
        - প্রাচীন কুচী ও খোটানী ভাষার লিপি
      - দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
        - যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতির লিপি
- দক্ষিণ ভারতের লিপি [বট্টেঝু-ত্তু]
  - পল্লব (আ. ৫৫০ খ্রী.)
    - গ্রন্থ (৫ম-৬ষ্ঠ শতক ?)
    - মালয়ালম্‌
    - তামিল
    - তেলুগু-কানাড়ী
    - সিংহলী
    - ব্রহ্ম, কম্বোজ ও শ্যামদেশীয় লিপি

॥ ১৫ ॥

ভারতীয় ভাষা ঃ নির্বাচিত নিদর্শন

১৫.১ ভারতীয়-আর্য শাখা (ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী)

১. বাঙলা ঃ

[ক] সাধুভাষা—

এক ব্যক্তির (=বেক্তির) দুইটি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র পিতাকে কহিল —পিতা, সম্পত্তির যে (=জে) অংশ আমার হইবে, তাহা আমাকে দিন। তাহাতে তিনি আপন সম্পত্তি তাহাদিগের মধ্যে ভাগ (বণ্টন) করিয়া দিলেন।

[খ] চলিত ভাষা—

এক জন লোকের দুটি ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ছোটোটি বাপকে ব'ল্লে (=বোল্লো)—বাবা, আপনার বিষয়ের মধ্যে যে (=জে) ভাগ আমি পাবো, তা আমাকে দিন। তাতে তাদের বাপ তার (নিজের, আপনার) বিষয়-আশয় তাদের মধ্যে ভাগ ক'রে (বেঁটে) দিলেন (দিলে)।

২. ওড়িয়া ঃ

জণ-কর দুই পুঅ থিলা। তাঙ্ক মধ্যরে যে (= জে) বয়সরে সান, সে আপণা বাপকু কহিলা—বাপা, মো বাণ্টরে যেউঁ (= জেউঁ) সম্পত্তি পড়িব, তাহা মোতে দিঅ। বাপা আপণা বিষয়কু সেমানঙ্ক ভিতরে বাণ্টি দেলা।

৩. অসমীয়া ঃ

কোনো এজন [=ɛzon] মানুহর দুটা (ট=ত) পুতেক আছিল্ [=āsil]। তারে সরুটোৱে [=xorutowe] বাপেকক্ কলে—হে পিতৃ [pitri], সম্পত্তির [=xɔmpɔttir] যি [=zi] ভাগ মোত্ পড়ে (ড়=র), তাক্ মোক্ দিয়া। তাতে তেওঁ আপোন সম্পত্তি সি-বিলাকক্ [=xibilākɔk] বাঁটি দিলে।

LSI গ্রন্থ থেকে সংকলিত ; চট্টোপাধ্যায় ঃ ভা ভা স, পৃ. ১০৭ ১৩৭ ;
Chatterji : LLMI, pp. 70-92 ;

[দ্রষ্টব্য : শ, ষ, স = খ. /x/ ; চ, ছ = /s/ ; য, জ = জ. /z/ ; ট, ঠ, ড, ঢ, ণ = / t, th, d, dh, n/]

৪. বিহারী :

[ক] ভোজপুরী—

এক আদমীকা দূ বেটা রহে। ছোট্কা অপনা বাপ-সে কহলস্ কী—এ বাবূজী, ধনমেঁ জে হমার হিস্সা হোখে, সে বাঁট্ দী। তব্ উ আপন্ ধন্ দূনোকে বাঁট দেলস্।

[খ] মগহী—

এক আদমীকে দু-গো বেটা হলথীন্। উন্কন্হীঁ-মেঁ-সে ছোট্কা অপন্ বাপ-সে কহলক্ কে—এ বাব্জী, তোহর চীজ্-বতুস্ (= বস্তু) -মেঁ -সে জে হমর্ বখ্র হো-হৈ, সে হম্রা দে-দও। তব্ উ অপন্ সব চীজ্-বতুস্ উন্কন্হীঁ দূনোঁ-মেঁ বাঁট্ দেলক্।

[গ] মৈথিলী—

কোনো মনুখ্যকেঁ দুই বেটা রহৈন্হি। ওহি-সঁ ছোট্কা বাপ-সঁ কহল-কৈন্হি জে —ঔ বাবা, ধন-সম্পত্তি মেঁ-সঁ জে হমর্ হিস্সা হোয়্, সে হম্রা দিয়হ্। তখন ও হুন্কা অপন্ সম্পত্তি বাঁটি দেল-থীন্হি।

৫. উর্দু :

[ক] আদর্শ উর্দু (মুসলমানী-হিন্দী বা হিন্দুস্থানী)—

এক (কিসী) শখ্স্-কে দো বেটে থে। উন্মে-সেঁ ছোটে-নে বাপ-সে কহা—অব্বাজান্, আপ-কী জাএদাদ-মেঁ জো-কুছ্ মেরা হিস্সা হৈ, মুঝ-কো দে-দীজিয়ে। চূনাচে উস্নে অপ্না অসাসা দোনোঁ-কো তক্সীম (taqsīm) কর্ দিয়া।

[খ] দক্নী/দখ্নী—

এক আদমীকে দো বেটে থে। উন্মেঁ-সে ছোটে ছোরে-নে বোলা—বাবা, মেরে ভাগ-কা মাল মেরে-কূঁ দে। হৌর উস্-নে উন্-মেঁ ভাগ্ পাড় দিয়া।

৬. হিন্দী তথা পশ্চিমা হিন্দী :

[ক] শুদ্ধ বা সাধু হিন্দী (রাষ্ট্রভাষা)—

কিসী মনুষ্য-কে দো পুত্র্ থে। উন্‌মেঁ-সে ছুট্‌কে-নে পিতা-সে কহা কি,—পিতাজী, অপ্‌নী সম্পত্তি-মেঁ-সে জো মেরা অংশ্ হো, সো মুঝে দে-দীজিয়ে। তব উস্‌নে উন্-কো অপনী সম্পত্তি বাঁট দী।

[খ] খড়ীবোলী হিন্দুস্থানী (মীরাট জেলা)—

এক আদমী-কে দো লোণ্ডে থে। উন্-মেঁ-তেঁ ছোটে-নে অপ্‌নে বাপ-সেত্তী কহা—ও বাপ, তেরে মরে পিছে জো-কুছ্ ধন-ধর্‌তী মরোঁ মিলেঙ্গী ৱা ইভী দে-দে। বাপ-নেঁ দোনোঁ লোণ্ডে-কো অপ্‌নী মায়া বাঁট্ দী।

[গ] ব্রজভাষা (মথুরা ও আলীগড় জেলা)—

এক জনে-কে দ্বৈ (দো) বেটা হে। উন্-মেঁ-তেঁ ছোটে -নে বাপ-স্যুঁ কহ্‌য়ৌ কি,—এ বাপ, মেরৌ জো বাঁটু হোতু-হৈ, সো মোয়্ দৈ-দেউ। তব্ ৱা-নে মালু উন্‌হৈঁ বাঁটি দিয়ৌ।

[ঘ] বাঙ্গ্রু বা জাটু (কর্ণল জেলা)—

এক মাণস্‌কৈ দো ছোরে থে। উন্-মৈঁ-তৈ ছোট্টে-নে বাপ্পূ-তৈ কহিয়া (কহ্যা) অক্—বাপ্প্ হো, ধন-কা জৌণ্-সা হিস্‌সা মেরে বাঁডে আৱে, সে ম-নৈ দে-দে। তৌ উস্‌নে ধন উন্‌হৈ বাঁড্ দিয়া।

[ঙ] কনৌজী—

এক জনেকে দোএ লড়িকা হতে। উন্-মৈঁ-সে ছোটে-নে বাপ-সে কহী কি—হে পিতা, মালু-কো হীঁসা জো হমারে চাহিয়ে, সো দেও। তব্ উন্-নে মালু উন্‌হে বাঁট্ দও।

[চ] বুন্দেলী (ঝাঁসী জেলা)—

এক জনে-কে দো মোড়া হতে। ওর তা-মেঁ-সে লোরে-নে অপ্‌নে দদ্দা-সে কঈ (=কহী)—ধন-মেঁ-সেঁ মেরো হিস্‌সা মো-খোঁ দেই-রাখো। তা-কে পীছে উঁ-নে অপ্‌নো ধন্ বরাব্ দও।

৭. অৱধী (পূর্বী হিন্দী) :

কৌনোঁ মনঈ-কে দুই বেট্‌ৱা রহিন্। ঔ উন্-মাঁ-সে লহুর্‌ৱা অপ্‌নে বাপ-সে কহিস্—দাদা হো, মাল্-টাল্-মাঁ-সে জওন হীসা হমার নিকটৈ, তওন্ হম্-কা দৈ-দ্যা। তৌ বাপ্ আঁপন্ রিজিক্ উন্-মাঁ বাঁট দিহিস্।

৮. রাজস্থানী :

[ক] মারোয়াড়ী (যোধপুর)—

এক জিণৈ-রৈ দোয় ডাব্‌ড়া হা। উৱা-মাঁয়্‌-স্যূঁ নৈনকিঐ আপ্‌রৈ বাপ্‌-নৈ কয়ো কৈ—বাবো-সা, মারী পাঁতী-রো মাল্ আৱৈ, জিকো ম-নৈ দিরাৱো। জরৈ উণ্ আপ্‌-রী ঘর-বিক্‌রী উণা-নৈ বাঁট্ দিৱী।

[খ] জয়পুরী—

এক জণা-কৈ দো বেটা ছা। বা মৈঁ-স্যূঁ ছোট্‌ক্যো আপ্‌কা বাপ-নৈ খঙ্গ (=কহী), দাদা-জী, ধন-মৈঁ-স্যূঁ জো বাঁটো ম্‌হারৈ বাঁটে আৱৈ, সো মূঁ-নৈ দ্যো। বো আপকো ধন বা-নৈ বাঁট্ দীন্।

৯. গুজরাটী :

এক মাণস-নে বে' দীক্‌রা হতা। অনে তেও-মাঁ-না নানাএ বাপ-নে কহ্যুঁ কে, বাপ, সম্পত্-নো পহোঁচ্‌-তো ভাগ ম-নে আপ্। নে তে-ণে তেও-নে পুঞ্জী বহেঁচী আপী।

[দ্রষ্টব্য : ব' = নিরুদ্ধ (recursive) ব্যঞ্জন]।

১০. পাঞ্জাবী :

[ক] পূর্বী পাঞ্জাবী (আদর্শ ভাষা)—

ইক্ মনুক্‌খ্-দে দো পুত্ সন্। অতে উন্‌হাঁ বিচ্চোঁ ছোটে-নৈ পিউ-ন্ আখিআ, পিতা-জী, মাল-দা জিহ্‌ড়া হিস্‌সা মৈ-নূঁ পহুঁচ্‌দা হৈ, সো মৈ-নূঁ দে-দিও। অতে উস্-নে উন্‌হা-নূঁ পূঁজী বণ্ড্ দিত্তী।

[খ] হিন্দ্‌কী বা লহ্‌ন্দা (পশ্চিমা পাঞ্জাবী)—

হিক্কী জণে-নেঁ দোঁ পুত্তর্ আহে। উন্‌হা-বিচ্চোঁ নিক্‌ড়ে পিউ-অাঁ আখেআ—পিউ, মাল্-নাঁ জেহ্‌ড়া হিস্‌সা মাঁহ্ আনাঁ, মাঁহ্ বণ্ড্-দেহ্। পিউ আপণাঁ মাল্ উন্‌হাঁ বণ্ড্ দিত্তা।

১১. সিন্ধী :

হিকিড়ে মাণ্‌হুঅ-খে ব' পুট হুআ। তিনি-মাঁ নণ্‌ঢে পিউ-খে চয়ো—এ বাবা, মাল্‌-মাঁ জে-কো ভাঙো মুঁহিঁ-জে হিসে অচে, সো মূঁ-খে থণী ডে'। জঁহিঁ-তে হুন মালু বি'ন্‌হী-খে ৱিরাহে ডি' নো।

[দ্রষ্টব্য ব', ড' = নিরুদ্ধ ব্যঞ্জন]।

১২. মারাঠী :

কোণে একা মাণসাস্‌ (<মনুষ্যাস্‌) দোন্‌ পুত্র (মুল্‌.গে) হোতে। ত্যাঁ-তীল্‌ ধাকটা বাপা-লা ম্‌হণালা—বাবা, জো মাল্‌-মত্তে-চা ৱাঁটা ম-লা য়াৱয়া-চা, তো দে। মগ্‌ ত্যা-নেঁ ত্যাঁ-স্‌ সম্পত্তি ৱাঁটূন্‌ দিলী।

১৩. কাশ্মীরী (দরদ্‌ শাখাভুক্ত) :

অকিস্‌ মহনিৱিস্‌ অ'াসি্‌ জ.হ ন্যচিৱি্‌ [nĕciwi]। তিমৌ মন্‌জঁ. দ'পু্‌ কূঁসি্‌-হিহি্‌ ম'ালিস্‌ কি—হে মালি, ম্য [mĕ] দিহ্‌ দনুকু্‌ (=ধনু.কু) হিস্‌্‌, য়ুস্‌ ম্য ৱাতি। তৱ-পত তমি্‌ তিহন্দি থ'াত্‌র দন (=ধন) ব'াগ্‌রোৱ্‌ন্‌।

[দ্রষ্টব্য : অ'া=ö, জ. = /z/ ; সি্‌ = si ইত্যাদি]।

১৫.২ ভারত-বহির্ভূত আর্য ভাষা

১৪. নেপালী (পূর্বী পাহাড়ী) :

এক জনা মান্‌ছে-কা দুই-ভাঈ ছোরা থিয়ে। অনি তিনি-হরু-মাঁ-কো কান্‌ছো-চইঁ-লে বাবু-লাই ভন্যো—বাবৈ, ধন্‌-সম্পত্তি-কো মঁ-লাই পর্‌নে ভাগ্‌ মঁ-লাই দেউ ভনি। অনি ত্যোস্‌-লে তিনি-হরু-লাই আফ্‌নু জীবিকা বাঁড়ি দিয়ো।

১৫. সিংহলী :

এক্‌-তরা মিনিহেকু-ট পুত্রয়ো দেঃ-দেনেঃক্‌ ৱূহ। ওৱুন্‌-গেন বালয়া পিয়া-ট কথা কোট—পিয়াণেনি, ওব-গেঃ ৱস্তৱিন্‌ ম-ট অয়িতি ৱন কোটস ম-ট দেনু2ম2নৱম্নি কীয়েয়। এ-ৱিট পিয়া তমা-গেঃ ৱস্তৱ দরুৱন্‌ দেদেনা-ট বেদা-দুন্নেঃয়।

[দ্রষ্টব্য এঃ = দীর্ঘ এ ; 2=একধরণের অ্যা]।

১৬. জিপসী (ব্রিটেনের ওয়েলস্ প্রদেশে প্রচলিত) :

সাস য়েথেস্তী মানুশেস্তী দূঈ চাৱে (<শারক)।
ছিল একজনকে মানুষকে দুই ছেলে।

ফেন্দাস (<ভণ্) ও লেড়েরো তার্নেদের লেস্তী দাদেস্তী—
বলিল ওই তাদের তরুণতর তাদের তাত-কে—

দাদে, দে মন্ মীরো উলৱিবেন্ তীরো বর়ৱলিপেনাস্তে (<বলবৎ-পন)।
তাত, দে আমাকে মোর ভাগ/লাভ তোর অর্থ থেকে।

থা ফাগের্দাস য়োৱ্ পেস্কো বর়ৱলিপেন্, থা দীআস্
তথা ভাগ করিল ও আপনার সম্পত্তি, এবং দিল

লেস্ (<তস্য) ঈ ফালেডী (<ভ্রাতা)।
উহা ঐ ভ্রাতাদের।

১৫.৩ দ্রাবিড় গোষ্ঠী

১৭. তামিল :

ওরু মনু'যনু'ক্কু ইরণ্ডু কুমারর্ ইরুন্দারগল.। অৱর্গল.-ইল্ ইলৈ.য়ৱন্' তগপ্পন্'-ঐ নোক্কি-তগপ্পন'-এঃ ! আস্তিয়িল্ এন'ক্কু ৱরুম্ পঙ্গেই এন'ক্কু-তর-ৱেণ্ডুম্, এন্'র'ান্'। অন্দপ্পডি অৱন্' অৱরগল.-উক্কুত্-তান্ আস্তিয়ৈ-প্-পঙ্গিট্টুক্-কোডুত্তান্'।

[দ্রষ্টব্য ন', র'=দন্তমূলীয় ন, র ; ল. =মূর্ধন্য ল ; এঃ=দীর্ঘ এ]।

১৮. মালয়ালম্ :

ওরু মনুষ্যন্-নু রণ্ডু মক্কল. উণ্ডু-আয়-ইরুন্নু। অদিল্ ইল.য়ৱন্ অপ্পনোঃডু— অপ্পা! বস্তুক্কল.-ইল্ এনিক্কু ৱর্-এঃণ্ডুন্ন পঙ্গু তরেঃণমেঃ, এন্ন পর'ঞ্ঞু। অৱন্ উম্ মুদলিয়ে অৱর্ক্কু পণ্ডদি- চেয়্দু।

[দ্রষ্টব্য : এঃ=দীর্ঘ এ ; ওঃ=দীর্ঘ ও]।

১৯. কানাড়ী ঃ

ওব্ব মনুষ্য-নি-গে ইব্বরু মক্কল. ইদ্দরু। অবর্-অল্লি চিক্কবনু তন্দেগে—তন্দেয়েঃ! আস্তিয়্-অল্লি নন-গে বর-তক্ক পালন্নু নন-গে কোডু। অন্দাগ বনু-কন্ন অবরি-গে পাল্-ইট্টনু।

২০. তেলুগু ঃ

ব্রোক মনুষ্যু-নি-কি য়িদ্দরু কুমারু-লু বুণ্ডিরি। বারি-লোঃ চিন্নবাড়ু—ওঃ তণ্ড্রি! আস্তি-লোঃ না-কু বচ্চে পালু য়িম্-অনি, তণ্ড্রি-তোঃ চেপ্পিন্-অপ্পুড়ু আয়ন্, বারি-কি তন আস্তি-নি পঞ্চি পেট্টেনু।

১৫.৪ অস্ট্রিক বা নিষাদ গোষ্ঠী

২১. সাওঁতালী/সান্তালী (কোল/মুণ্ডা শাখা) ঃ

মিত্' হড়-র‍্যান্ বারেআ কোড়া-হপন্-কিন্ তাহেকান-তাএ-আ। আর উন্-কিন্ মতর‍্যা হুডিঞ্চ্'-দ আপাত্'-এ্যা মেতাদ্-এআ—আ বাবা, ইঞ্-র‍্যা পাড়াওক' মেনাক্'-আক্'-রেআক' বাথ্রা ঘ্যান্-এ্যাম্-কা-তিঞ্-ম্যা। আদ অ˚ইদ˚রি-ত্যাত্'-এ্যা হ˚টিঞ্-আত্' -কিন্-আ।

[দ্রষ্টব্য ঃ ক্', চ্', ট্', ত্', প্'=নিরুদ্ধ (checked stop) স্পর্শ ব্যঞ্জন ; অ=/ɔ/ ; /অ˚/ə/ ঃ ইংরেজী *a*gain, chin*a* শব্দের *a*-ধ্বনির অনুরূপ]।

২২. খাসি (মোন্-খ্মের শাখা) ঃ

লা-দোন্ উ-ব্রেই উ-ব্রীব্, উ-বা লা-দোন্ আর্-ক্সুত্
ছিল-সেথা এক মানুষ, যে(=যার) ছিল দুই-জন

কি-খ্‌ন শিন্-রাঙ্। উ-বা খাদ্‌দুহ্ উ লা-ওঙ্, হা উ-ক্যপা
সন্তান পুরুষ। যে শেষ (=ছোট) সে বলিল, প্রতি পিতা

জোঙ্‌উ—কো-পা, আই-নোহ্ হা ঙাঃ কা ব্যন্তা কা-বা
নিজ পিতা, দিয়া-দাও প্রতি আমাকে ঐ ভাগ যাহা

হাঃপ্ ইআ ঙাঃ। তে উ লা-প্যন্-ইআ-ব্যন্তা হা
পড়ে প্রতি আমাকে। তখন সে বাঁটিয়া দিল প্রতি

কি কাথা উ দোন্।
তাহাদের যাহা-কিছু সে (=তার) ছিল।

[দ্রষ্টব্য : ক্য, ব্য ইত্যাদি = / kə /, / bə / (ə—অতিহ্রস্ব স্বর); আঃ = দীর্ঘতর 'আ']।

১৫.৫ ভোট-চীনা বা কিরাত গোষ্ঠী

২৩. নেওয়ারী (হিমালয়ী তিব্বতী-বর্মী শাখা) :

ছ-ম্হ মনুষ্‌ছ-য়া কাএ ম-চা নী-ম্হ দ-স্যাঁ চো-ন।
এক-জন মানুষের বালক সন্তান দুই-জন হইয়া ছিল।

চিক্-চি-ম্হ কাএ* থও ববা-য়া-কে—জি-গু অংশ-ভাগ
ছোট পুত্রদ্বারা নিজ পিতাকে—আমাকে অংশ-ভাগ

জি-ত বি-য়া-দি-স, ধাক ধাল। ধাএ-তুন্থ
আমাতে দিন, বলিয়া বলিল। কিছু-পরে

ববা-ম্হঁ অংশ-ভাগ বি-ল।
পিতা দ্বারা অংশ-ভাগ দিল।

২৪. মেইতেই/মণিপুরী (কুকি-চিন শাখা) :

মি আ-মা-গি মা-চাঃ নি-পাঃ আ-নি লাই-রাম্মি।
মানুষ একজনের তার-সন্তান পুরুষ দুই ছিল।

মা-বুঙাঃ-ঙি-গি মা-রাক্-তাঃ মা-নাঃও আ-তোম্-বাঃ
উভয়ের মধ্যে তার-পুত্র কনিষ্ঠ

আ-হু-নাঃ মা-পাঃ-দাঃ হাঃই—পাঃবাঃ, আই-না
তাহার-দ্বারা তাহার পিতাকে বলিল—বাবা, আমার-দ্বারা

ফাঙ্-গা-দা-বাঃ লান্ সারুক্, আ-হু আই-ঙোন্-দাঃ পি-বি-য়ু।
প্রাপ্তব্য সম্পত্তি অংশ, উহা আমাকে দিন।

আ-হু-দাঃ মা-পাঃ-নাঃ মা-খোই আ-নি-গি দা-মাক্
তখন তাহার পিতার দ্বারা তাহাদিগকে দুইজনের জন্য

লান্-থুম্ য়েল্-লে।
সম্পত্তি ভাগ করিল।

[দ্রষ্টব্য : আঃ = দীর্ঘতর আ]

পরিশিষ্ট ॥ ১ ॥

ভারতীয় মাতৃভাষার পরিসংখ্যান (১৯৬১)

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	মাতৃভাষা	ভাষাভাষীর সংখ্যা
১	মোট মাতৃভাষার সংখ্যা	১,৬৫২	৪৩,৮৯,৩৬,৯১৮
২	LSI স্বীকৃত মাতৃভাষার সংখ্যা	৫৭২	৪৩,৬২,২৪,৫৪৫
৩	LSI সমর্থিত নয় এমন নতুন বর্গীভূত মাতৃভাষা	৪০০	৪,২৬,০৭৬
৪	LSI সমর্থিত কিন্তু পুনর্ন্যস্ত (Re-classified)	৫০	১৯,০৮,৩৯৯
৫	অবর্গীভূত মাতৃভাষা	৫২৭	৬২,৪৩২
৬	বিদেশী ভাষা	১০৩	৩,১৫,৪৬৬

Census of India, Vol. I Part II-c(ii), Language Tables, p. ccxxiv

পরিশিষ্ট ॥ ২ ॥

সংবিধান-স্বীকৃত প্রধান ভারতীয় ভাষা (১৯৬১)

ভাষা	ভাষাভাষীর সংখ্যা	জনসংখ্যার % হার
১। হিন্দী	১৩,৩৪,৩৫,৩৬০	৩০.৩৭
২। তেলুগু	৩,৭৬,৬৮,১৩২	৮.৫৭
৩। বাঙলা	৩,৩৮,৮৮,৯৩৯	৭.৭১
৪। মারাঠী	৩,৩২,৮৬,৭৭১	৭.৫৭
৫। তামিল	৩,০৫,৬২,৭০৬	৬.৯৫
৬। উর্দু	২,৩৩,২৩,৫১৮	৫.৩১
৭। গুজরাটী	২,০৩,০৪,৪৬৪	৪.৬২
৮। কন্নড়	১,৭৪,১৫,৮২৭	৩.৯৬
৯। মালয়ালম	১,৭০,১৫,৭৮২	৩.৮৭
১০। ওড়িয়া	১,৫৭,১৯,৩৯৮	৩.৫৭
১১। পাঞ্জাবী	১,০৯,৫০,৮২৬	২.৪৯
১২। অসমীয়া	৬৮,০৩,৪৬৫	১.৫৪
১৩। কাশ্মীরী	১৯,৫৬,১১৫	০.৪৪
১৪। সিন্ধী	১৩,৭১,৯৩২	
১৫। ইংরেজী	২,২৩,৭৮১	০.০৫
১৬। সংস্কৃত	২,৫৪৪	

পরিশিষ্ট ॥ ৩ ॥

ভারতীয় প্রধান ভাষা ও ভাষিক বিন্যাস (১৯৭১)

ভাষা	জনসংখ্যা	প্রধান প্রধান ভাষাঞ্চল
১. হিন্দী	১৫,৩৭,২৯,০৬২	বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা
২. তেলুগু	৪,৪৭,০৭,৬৯৭	অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক
৩. বাঙলা	৪,৪৫,২১,৫৩৩	পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম
৪. মারাঠী	৪,১৭,২৩,৮৯৩	মহারাষ্ট্র
৫. তামিল	৩,৭৫,৯২,৭৯৪	তামিলনাড়ু
৬. উর্দু	২,৮৬,০০,৪২৮	বিহার, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও অন্যান্য রাজ্য
৭. গুজরাটী	২,৫৬,৫৬,২৭৪	গুজরাট
৮. মালয়ালম্	২,১৯,১৭,৪৩০	কেরালা
৯. কানাড়া	২,১৫,৭৫,০১৯	কর্ণাটক
১০. ওড়িয়া	১,৯৭,২৬,৭৪৫	উড়িষ্যা
১১. ভোজপুরী	১,৪৩,৪০,৫৬৪	উত্তরপ্রদেশ ও বিহার
১২. পাঞ্জাবী	১,৩৯,০০,২০২	পাঞ্জাব, দিল্লী
১৩. অসমীয়া	৮৯,৫৮,৯৭৭	আসাম
১৪. ছত্তিশগঢ়ী	৬৬,৯৩,৪৪৫	বিহার ও উত্তরপ্রদেশ
১৫. মগহী	৬৬,৩৮,৪৯৫	বিহার
১৬. মৈথিলী	৬১,২১,৯২২	বিহার
১৭. মারোয়াড়ী	৪৭,১৪,০৯৪	রাজস্থান
১৮. সাঁওতালী	৩৬,৯৩,৫৫৮	বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম
১৯. কাশ্মীরী	২৪,২১,৭৬০	জম্মু ও কাশ্মীর
২০. রাজস্থানী	২০,৯৩,৫৫৭	রাজস্থান

ভাষা	জনসংখ্যা	প্রধান প্রধান ভাষাঞ্চল
২১. কোঙ্কনী	১৫,২২,৬৮৪	কর্ণাটক, গোয়া, দমন, দিউ, মহারাষ্ট্র, কেরালা
২২. ডোগরী	১২,৯৮,৮৫৫	জম্মু ও কাশ্মীর
২৩. নেপালী	১২,৮৬,৮২৪	পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, সিকিম
২৪. গাঢ়োয়ালী	১২,৭৭,১৫১	উত্তরপ্রদেশ
২৫. পাহাড়ী	১২,৬৯,৬৫১	হিমাচলপ্রদেশ
২৬. ভীলী	১২,৫০,৩১২	মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র
২৭. কুমাওনী	১২,৩৪,৯৩৯	উত্তরপ্রদেশ
২৮. সিন্ধী	১২,০৪,৬৭৮	গুজরাট, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র
২৯. টুলু	১১,৫৬,৯৫০	কর্ণাটক
৩০. মণিপুরী	৭,৮০,৮৭১	মণিপুর
৩১. গারো	৪,১১,৫৩২	মেঘালয়
৩২. খাসী	৩,৮৪,০০৬	মেঘালয়
৩৩. মিজো	২,৭০,৩১২	মিজোরাম
৩৪. ত্রিপুরী	২,৬৮,৯৪৮	ত্রিপুরা
৩৫. ইংরেজী	১,৯১,৫৭৯	

R. C. Nigam : Language Handbook on Mother-Tongues in Census, Appendix II ; Census of India, Part II c(i), Table C-V-B ; এস্ চাকলাদার : ভারতের ভাষাসমস্যা ও রাষ্ট্রনীতি (কলিকাতা, ১৯৮১) পৃঃ ১৭৮-১৭৯।

ভাষা-সূচী
[Language-Index]

(নিম্নের ভাষাগুলির পার্শ্বস্থিত সংখ্যা পৃষ্ঠাঙ্ক-সূচক)

অ

অগারিয়া ৭০
অন্তরঙ্গ শাখা ৪১-৪২, ৪৮-৬৩
অন্তর্বর্তী শাখা ৪১-৪২, ৪৭-৪৮
অবধী ৪৭, ১৬৬-১৬৯
অবর্গীভূত ভাষা ৬৪
অর্ধমাগধী ২৪, ৬৩-৬৪
অষ্ট্রেলীয় ৬
অষ্ট্রো-এশিয়াটিক ৪, ৬৮-৭২
অষ্ট্রোনেশীয় ৫
অসমীয়া ১০৭-১২২

আ

আইরিশ ১৯
আক্কাদীয় ৯
আজটেক ১২
আথাপাস্কান ১২
আন্দামানী ৪
আবেস্তিক ২২
আমেরিকাদেশীয় ১২-১৩
আর্য দ্র. ইন্দো-ইরানীয়
আরবী ১০
আর্মেনীয় ১৭
আলতাইক ৬
আলবানীয় ১৮
আসুরী ৭০
আহোম ৬৬, ৬৭, ১১৩, ১১৫

ই

ইংরেজী ২০
ইটালীয় ১৮
ইটালিয়ান ১৮
ইথিওপীয় ১০
ইন্দো-ইউরোপীয় ৩-৪, ১৪-১৬, ৩৯
ইন্দো-ইরানীয় ১৭, ২১, ৩৯
ইন্দোনেশীয় দ্র. অষ্ট্রোনেশীয়

উ

উটো-আজটেক ১২
উরালীয় ৬
উর্দু ৫৩-৫৪, ১২৯-১৩৮

এ

এশিয়ানীয় ৮
এস্‌কিমো-অ্যালেউট ১২

এ্যা

এ্যালগঙ্কিন ১২
এ্যাসিরীয় ৯

ও

ওড়িয়া ৪৫, ৯১-১০৭
ওরাওঁ দ্র. কুরুখ
ওল্লারি ৭৫

ক

ককেশীয় ৮
কচ্ছী ১৮১, ১৮৯
কনানীয় ৯
কন্‌ওয়ারী (মুণ্ডা) ৭২
কনৌজী ৫৭, ১৫৭-১৫৯
কপ্‌টিক ১০
কৰি দ্র. অষ্ট্রোনেশীয়
কানাড়ী/কন্নড় ৭৩, ২২৮-২৩৭
কাশ্মীরী ২১-২২, ৪১, ২০২-২০৯
কাংড়ী ৫৮
কিচুয়া ১৩
কিরাতগোষ্ঠী দ্র. ভোট-চীনা
কিসান ৯৯
কুই ৭৪, ৭৫, ৯৯
কুকি-চিন ৬৭, ১১১
কুবি ৭৫
কুরুখ ৭৪, ৯৯
কুর্গী ৭৩-৭৪
কুশীয় ১০
কেকয়-অপভ্রংশ ১৮১, ১৯০
কেল্‌টিক ১৯
কোঙ্কনী ৪৪, ১৯৫-১৯৬, ২০১
কোটা ৭৪
কোড়গু দ্র. কুর্গী
কোডা ৭০ ৯৯,
কোন্দ ৭৫
কোন্ধ ৭৪, ৯৯
কোয় ৭৪
কোরা দ্র. কোডা
কোরীয় ৬
কোর্‌ওয়া ৭০
কোর্‌কু ৭০
কোল দ্র. মুণ্ডা
কোলমি ৭৫
কোশলী দ্র. পূর্বী হিন্দী

খ

খড়িআ ৭০, ৯৯
খড়ীবোলী ৫৫-৫৬, ১২৯-১৩০ ১৩৪,
১৪৫-১৪৮
খাজুনা দ্র. বুরুশাস্কী
খান্দেশী ৫৮-৫৯
খামতী ৬৫-৬৬
খাসী (খাসিয়া) ৬৯-১০৭ ১১৩-১১৪
খেরওয়ারী ৭১
খোন্দ্‌ দ্র. কোন্ধ

গ

গদব(া) ৭০, ৯৯
গান্ধারী প্রাকৃত ১৮১, ১৯০
গারো ১০৭, ১১১
গুজরাটী ৫৮, ১৭৪-১৮০

গুজরী/গোজরী/গুজ্জরী ৬০, ১৭২, ২০২, ২০৩
গোণ্ডী ৭৪, ৭৫, ৯৯
গ্রীক ১৮

চ

চীনা ৬৫, ৬৭
চীনা-তিব্বতীয় ৪, ৬৫-৬৮
চেক ১৭

ছ

ছত্রিশগঢ়ী ৪৮, ১৬৬, ১৬৭-১৬৮

জ

জয়পুরী ১৭১-১৭২
জাপানী ৬
জার্মান ২০
জার্মানিক ১৯-২০
জিপ্‌সী ২৫৭-২৫৯
জুয়াঙ্‌ ৭০, ৯৯

ট

টুলু ৭৩-৭৪
টোডা ৭৪

ঠ

ঠেঠ হিন্দী ৫০, ১৩৪, ১৩৯

ড

ডাচ ২০
ডিঙ্গল ১৭৭
ড্যানিশ ১৯
ডোগরী ৫৮, ১৮৫, ২০৩

ঢ

ঢুণ্ডারী ১৭১-১৭২

ত

তাই দ্র. শ্যামীয়
তাই-চীনা ৬৫-৬৬
তামিল ৭৩, ২১০-২২১
তাসমানীয় ৬
তিব্বতী ৬৬
তুখারীয় ২০
তুরী ৭০
তেলুগু ৭৩, ৯৯-১০০, ২৩৮-২৪৪

থ

থরেলী/থরী ১৮৯

দ

দখনী-হিন্দোস্তানী ১৩০-১৩২
দর্দিক ২১, ৪০
দ্রাবিড় ৪, ৭৩-৭৬

ন

নইকি ৭৫
নরওয়েজিয়ান ১৯
নাগা ৬৭
নাহুয়াট্‌ল দ্র. আজটেক
নিকোবরী ৬৯-৭০
নিষাদ গোষ্ঠী
দ্র. অষ্ট্রো-এশিয়াটিক

নেওয়ারী ৬৭, ২৫১
নেপালী ৬২, ২৪৫-২৫৪

প

পড়ীবোলী ১৩০
পপুয়ান ৫
পর্জি ৭৫,৯৯
পর্তুগীজ ১৮
পরভু (মারাঠী) ১৯৫
পশ্চিমা পাঞ্জাবী দ্র. লহ্ন্দা
পশ্চিমা হিন্দী ৪৮-৫২,১৬৮-১৬৯
পলিনেশীয় দ্র. অষ্ট্রোনেশীয়
পাঞ্জাবী ৫৭-৫৮,১৮১-১৮৮
পারেঙ্গা ৯৯
পারসীক (প্রাচীন) ২২-২৩
পালি ২৩,৬৩-৬৪
পাহাড়ী ৬১-৬৩
পিউনিক ৯
পিঙ্গল ১৭৭
পিশাচ দ্র. দর্দিক
পূর্বী হিন্দী ৪৭, ১৬৬-১৬৯
পেঙ্গু ৯৯
পৈশাচী প্রাকৃত ১৮১
প্রাকৃত ২৪,৬৩-৬৪

ফ

ফরাসী ১৮
ফারসী ২৩
ফিনিসীয় দ্র. সেমীয়-হামীয়
ফিন্নো-উগ্রীয় ৬

ফ্রিজীয় ২০
ফ্লেমিশ ২০

ব

বঘেলী ৪৮,১৬৬,১৬৭
বঘেলখণ্ডী দ্র. বঘেলী
বঞ্জারী ১৭২
বর্মী ৬৭
বহিরঙ্গ শাখা ৪১-৪২, ৪৩-৪৭
ব্রজভাষা/ভাখা ৫৬,১৪৮-১৫৪
বাঙ্গরু ৫৬,১৫৯-১৬০
বাঙলা ৪৬,৭৭-৯৮
বান্টু ১১
বাল্টো-শ্লাবিক ১৭
বাস্ক ৮
বাহাসা ইন্দোনেশিয়া দ্র. অষ্ট্রোনেশীয়
ব্রাচড অপভ্রংশ ১৯০
ব্রাহুই ৭৩,৭৪
বিদেশী ভাষা ৬৪
বির্জিঅ/বিন্ঝিঅ ৭০,৯৯
বিরহোড় ৭০
বিহারী ৪৫-৪৬,১২২-১২৮
বুন্দেলী/বুন্দেলখণ্ডী ৫৭, ১৫৪-১৫৭
বুরুশাস্কী ৫
বুল্গেরীয় ১৭
বেরারী (মারাঠী) ১৯৬-১৯৭
ব্যাবিলোনীয় দ্র. আক্কাদীয়
বোডো/বোরো ৬৬-৬৭ ১০৭, ১১১, ১১৭-১১৮

ভ

ভারতীয় আর্য ২৩-২৪, ৪১-৪২
ভারিআ ৭৩, ৭৫
ভিলী ৫৮-৫৯
ভূমিজ ৭০, ৯৯
ভূঁয়া ৯৯
ভোজপুরী ১২২-১২৪
ভোট-চীনা ৪,৬৫-৬৮
ভোট-বর্মী ৬৬-৬৭,১১১
ভোট-হিমালয়ী ৬৬,১১০
ভোটিয়া দ্র. তিব্বতী

ম

মগহী/মগধী ১২৪-১২৬
মণিপুরী ৬৭, ১১১-১১২
মাইক্রোনেশীয় দ্র. অষ্ট্রোনেশীয়
মাঝি ১৮৫
মারাঠী ৪৪, ১৯৪-২০১
মারোয়াড়ী ১৭০-১৭১
মালবৈ ১৮৫
মালয়ালম্ ৭৩,২২২-২২৮
মালয়ো-পলিনেশীয় ৫
মাল্তো ৭৪
মাল্পাহাড়ী দ্র. মাল্তো
মিজো ১১২
মিশরীয় দ্র, সেমীয়-হামীয়
মুণ্ডা ৭০-৭২
মুণ্ডারী ৭০,৭১,৯৯
মূলতানী ১৮৪-১৮৫
মেইতেই দ্র. মণিপুরী
মেক্সীয় ১২
মেলানেশীয় দ্র. অষ্ট্রোনেশীয়
মৈথিলী ১২৬-১২৮
মোন্-খ্মের ৬৯-৭০
মোয়াবাইট ৯

য়

য়িড্ডিশ ২০
যবদ্বীপীয় দ্র. অষ্ট্রোনেশীয়

র

রাজস্থানী ৫৯-৬০,১৭০-১৭৩
রুশীয় ১৭
রেখ্তা ৫৪, ১৩৩
রোমনী দ্র. জিপসী

ল

লধাদি ৭৩,৭৫
লমনী/লম্বড়ী ১৭২
লহ্ন্দা ৪৩, ১৮১-১৮২, ১৮৪-১৮৫
লা-তি ৬
লিথুয়ানীয় ১৭
লিবীয়-বের্বের ১০
লুশেই দ্র. মিজো

শ

শবর/শোরা ৭০,৯৯
শ্যামীয় ৬৬,৬৭
শ্লাবিক ১৭

স

সলুর ৭৫
সাঁওতালী/সান্তালী ৭০, ৭১, ৯৯
সিন্ধী ৪৩, ১৮৯-১৯৩
সিংহলী ২৫৪-২৫৬
সুইডিশ ১৯
সুদানী-গিনীয় ৮
সেমীয়-হামীয় ৯
সংস্কৃত ৬৩
স্প্যানিশ ১৮

হ

হটেনটট্-বুশম্যান ১১
হরিয়ানী দ্র. বাঙ্গরু
হলবী (মারাঠী) ১৯৬,১৯৭, ২০০-২০১
হাইপারবোরীয় ৭
হাউস্‌সা দ্র. সুদানী-গিনীয়
হামীয় দ্র. সেমীয়-হামীয়
হিট্টাইট/হিট্টী ২০
হিন্দী (আদর্শ) ৫২-৫৩,১৬০-১৬৫
হিন্দী ১৩৮-১৬৫
হিন্দুস্তানী/হিন্দুস্থানী ৫৪-৫৫, ১৩০, ১৪১-১৪২
হিন্দ্‌কী দ্র. লহ্‌ন্দা
হিন্দবী/হিন্দ্বী ১৩০
হিব্রু দ্র. সেমীয়-হামীয়
হিমালয়ী ৬৬
হো ৭০,৯৯

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৬	২১	ধাঁধাঁ	ধাঁধা
৯৮	২৯	সাথী	সাখী
১০৩	পাদটীকা ১	MOA	HOM
১০৬	পাদটীকা ৪	আবিস্তৃত লোচনা	বিস্তৃত আলোচনা
১০৯	২৭	Palaeho-	Palaeo-
১৫৩	২৩	হৈঁ/হৌঁ	হৌঁ/হৈঁ
১৫৬	২৮	ম্তুহারা	তুম্হারা
১৬৫	১	Agenlative	Agentative
১৭৩	পাদটীকা ২	বাভাপা	বাভাপ
২৬৫	২৩	$k\bar{a}m_n$	$k\bar{a}m^u$

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্য
শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার এম. এ., ডি. লিট্
কালীন উভয় বাংলার এক অগ্রণী ভাষাতাত্ত্বিক।
তাঁর রবীন্দ্র-পুরস্কার-সম্মানিত "সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ" এবং "বাংলা ভাষা পরিক্রমা" নামক বৃহৎ গ্রন্থদুটি প্রামাণিকতায় ও বিশ্লেষণে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদান হিসাবে সকলেরই স্বীকৃতি লাভ করেছে। "আধুনিক ভারতীয় ভাষা প্রসঙ্গে" গ্রন্থে অধ্যাপক মজুমদার এক দুরূহ ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন। আজকের ভারতের রাজনৈতিক আবর্তের যে মূল সঙ্কট তা হল জাতীয় সংহতির এবং নিঃসন্দেহেই এই সংহতির প্রশ্নে ভাষা-সমস্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সার্থক সমন্বয়ে সেই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরেছেন তিনি তাঁর এই বইয়ে। আলোচনা কেবল ভারতের সংবিধান স্বীকৃত প্রধান ভাষাগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তিনি নানান উপভাষা, এমন কি বিদেশী ভাষা যা ভারতে আজ সাধারণের স্বীকৃত, তাদেরও বিস্তারিত বিচার করেছেন। গ্রীয়ার্সনের ভাষিক বিন্যাস মেনে নিলেও, পাঠকদের সুবিধার জন্যে ভাষাগুলিকে তিনি ন্যস্ত করেছেন আঞ্চলিক পরিসীমায়। যেমন তিনি বিচার করেছেন আর্য-ভাষাগুলির তেমনই আর্যেতর ভাষাগুলিরও। প্রসঙ্গত এসেছে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর নিজস্ব আশা-আকাঙ্খা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের কথাও। আজকের ভারতের ভাষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে সম্যক ভাবে অনুধাবন করতে এ বই কেবল ভাষা-তাত্ত্বিকদের কাছে নয়, সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনীতিকদের কাছেও অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে।